শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ

দশম সম্ভার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ষোড়শী

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র-পরিচয়

—পুরুষ—

জীবানন্দ চৌধুরী	...	চণ্ডীগড়ের জমিদার
প্রফুল্ল রায়	...	জীবানন্দের সেক্রেটারী
এককড়ি নন্দী	...	ঐ গোমস্তা
জনার্দ্দন রায়	...	মহাজন
নির্ম্মল বসু	...	ঐ জামাতা ও ব্যারিস্টার
শিরোমণি	...	ব্রাহ্মণ পণ্ডিত
তারাদাস চক্রবর্ত্তী	...	ষোড়শীর পিতা
সাগর সর্দ্দার	...	ষোড়শীর অনুচর

পূজারী. ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্‌সপেক্টর, সাব্‌ ইন্‌সপেক্টর, বল্লভ ডাক্তার, ফকির, হরিহর, বিশ্বম্ভর, ভিক্ষুকদ্বয়, মহাবীর, বেহারা, ভৃত্য, পথিক, গাড়োয়ান. পাইকগণ, ইত্যাদি

—স্ত্রী—

ষোড়শী	...	গড়চণ্ডীর ভৈরবী
হৈমবতী	...	জনার্দ্দনের কন্যা ও নির্ম্মলের স্ত্রী

ভিক্ষুক-কন্যা, নারীগণ, ইত্যাদি

ষোড়শী

(দেনা পাওনা)

১০খ—১

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চণ্ডীগড় ঃ গ্রাম্যপথ

[বেলা অপরাহ্ণপ্রায়। চণ্ডীগড়ের সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথের 'পরে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামিয়া আসিতেছে। অদূরে বীজগাঁ'র জমিদার কাছারি-বাটীর ফটকের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। জন-দুই পথিক দ্রুতপদে চলিয়া গেল ; তাহাদেরই পিছনে একজন কৃষক মাঠের কর্ম্ম শেষ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিল, তাহার বাঁ কাঁধে লাঙ্গল, ডান হাতে ছড়ি, অগ্রবর্ত্তী অদৃশ্য বলদযুগলের উদ্দেশ্যে হাঁকিয়া বলিতে বলিতে গেল, "ধলা, সিধে চ' বাবা, সিধে চল্! কেলো, আবার আবার। আবার পরের গাছপালায় মুখ দেয়!"

কাছারির গোমস্তা এককড়ি নন্দী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল এবং উৎকণ্ঠিত শঙ্কায় পথের একদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় গলা বাড়াইয়া কিছু একটা দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার পিছনের পথ দিয়া দ্রুতপদে বিশ্বম্ভর প্রবেশ করিল। সে কাছারির বড় পিয়াদা, তাগাদায় গিয়াছিল, অকস্মাৎ সংবাদ পাইয়াছে বীজগাঁ'র নবীন জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী চণ্ডীগড়ে আসিতেছেন। ক্রোশ-দুই দূরে তাঁহার পাল্‌কী নামাইয়া বাহকেরা ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লইতেছিল, আসিয়া পড়িল বলিয়া।]

বিশ্বম্ভর। নন্দীমশাই, দাঁড়িয়ে করতেছ কি? হুজুর আসচেন যে!

এককড়ি। (চমকিয়া মুখ ফিরাইল। এ দুঃসংবাদ ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে তাহার কানে পৌঁছিয়াছে। উদাস-কণ্ঠে কহিল) হুঁ।

বিশ্বম্ভর। হুঁ কি গো। স্বয়ং হুজুর আসছেন যে!

এককড়ি। (বিকৃত-স্বরে) আসচেন ত আমি করব কি? খবর নেই, এত্তালা নেই—হুজুর আসচেন! হুজুর বলে ত আর মাথা কেটে নিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। (এই আকস্মিক উত্তেজনার অর্থ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া একমুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া শুধু কহিল) আরে, তুমি কি মরিয়া হয়ে গেলে নাকি?

এককড়ি। মরিয়া কিসের! মামার বিষয় পেয়েচে বই ত কেউ আর বাপের বিষয় বলবে না। তুই জানিস্ বিশু, কালিমোহনবাবু ওকে দূর করে দিয়েছিল, বাড়ি ঢুকতে পর্য্যন্ত দিত না। তেজ্যপুত্তুরের সমস্ত ঠিক-ঠাক, হঠাৎ খামোকা মরে গেল বলেই ত জমিদার! নইলে থাকতেন আজ কোথায়? আমি জানিনে কি!

বিশ্বম্ভর। কিন্তু জেনে সুবিধেটা কি হচ্ছে শুনি। এ মামা নয়, ভাগ্নে। ওকথা ঘুণাগ্রে কানে গেলে ভিটেয় তোমার সন্ধ্যে দিতেও কাউকে বাকী রাখবে না। ধরবে আর দুম্ করে গুলি করে মারবে। এমন কত গণ্ডা এরই মধ্যে মেরে পুঁতে ফেলেচে জানো? ভয়ে কেউ কথাটি পর্য্যন্ত কয় না।

এককড়ি। হুঁঃ—কথা কয় না! মগের মুল্লুক কি-না!

বিশ্বম্ভর। আরে মাতাল যে! তার কি হুঁশ্ পবন আছে, না, দয়া-মায়া আছে! বন্দুক-পিস্তল ছুরি-ছোরা ছাড়া এক পা কোথাও ফেলে না। মেরে ফেললে তখন করবে কি শুনি?

এককড়ি। তুই ত সেদিন সদরে গিয়েছিলি—দেখেচিস তাকে?

বিশ্বম্ভর। না, ঠিক দেখিনি বটে, তবে সে দেখাই। ইয়া গাল-পাট্টা, ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি, জবাফুলের মত চোখ ভাঁটার মত বন্ বন্ করে ঘুরচে—

এককড়ি। বিশু, তবে পালাই চ'।

বিশ্বম্ভর। আরে পালিয়ে ক'দিন তার কাছে বাঁচবে নন্দীমশাই? চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে এনে খাল খুঁড়ে পুঁতে ফেলবে।

এককড়ি। কি তবে হবে বল? মাতালটা যদি বলে বসে শান্তিকুঞ্জেই থাকব?

বিশ্বম্ভর। কতবার ত বলেচি নন্দীমশাই, এ কাজ ক'রো না, ক'রো না, ক'রো না। বছরের পর বছর খাতায় কেবল শান্তিকুঞ্জের মিথ্যে মেরামতি খরচই লিখে গেলে, গরীবের কথায় ত আর কান দিলে না।

এককড়ি। তুইও ত কাছারির বড় সর্দ্দার, তুইও তো—

বিশ্বম্ভর। দেখ, ও-সব শয়তানি ফন্দি ক'রো না বলচি। আমার ওপর দোষ চাপিয়েছ কি—ওগো; ওই যে একটা পাল্‌কী দেখা যায়!

[নেপথ্যে বাহকদিগের কণ্ঠধ্বনি শুনা গেল। বিশ্বম্ভর পলায়নোদ্যত এককড়ির হাতটা ধরিয়া ফেলিতেই সে নিজেকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে করিতে]

এককড়ি। ছাড়্‌না হারামজাদা।

বিশ্বম্ভর। (অত্যুচ্চ-চাপা কণ্ঠে) পালাচ্চো কোথায়? ধরলে গুলি করে মারবে যে!

[এমনি সময় পাল্‌কী সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে উভয়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পালকীর অভ্যন্তরে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বসিয়াছিলেন; তিনি ঈষৎ একটুখানি মুখ বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন]

জীবানন্দ। ওহে, এ গ্রামে জমিদারের কাছারি-বাড়িটা কোথায় তোমরা কেউ বলে দিতে পার?

এককড়ি। (করজোড়ে) সমস্তই ত হুজুরের রাজ্য।

জীবানন্দ। রাজ্যের খবর জানতে চাইনি। কাছারিটার খবর জানো?

এককড়ি। জানি হুজুর। ওই যে।

জীবানন্দ। তুমি কে?

[এককড়ি ও বিশ্বম্ভর উভয়ে হাঁটু গাড়িয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

এককড়ি। হুজুরের নফর এককড়ি নন্দী।

জীবানন্দ। ওহো, তুমিই এককড়ি, চণ্ডীগড়-সাম্রাজ্যের বড়কর্ত্তা? কিন্তু দেখ এককড়ি, একটা কথা বলে রাখি তোমাকে। চাটুবাক্য অপছন্দ করিনে সত্যি, কিন্তু তার একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকাটাও পছন্দ করি। এটা ভুলো না। তোমার কাছারির তসিল কত?

এককড়ি। আজ্ঞে, চণ্ডীগড় তালুকের আয় প্রায় হাজার-পাঁচেক টাকা।

জীবানন্দ। হাজার-পাঁচেক?—বেশ।

[বাহকেরা পাল্‌কী নীচে নামাইল। জীবানন্দ অবতরণ করিলেন না, শুধু পা দুটা বাহির করিয়া ভূমিতলে রাখিয়া সোজা হইয়া কহিলেন]

বেশ। আমি এখানে দিন পাঁচ-ছয় আছি, কিন্তু এরই মধ্যে আমার হাজার-দশেক টাকা চাই এককড়ি। তুমি সমস্ত প্রজাদের খবর দাও যেন কাল তারা এনে কাছারিতে হাজির হয়।

এককড়ি। যে আজ্ঞে। হুজুরের আদেশে কেউ গরহাজির থাকবে না।

জীবানন্দ। এ গাঁয়ে দুষ্ট বজ্জাত প্রজা কেউ আছে জানো?

এককড়ি। আজ্ঞে, না তা এমন কেউ—শুধু তারাদাস চক্কোত্তি—তা সে আবার হুজুরের প্রজা নয়।

জীবানন্দ। তারাদাসটা কে?

এককড়ি। গড়চণ্ডীর সেবায়েত।

জীবানন্দ। এই লোকটাই কি বছর-দুই পূর্ব্বে একটা প্রজা-উৎখাতের মামলায় আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল?

এককড়ি। (মাথা নাড়িয়া) হুজুরের নজর থেকে কিছুই এড়ায় না। আজ্ঞে, এই সেই তারাদাস।

জীবানন্দ। হুঁ। সেবার অনেক টাকার ফেরে ফেলে দিয়েছিল। এ কতখানি জমি ভোগ করে?

এককড়ি। (মনে মনে হিসাব করিয়া) ষাট-সত্তর বিঘের কম নয়।

জীবানন্দ। একে তুমি আজই কাছারিতে ডেকে আনিয়ে জানিয়ে দাও যে, বিঘে-প্রতি আমার দশ টাকা নজর চাই।

এককড়ি। (সঙ্কুচিত হইয়া) আজ্ঞে, সে যে নিষ্কর দেবোত্তর, হুজুর!

জীবানন্দ। না, দেবোত্তর এ-গাঁয়ে একফোঁটা নেই। সেলামি না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এককড়ি। আজই তাকে হুকুম জানাচ্ছি।

জীবানন্দ। শুধু হুকুম জানানো নয়, টাকা তাকে দু'দিনের মধ্যে দিতে হবে।

এককড়ি। কিন্তু হুজুর…

জীবানন্দ। কিন্তু থাক্ এককড়ি। এই সোজা বারুইয়ের তীরে আমার শান্তিকুঞ্জ না? মহাবীর, পাল্‌কী তুলতে বল।

[বাহকেরা পাল্‌কী লইয়া প্রস্থান করিল।]

এককড়ি। যা ভেবেচি তাই যে ঘটল রে বিশু! এ যে গিয়ে সোজা শান্তিকুঞ্জেই ঢুকতে চায়।

বিশ্বম্ভর। নয় ত কি তোমার কাছারির খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে চাইবে?

এককড়ি। সেখানে হয়ত ঢোকবার পথ নেই। হয়ত দোর-জানালা সব চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে, হয়ত তার ঘরে ঘরে বাঘ-ভালুকে বসবাস করে আছে—সেখানে কি আছে আর কি যে নেই, কিছুই যে জানিনে বিশ্বম্ভর!

বিশ্বম্ভর। আমিই কি জানি না-কি তোমার দোর-জানালার খবর? আর বাঘ-ভালুকের কাছে ত আমি খাজনা আদায়ে যাইনি গো!

এককড়ি। এই রাত্তিরে কোথায় আলো, কোথায় লোকজন, কোথায় খাবার-দাবার—

বিশ্বম্ভর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলে লোকজন জুটতে পারে, কিন্তু আলো আর খাবার-দাবার—

এককড়ি। তোর কি! তুই ত বসবিই রে নচ্ছার পাজি ব্যাটা হারামজাদা—

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

শান্তিকুঞ্জ

[বারুই নদীতীরে বীজগাঁ'র জমিদার ৺রাধামোহনের নির্ম্মিত বিলাসভবন শান্তিকুঞ্জ। সংস্কারের অভাবে আজ তাহা জীর্ণ, শ্রীহীন, ভগ্নপ্রায়। তাহারই একটা কক্ষে তক্তা-পোষের উপর বিছানা, বিছানায় চাদরের অভাবে বহুমূল্য শাল পাতা; শিয়রের দিকে একটা গোল টেবিল, তাহাতে মোটা বাঁধানো একখানা বইয়ের উপর আধপোড়া একটা মোমবাতি। তাহারই পাশে একটা পিস্তল। হাতের কাছে একটা টুল, তাহাতে সোডার বোতল, সুরাপূর্ণ গ্লাস ও মদের বোতল, বোতলটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—পার্শ্বে দামী একটা সোনার ঘড়ি—ঘড়িটা ছাইয়ের আধারস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—আধপোড়া একখণ্ড চুরুট হইতে তখনও ধূমের রেখা উঠিতেছে। সম্মুখের দেয়ালে গোটা-দুই নেপালী কুক্‌রী টাঙানো, কোণে একটা বন্দুক ঠেস্ দিয়া রাখা, তাহারই অদূরে মেঝের উপর একটা শৃগালের মৃতদেহ হইতে রক্তের ধারা বহিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটা শূন্য মদের বোতল। একটা ডিসে উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশেষ তখনও পরিষ্কৃত হয় নাই, ইহারই সন্নিকটে একটা দামী ঢাকাই চাদরে হাত মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—সেটা মেঝেতে লুটাইতেছে। জীবানন্দ চৌধুরী বিছানায় আড় হইয়া পড়িয়া। পায়ের দিকের জানালাটা ভাঙ্গা, তাহার ফাঁক দিয়া বাহিরের একটা গাছের ডালের খানিকটা ভিতরে ঢুকিয়াছে। দুইদিকে দুইটি দরজা—দরজা ঠেলিয়া জীবানন্দের সেক্রেটারী প্রফুল্ল প্রবেশ করিল।]

প্রফুল্ল। সেই লোকটা এখানেও এসেছিল দাদা।

জীবানন্দ। কে বল ত?

প্রফুল্ল। সেই মাদ্রাজী সাহেবের কর্ম্মচারী, যিনি আখের চাষ আর চিনির কারখানার জন্যে সমস্ত দক্ষিণের মাঠটা কিনতে চান। সত্যই কি ওটা বিক্রী করে দেবেন?

জীবানন্দ। নিশ্চয়। আমার এখন ভয়ানক টাকার দরকার।

প্রফুল্ল। কিন্তু অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হবে।

জীবানন্দ। তা হবে, কিন্তু আমার সর্ব্বনাশটা বাঁচবে।

প্রফুল্ল। আর একটি লোক বাইরে বসে আছেন, তাঁর নাম জনার্দ্দন রায়। আসতে বলব?

জীবানন্দ। না ভায়া, এখন থাক্। সাধু-সন্দর্শন যখন-তখন করতে নেই—শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

প্রফুল্ল। (হাসিয়া) লোকটা শুনেছি খুব ধনী।

জীবানন্দ। শুধু ধনী নয়, গুণী। চিঠি, খত, তমস্থক, দলিল, যথা-ইচ্ছা ইনি প্রস্তুত করে দিতে পারেন—নকল নয়, অনুকরণ নয়, একেবারে অভিনব, অপূর্ব্ব; যাকে বলে সৃষ্টি। মহাপুরুষ ব্যক্তি।

প্রফুল্ল। এ-সব লোককে প্রশ্রয় দেবেন না দাদা।

জীবানন্দ। তার প্রয়োজন নেই প্রফুল্ল, ইনি নিজের প্রতিভায় যে উচ্চে বিচরণ করেন, আমার প্রশ্রয় সেখানে নাগাল পাবে না।

প্রফুল্ল। শুনলাম সমস্ত মাঠটা আপনার একার নয়, দাদা। এ সম্বন্ধে—

জীবানন্দ। না। প্রফুল্ল, এ-সম্বন্ধে তোমাকে আমি কথা কইতে দেব না। দেনায় গলা পর্য্যন্ত ডুবে আছি, এর পরে তোমার সৎ-অসতের ভূত ঘাড়ে চাপলে আর রসাতলে তলিয়ে যাবার দেরি হবে না।

[একপাত্র মদ পান করিয়া]

জীবানন্দ। তুমি ভাবচ রসাতলের দেরি বা কত? দেরি নেই সে আমি জানি। আরও একটা কথা তোমার চেয়ে বেশী জানি প্রফুল্ল, এর কূল-কিনারাও নেই।

[প্রফুল্ল নিঃশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিল।]

জীবানন্দ। তোমার মস্ত দোষ প্রফুল্ল, শেষ হওয়া জিনিসটাও নিঃশেষ হচ্ছে শুনলে তোমার চোখ ছল্ ছল্ করে আসে। যাও তো ভায়া এককড়িকে পাঠিয়ে দাও ত। আর দেখ, তোমাকে একবার সদরে গিয়ে মাদ্রাজী সাহেবের সঙ্গে পাকা কথা কইতে হবে। বুঝলে?

প্রফুল্ল। (মাথা নাড়িয়া) তা হলে এখনো ত বেলা আছে, আজই ত যেতে পারি। সাহেবের সঙ্গে গাড়ি আছে।

জীবানন্দ। বেশ, তা হলে এঁর গাড়িতে যাও।

[প্রফুল্লর প্রস্থান ও এককড়ির প্রবেশ।]

জীবানন্দ। টাকা আদায় হচ্ছে এককড়ি?

এককড়ি। হচ্ছে হুজুর।

জীবানন্দ। তারাদাস টাকা দিলে?

এককড়ি। সহজে দিতে চায়নি। শেষে কান ধরে ঘোড়-দৌড়, ব্যাঙের নাচ নাচাবার প্রস্তাব করতেই দিতে রাজি হয়ে বাড়ি গেছে। আজ দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দ। তার পরে ?

এককড়ি। মহাবীর সিংকে সঙ্গে দিয়ে হুজুরের পাল্‌কী বেহারাদের পাঠিয়েছি তাকে ধরে আনতে।

জীবানন্দ। (মদ্যপান করিয়া) ঠিক হয়েচে। তোমাদের এখানে বোধ করি বিলিতি মদের দোকান নেই। তা না থাক্‌, যা আমার সঙ্গে আছে তাতেই এ ক'টা দিন চলে যাবে। কিন্তু আরও একটা কথা আছে এককড়ি।

এককড়ি। আজ্ঞে করুন ?

জীবানন্দ। দেখ এককড়ি, আমি বিবাহ—হাঁ—বিবাহ আমি করিনি—বোধ হয় কখনো করবও না। (একটু পরে) কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব—বলি মহাভারত পড়েচ ত ? তার ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি—শুকদেব হয়েও উঠিনি—বলি কথাটা বুঝলে ত এককড়ি ? ওটা চাই !

[এককড়ি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল]

জীবানন্দ। অপর সকলের মত যাকে তাকে দিয়ে এ-সব কথা বলাতে আমি ভালোবাসিনে, তাতে ঠকতে হয়। আচ্ছা এখন যাও।

এককড়ি। আমি তারাদাসকে দেখি গে। সে এর মধ্যে প্রজা বিগড়ে না দেয়।

[যাইতেছিল]

জীবানন্দ। প্রজা বিগড়ে দেবে ? আমি উপস্থিত থাকতে ?

এককড়ি। হুজুর, পারে ওরা।

জীবানন্দ। তারাদাসকেই ত জানি, আবার 'ওরা' এল কারা ?

এককড়ি। চক্কোত্তির মেয়ে ভৈরবী। নইলে চক্কোত্তিমশাই নিজে তত মন্দ লোক নয় ; কিন্তু মেয়েটাই হচ্চে আসল সর্ব্বনাশী। দেশের যত বোম্বেটে বদ্‌মাসগুলো হয়েচে যেন একেবারে তার গোলাম।

জীবানন্দ। বটে ! কত বয়স ? দেখতে কেমন ?

[ঘরের মধ্যে ক্রমশঃ সন্ধ্যার আবছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।]

এককড়ি। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর ত সে যেন এক কাটখোট্টা সিপাই ! না আছে মেয়েলি ছিরি, না আছে মেয়েলি ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলচে। তাতেই ত দেশের ছোটলোক-গুলো মনে করে গড়ের উনিই হচ্চেন সাক্ষাৎ চণ্ডী।

জীবানন্দ। (উৎসাহ ও কৌতূহলে সোজা উঠিয়া বসিয়া) বল কি এককড়ি ? ভৈরবীর ব্যাপারটা কি খুলে বল ত শুনি ?

এককড়ি। ভৈরবী ত কারু নাম নয় হুজুর। গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের ওই হ'লো উপাধি। বর্ত্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী, এর আগে যিনি ছিলেন তাঁর নাম ছিল মাতঙ্গিনী। মার আদেশে তাঁর সেবায়েত কখনো পুরুষ হতে পারে না, চিরদিন মেয়েরাই হয়ে আসচে।

জীবানন্দ। তাই নাকি? এ ত কখনো শুনিনি!

এককড়ি। মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীকে আর ভৈরবীর স্পর্শ করবারও জো নেই। তাই দূরদেশ থেকে দুঃখী গরীবদের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনো কেউ তার ছায়াও দেখতে পায় না। এই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসচে।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) বল কি এককড়ি, একেবারে দেশান্তর? ভৈরবী মানুষ, রাত্রে নিরিবিলি একপাত্র সুধা ঢেলে দেওয়া—গরমমশলা দিয়ে চাট্টি মহাপ্রসাদ রেঁধে খাওয়ানো—একেবারে কিছুই করতে পায় না?

এককড়ি। (মাথা নাড়িয়া) না হুজুর, মায়ের ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করতে নেই, কিন্তু তাই বলে কি স্বামী ছাড়া গাঁয়ে আর পুরুষ নেই? মাতু ভৈরবীকেও দেখেচি, ষোড়শী ভৈরবীকেও দেখচি। লোকগুলো কি আর খামোকা—তার সাক্ষী দেখুন না—কথায় কথায় হুজুরের সঙ্গেই মামলা-মোকদ্দমা বাধিয়ে দেয়!

জীবনানন্দ। মেয়ে-মোহাস্ত আর কি! তাতে দোষ নেই। এককড়ি, আলোটা জ্বালো ত।

এককড়ি। (আলো জ্বালিয়া) এখন আসি হুজুর।

জীবানন্দ। আচ্ছা যাও। বইখানা দিয়ে যাও ত।

[বই দিয়া প্রণাম করিয়া এককড়ি প্রস্থান করিল। জীবানন্দ শুইয়া পুস্তকে মনোনিবেশ করিলেন। একটু পরে বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ হইল।]

জীবানন্দ। কে?

সর্দ্দার। (ষোড়শীকে লইয়া প্রবেশ করিয়া কহিল) শালা তারাদাস ভাগ্‌ গিয়া। হুজুর, উস্‌কো বেটীকো পাকড় লায়া।

জীবানন্দ। (বই ফেলিয়া ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া বিস্মিতভাবে) কাকে? ভৈরবীকে? (কিছুক্ষণ পরে) ঠিক হয়েচে। আচ্ছা যা।

[সর্দ্দার অনুচর পাইকদের লইয়া প্রস্থান করিল।]

জীবানন্দ। তোমাদের আজ টাকা দেবার কথা। টাকা এনেচ? (ষোড়শীর কণ্ঠস্বর ফুটিল না) আনোনি জানি। কিন্তু কেন?

ষোড়শী। আমাদের নেই।

জীবানন্দ। না থাকলে সমস্ত রাত্রি তোমাকে পাইকদের ঘরে আটকে থাকতে হবে, তার মানে জানো।

[ষোড়শী দ্বারের চৌকাঠটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া মূর্চ্ছা হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ভয়ানক বিবর্ণ মুখের চেহারা জীবানন্দের চোখে পড়িল, মিনিট-খানেক সে কেমন যেন আচ্ছন্নের ন্যায় বসিয়া রহিল। তার পরে বাতির আলোটা হঠাৎ হাতে তুলিয়া লইয়া ষোড়শীর কাছে গেল। আলোটা তাহার মুখের সম্মুখে ধরিয়া একদৃষ্টে ষোড়শীর গৈরিক বস্ত্র, তাঁহার এলায়িত রুক্ষ কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল সুস্থ ঋজু দেহ, সমস্তই সে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে পর]

জীবানন্দ। (ফিরিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া দিয়া মদের বোতল হইতে কয়েক পাত্র উপর্য্যুপরি পান করিয়া) তোমার নাম ষোড়শী, না? (ষোড়শী নীরব) তোমার বয়স কত? (কোন উত্তর না পাইয়া কঠিন-স্বরে) চুপ করে থেকে বিশেষ কোন লাভ হবে না, জবাব দাও।

ষোড়শী। (মৃদু-স্বরে) আমার বয়স আটাশ।

জীবানন্দ। বেশ। তা হলে খবর যদি সত্য হয় ত, এই উনিশ-কুড়ি বৎসর ধরে তুমি ভৈরবীগিরি করচ; খুব সম্ভব অনেক টাকা জমিয়েচ। দিতে পারবে না কেন?

ষোড়শী। আপনাকে আগেই ত জানিয়েচি আমার টাকা নেই?

জীবানন্দ। না থাকলে আরও দশজনে যা করচে তাই কর। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে জমি বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রী করে হোক দাও গে।

ষোড়শী। তারা পারে, জমি তাদের। কিন্তু দেবতার সম্পত্তি বাঁধা দেবার, বিক্রী করবার ত আমার অধিকার নেই।

জীবানন্দ। (হঠাৎ হাসিয়া) নেবার অধিকার কি ছাই আমারই আছে? এক কপর্দ্দকও না। তবুও নিচ্চি, কেন না আমার চাই। এই চাওয়াটাই হচ্চে সংসারের খাঁটী অধিকার, তোমারও যখন দেওয়া চাই-ই, তখন—বুঝলে? (কিছু পরে) যাক, এত রাত্রে কি একা বাড়ি যেতে পারবে? যাদের সঙ্গে তুমি এসেছিলে তাদের আমি সঙ্গে দিতে চাইনে।

ষোড়শী। (সবিনয়ে) আপনার হুকুম হলেই যেতে পারি।

জীবানন্দ। (সবিস্ময়ে) একলা? এই অন্ধকার রাত্রে? ভারী কষ্ট হবে যে! (হাসিতে লাগিল।)

ষোড়শী। না, আমাকে এখ্খুনি যেতেই হবে।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) বেশ ত, টাকা না হয় নাই দেবে ষোড়শী। তা ছাড়া আরো অনেক রকমের স্থবিধে—

ষোড়শী। আপনার টাকা, আপনার স্থবিধা আপনারই থাক্, আমাকে যেতে দিন।

[কয়েক পা অগ্রসর হইয়া সেই পাইকদের সম্মুখে কিছুদূরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আপনিই থমকিয়া দাঁড়াইল।]

জীবানন্দ। (মুখ অন্ধকার করিয়া কঠিন-স্বরে) তুমি মদ খাও?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তোমার কয়েকজন পুরুষ বন্ধু আছে শুনেছি। সত্যি?

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না, মিছে কথা।

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) তোমার পূর্ব্বেকার সকল ভৈরবীই মদ খেতেন—সত্যি? মাতঙ্গী ভৈরবীর চরিত্র ভালো ছিলো না—এখনো তার সাক্ষী আছে। সত্যি, না মিছে?

ষোড়শী। (লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে) সত্যি বলেই শুনেচি।

জীবানন্দ। শুনেচ? ভালো। তবে হঠাৎ তুমিই বা এমন দলছাড়া, গোত্রছাড়া ভালো হতে গেলে কেন? (হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া পরুষ-কণ্ঠস্বরে) মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্কও আমি করিনে, তাদের মতামতও কখনো জানতে চাইনে। তুমি ভালো কি মন্দ, চুল-চিরে তার বিচার করবারও আমারও সময় নেই। আমি বলি, চণ্ডীগড়ের সাবেক ভৈরবীদের যেভাবে কেটেচে তোমারও তেমনভাবে কেটে গেলেই যথেষ্ট। আজ তুমি এই বাড়িতেই থাকবে।

[হুকুম শুনিয়া ষোড়শী বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে কাঠ হইয়া গেল।]

জীবানন্দ। তোমার সম্বন্ধে কি করে যে এতটা সহ্য করেচি জানিনে; আর কেউ এ বেয়াদপি করলে এতক্ষণ তাকে পাইকদের ঘরে পাঠিয়ে দিতুম। এমন অনেককে দিয়েচি।

ষোড়শী। (অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া, গলায় আঁচল দিয়া করজোড়ে) আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ। কেন বল ত? এ-রকম কান্নাও নতুন নয়, এ-রকম ভিক্ষেও এই নতুন শুনচিনে! কিন্তু তাদের সব স্বামি-পুত্র ছিল—কতকটা না হয় বুঝতেও পারি।

(ষোড়শী শিহরিয়া উঠিল) কিন্তু তোমার ত সে বালাই নেই। পনের-ষোল বছরের মধ্যে তোমার স্বামীকে তুমি ত চোখেও দেখনি। তা ছাড়া তোমাদের ত এতে দোষই নেই।

ষোড়শী। (করজোড়ে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে) স্বামীকে আমার ভালো মনে নেই সত্যি, কিন্তু তিনি ত আছেন! যথার্থ বলচি আপনাকে, কখনো কোন অন্যায়ই আমি আজ পর্য্যন্ত করিনি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন—

জীবানন্দ। (হাঁক দিয়া) মহাবীর—

ষোড়শী। (আতঙ্কে কাঁদিয়া) আমাকে আপনি মেরে ফেলতে পারবেন, কিন্তু—

জীবানন্দ। আচ্ছা, ও বাহাদুরী কর গে ওদের ঘরে গিয়ে। মহাবীর—

ষোড়শী। (মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া) কারও সাধ্য নেই আমার প্রাণ থাকতে নিয়ে যেতে পারে। আমার যা-কিছু দুর্দ্দশা—যত অত্যাচার আপনার সামনেই হোক—আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপনি আজও ভদ্রলোক।

জীবানন্দ। (কঠিন নিষ্ঠুর হাস্য করিল) তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না! আমি অনেক শুনি। মেয়েমানুষের ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই—ভালো না লাগলে চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেচে। ঠিক জানিনে—নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্ছিনে।

মহাবীর। (দ্বারপ্রান্তে আসিয়া) হুজুর!

জীবানন্দ। (সম্মুখের কবাটটায় আঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া) একে আজ রাত্রের মত ও-ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। কাল আবার দেখা যাবে।

ষোড়শী। (গলদশ্রু-লোচনে) আমার সর্ব্বনাশটা একবার ভেবে দেখুন হুজুর। কাল যে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।

জীবানন্দ। দু'একদিন। তার পরে পারবে। সেই লিভারের ব্যথাটা আজ সকাল থেকেই টের পাচ্ছিলাম। এখন হঠাৎ ভারী বেড়ে উঠল—আর বেশী বিরক্ত ক'রো না — যাও।

মহাবীর। (তাড়া দিয়া) আরে, উঠ্‌না মাগী—চোল্!

জীবানন্দ। (ভয়ানক ধমক দিয়া) খবরদার, শুয়োরের বাচ্ছা, ভালো করে কথা বল্। ফের যদি কখনো আমার হুকুম ছাড়া কোন মেয়েমানুষকে ধরে আনিস্ ত গুলি করে মেরে ফেলব। (মাথার বালিশটা পেটের কাছে টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া যাতনায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া) আজকের মত ও-ঘরে বন্ধ থাকো,

কাল তোমার সতী-পনার বোঝাপড়া হবে। আঃ—এই, যা না আমার সুমুখ থেকে একে সরিয়ে নিয়ে।

মহাবীর। (আস্তে আস্তে বলিল) চলিয়ে—

[ষোড়শী নির্দ্দেশমত নিরুত্তরে পাশের অন্ধকার ঘরে যাইতেছিল]

জীবানন্দ। ষোড়শী, একটু দাঁড়াও, প্রফুল্ল নেই, সে সদরে গেছে—তুমি পড়তে জানো, না?

ষোড়শী। জানি।

জীবানন্দ। তা হলে একটু কাজ করে যাও। ওই যে বাক্সটা, ওর মধ্যে আর একটা কাগজের বাক্স পাবে। কয়েকটা ছোট-বড় শিশি আছে, যার গায়ে বাঙলায় 'মরফিয়া' লেখা, তার থেকে একটুখানি ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ। মহাবীর, আলোটা ধর।

[মহাবীর আলো ধরিল।]

ষোড়শী। (বাতির আলোকে কম্পিত-হস্তে শিশিটা বাহির করিয়া) কতটুকু দিতে হবে?

জীবানন্দ। (তীব্র বেদনায় অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া) ঐ ত বললুম খুব একটুখানি। আমি উঠতেও পারচিনে, আমার হাতেরও ঠিক নেই, চোখেরও ঠিক নেই। ওতেই একটা কাঁচের ঝিনুক আছে, তার অর্দ্ধেকেরও কম। একটা বেশী হয়ে গেলে এ ঘুম তোমার চণ্ডীর বাবা এসেও ভাঙাতে পারবে না।

[পরিমাণ স্থির করিতে ষোড়শীর হাত কাঁপিতে লাগিল, অবশেষে অনেক যত্নে অনেক সাবধানে নির্দ্দেশমত ঔষধ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

জীবানন্দ। (হাত বাড়াইয়া সেই বিষ লইয়া চোখ বুজিয়া মুখে ফেলিয়া দিল) খুব কমই দিয়েচ—ফল হবে না হয়ত। আচ্ছা এই থাক্।

[ষোড়শী পাশের ঘরে পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় এককড়ি নিতান্ত ব্যস্ত ও ব্যাকুলভাবে প্রবেশ করিয়া ও এদিক-ওদিক চাহিয়া জীবানন্দের কানের কাছে চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল। জীবানন্দের মুখের ভাবে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। ষোড়শী দ্বারপ্রান্তে স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

জীবানন্দ। (হাত নাড়িয়া ষোড়শীকে) তোমার ভয় নেই, কাছে এসো, (ষোড়শী আসিলে) পুলিশের লোক বাড়ি ঘিরে ফেলেচে—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব গেটের মধ্যে ঢুকেচেন—এলেন বলে। (ষোড়শী চমকিয়া উঠিল) জেলার ম্যাজিস্ট্রেট্ টুরে বেরিয়ে ক্রোশ-খানেক দূরে তাঁবু ফেলেছিলেন, তোমার বাবা এই রাত্রেই তাঁর কাছে

গিয়ে সমস্ত জানিয়েচেন। কেবল তাতেই এতটা হ'তো না, কে সাহেবের নিজেরই আমার উপর ভারী রাগ। গত বৎসর দু'বার ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি—আজ একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেলেচে— (একটু হাসিল।)

এককড়ি। (মুখ চুন করিয়া) হুজুর, এবার বোধ হয় আমাদেরও আর রক্ষা নেই।

জীবানন্দ। সম্ভব বটে। (ষোড়শীকে) শোধ নিতে চাও ত এই-ই সময়। আমাকে জেলে দিতেও পার।

ষোড়শী। এতে জেল হবে কেন ?

জীবানন্দ। আইন। তা ছাড়া, কে-সাহেবের হাতে পড়েচি। বাদুড়বাগান মেসে থাকতে এরই কাছে একবার দিন-কুড়ি হাজত-বাসও হয়ে গেছে। কিছুতে জামিন দিলে না—আর জামিনই বা তখন হ'তো কে !

ষোড়শী। (উৎসুক-কণ্ঠে) আপনি কি কখনো বাদুড়বাগানের মেসে ছিলেন ?

জীবানন্দ। হাঁ। ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডের বৃন্দে হয়েছিলুম—ব্যাটা আয়ান ঘোষ কিছুতে ছাড়লে না—পুলিশে দিলে। যাক, সে অনেক কথা। সে আমাকে ভোলেনি, বেশ চেনে। আজও পালাতে পারতুম, কিন্তু ব্যথায় শয্যাগত হয়ে পড়েচি, নড়বার জো নেই।

ষোড়শী। (কোমল-কণ্ঠে) ব্যথাটা কি আপনার কমচে না ?

জীবানন্দ। না, তা ছাড়া এ সারবার ব্যথাও নয়।

ষোড়শী। (কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) আমাকে কি করতে হবে ?

জীবানন্দ। শুধু বলতে হবে তুমি নিজের ইচ্ছায় এসেচ, নিজের ইচ্ছায় এখানে আছ। তার বদলে তোমাকে সমস্ত দেবোত্তর ছেড়ে দেব, হাজার টাকা নগদ দেব, আর নজরের টাকার ত কথাই নেই।

[এককড়ি কি বলিতে যাইয়া ষোড়শীর মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেল।]

ষোড়শী। (সোজা হাসিয়া) এ-কথা স্বীকার করার অর্থ বোঝেন ? তার পরেও কি আমার জমিতে, টাকাকড়িতে প্রয়োজন থাকতে পারে বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?

জীবানন্দ। (বিবর্ণ-মুখে) তাই বটে ষোড়শী, তাই বটে। জীবনে আজও ত তুমি পাপ করোনি—ও তুমি পারবে না সত্যি। (একটু হাসিয়া) টাকাকড়ির বদলে যে সম্ভ্রম বেচা যায় না—ও যেন আমি ভুলেই গেছি। তাই হোক, যা সত্যি তাই তুমি ব'লো—জমিদারের তরফ থেকে আর কোনো উপদ্রব তোমার ওপর হবে না।

[এককড়ি ব্যাকুল হইয়া আবার কি বলিতে গেল, কিন্তু রুদ্ধদ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাতের শব্দ শুনিয়া বিবর্ণ-মুখে থামিয়া গেল।]

জীবানন্দ। (সাড়া দিয়া) খোলা আছে, ভিতরে আসুন।

[দরজা উন্মুক্ত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট, ইন্‌স্পেক্টার, কয়েকজন কনেস্টবল ও তারাদাস চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন।]

তারাদাস। (ভিতরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া) ধর্ম্মাবতার, হুজুর! এই আমার মেয়ে, মা-চণ্ডীর ভৈরবী। আপনার দয়া না হলে আজ ওকে টাকার জন্যে খুন করে ফেলত ধর্ম্মাবতার।

ম্যাজিস্ট্রেট। (ষোড়শীর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমারই নাম ষোড়শী? তোমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন?

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না, আমি নিজের ইচ্ছায় এসেচি। কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।

তারাদাস। (চেঁচামেচি করিয়া উঠিল) না হুজুর, ভয়ানক মিথ্যে কথা, গ্রামসুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে মাকে বাড়ি থেকে মারতে মারতে টেনে এনেচে।

ম্যাজিস্ট্রেট। (জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া ষোড়শীকে কহিলেন) তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্য কথা বল। তোমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনেচে?

ষোড়শী। না, আমি আপনি এসেচি।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখানে তোমার কি প্রয়োজন?

ষোড়শী। আমার কাজ ছিল।

ম্যাজিস্ট্রেট। এত রাত্রেও বাড়ি ফিরে যেতে দেরি হচ্ছিল।

তারাদাস। (চেঁচাইয়া) না হুজুর, সমস্ত মিছে—সমস্ত বানানো, আগাগোড়া শিখানো কথা।

ম্যাজিস্ট্রেট। (তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া হাসিলেন এবং শিস্ দিতে দিতে প্রথমে বন্দুকটা এবং পরে পিস্তলটা তুলিয়া লইয়া জীবানন্দকে কেবল বলিলেন) I hope you have permission for this.

[ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তারাদাস হতজ্ঞানের ন্যায় স্তব্ধ অভিভূতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিল।]

ম্যাজিস্ট্রেট। (নেপথ্যে) হামারা ঘোড়া লাও!

[ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল।]

তারাদাস। (অকস্মাৎ বুকফাটা ক্রন্দনে সকলকে সচকিত করিয়া পুলিশ-কর্ম্মচারীর পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিয়া) বাবুমশায়, আমার কি হবে! আমাকে যে এবার জমিদারের লোক জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

ইন্‌স্পেক্টার। (তিনি বয়সে প্রবীণ, শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া সদয়কণ্ঠে) ভয় কি ঠাকুর, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো গে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেব তোমার সহায় রইলেন– আর কেউ তোমাকে জুলুম করবে না। (কটাক্ষে জীবানন্দের দিকে চাহিলেন।)

তারাদাস। (চোখ মুছিতে মুছিতে) সাহেব যে রাগ করে চলে গেলেন বাবু!

ইন্‌স্পেক্টার। (মুচকি হাসিয়া) না ঠাকুর, রাগ করেননি, তবে আজকের এই ঠাট্টাটুকু তিনি সহজে ভুলতে পারবেন, এমন মনে হয় না। তা ছাড়া আমরাও মরিনি, থানাও যা হোক একটা আছে। (আড়চোখে জীবানন্দের দিকে চাহিয়া, কিছু পরে) এখন চল ঠাকুর, যাওয়া যাক। এই রাতে যেতেও ত হবে অনেকটা।

সাব-ইন্‌স্পেক্টার। (বয়সে তরুণ, অল্প হাসিয়া) মেয়েটি রেখে ঠাকুরটি কি তবে একাই যাবেন না কি?

[কথাটায় সবাই হাসিল—কনেস্টবলগুলা পর্য্যন্ত। এককড়ি কড়িকাঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। তারাদাসের চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হইয়া গেল]

তারাদাস। (ষোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া সগর্জ্জনে) যেতে হয় আমি একাই যাব। আবার ওর মুখ দেখব—আবার ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেব আপনারা ভেবেচেন?

ইন্‌স্পেক্টার। (সহাস্যে) মুখ তুমি না দেখতে পার কেউ মাথার দিব্যি দেবে না ঠাকুর! কিন্তু যার ঘর-বাড়ি, তাকে বাড়ি ঢুকতে না দিয়ে আর যেন নতুন ফ্যাসাদে পোড়ো না!

তারাদাস। (আস্ফালন করিয়া) বাড়ি কার? বাড়ি আমার। আমি ভৈরবী করেচি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াব। কলকাঠি এই তারা চক্কোত্তির হাতে (সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া) নইলে কে ও জানেন? শুনবেন ওর মায়ের—

ইন্‌স্পেক্টার। (থামাইয়া দিয়া) থামো ঠাকুর, থামো, রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেলতে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। (ষোড়শীর প্রতি) তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। চল, আর দেরি ক'রো না।

[ষোড়শী অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।]

সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার। (মুখ টিপিয়া হাসিয়া) যাবার বিলম্ব আছে বুঝি?

ষোড়শী। (মুখ তুলিয়া চাহিয়া ইন্‌স্‌পেক্টারের প্রতি) আপনারা যান, আমার যেতে এখনো দেরি আছে।

তারাদাস। (উন্মত্তের মত) দেরি আছে! হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই। (লাফাইয়া উঠিয়া ষোড়শীকে আঘাত করিতে গেল।)

ইন্‌স্‌পেক্টার। (তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া) ফের যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাব। চল, ভালোমানুষের মত ঘরে চল।

[তারাদাসকে টানিয়া লইয়া তিনি ও সব পুলিশ-কর্ম্মচারী প্রস্থান করিল, এককড়িও পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল। দূর হইতে তারাদাসের গর্জ্জন ও গালাগালি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর শোনা যাইতে লাগিল।]

জীবানন্দ। (ইঙ্গিতে ষোড়শীকে আরো একটু কাছে ডাকিয়া) তুমি এঁদের সঙ্গে গেলে না কেন?

ষোড়শী। এঁদের সঙ্গে ত আমি আসিনি।

জীবানন্দ। (কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু'চারদিন দেরি হবে, কিন্তু টাকাটা কি আজই নিয়ে যাবে?

ষোড়শী। তাই দিন।

জীবানন্দ। (বিছানার তলা থেকে একতাড়া নোট বাহির করিল। সেইগুলা গণনা করিতে করিতে ষোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল) আমার কিছুতেই লজ্জা করে না, কিন্তু আমারও এগুলো তোমার হাতে তুলে দিতে বাধ বাধ ঠেকচে।

ষোড়শী। (শান্ত নম্র-কণ্ঠে) কিন্তু তাই ত দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দ। কথা যাই থাক্ ষোড়শী, আমাকে বাঁচাতে তুমি যা খোয়ালে, তার দাম টাকায় ধার্য্য করচি, এ মনে করার চেয়ে বরঞ্চ আমার না বাঁচাই ছিল ভালো।

ষোড়শী। (তার মুখে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া) কিন্তু মেয়েমানুষের দাম ত আপনি এই দিয়েই চিরদিন ধার্য্য করে এসেচেন। (জীবানন্দ নিরুত্তর—কিছু পরে) বেশ, আজ যদি আপনার সে মত বদলে থাকে, টাকা না হয় রেখেই দিন, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিনতে পারেননি? ভালো করে চেয়ে দেখুন দিকি?

জীবানন্দ। (নীরবে বহুক্ষণ নিষ্পলক চাহিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া) বোধ হয় পেরেচি। ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল, না?

ষোড়শী। (তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল) আমার নাম ষোড়শী। ভৈরবীর দশমহাবিদ্যার নাম ছাড়া আর কোন নাম থাকে না। কিন্তু অলকাকে আপনার মনে আছে?

জীবানন্দ। (নিরুৎসুক-কণ্ঠে) কিছু কিছু মনে আছে বৈ কি। তোমার মায়ের হোটেলে মাঝে মাঝে খেতে যেতাম। তখন তুমি ছোট ছিলে। কিন্তু আমাকে ত তুমি অনায়াসে চিনতে পেরেচ?

ষোড়শী। অনায়াসে না হলেও পেরেচি। অলকার মাকে মনে পড়ে?

জীবানন্দ। পড়ে। তিনি বেঁচে আছেন?

ষোড়শী। না—বছর-দশেক আগে তাঁর কাশীলাভ হয়েচে। আপনাকে তিনি বড় ভালোবাসতেন, না?

জীবানন্দ। (উদ্বেগে) হাঁ—একবার বিপদে পড়ে তাঁর কাছে একশ' টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয়নি।

ষোড়শী। না, কিন্তু আপনি সেজন্য মনে কোন ক্ষোভ রাখবেন না। কারণ অলকার মা সে টাকা ধার বলে আপনাকে দেননি, জামাইকে যৌতুক বলে দিয়েছিলেন। (ক্ষণকাল চুপ করিয়া) চেষ্টা করলে এটুকু মনেও পড়তে পারে যে, সে দিনটাও ঠিক এমনি দুর্দ্দিন ছিল। আজ ষোড়শীর ঋণটাই খুব ভারী বোধ হচ্চে, কিন্তু সেদিন ছোট্ট অলকার কুলটা মায়ের ঋণটাও কম ভারী ছিল না চৌধুরীমশাই।

জীবানন্দ। তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ঐ ক'টা টাকার জন্যে তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন।

ষোড়শী। বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেননি, বরঞ্চ করেছিলেন আপনি নিজে। কিন্তু, যাক ও-সব বিশ্রী আলোচনা। বিবাহ আপনি করেন নি, করেছিলেন শুধু একটু তামাসা। সম্প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তার পরে আজ প্রথম দেখা।

জীবানন্দ। কিন্তু তার পরে ত তোমার সত্যিকারের বিবাহই হয়েচে শুনেচি।

ষোড়শী। তার মানে আর একজনের সঙ্গে? এই না? কিন্তু নিরুপায় বালিকার ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা যদি ঘটেই থাকে, তবু ত আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জীবানন্দ। নাই থাক্, কিন্তু তোমার মা জানতেন শুধু কেবল তোমাকে তোমার বাবার হাত থেকে আলাদা রাখবার জন্যেই তিনি যা হোক একটা—

ষোড়শী। বিবাহের গণ্ডী টেনে দিয়েছিলেন? তা হবেও বা। অলকার মাও বেঁচে নেই, এবং আমিই অলকা কি না, এতকাল পরে তা নিয়েও দুশ্চিন্তা করবার আপনার দরকার নেই।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে থাকিয়া) কিন্তু, ধর, আসল কথা যদি তুমি প্রকাশ করে বল, তা হলে—

ষোড়শী। আসল কথাটা কি। বিবাহের কথা? কিন্তু সেই ত মিথ্যে। তা ছাড়া সে সমস্যা অলকার, আমার নয়। সারারাত এখানে কাটিয়ে গিয়ে ও-গল্প করলে ষোড়শীর সর্ব্বনাশের পরিমাণ তাতে এতটুকু কমবে না।

জীবানন্দ। (কয়েক-মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) ষোড়শী, আজ আমি এত নীচে নেবে গেছি যে, গৃহস্থের কুলবধূর দোহাই দিলেও তুমি মনে মনে হাসবে; কিন্তু সেদিন অলকাকে বিবাহ করে বীজগাঁ'র জমিদার বংশের বধূ বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভাল কাজ হ'তো?

ষোড়শী। সে ঠিক জানিনে, কিন্তু সত্য কাজ হ'তো এ জানি! কিন্তু আমি মিথ্যে বকচি, এখন এ-সব আর আপনার কাছে বলা নিষ্ফল। আমি চললুম—আপনি কোন-কিছু দেবার চেষ্টা করে আর আমাকে অপমান করবেন না।

[এককড়ির প্রবেশ]

জীবানন্দ। (এককড়ি প্রবেশ করিতেই তাহাকে) এককড়ি, তোমাদের এখানে কোন ডাক্তার আছেন? একবার খবর দিয়ে আনতে পার। তিনি যা চাবেন আমি তাই দেব।

এককড়ি। ডাক্তার আছে বই কি হুজুর—আমাদের বল্লভ ডাক্তারের খাসা হাতযশ। (ষোড়শীর দিকে চাহিল।)

জীবানন্দ। (ব্যগ্রকণ্ঠে) তাঁকেই আনতে পাঠাও এককড়ি, আর এক মিনিট দেরি ক'রো না।

এককড়ি। আমি নিজেই যাচ্চি। কিন্তু হুজুরকে একলা—

জীবানন্দ। (দুঃসহ বেদনায় মুহূর্ত্তে বিবর্ণ ও উপুড় হইয়া পড়িয়া) উঃ—আর আমি পারিনে।

ষোড়শী। তুমি বল্লভ ডাক্তারকে ডেকে আনো গে এককড়ি, এখানে যা করবার আমি করব এখন। [এককড়ি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেল।]

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ উপুড় হইয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া) ডাক্তার আসেনি? কতদূরে থাকেন জানো?

ষোড়শী। কাছেই থাকেন, কিন্তু তাই বলে তিন-চার মিনিটেই কি আসা যায়?

জীবানন্দ। সবে তিন-চার মিনিট? আমি ভেবেচি আধ ঘণ্টা—কি আরও কতক্ষণ যেন এককড়ি তাঁকে আনতে গেছে। (উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল) হয়ত তিনিও ভয়ে এখানে আসবেন না অলকা। (তাহার কণ্ঠস্বরে ও চোখের দৃষ্টিতে নিরাশাসের অবধি রহিল না।)

ষোড়শী। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে) ডাক্তার আসবেন বই কি।

জীবানন্দ। বোধ করি আমি বাঁচব না। আমার নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্চে, মনে হচ্চে পৃথিবীতে আর বুঝি হাওয়া নেই।

ষোড়শী। আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্চে?

জীবানন্দ। হুঁ। অলকা, আমাকে তুমি মাপ কর। (একটু থামিয়া) আমি ঠাকুর-দেবতা মানিনে, দরকারও হয় না। কিন্তু একটু আগেই মনে মনে ডাকছিলাম। জীবনে অনেক পাপ করেচি, তার আর আদি-অন্ত নেই। আজ থেকে থেকে কেবলি মনে হচ্ছে বুঝি সব দেনা মাথায় নিয়েই যেতে হবে। (ক্ষণেক থামিয়া) মানুষ অমর নয়, মৃত্যুর বয়সও কেউ দাগ দিয়ে রাখেনি—কিন্তু এই যন্ত্রণা আর সইতে পারচিনে—উঃ—মা গো! (ব্যথার তীব্রতায় সর্ব্বশরীর যেন আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল।)

[ষোড়শী একটু ইতস্ততঃ করিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আঁচল দিয়া ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিয়া, পাখার অভাবে আঁচল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। জীবানন্দ কোন কথা কহিল না, কেবল তাহার ডান হাতটা ধীরে ধীরে কোলের উপর টানিয়া লইল।]

জীবানন্দ। (ক্ষণেক পরে) অলকা—

ষোড়শী। আপনি আমায় ষোড়শী বলে ডাকবেন।

জীবানন্দ। আর কি অলকা হতে পার না?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। কোনদিন কোন কারণেই কি—

ষোড়শী। আপনি অন্য কথা বলুন। (জীবানন্দ নীরবে রহিল; ক্ষণেক পরে) কষ্টটা কি কিছুই কমেনি?

জীবানন্দ। (ঘাড় নাড়িয়া) বোধ হয় একটু কমেচে। আচ্ছা যদি বাঁচি, তোমার কি কোন উপকার করতে পারিনে?

ষোড়শী। না, আমি সন্ন্যাসিনী—আমার নিজের কোন উপকার করা কারো সম্ভব নয়।

জীবানন্দ। আচ্ছা এমন কিছুই কি নেই, যাতে সন্ন্যাসিনীও খুশী হয়?

ষোড়শী। তা হয়ত আছে, কিন্তু সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন?

জীবানন্দ। (একটু ক্ষীণ হাসিয়া) আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এ দোষ আজও কেউ দেয়নি। তা ছাড়া এখন বল'চি বলেই যে ভালো হয়েও বলব, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই—এমনিই বটে! এমনিই বটে! সারাজীবনে এ-ছাড়া আর আমার কিছুই বোধ হয় নেই।

[ষোড়শী নীরবে তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল।]

জীবানন্দ। (হঠাৎ সেই হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া) সন্ন্যাসিনীর কি সুখ-দুঃখ নেই? সে খুশী হয়, পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই?

ষোড়শী। কিন্তু সে ত আপনার হাতের মধ্যে নয়।

জীবানন্দ। যা মানুষের হাতের মধ্যে? তেমন কিছু?

ষোড়শী। তাও আছে, কিন্তু ভালো হয়ে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন তখনই জানাব।

জীবানন্দ। (তাহার হাতটাকে বুকের কাছে টানিয়া) না, না, আর ভালো হয়ে নয়—এই কঠিন অসুখের মধ্যেই আমাকে বল। মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচি, আজ নিজের ব্যথার মধ্যে পরের ব্যথা, পরের আশার কথাটা একটু শুনে নিই। নিজের দুঃখের একটা সদ্গতি হোক।

[বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল। ষোড়শী নিজের হাতটাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইল]

ষোড়শী। ডাক্তারবাবু বোধ হয় এলেন।

[ডাক্তার ও এককড়ি প্রবেশ করিল। ডাক্তার ষোড়শীকে এখানে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কিন্তু কিছু না বলিয়া নীরবে শয্যাপ্রান্তে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন; ষোড়শী এই সময়ে প্রস্থান করিল।]

এককড়ি। যদি ভালো করতে পারেন ডাক্তারবাবু, বকশিসের কথা ছেড়েই দিন—আমরা সবাই আপনার কেনা হয়ে থাকব।

ডাক্তার। (পরীক্ষা শেষ করিয়া) অত্যাচার করে রোগ জন্মেচে। সাবধান না হলে পিলে কি লিভার পাকা অসম্ভব নয়, এবং তাতে ভয়ের কথা আছে। তবে সাবধান হলে নাও পাকতে পারে এবং তাতে ভয়ের কথাও কম। তবে এ-কথা নিশ্চয় যে ওষুধ খাওয়া আবশ্যক।

জীবানন্দ। এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া সম্ভব কি না তা বলতে পারেন?

ডাক্তার। যদি যেতে পারেন তা হলেই সম্ভব, নইলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবানন্দ। এখানে থাকলে ভাল হবো কি না বলতে পারেন?

ডাক্তার। (বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া) আজ্ঞে না হুজুর, তা বলতে পারিনে। তবে এ-কথা নিশ্চয় যে এখানে থাকলেও ভালো হতে পারেন, আবার কলকাতা গিয়ে ভালো নাও হতে পারেন।

এককড়ি। হুজুরের ব্যথাটা—

ডাক্তার। এ-রকম ব্যথা হঠাৎ বাড়ে, আবার হঠাৎ কমে যায়। কাল সকালেই হুজুর সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। তবে এ-কথা নিশ্চয় যে, আমাকে আবার আসতে হবে।

[এককড়ির কাছ থেকে ভিজিট লইয়া ডাক্তার প্রস্থান করিলেন]

জীবানন্দ। কি হবে এককড়ি?

এককড়ি। ভয় কি হুজুর, ওষুধ এল বলে। বল্লভ ডাক্তারের একশিশি মিক্‌চার খেলেই সব ভালো হয়ে যাবে।

জীবানন্দ। (ষোড়শী যে দ্বারপথে একটু আগে বাহির হইয়া গেছে সেইদিকে উৎসুক-চোখে চাহিয়া) ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে—

[এককড়ি বাহিরে গিয়া ক্ষণেক পরে পুনরায় প্রবেশ করিল]

এককড়ি। তিনি নেই, বাড়ি চলে গেছেন হুজুর। ভোর হয়ে এসেচে।

জীবানন্দ। (ব্যগ্র ব্যাকুল-কণ্ঠে) আমাকে না জানিয়ে চলে যাবেন না। এমন হতেই পারে না এককড়ি!

এককড়ি। হাঁ হুজুর, তিনি ডাক্তারবাবু আসবার পরেই চলে গেছেন। বাইরে সর্দার বসে আছে, সে দেখেচে ভৈরবী-ঠাকরুণ সোজা চলে গেলেন।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ চোখের দিকে সোজা তাকাইয়া থাকিয়া) তা হলে আলো নিভিয়ে দিয়ে তুমিও যাও এককড়ি, আমি একটু ঘুমুব।

[এককড়ি আলো নিভাইয়া দিল। জীবানন্দ বেদনা-ম্লানমুখে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আলো নিভাইতেই অতি প্রত্যূষের আবছায়া আভা জানালা দিয়া ঘরে ছড়াইয়া পড়িল।]

তৃতীয় দৃশ্য

চণ্ডী-মন্দিরের পথ : বেলা—পূর্ব্বাহ্ন

[জনৈক ভিক্ষুক ও তাহার কন্যার প্রবেশ।]

কন্যা। আর যে চলতে পারিনে বাবা, মায়ের মন্দির আর কত দূরে ?

ভিক্ষুক। ঐ যে আগে কত লোক চলে যাচ্ছে মা, বোধ হয় আর বেশী দূরে নয়।

কন্যা। কে গান গাইতে গাইতে আসচে বাবা, ওকে শুধোও না ?

[গান গাইতে গাহিতে দ্বিতীয় ভিক্ষুকের প্রবেশ]

তোর পাওয়ার সময় ছিল যখন, ওরে অবোধ মন,
মরণ-খেলার নেশায় মেতে রইলি অচেতন।

প্রথম ভিক্ষুক। মায়ের মন্দির আর কত দূরে বাবা ?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। ঐ যে—

তখন ছিল মণি, ছিল মানিক
পথের ধারে ধারে—
এখন ডুবলো তারা দিনের শেষে
বিষম অন্ধকারে।

প্রথম ভিক্ষুক। হাঁ গা—

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। কি গো কি ?

প্রথম ভিক্ষুক। বিষ্ণু গাঁ থেকে আসছি বাবা, পথ যেন আর ফুরোয় না। শুনি যে জনার্দ্দন রায়মশায়ের নাতির কল্যাণে আজ মায়ের পুজো। বামুন বোষ্টম ভিখারী যে যা চাইবে তাই নাকি রায়মশায়—

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। রায়মশায় নয়, রায়মশায় নয়, তার জামাই। পশ্চিম মুল্লুকের ব্যারিস্টার—রাজা বললেই হয়। দু' সরা চিঁড়ে-মুড়কি, এক সরা সন্দেশ, আর আট-গণ্ডা পয়সা নগদ—

ভিক্ষুক-কন্যা। [পিতার প্রতি] হাঁ বাবা, তুমি যে বলেছিলে মেয়েদের একখানা করে রাঙা-পেড়ে কাপড় দেবে ?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। দেবে, দেবে। যে যা চাইবে। রায়মশায়ের মেয়ে হৈমবতী কাউকে না বলতে জানে না।

আজ মিথ্যে রে তার খোঁজা-খুঁজি

মিথ্যে চোখের জল,

তারে কোথায় পাবি বল,

(তোর) অতল তলে তলিয়ে গেল

শেষ সাধনার ধন !

ভিক্ষুক-কন্যা। বাবা, চাইলে হয়ত তুমিও পাবে একখানা কাপড়, না ?

দ্বিতীয় ভিক্ষুক। পাবে পাবে, একটু পা চালিয়ে এসো।

তোর পাওয়ার সময় ছিল যখন, ওরে অবোধ মন,

মরণ-খেলার নেশায় মেতে রইলি অচেতন।

[সকলের প্রস্থান]

[কথা কহিতে কহিতে ষোড়শী ও ফকিরসাহেব প্রবেশ করিলেন।]

ফকির। যে-সব কথা আমার কানে গেছে মা, চুপ করে থাকতে পারলাম না, চলে এলাম। কিন্তু আমি ত কিছুতেই ভেবে পাইনে ষোড়শী, সেদিন কিসের জন্য ও লোকটাকে তুমি এমন করে বাঁচিয়ে দিলে।

ষোড়শী। ঐ পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানই কি উচিত হ'তো ফকিরসাহেব ?

ফকির। সে বিবেচনার ভার ত তোমার ছিল না মা, ছিল রাজার, তাই তাঁর জেলের মধ্যেও হাসপাতাল আছে, পীড়িত অপরাধীরও তিনি চিকিৎসা করেন। কিন্তু শুধু এই যদি কারণ হয়ে থাকে ত তুমি অন্যায় করেচ বলতে হবে।

[ষোড়শী নিঃশব্দে মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল]

ফকির। যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এ ত্রুটি তোমাকে শুধরে নিতে হবে ষোড়শী।

ষোড়শী। তার অর্থ ?

ফকির। ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই, এ তুমি জানো। শাস্তি হওয়া উচিত।

ষোড়শী। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) আমি সমস্ত জানি। তাকে শাস্তি দেওয়াই হয়ত আপনাদের কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার কথা কাউকে বলবার নয়। তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোনদিন পারব না।

ফকির। সেদিন পারো নি সত্য, কিন্তু ভবিষ্যতেও কি পারবে না ?

ষোড়শী। না।

ফকির। আত্মরক্ষার জন্যেও না ?

ষোড়শী। না, আত্মরক্ষার জন্যেও না।

ফকির। আশ্চর্য্য! (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) তুমি ত এখন মন্দিরে যাচ্চ ষোড়শী, আমি তা হলে চললেম।

[ষোড়শী হেঁট হইয়া নমস্কার করিল; ফকির প্রস্থান করিলেন। অন্যমনস্কের ন্যায় ষোড়শী চলিবার উপক্রম করিতেই সাগর দ্রুতবেগে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল]

সাগর। হাঁ মা, তোমার বাবা তারাদাস ঠাকুর নাকি ঘরে ঘরে তালা বন্ধ করে তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েচে? তারা সবাই মিলে নাকি মতলব করেচে, তোমাকে চণ্ডীমন্দির থেকে বিদায় করে আবার নতুন ভৈরবী আনবে? সে হবে না, সাগর সর্দ্দার বেঁচে থাকতে তা হবে না বলে দিচ্চি।

ষোড়শী। এ-খবর তুই কোথায় শুনলি সাগর?

সাগর। শুনেচি মা, এইমাত্র শুনতে পেয়ে তোমার কাছে জানতে ছুটে এসেচি। তুমি মেয়েমানুষ, তোমাকে একলা পেয়ে যদি জমিদারের লোক বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে সে কি তোমার অপরাধ? অপরাধ সমস্ত গ্রামের। অপরাধ এই সাগরের, যে কুটুম-বাড়িতে গিয়ে আমোদে মেতেছিল—মায়ের খবর রাখতে পারেনি। অপরাধ তার খুড়ো হরিহর সর্দ্দারের, যে গাঁয়ের মধ্যে উপস্থিত থেকেও এতবড় অপমানের শোধ নিতে পারেনি।

ষোড়শী। কিন্তু এই যদি সত্যি হয়ে থাকে সাগর, তোরা দু'জন খুড়ো-ভাইপোতে উপস্থিত থাকলেই বা কি করতিস্ বল্ ত? জমিদারের কত লোক-জন একবার ভেবে দেখ্ দিকি!

সাগর। তাও দেখেচি মা। তাঁর ঢের লোক, ঢের পাইক-পিয়াদা। গরীব বলে আমাদের দুঃখ দিতেও তারা কম করে না। কিন্তু দিক আমাদের দুঃখ, আমরা ছোটলোক বই ত না। কিন্তু তোমার হুকুম পেলে মা, ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার একবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা, কোন শালা আটকাতে পারবে না।

ষোড়শী। (শিহরিয়া) বলিস্ কি সাগর, তোরা কি এত নিষ্ঠুর, এমন ভয়ঙ্কর হতে পারিস্? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের?

সাগর। এইটুকু? তোমার গায়ে হাত দেওয়াকে তুমি এইটুকু বল মা! তারাদাস ঠাকুরকেও আমরা মাপ করতে পারি, জনার্দ্দন রায়কেও হয়ত পারি, কিন্তু সুবিধে পেলে জমিদারকে আমরা সহজে ছাড়ব না। (ক্ষণেক থামিয়া) কিন্তু ওরা

যে সব বলাবলি করে মা, তুমি নাকি ওঁকেই সে-রাত্রে হাকিমের হাত থেকে রক্ষে করেচ? না-কি বলেচ, তোমাকে ধরে নিয়ে কেউ যায়নি, নিজে ইচ্ছে করেই গিয়েছিলে?

ষোড়শী। এমন ত হতে পারে সাগর, আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম।

সাগর। তাই ত বিষম খটকা লেগেচে মা, তোমার মুখ দিয়ে ত কখনো মিছে কথা বার হয় না। তবে এ কি! কিন্তু সে যাই হোক, যাই কেন না গ্রামসুদ্ধ লোক বলে বেড়াক, আমরা ক'ঘর ছোটজাত তোমার ভূমিজ প্রজারা তোমাকেই মা বলে জেনেচি, যদি চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাও মা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব, কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাব যে কারা গেল। [দ্রুতপদে প্রস্থান]

ষোড়শী। সাগর! একটা কথা তোকে বলতে পারলেম না বাবা, তোদের দায়িত্ব হয়ত আর বইতে পারব না।

[এককড়ির প্রবেশ]

ষোড়শী। কে, এককড়ি?

এককড়ি। (সসম্ভ্রমে) আপনার কাছেই এলাম। হুজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেচেন।

ষোড়শী। কোথায়?

এককড়ি। কাছারিতে বসে প্রজাদের নালিশ শুনছেন। যদি অনুমতি করেন ত পালকী আনতে পাঠাই।

ষোড়শী। পাল্‌কী? এটি তাঁর প্রস্তাব, না তোমার সুবিবেচনা এককড়ি?

এককড়ি। আজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ হুজুরের স্বয়ং আদেশ।

ষোড়শী। (হাসিয়া) তোমার হুজুরের বিবেচনা আছে তা মানি, কিন্তু সম্প্রতি পাল্‌কী চড়বার আমার ফুরসৎ নেই এককড়ি। হুজুরকে ব'লো আমার অনেক কাজ।

এককড়ি। ও-বেলায় কিংবা কাল সকালেও কি সময় হবে না?

ষোড়শী। না।

এককড়ি। কিন্তু হলে ভাল হ'তো। আরও দশজন প্রজার নালিশ আছে কি-না।

ষোড়শী। (কঠোর-স্বরে) তাঁকে ব'লো এককড়ি, বিচার করার মত বুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের প্রজাদের করুন গে। আমি তাঁর প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে।

[ষোড়শী দ্রুতপদে প্রস্থান করিল, এবং এককড়ি কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অপর দিক দিয়া হৈম ও নির্ম্মল প্রবেশ করিল। হৈমর হাতে পূজার উপকরণ।]

হৈম। যে দয়ালু লোকটি তোমাকে সেদিন অন্ধকার রাতে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন, সত্যি বল ত তিনি কে? তাঁকে আমি চিনেচি।

নির্ম্মল। চিনেচ? কে বল ত তিনি?

হৈম। আমাদের ভৈরবী। কিন্তু তুমি তাঁকে পেলে কোথায়, তাই শুধু আমি ঠাউরে উঠতে পারি নি।

নির্ম্মল। পারোনি? পেয়েছিলাম তাঁকে অনেক দূরে। তোমাদের ফকির-সাহেবের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনে ভারী কৌতূহল হয়েছিল তাঁকে দেখবার। খুঁজে খুঁজে চলে গেলাম। নদীর পারে তাঁর আশ্রম, সেখানে গিয়ে দেখি তোমাদের ভৈরবী আছেন বসে।

হৈম। তার কারণ, ফকিরকে তিনি গুরুর মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সত্যিই কি তোমাকে একেবারে হাত ধরে অন্ধকারে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন?

নির্ম্মল। সত্যিই তাই। যে মুহূর্ত্তে তিনি নিশ্চয় বুঝলেন প্রচণ্ড ঝড়-জলের মধ্যে ভয়ঙ্কর অন্ধকার অজানা পথে আমি অন্ধের সমান, নারী হয়েও তিনি অসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার হাত ধরে আসুন। কিন্তু পরের জন্য এ-কাজ তুমি পারতে না হৈম।

হৈম। না।

নির্ম্মল। তা জানি। (ক্ষণেক থামিয়া) দেখ হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবীটিকে আমি চিনতে পারিনি সত্যি, কিন্তু এইটুকু নিশ্চয় বুঝেচি এঁর সম্বন্ধে বিচার করার ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটে না। হয়, সতীত্ব জিনিসটা এঁর কাছে নিতান্তই বাহুল্য বস্তু—তোমাদের মত তার যথার্থ রূপটা ইনি চেনেন না, না হয়, সুনাম-দুর্নাম এঁকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করতে পারে না।

হৈম। তুমি কি সেদিনের জমিদারের ঘটনা মনে করেই এই-সব বলচ?

নির্ম্মল। আশ্চর্য্য নয়। শাস্ত্রে বলে সাত পা একসঙ্গে গেলেই বন্ধুত্ব হয়। অতবড় পথটায় ওই দুর্ভেদ্য আঁধারে একমাত্র তাঁকেই আশ্রয় করে অনেক পা গুটি গুটি একসঙ্গে গেলাম, একটি একটি করে অনেক প্রশ্নই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু পূর্ব্বেও যে-রহস্যে ঢাকা ছিলেন পরেও ঠিক তেমনি রহস্যেই গা-ঢাকা দিয়ে মিলিয়ে গেলেন—কিছুই তাঁর হদিস্ পেলাম না।

হৈম। তোমার জেরাও মানলেন না, বন্ধুত্বও স্বীকার করলেন না?

নির্ম্মল। না গো, না, কোনটাই না।

হৈম। (হাসিয়া ফেলিয়া) একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্ম্মল। এতবড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়েই বার করে নিতে চাও নাকি? কিন্তু নিজেকে জানতে যে দেরি লাগে হৈম।

হৈম। দেরি লাগুক তবু পুরুষের হয়। কিন্তু মেয়েমানুষের এমনি অভিশাপ, আমরণ নিজের অদৃষ্ট বুঝতেই তার কেটে যায়।

নির্ম্মল। (হৈমর হাত ধরিয়া) তুমি কি পাগল হয়েচ হৈম? চল, আমরা একটু তাড়াতাড়ি যাই, হয়ত পুজোর বিলম্ব হয়ে যাবে।

[উভয়ে প্রস্থান]

চতুর্থ দৃশ্য

নাটমন্দির

[গড়চণ্ডীর মন্দির ও সংলগ্ন প্রশস্ত অলিন্দ। সম্মুখে দীর্ঘ প্রাকার-বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণে নাটমন্দিরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। দক্ষিণদিকে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পথ। সকালের কাঁচা রোদের আলো চারিদিকে পড়িয়াছে; মন্দিরের অলিন্দে ও প্রাঙ্গণে উপস্থিত জনার্দ্দন রায়, শিরোমণি ঠাকুর, নির্ম্মল বসু, ষোড়শী, হৈম এবং আরও কয়েকজন নর-নারী।]

শিরোমণি। (ষোড়শীকে) আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পূজা দিতেছেন তাতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না. তাঁর এই সঙ্কল্প তিনি আমাদের জানিয়েচেন। তাঁর আশঙ্কা তোমাকে দিয়ে তার কার্য্য সুসিদ্ধ হবে না।

ষোড়শী। (পাণ্ডুর মুখে) বেশ, তাঁর কাজ যাতে সুসিদ্ধ হয় তিনি তাই করুন।

শিরোমণি। কেবল এইটুকুই ত নয়। আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থির-সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয়েচি যে, দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না। মায়ের ভৈরবী তোমাকে রাখলে আর চলবে না। কে আছ, একবার তারাদাস ঠাকুরকে ডাক ত।

[একজন ডাকিতে গেল।]

ষোড়শী। কেন চলবে না?

জনৈক ব্যক্তি। সে তোমার বাবার মুখেই শুনতে পাবে।

জনার্দ্দন। আগামী চৈত্রসংক্রান্তিতে নতুন ভৈরবীর অভিষেক হবে, আমরা স্থির করেচি।

[তারাদাস একটি দশ বছরের মেয়ে সঙ্গে করিয়া প্রবেশ করিল।]

হৈম। (তারাদাসের দিকে চাহিয়া) যা সমস্ত শুনচি বাবা, তাতে কি ওঁর কথাই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

জনার্দ্দন। নয়ই বা কেন শুনি?

হৈম। (ছোট মেয়েটিকে দেখাইয়া) ঐটিকে যখন উনি যোগাড় করে এনেচেন তখন মিথ্যে বলা কি ওঁর এতই অসম্ভব? তা ছাড়া সত্যি মিথ্যে ত যাচাই করতে হয় বাবা, ও ত একতরফা রায় দেওয়া চলে না।

[সকলেই বিস্মিত হইল]

শিরোমণি। (স্মিতহাস্যে) বেটি কৌঁসুলীর গিন্নী কিনা, তাই জেরা ধরেচে! আচ্ছা, আমি দিচ্চি থামিয়ে। (হৈমকে) এটা দেবীর মন্দির—পীঠস্থান। বলি এটা ত মানিস?

হৈম। (ঘাড় নাড়িয়া) মানি বৈকি।

শিরোমণি। তা যদি হয়, তা হলে তারাদাস বামুনের ছেলে হয়ে কি দেবমন্দিরে দাঁড়িয়ে মিছে-কথা কইচে পাগলী? (প্রবল হাস্য করিলেন।)

হৈম। আপনি নিজেও ত তাই শিরোমণিমশাই। অথচ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েই ত মিছে-কথার বৃষ্টি করে গেলেন। আমি ত একবারও বলিনি ওঁকে দিয়ে কাজ করালে আমার সিদ্ধ হবে না।

[শিরোমণি হতবুদ্ধির মত হইলেন]

জনার্দ্দন। (কুপিত হইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে) বলনি কি-রকম?

হৈম। না বাবা, বলিনি। বলা দূরে থাক্‌, ও-কথা আমি মনেও করিনে। বরঞ্চ ওঁকে দিয়েই আমি পূজো করাব, এতে ছেলের আমার কল্যাণই হোক, আর অকল্যাণই হোক। (ষোড়শীর প্রতি) চলুন মন্দিরের মধ্যে—আমাদের সময় বয়ে যাচ্ছে।—

জনার্দ্দন। (ধৈর্য্য হারাইয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ-কণ্ঠে) কখ্‌খনো না, আমি বেঁচে থাকতে ওকে কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে দেব না। তারাদাস, বল ত ওর মায়ের কথাটা। একবার শুনুক সবাই!

শিরোমণি। (সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া) না তারাদাস, থাক। ওর কথা আপনার মেয়ে হয়ত বিশ্বাস করবে না রায়মশাই। ও-ই বলুক। চণ্ডীর দিকে মুখ করে ও-ই নিজের মায়ের কথা নিজে বলে যাক। কি বল চাটুয্যে? তুমি কি বল হে যোগেন ভট্‌চায? কেমন? ও-ই নিজে বলুক।

[ষোড়শীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।]

হৈম। আপনারা ওঁর বিচার করতে চান নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়া নেবেন, অতবড় অন্যায় আমি কোনমতে হতে দেব না। (ষোড়শীর প্রতি) চলুন আপনি আমার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে—

ষোড়শী। না বোন, আমি পূজো করিনে, যিনি এ-কাজ নিত্য করেন তিনিই করুন, আমি কেবল এইখানে দাঁড়িয়ে তোমার ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করি, সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, নীরোগ হয়, মানুষ হয়! (পূজারীর প্রতি) কিন্তু—ছোটঠাকুরমশাই, তুমি ইতস্ততঃ করচ কিসের জন্য? আমার আদেশ রইল দেবীর পূজা যথারীতি সেরে তুমি নিজের প্রাপ্য নিয়ো। বাকী মন্দিরের ভাঁড়ারে বন্ধ করে চাবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। (হৈমের প্রতি) আমি আবার আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি, এতেই তোমার ছেলের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে।

[ষোড়শী প্রাঙ্গণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল এবং পুরোহিত পূজার জন্য মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন]

জনার্দ্দন। (নির্ম্মল ও হৈমর প্রতি) যাও মা, তোমরাও পূজারী ঠাকুরের সঙ্গে যাও—পূজোটি যাতে সুসম্পন্ন হয় দেখো গে।

[নির্ম্মল ও হৈম মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।]

জনার্দ্দন। যাক বাঁচা গেছে শিরোমণিমশায়, ষোড়শী আপনিই চলে গেল। ছুঁড়ি জিদ করে যে আমার নাতির মানস-পূজাটি পণ্ড করে দিলে না এই ঢের।

শিরোমণি। এ যে হতেই হবে ভায়া, মা মহামায়ার মায়া কি কেউ রোধ করতে পারে? এ যে ওঁরই ইচ্ছে। (এই বলিয়া তিনি যুক্তকরে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।)

যোগেন ভট্‌চায। (গলা বাড়াইয়া দেখিয়া) অ্যাঁ, এ যে স্বয়ং হুজুর আসচেন।

[সকলেই ত্রস্ত এবং চকিত হইয়া উঠিল, জীবানন্দ ও তাঁহার পশ্চাতে কয়েকজন পাইক ও ভৃত্য প্রভৃতি প্রবেশ করিল]

শিরোমণি ও জনার্দ্দন। আসুন, আসুন, আসুন।

[কেহ নমস্কার করিল, অনেকেই প্রণাম করিল।]

জনার্দ্দন। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি এসেচেন। আজ আমার দৌহিত্রের কল্যাণে মায়ের পূজা দেওয়া হচ্চে।

জীবানন্দ। বটে! তাই বুঝি বাইরে এত জন-সমাগম?

[জনার্দ্দন সবিনয়ে মুখ নত করিলেন।]

শিরোমণি। হুজুরের দেহটি ভাল আছে?

জীবানন্দ। দেহ? (হাসিয়া) হাঁ, ভালই আছে। তাই ত আজ হঠাৎ বেরিয়ে পড়লাম। দেখি, বহুলোকে ভীড় করে এইদিকে আসচে। সঙ্গ নিলাম। অদৃষ্ট প্রসন্ন ছিল, দেবতা ব্রাহ্মণ এবং সাধু-সঙ্গ তিনটেই বরাতে জুটে গেল। কিন্তু রায়মশায়কেই জানি, আপনাকে ত বেশ চিনতে পালাম না ঠাকুর?

জনার্দ্দন। ইনি সর্ব্বেশ্বর শিরোমণি। প্রাচীন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। গ্রামের মাথা বললেই হয়।

জীবানন্দ। বটে? বেশ, বেশ, বড় আনন্দ লাভ করলাম। তা এইখানেই একটু বসা যাক না কেন?

[বসিতে উদ্যত হইলে সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল।]

শিরোমণি। (চীৎকার করিয়া) আসন, আসন, বসবার একটা আসন নিয়ে এস কেউ—

জীবানন্দ। ব্যস্ত হবেন না শিরোমণিমশাই, আমি অতিশয় বিনয়ী লোক। সময়-বিশেষে রাস্তায় শুয়ে পড়তেও অভিমান বোধ করিনে—এ ত ঠাকুরবাড়ি। বেশ বসা যাবে।

[জীবানন্দ উপবেশন করিলেন।]

জনার্দ্দন। একটা গুরুতর কার্য্যোপলক্ষে আমরা সবাই আপনার কাছে যাব স্থির করেছিলাম, শুধু আপনি পীড়িত মনে করেই যেতে পারিনি।

জীবানন্দ। গুরুতর কার্য্যোপলক্ষ্যে?

শিরোমণি। হাঁ হুজুর, গুরুতর বই কি। ষোড়শী ভৈরবীকে আমরা কেউ চাইনে।

জীবানন্দ। চান না?

শিরোমণি। না, হুজুর।

জীবানন্দ। একটুখানি জনশ্রুতি আমার কানেতেও পৌছেচে। ভৈরবীর বিরুদ্ধে আপনাদের নালিশটা কি শুনি?

[সকলেই নীরব রহিল]

জীবানন্দ। বলতে কি আপনাদের করুণা বোধ হচ্ছে?

জনার্দ্দন। হুজুর সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের অভিযোগ—

জীবানন্দ। কি অভিযোগ?

জনার্দ্দন। আমরা গ্রামস্থ ষোল-আনা ইতর-ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ। (একটু হাসিলেন) তা দেখতে পাচ্ছি। (অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া) ওইটি কি সেই ভৈরবীর বাপ তারাদাস ঠাকুর নয়?

[তারাদাস সাড়া দিল না, মাটিতে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিল।]

শিরোমণি। (সবিনয়ে) রাজার কাছে প্রজা সন্তান-তুল্য, তা সে দোষ করলেও সন্তান, না করলেও সন্তান। আর কথাটা একরকম ওরই। ওর কন্যা ষোড়শীকে আমরা নিশ্চয় স্থির করেচি, তাকে আর মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারে না। আমার নিবেদন, হুজুর তাকে সেবায়েতের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার আদেশ করুন।

জীবানন্দ। (চকিত) কেন? তার অপরাধ?

দু'তিনজন ব্যক্তি। (সমস্বরে) অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ। তিনি হঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেচেন রায়মশায়, যার জন্য তাঁকে তাড়ানো আবশ্যক?

[জনার্দ্দন শিরোমণিকে বলিতে চোখের ইঙ্গিত করিলেন]

জীবানন্দ। না, না, উনি অনেক পরিশ্রম করেচেন, বুড়ো মানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা আপনিই ব্যক্ত করুন।

জনার্দ্দন। (চোখে ও মুখে দ্বিধা ও সঙ্কোচের ভাব আনিয়া) ব্রাহ্মণকন্যা—এ আদেশ আমাকে করবেন না।

জীবানন্দ। গো-ব্রাহ্মণে আপনার অচলা ভক্তির কথা এদিকে কারও অবিদিত নেই। কিন্তু এতগুলি ইতর-ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উঠে-পড়ে লেগেচেন, তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা আমার বিশ্বাস হয়েচে। কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

জনার্দ্দন। (শিরোমণির প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানিয়া) হুজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্ছেন তখন আর ভয় কি ঠাকুর? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন না!

শিরোমণি। (ব্যস্ত হইয়া) সত্যি কথায় ভয় কিসের জনার্দ্দন? তারাদাসের মেয়েকে আর আমরা কেউ রাখব না হুজুর। তার স্বভাব-চরিত্র ভারি মন্দ হয়ে গেছে—এই আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি।

[জীবানন্দের পরিহাস-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল]

জীবানন্দ। তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খবর আপনারা নিশ্চয় জেনেচেন ?

[সকলে ঘাড় নাড়িল।]

জীবানন্দ। তাই সুবিচারের আশায় বেছে বেছে একেবারে ভীষ্মদেবের শরণাপন্ন হয়েচেন রায়মশায় ?

শিরোমণি। আপনি দেশের রাজা—সুবিচার বলুন, অবিচার বলুন, আপনাকেই করতে হবে। আমাদেরও তাই মাথা পেতে নিতে হবে। সমস্ত চণ্ডীগড় ত আপনারই।

জীবানন্দ। (মৃদু হাসিয়া) দেখুন শিরোমণিমশায়, অতি-বিনয়ে আপনাদেরও খুব হেঁট হয়ে কাজ নেই, অতি গৌরবে আমাকেও আকাশে তোলবার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু জানতে চাই, এ অভিযোগ কি সত্য ?

[অনেকেই উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল]

শিরোমণি। অভিযোগ ? সত্য কি না!—আচ্ছা, আমরা না হয় পর, কিন্তু তারাদাস, তুমিই বল ত। রাজদ্বার, যথাধর্ম্ম ব'লো—

[তারাদাস একবার পাংশু একবার রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। জনার্দ্দনের ক্রুদ্ধ একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা মারিয়া যেন তাহাকে বারংবার তাড়না করিতে লাগিল। সে একবার ঢোঁক গিলিয়া একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল]

তারাদাস। হুজুর—

জীবানন্দ। (হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া) ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কলঙ্কের কথা আমি যথাধর্ম্ম বললেও শুনব না। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম্ম বলুন।

[ভৃত্য অন্তরালে ছিল, সে টাম্‌ব্লার ভরিয়া হুইস্কি সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল। তিনি এক নিশ্বাসে পান করিয়া বেয়ারার হাতে ফিরাইয়া দিলেন।]

জীবানন্দ। আঃ—বাঁচলাম। আপনাদের অজস্র বাক্য-সুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপচাপ যে! কি হ'লো আপনাদের যথাধর্ম্মের ?

[শিরোমণি নাকে কাপড় দিয়াছিলেন।]

জীবানন্দ। (সহাস্যে) শিরোমণিমশায় কি ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের কাজটা সেরে নিলেন নাকি ?

[অনেকেই হাসিয়া মুখ ফিরাইল]

শিরোমণি। (হতবুদ্ধি হইয়া) এই যে বলি হুজুর। আমি যথাধর্ম্মই বলব।

জীবানন্দ। (ঘাড় নাড়িয়া) সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাটা যদিই বা থাকে, ধর্ম্মটা থাকবে কি? আমার নিজের কোন বিশেষ আপত্তি নেই—ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে—তবু আমি বলি, ওতে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্ত্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান—এই না?

সকলে। (মাথা নাড়িয়া) হাঁ, হাঁ।

জীবানন্দ। এঁকে নিয়ে আর সুবিধা হচ্চে না?

জনার্দ্দন। (প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা তুলিয়া) সুবিধে-অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালোর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া ফেলিয়া) অর্থাৎ গ্রামের ভালোমন্দের আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আপনার ভালোমন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কি না জানিনে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরী করা যায় না? দেখুন না চেষ্টা করে। বরঞ্চ আমাদের এককড়িটিকেও না হয় সঙ্গে নিন, এ-বিষয়ে তার বেশ একটু হাতযশ আছে।

[সকলে অবাক্ হইয়া রহিল]

জীবানান্দ। এঁদের সতীপনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ; সুতরাং তাকে আর নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাকলেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবদেরও ভৈরবী নইলে চলে না, এ অতি সনাতন প্রথা—সহজে টলানো যাবে না। দেশশুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত বা দেবী নিজেও খুশী হবেন না—একটা হাঙ্গামা বাধবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা-পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্ব্বে যিনি ছিলেন, তাঁর নাকি হাতে গোনা যেত না। কি বলেন শিরোমণিমশাই, আপনি ত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব?

শিরোমণি। (শুষ্কমুখে জনান্তিকে) কি জানি, শুনেচি না কি?

[প্রফুল্ল প্রবেশ করিল, তার হাতে ইংরাজি বাঙলা কয়েকখানা
সংবাদপত্র ও কতকগুলো খোলা চিঠি-পত্র।]

জীবানন্দ। কিহে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে নাকি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে!

প্রফুল্ল। (ঘাড় নাড়িয়া) সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধে হ'তো। কিন্তু সে যখন হয়নি তখন এগুলো দেখবার কি সময় হবে? অত্যন্ত জরুরী।

জীবানন্দ। তা বুঝেচি, নইলে এখানে আনবে কেন? কিন্তু দেখবার সময় আমার এখনও হবে না, অন্য সময়েও হবে না। কিন্তু ব্যাপারটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্চে। ওই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ। পত্রখানি তাঁর উকিলের, না একে-বারে আদালতের হে? ও খামখানা ত দেখচি সলোমন সাহেবের। বাবা, বিলিতি সুধার গন্ধ যেন কাগজ ফুঁড়ে বের হচ্চে। কি বলেন সাহেব? ডিক্রী-জারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেন—জানাচ্চেন? আঃ—সেকালের ব্রাহ্মণ্য তেজ কিছু যদি বাকী থাকত ত এই ইহুদি ব্যাটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা আর শুধতে হ'তো না।

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল হইয়া) কি বলচেন দাদা? থাক্, থাক্, আর একসময় হবে। (ফিরিতে উদ্যত হইল।)

জীবানন্দ। (সহাস্যে) আরে লজ্জা কি ভায়া, এঁরা সব আপনার লোক, জ্ঞাত-গোষ্ঠি, এমন কি মণিমাণিক্যের এপিঠ-ওপিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া তোমার দাদাটি যে কস্তুরী-মৃগ; সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে ভাই? প্রফুল্ল, রাগ ক'রো না ভায়া, আপনার বলতে আর কাউকে বড় বাকী রাখিনি, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারব বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ নোট-টোট জাল করতে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আনতে পারতে হে—

প্রফুল্ল। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল) দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবে না। সত্য ভেবে যদি কেউ—

জীবানন্দ। (গম্ভীর হইয়া) সন্ধান করে নিয়ে আসেন? তা হলে ত বেঁচে যাই প্রফুল্ল। রায়মশায়, আপনি ত শুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাশুনা কি এমন কেউ—

জনার্দ্দন। (ম্লান-মুখে উঠিয়া) বেলা হ'লো যদি অনুমতি করেন ত—

জীবানন্দ। বসুন, বসুন, নইলে প্রফুল্লর জাঁক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া ভৈরবীর কথাটাও শেষ হয়ে যাক। কিন্তু আমি যাও বললেই কি সে যাবে?

জনার্দ্দন। সে ভার আমাদের।

জীবানন্দ। কিন্তু আর কাউকে ত বাহাল করা চাই। ও ত খালি থাকতে পারে না।

অনেকে। সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ। যাক বাঁচা গেল, তবে সে যাবেই। এতগুলো মানুষের নিশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা-চণ্ডীও সামলাতে পারেন না। আপনাদের লাভ-

লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে, টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভালো কথা, কেউ দেখ্ ত রে এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা এদিকে যে মরুভূমি হয়ে গেল।

বেয়ারা। (প্রবেশ করিয়া প্রভুর ব্যগ্র-ব্যাকুল হস্তে পূর্ণ-পাত্র দিয়া) তিনি রান্না-বাড়ির ঘরগুলো দেখচেন।

জীবানন্দ। এর মধ্যেই? ডাক্ তাকে। (মদ্যপান)

[ইহার পর হইতে পূজার্থীরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল—ও পূজা শেষ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল—তাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। এককড়ি প্রবেশ করিল।]

জীবানন্দ। আজ যে ভৈরবীকে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিল?

এককড়ি। আমি নিজে গিয়েছিলাম।

জীবানন্দ। তিনি এসেছিলেন?

এককড়ি। আজ্ঞে না।

জীবানন্দ। না কেন? (এককড়ি অধোমুখে নীরব) তিনি কখন আসবেন, জানিয়েচেন?

এককড়ি। (তেমনি অধোমুখে) এত লোকের সামনে আমি সে-কথা হুজুরে পেশ করতে পারব না।

জীবানন্দ। এককড়ি, তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আসবেন, না, না?

এককড়ি। না।

জীবানন্দ। কেন?

এককড়ি। তিনি আসতে পারবেন না। তিনি বললেন, তোমার হুজুরকে ব'লো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে—আমার বিচার করবার জন্যে আদালত খোলা আছে।

জীবানন্দ। (অন্ধকার-মুখে) হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও।

[এককড়ির প্রস্থান]

প্রফুল্ল, সেই যে চিনির কোম্পানীর সঙ্গে হাজার বিঘে জমি বিক্রীর কথা হয়েছিল, তার দলিল লেখা হয়েচে?

প্রফুল্ল। আজ্ঞে হয়েচে।

জীবানন্দ। এক্ষুনি তুমি গিয়ে সেটা পাকাপাকি করগে। লিখে দাও জমি তারা পাবে।

প্রফুল্ল। তাই হবে।

[পূজার্থী ও পূজার্থিনীরা আসিতেছে যাইতেছে।]

জীবানন্দ। আজ যে পূজার বড় ভীড় দেখছি। না, রোজই এই-রকম।

জনার্দ্দন। আজকের একটু বিশেষ আয়োজন ত আছেই, তা ছাড়া এই চড়কের সময়টায় কিছুদিন ধরে এমনিই হয়। লোকজনের ভীড় এখন বাড়তেই থাকবে।

জীবানন্দ। তাই নাকি? বেলা হ'লো, এখন তা হলে আসি। (হাসিয়া) একটা মজা দেখেছেন রায়মশায়, চণ্ডীগড়ের লোকগুলো প্রায়ই ভুলে যায় যে, জমিদার এখন কালীমোহন নয়—জীবানন্দ চৌধুরী। অনেক প্রভেদ না?

[জনার্দ্দন কি জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

জীবানন্দ। এখানে বীজগাঁ'র প্রজা নয় এমন একটা প্রাণীও নেই। ঠিক না শিরোমণিমশায়?

শিরোমণি। তাতে আর সন্দেহ কি হুজুর!

জীবানন্দ। না, আমার সন্দেহ নেই, তবে আর কারও না সন্দেহ থাকে। আচ্ছা, নমস্কার, শিরোমণিমশায়, চললাম। (হাসিয়া) কিন্তু ভৈরবী-বিদায়ের পালটা শেষ করা চাই। প্রফুল্ল, যাওয়া যাক। [প্রস্থান]

শিরোমণি। (জমিদার সত্যই গেল কি না উঁকি মারিয়া দেখিয়া) জনার্দ্দন, কিরূপ মনে হয় ভায়া?

জনার্দ্দন। মনে ত অনেক কিছুই হয়।

শিরোমণি। মহাপাপিষ্ঠ—লজ্জা-সরম আদৌ নেই।

জনার্দ্দন। (গম্ভীর মুখে) না।

শিরোমণি। ভারি দুর্ম্মুখ। মানীর মান-মর্য্যাদা জ্ঞান নেই।

জনার্দ্দন। না।

শিরোমণি। কিন্তু দেখলে ভায়া কথার ভঙ্গী? সোজা না বাঁকা, সত্য না মিথ্যা, তামাসা না তিরস্কার, ভেবে পাওয়াই দায়। অর্দ্ধেক কথা ত বোঝাই গেল না, যেন হেঁয়ালি। পাষণ্ড সত্যি বললে, না আমাদের বাঁদর নাচালে ঠিক ঠাহর করা গেল না। জানে সব, কি বল?

[জনার্দ্দন নিরুত্তর]

শিরোমণি। যা ভাবা গিয়েছিল ব্যাটা হাবা-গোবা নয়—বিশেষ সুবিধে হবে না বলেই যেন শঙ্কা হচ্চে, না?

জনার্দ্দন। মায়ের অভিরুচি।

শিরোমণি। তার আর কথা কি! কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল। না গেল একে ধরা, না গেল তাঁকে মারা। তোমার কি ভায়া, পয়সার জোর আছে, ছুঁড়ি যক্ষের মত আগলে আছে, গেলে সুমুখের বাগান-বেড়াটা তোমার টানা দিয়ে চৌকোশ হতে পারবে। কিন্তু বাঘের গর্ত্তের মুখে ফাঁদ পাততে গিয়ে না শেষ আমি মারা পড়ি।

জনার্দ্দন। আপনি কি ভয় পেয়ে গেলেন না কি?

শিরোমণি। না না, ভয় নয়,—কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেলে তা ত তোমারও মুখ দেখে অনুভব হচ্ছে না। হুজুরটি ত কানকাটা সেপাই—কথাও যেমন হেঁয়ালী, কাজও তেমনি অদ্ভুত। ও যে ধরে গলা টিপে মদ খাইয়ে দেয়নি এই আশ্চর্য্য। এককড়ির মুখে ভৈরবী ঠাকুরুণের হুমকিও ত শুনলে? তোমরা চুপ করে ছিলে, আমিই মেলা কথা কয়েচি—ভালো করিনি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় না কি। দুয়ের মাঝখানে পড়ে শেষকালে না বেড়াজালে ধরা পড়ি।

জনার্দ্দন। (উদাস-কণ্ঠে) সকলই চণ্ডীর ইচ্ছে। বেলা হ'লো, সন্ধ্যের পর একবার আসবেন।

শিরোমণি। তা আসব। কিন্তু ঐ যে আবার এঁরা ফিরে আসচেন হে!

[মন্দির-প্রাঙ্গণের একটা দ্বার দিয়া ষোড়শী ও তাহার পশ্চাতে সাগর ও তাহার সঙ্গী প্রবেশ করিল। অন্য দ্বার দিয়া জীবানন্দ, প্রফুল্ল, ভৃত্য ও কয়েকজন পাইক প্রবেশ করিল।]

জীবানন্দ। চলে যাচ্ছিলাম, শুধু তোমাকে আসতে দেখে ফিরে এলাম। এককড়িকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এবং তারই মুখে তোমার জবাবও শুনলাম। তোমার বিরুদ্ধে রাজার আদালতে গিয়ে দাঁড়াবার বুদ্ধি আমার নেই, কিন্তু নিজের প্রজাদের শাসনে রাখবার বিদ্যেও জানি। সমস্ত গ্রামের প্রার্থনা-মত তোমার সম্বন্ধে কি আদেশ করেচি শুনেচ?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তোমাকে বিদায় করা হয়েচে। নতুন ভৈরবী করে, তাকে মন্দিরের ভার দেওয়া হবে। অভিষেকের দিনও স্থির হয়ে গেছে। তুমি রায়মশায়

প্রভৃতির হাতে দেবীর সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার গোমস্তার হাতে সিন্দুকের চাবি দেবে। এ-বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে?

ষোড়শী। আমার বক্তব্যে আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ। না, নেই। তবে আজ সন্ধ্যার পরে এইখানেই একটা সভা হবে! ইচ্ছে কর ত দশের সামনে তোমার দুঃখ জানাতে পার। ভাল কথা, শুনতে পেলাম আমার বিরুদ্ধে প্রজাদের না-কি তুমি বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা করচ?

ষোড়শী। তা জানিনে। তবে, আমার নিজের প্রজাদের আপনার উপদ্রব থেকে বাঁচবার চেষ্টা করচি।

জীবানন্দ। (অধর দংশন করিয়া) পারবে?

ষোড়শী। পারা না-পারা মা-চণ্ডীর হাতে।

জীবানন্দ। তারা মরবে।

ষোড়শী। মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

[ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এককড়ি এমন ভাব দেখাইতে লাগিল যে সে কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে]

জীবানন্দ। (একমুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া) তোমার নিজের প্রজা আর কেউ নেই। তারা যাঁর প্রজা তিনি নিজে দস্তখত করে দিয়েচেন। তাঁকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ষোড়শী। (মুখ তুলিয়া) আপনার আর কোন হুকুম আছে? নেই? তা হলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা শুনুন।

জীবানন্দ। বল।

ষোড়শী। আজ দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই, এবং সন্ধ্যায় মন্দিরের কোথাও সভা-সমিতির স্থানও হবে না। এগুলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি। (সহসা চীৎকার করিয়া) কখনো না! কিছুতেই নয়! এ-সব চালাকি আমাদের কাছে খাটবে না বলে দিচ্ছি--

[জীবানন্দ ছাড়া সকলেই ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।]

জনার্দ্দন। (উষ্মার সহিত) তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর জায়গা কেন হবে না শুনি ঠাকরুণ?

ষোড়শী। (বিনীত-কণ্ঠে) আপনি ত জানেন রায়মশাই, এখন চড়কের উৎসব। যাত্রীর ভীড়, সন্ন্যাসীর ভীড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায়?

জনার্দ্দন। (আত্মবিস্মৃত হইয়া সগর্জ্জনে) হতেই হবে। আমি বলচি হতে হবে।

ষোড়শী। (জীবানন্দকে) ঝগড়া করতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তবে ও-সব করবার এখন সুযোগ হবে না, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিয়ে বলে দেবেন। আমার সময় অল্প; আপনাদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চললাম।

জীবানন্দ। (তপ্ত-স্বরে) কিন্তু আমি হুকম দিয়ে যাচ্ছি, আজই এ-সব হতে হবে এবং হওয়াও চাই।

ষোড়শী। জোর করে?

জীবানন্দ। হাঁ, জোর করে।

ষোড়শী। সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক?

জীবানন্দ। হাঁ, সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক।

ষোড়শী। (পিছনে চাহিয়া ভীড়ের মধ্যে সাগরকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া) সাগর, তোদের সমস্ত ঠিক আছে?

সাগর। (সবিনয়ে) আছে মা, তোমার আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী। বেশ। জমিদারের লোক আজ একটা হাঙ্গামা বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাইনে। এই গাজনের সময়টায় রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলোকে তোরা দেখে রাখ্, এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে। হঠাৎ মারিস্‌নে—শুধু বার করে দিবি।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ষোড়শীর কুটীর

[সন্ধ্যা এই মাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। গৃহের অভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। বাহিরে ষোড়শী উপবিষ্ট। এমনি সময়ে নির্ম্মল ও হৈম প্রবেশ করিল। পিছনে ভৃত্য।]

ষোড়শী। এস, এস, কিন্তু এ কি কাণ্ড! তোমাদের যে আজ দুপুরের গাড়িতে যাবার কথা ছিল?

[নির্ম্মল ও হৈম নিকটে উপবেশন করিল।]

হৈম। কথা ছিল, কিন্তু যাইনি। এঁকেও যেতে দিইনি। দিদির এই নতুন ঘরখানি চোখে দেখে না গেলে দুঃখ করতে হ'তো।

নির্ম্মল। চোখে দেখে গিয়েও দুঃখ কম করতে হবে মনে হয় না।

হৈম। সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখলেই ছিল ভালো। এ-ঘরের আর যা দোষ থাক্, অপব্যয়ের অপবাদ শিরোমণিমশায় কেন বোধ হয় আমার বাবাও দিতে পারেন না। কিন্তু এ পাগলামি কেন করতে গেলে দিদি, এ-ঘরে ত তুমি থাকতে পারবে না!

ষোড়শী। এর চেয়েও কত খারাপ ঘরে কত মানুষকে ত থাকতে হয় ভাই।

হৈম। তা হলে সত্যিই কি তুমি সব ছেড়ে দেবে?

নির্ম্মল। তা ছাড়া কি উপায় আছে বলতে পার? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন অসহায় স্ত্রীলোক দিবানিশি বিবাদ করে টিকতে পারে না।

হৈম। আমরা সমস্তই শুনেচি। তুমি সন্ন্যাসিনী, সবই তোমার সইবে, কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী। দুর্নাম যদি মিথ্যেই হয় সইবে না কেন? হৈম, সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই, কিন্তু সেই মিথ্যে কথার সঙ্গে ঝগড়া করে মিথ্যে কাজের সৃষ্টি করতে আমার লজ্জা করে বোন।

হৈম। দিদি, তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার সব কথা আমরা বুঝতে পারিনে, কিন্তু তোমাকে দেখে কি আমার মনে হয় জানো? আমার শ্বশুরকে কোন্ এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন। খাপখানা তার ধূলো-বালিতে মলিন হয়ে

গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরেনি। সে যেমন সোজা, তেমন খাঁটি, তেমনি কঠিন। তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয় দেশশুদ্ধ লোকে সবাই ভুল করেচে, আসল কথা কেউ কিছুই জানে না।

ষোড়শী। (হৈমের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া) আজ তোমাদের কেন যাওয়া হ'লো না হৈম? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে, না?

হৈম। আমার ছেলের কথা তুললেই তুমি রাগ কর, সে আর বলব না, কিন্তু ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগের রাতে আমার এই অন্ধ মানুষটিকে যিনি হাতে ধরে নদী পার করে এনে নিঃশব্দে দিয়ে গেছেন, তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়েই বা আমরা যাই কি করে? কিন্তু যাবার আগে এই কথাটি আজ দাও দিদি, আপনার লোকের যদি কখনো দরকার হয়, এই প্রবাসী বোনটিকে তখন ভুলো না।

হৈম। (ষোড়শীকে নীরব দেখিয়া) কথা দিতে বুঝি চাঁও না দিদি?

ষোড়শী। কথা দিলাম, ভুলব না। ভুলিওনি হৈম। আঘাত পেয়ে আজই তোমাকে একখানা চিঠি লিখছিলাম, ভেবেছিলাম, তুমি চলে গেলে সেখানা তোমাকে ডাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু শেষ করতে পারলাম না, হঠাৎ মনে পড়ল এর জন্যে হয়ত তোমার বাবার সঙ্গেই শেষে বিবাদ বেধে যাবে।

হৈম। যেতেও পারে। কিন্তু আরও যে একটা মস্ত কথা আছে দিদি। আমার এই অন্ধ মানুষটিকে তুমি রক্ষে করেচ, তার চেয়ে বড় সংসারে ত আমার কিছুই নেই।

ষোড়শী। সত্যিই কিছু নেই হৈম?

হৈম। না, নেই। আর সত্যি কথাটিই বলে যাব বলে আজ যেতে পারিনি।

ষোড়শী। (হাসিয়া) কিন্তু এই ছোট্ট কথাটুকুর জন্যে ত একজনই যথেষ্ট ছিল ভাই, নির্ম্মলবাবুকে ত অনায়াসে যেতে দিতে পারতে?

হৈম। এঁকে? একলা? হায়, হায়, দিদি, বাইরে থেকে তোমরা ভাব প্রচণ্ড ব্যারিস্টার, মস্তলোক। কিন্তু আমিই জানি শুধু এই বিনি-মাইনের দাসীটিকে পেয়েছিলেন বলেই উনি জগতে টিকে গেলেন। বাস্তবিক দিদি, পুরুষমানুষদের এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! বাইরের দিকে যিনি যত বড়, যত দুর্দ্দাম, যত শক্তিমান, ভিতরের দিকে তিনি তেমনি অক্ষম, তেমনি দুর্ব্বল, তেমনি অপটু। দরকারের সময় কোথায় হারাবে এঁদের কাগজ-পত্র, বার হবার সময়ে কোথায় যাবে জামা-কাপড়-পোষাক, রাস্তায় বেরিয়ে কোথায় ফেলবে পকেটের টাকাকড়ি—কোন্ ভরসায় একলা ছেড়ে দিই বল ত? (সহাস্যে) একটুখানি চোখের আড়াল করেছিলাম বলেই ত সেদিন অমন বিভ্রাট বাধিয়েছিলেন। ভাগ্যে তুমি ছিলে।

ভৃত্য। মা, কালকের মত আজও ঝড়-জল হতে পারে—মেঘ উঠেচে।

হৈম। আজ তা হলে উঠি। মেঘের জন্যে নয় দিদি, তোমার কাছ থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু কাল সকালেই যাত্রা করতে হবে—আজ যেন আর কাজের অন্ত নেই। এঁকে নিয়ে পালিয়ে এসেচি, লুকিয়ে বাড়ি ঢুকতে হবে—বাবা না দেখতে পান। এতক্ষণে খোকা হয়ত ঘুম ভেঙে উঠে বসে কাঁদচে, তাকে আবার দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে, এঁর খাওয়া-দাওয়া আমি ছাড়া আর কেউ বোঝে না, আড়ালে থেকে সে ব্যবস্থা করতে হবে—তার পরে রেলগাড়িতে দীর্ঘ পথের সমস্ত আয়োজনই আমাকে নিজের হাতে করে নিতে হবে। কারও উপর নির্ভর করবার জো নেই। স্বামী, পুত্র, চাকর-বাকর—তার কত ঝঞ্ঝাট, কত ভার—আমার নিশ্বাস ফেলবারও সময় নেই দিদি।

ষোড়শী। এতে ত তোমার কষ্ট হয় বোন?

হৈম। (হাসিমুখে) তা হয়। তবু এই আশীর্ব্বাদ আমাকে কর তুমি, যেন এই কষ্ট মাথায় নিয়েই একদিন যেতে পারি। আর ফিরে যদি আবার জন্ম নিতেই হয়, যেন এমনি কষ্টই বিধাতা আমার অদৃষ্টে লিখে দেন। সেদিনেও যেন এমনি নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ না পাই।

ষোড়শী। তোমার কথাটা আমি বুঝেছি হৈম। এ যেন তোমার আনন্দের মধুচক্র। ভার যতই বাড়চে ততই এর অন্ধ্র-রন্ধ্র মধুতে ভরে ভরে উঠচে। তাই হোক, এই আশীর্ব্বাদই তোমাকে আজ করি।

হৈম। (সহসা পদধূলি লইয়া) তাই কর দিদি, মেয়েমানুষের জীবনে এর বড় আশীর্ব্বাদই কি আছে!

নির্ম্মল। আঃ, কি বকে যাচ্চো বল ত? আজ তোমার হ'লো কি?

হৈম। কি যে হয়েচে তুমি তার জানবে কি?

ষোড়শী। জানার শক্তিই আছে না কি আপনাদের?

নির্ম্মল। আপনাদের অর্থাৎ পুরুষদের ত? না, এতবড় কঠিন তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার সাধ্য নেই আমাদের সে-কথা মানি, কিন্তু আপনিই বা এ সত্য জানলেন কি করে?

হৈম। কেন? দেবীর ভৈরবী বলে? কিন্তু ভৈরবী কি নারী নয়? ওগো মশায়, এ তত্ত্ব আমাদের চেষ্টা করে শিখতে হয় না। আমাদের জন্মকালে বিধাতা স্বহস্তে তাঁর দুই হাত পূর্ণ করে আমাদের বুকের মধ্যে ঢেলে দেন। সে সম্পদের কাছে ইন্দ্রাণীর ঐশ্বর্য্যও কামনা করিনে এ কি সত্য নয় দিদি?

ষোড়শী। সত্যি বই কি ভাই।

ভৃত্য। মা, মেঘ যে বেড়েই আসচে?

হৈম। এই যে উঠি বাবা। অনেক বাচালতা করে গেলাম দিদি, মাপ ক'রো।

নির্ম্মল। হৈমকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন, তার হাতে দিলে সময়ও বাঁচত, খরচও বাঁচত।

ষোড়শী। (হাসিয়া) না দিলেও বাঁচবে। হয়ত আর তার প্রয়োজনই হবে না।

নির্ম্মল। ঈশ্বর করুন নাই যেন হয়, কিন্তু হলে আপনার প্রবাসী ভক্ত দু'টিকে বিস্মৃত হবেন না।

হৈম। আসি দিদি। (পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) তোমার মুখের পানে চেয়ে আজ কত-কি যেন মনে হচ্চে। দিদি! মনে হচ্চে, এমন যেন তোমাকে আর কখনো দেখিনি—যেন সহসা কোথায় কত দূরেই চলে গিয়েছো।

নির্ম্মল। নমস্কার। প্রয়োজনে যেন ডাক পাই।

[সকলের প্রস্থান]

ষোড়শী। হৈম, তুমি যেন আজ আমার কত যুগের চোখের ঠুলি খুলে দিয়ে গেলে বোন।—কে?

[সাগরের প্রবেশ]

সাগর। আমি সাগর।

ষোড়শী। তোদের আর সবাই? কাল যারা দল বেঁধে এসেছিল?

সাগর। আজও তারা তেমনি দল বেঁধেই গেছে হুজুরের কাছারি-বাড়িতে। আর বোধ হয় তোমারই বিরুদ্ধে—

ষোড়শী। বলিস্ কি সাগর? আমারই বিরুদ্ধে?

সাগর। আশ্চর্য্য হবার ত কিছু নেই মা! সর্ব্বপ্রকার আপদে বিপদে চিরকাল তোমার কাছে এসে দাঁড়ানই সকলের অভ্যাস। প্রথমটা সেই অভ্যাসটাই বোধ হয় তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু আজ জমিদারের একটা চোখ-রাঙানিতেই তাদের হুঁস হয়েচে।

ষোড়শী। ভালো। কিন্তু সভাটা যে শুনেছিলাম মন্দিরে হবার কথা ছিল?

সাগর। কথাও ছিল, হুজুরের ভোজপুরীগুলোর ইচ্ছেও ছিল, কিন্তু গ্রামের কেউ রাজি হলেন না। তাঁরা ত এদিককার মানুষ—আমাদের খুড়ো-ভাইপোকে হয়ত চেনেন।

ষোড়শী। কি স্থির হ'লো সভাতে?

সাগর। তা সব ভালো। এই মঙ্গলবারেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তোমারও ভাবনা নেই—কাশীবাসের বাবদে প্রার্থনা জানালে শ'খানেক টাকা পেতে পারবে।

ষোড়শী। প্রার্থনা জানাতে হবে বোধ করি হুজুরের কাছে?

সাগর। বোধ হয় তাই।

ষোড়শী। আচ্ছা, জমি-জমা যাদের সমস্ত গেল, তাদের উপায় কি স্থির হ'লো?

সাগর। ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তার অন্যথা হবে না।

ষোড়শী। আর তোদের?

সাগর। আমাদের খুড়ো-ভাইপোর? (একটু হাসিয়া) সে ব্যবস্থাও রায়মশায় করেছেন, নিতান্ত চুপ করে বসেছিলেন না। পাকা লোক, দারোগা পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ-দশেকের মধ্যে একটা ডাকাতি হতে যা দেরি।

ষোড়শী। (ভয় পাইয়া) হাঁরে, একি তোরা সত্যি বলে মনে করিস্?

সাগর। মনে করি? এ ত চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা। আমাদের জেলের বাইরে রাখতে পারে এ সাধ্য আর কারও নেই। (একটু থামিয়া) তা বলে যাদের জেল হবে না তাদের দুর্ভাগ্য কিছু কম নয় মা।

ষোড়শী। কেন রে?

সাগর। তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যা হোক আমরা দু'টো খেতে পাব, কিন্তু এরা তাও পাবে না। রায়মশায়ের কাছে ধার করে জমিদারের সেলামী জুগিয়েচে, সেই খতগুলো সব ডিক্রী হতে যা বিলম্ব, তার পরে তাঁর নিজ জোতে জন খেটে দু'মুঠো জোটে ভালো, না হয়—

ষোড়শী। না হয় কি?

সাগর। না হয় আসামের চা-বাগান আছেই। কেন মা, তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বেলডাঙাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বসতি ছিল?

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) পড়ে।

সাগর। আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা-বাগানে। কিন্তু আমি দেখেচি ছেলেবেলায় তাদের জমি-জমা, হাল-বলদ। দু'মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সবাইয়ের ছিল। আজ তাদের অর্দ্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্দ্ধেক রায়মশায়ের।

ষোড়শী। (স্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা সাগর, এ-সব তুই শুনলি কার মুখে?

সাগর। স্বয়ং হুজুরের মুখেই।

ষোড়শী। তা হলে এ-সকল তাঁরই মতলব ?

সাগর। (চিন্তা করিয়া) কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশায়ও আছেন।

ষোড়শী। এ ত গেল তোদের কথা সাগর। কিন্তু আমি ত একা। জমিদার ইচ্ছে করলে ত আমারও প্রতি অত্যাচার করতে পারেন ?

সাগর। তা জানিনে মা, শুধু জানি তুমি একা নও। (ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া) মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নেই, গুরুর নিষেধ আছে (বংশদণ্ড সজোরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া)—হরিহর সর্দ্দারের ভাইপো সাগরের নাম দশ-বিশ ক্রোশের লোক জানে—তোমার উপর অত্যাচার করবার মানুষ ত মা পঞ্চাশখানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবে না।

ষোড়শী। (দুই চক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল) সাগর, এ কি সত্যি ?

সাগর। (তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাতের লাঠি ষোড়শীর পায়ের কাছে রাখিয়া) বেশ ত মা, সেই আশীর্ব্বাদই কর না, যেন কথা আমার মিথ্যে না হয়।

ষোড়শী। (চোখের দৃষ্টি একবার একটুখানি কোমল হইয়া আবার তেমনি জ্বলিতে লাগিল) আচ্ছা সাগর, আমি ত শুনেচি তোদের প্রাণের ভয় করতে নেই ?

সাগর। (সহাস্যে) মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বলচিনে মা।

ষোড়শী। কেবল প্রাণ দিতেই পারিস, আর নিতে পারিস্নে ?

সাগর। পারিনে ? এই আদেশের জন্যে কত ভিক্ষেই না চাইলাম, কিন্তু কিছুতেই যে হুকুমটুকু তোমার মুখ থেকে বার করতে পারলাম না মা।

ষোড়শী। না সাগর, না। অমন কথা তোরা মুখেও আনিস্নে বাবা।

সাগর। কিন্তু মন থেকে যে কথাটা তাড়াতে পারচিনে মা !

[পূজারী প্রবেশ করিল]

পূজারী। মন্দিরের দোর বন্ধ করে এলাম মা।

ষোড়শী। চাবি ?

পূজারী। এই যে মা। (চাবির গোছা হাতে দিয়া) রাত হ'লো এখন তা হলে আসি ?

ষোড়শী। এস, বাবা।

[পূজারীর প্রস্থান।]

সাগর, ফকিরসাহেব চলে গেছেন ! তিনি কোথায় আছেন খোঁজ নিয়ে আমাকে জানাতে পারিস্ বাবা ?

সাগর। কেন মা ?

ষোড়শী। তাঁকে আমার বড় প্রয়োজন। তোমরা ছাড়া তাঁর চেয়ে শুভাকাঙ্ক্ষী আমার কেউ নেই।

সাগর। কিন্তু তোমার কাছেই ত কতবার শুনেচি তিনি সাধুপুরুষ। যেখানেই থাকুন তাঁকে যথার্থ মন দিয়ে ডাকলেই এসে উপস্থিত হন।

ষোড়শী। (চমকিয়া) তাই ত সাগর, এতবড় কথাটা আমি কি করে ভুলে-ছিলাম! আর আমার চিন্তা নেই, আমার এতবড় দুঃসময়ে তিনি না এসে কিছুতেই পারবেন না।

সাগর। আমারও বিশ্বাস তাই। কিন্তু কথায় কথায় রাত্রি অনেক হ'লো মা, তুমি বিশ্রাম কর, আসি?

ষোড়শী। এসো।

সাগর। (ঈষৎ হাসিয়া) ভয় নেই মা, সাগর তোমাকে একলা রেখে কোথাও বেশীক্ষণ থাকবে না!

[প্রস্থান]

[তখন পর্য্যন্ত ষোড়শীর আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকার্য্য সমাধা হয় নাই, সে এই আয়োজনে ব্যাপৃতা থাকিয়া]

ষোড়শী। সাগর আমাকে কতবড় কথাই না স্মরণ করিয়ে দিলে। ফকিরসাহেব! যেখানে থাকুন, এ বিপদে আপনার দেখা আমি পাবোই পাব।

নেপথ্যে। আসতে পারি কি?

ষোড়শী। (সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল-কণ্ঠে) আসুন আসুন—আমি যে সমস্ত মন দিয়ে শুধু আপনাকেই ডাকছিলাম!

[জীবানন্দ প্রবেশ করিলেন]

জীবানন্দ। এতবড় পতিভক্তি কলিকালে দুর্ল্লভ। আমার পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি কই?

ষোড়শী। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া সভয়ে) আপনি? আপনি এসেচেন কেন?

জীবানন্দ। তোমাকে দেখতে। একটু ভয় পেয়েচ বোধ হচ্চে। পাবারই কথা। কিন্তু চেঁচিও না। সঙ্গে পিস্তল আছে, তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু করতে পারবে না।

[ষোড়শী নির্ব্বাক হইয়া রহিল]

জীবানন্দ। তবু দোরটা বন্ধ করে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাক। কি বল?

[এই বলিয়া জীবানন্দ অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিলেন]

ষোড়শী। (ভয়ে কণ্ঠস্বর তাহার কাঁপিতেছিল) সাগর নেই—

জীবানন্দ। নেই? ব্যাটা গেল কোথায়?

ষোড়শী। আপনারা জানেন বলেই ত—

জীবানন্দ। জানি বলে? কিন্তু আপনারা কারা? আমি ত বাপ্পও জানতাম না।

ষোড়শী। নিরাশ্রয় বলেই ত লোক নিয়ে আমার উপর অত্যাচার করতে এসেচেন? কিন্তু আপনার কি করেছি আমি?

জীবানন্দ। লোক নিয়ে অত্যাচার করতে এসেচি? তোমার প্রতি? মাইরি না। বরঞ্চ, মন কেমন করছিল বলে ছুটে দেখতে এসেচি।

[ষোড়শীর চোখে জল আসিতেছিল, এই উপহাসে তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। জীবানন্দ অদূরে বসিয়া তাহার আনত মুখের প্রতি লুব্ধ তৃষিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন]

জীবানন্দ। অলকা?

ষোড়শী। বলুন।

জীবানন্দ। তোমার এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা বুঝি নেই?

[ষোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।]

জীবানন্দ। (দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া) ব্রজেশ্বরের কপাল ভালো ছিল। দেবী-রাণী তাকে ধরিয়ে আনিয়েছিল সত্যি, কিন্তু অম্বুরী তামাকও খাইয়েছিল, এবং ভোজনান্তে দক্ষিণাও দিয়েছিল। বিদায়ের পালাটা আর তুলব না, বঙ্কিমবাবুর বইখানা পড়েচ ত?

ষোড়শী। আপনাকে ধরে আনলে সেইমত ব্যবস্থাও থাকত—অনুযোগ করতে হ'তো না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) তা বটে। টানা-হেঁচড়া দড়িদড়ার বাঁধাবাঁধিই মানুষের নজরে পড়ে। ভোজপুরী পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই পাড়াশুদ্ধ সকলেই দেখে; কিন্তু যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না—হাঁ অলকা, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে কি বলে? অতনু, না? বেশ তিনি। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) যৎসামান্য অনুরোধ ছিল; কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচরগুলো সন্ধান পেলে জামাই আদর করবে না। এমন কি, শ্বশুরবাড়ি এসেচি বলে হয়ত বিশ্বাস করতেই চাইবে না—ভাববে প্রাণের দায়ে বুঝি মিথ্যেই বলচি।

[লজ্জায় ষোড়শী আরও অবনত হইল।]

জীবানন্দ। তামাকের ধুঁয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চলত, কিন্তু ধুঁয়া নয় এমন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক, নেই কিছু

ষোড়শী। কিছু কি? মদ?

জীবানন্দ। (হাসিয়া মাথা নাড়িয়া) এবারে ভুল হ'লো। ওর জন্যে অন্য লোক আছে, সে তুমি নয়। তোমাকে বুঝতে পারার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েচ—আর যা অপবাদ দিই, অস্পষ্টতার অপবাদ দিতে পারব না। অতএব তোমার কাছে যদি চাইতেই হয়, চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের পথে ঠেলে দেয় না। ডাল ভাত, মেঠাই-মণ্ডা, চিঁড়ে, মুড়ি যা হোক দাও, আমি খেয়ে বাঁচি! নেই?

[ষোড়শী নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল]

জীবানন্দ। আজ সকালে মন ভালো ছিল না! শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ সুস্থদেহ যে কি আমি জানিনে; সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম, কত যে হাঁটলাম বলতে পারিনে—ফিরতে ইচ্ছাই হ'লো না। সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, একলা জলের ধারে দাঁড়িয়ে কি যে ভালো লাগল বলতে পারিনে। কেবল তোমাকে মনে পড়তে লাগল। মনে পড়ল আমার কাছারি বাড়িতে এতক্ষণে লোক জমেচে—তোমাকে নির্ব্বাসনে পাঠাবার ব্যবস্থাটা আজ শেষ করাই চাই। ফিরে এসে সভায় যোগ দিলাম, কিন্তু টিকতে পারলাম না। একটা ছুতো করে পালিয়ে এসে দাঁড়ালাম ওই মনসা গাছটার পিছনে।

ষোড়শী। তার পরে?

জীবানন্দ। দেখি দাঁড়িয়ে সাগর সর্দ্দার এবং তুমি। আলাপ-আলোচনা সমস্তই কানে গেল, তাৎপর্য্য গ্রহণ করতেও বিলম্ব হ'লো না। ভাবলাম, আমাদের মত সাধু ব্যক্তিরা যে এ হেন নির্ব্বোধ ভৈরবীকে দূর করে দিতে চেয়েচে সে ঠিকই হয়েচে। সে-রাত্রে বাড়ি ঘেরাও করে পুলিশ পিয়াদা হাত-কড়া নিয়ে হাজির, সামান্য একটা মুখের কথার জন্য স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্য্যন্ত কি পীড়াপীড়ি—আর তুমি বললে কিনা আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচি! আর ছোট্ট একটুখানি হুকুমের জন্যে সাগরচাঁদের কত অনুনয়-বিনয়, কি সাধাসাধি—আর তুমি বলে বসলে কি-না অমন কথা মুখেও আনিসনে বাবা। অভিমানে বাবাজীবন মুখখানি ম্লান করে চলে গেলেন সে ত স্বচক্ষেই দেখলাম। মনে মনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বললাম, জয় মা চণ্ডীগড়ের চণ্ডী! তোমার এই অধম সন্তানের প্রতি এত কৃপা না থাকলে কি আর এই মেয়েমানুষটির বার বার এমন করে বুদ্ধি লোপ কর! এখন একবার একে

বিদায় করে আমাকে তক্তে বসাও মা, জনার্দ্দন আর এককড়ি, এই দুই তাল বেতালকে সঙ্গে নিয়ে আমি এমনি সেবা তোমার শুরু করে দেব যে, একদিনের পূজোর চোটে তোমার মাটির মূর্ত্তি আহ্লাদে একেবারে পাথর হয়ে যাবে। কিন্তু ভক্তি-তত্ত্বের এ-সব বড় বড় কথা না হয় পরে ভাবা যাবে, কিন্তু এখন ক্ষিদের জ্বালায় যে আর দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক নেই কিছু অলকা ?

ষোড়শী। কিন্তু বাড়ি গিয়ে ত অনায়াসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ। অর্থাৎ, আমার বাড়ির খবর আমার চেয়ে তুমি বেশী জানো। (এই বলিয়া সে একটুখানি হাসিল।)

ষোড়শী। আপনি সারাদিন খান্‌নি, আর বাড়িতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই। এ কি কখনো হতে পারে ?

জীবানন্দ। না পারবে কেন ? আমি খাইনি বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা ত করে রাখিনি। আজ খামোকা রাগ করলে চলবে কেন অলকা ? (বলিয়া সে তেমনি মৃদু হাসিল) আমার যে শাস্তিময় জীবনযাত্রা সেদিন চোখে দেখে এসেচ সে বোধ হয় ভুলে গেছ। আজ তা হলে আসি ?

ষোড়শী। (ব্যাকুল-কণ্ঠে) দেবীর সামান্য একটু প্রসাদ আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পারবেন ?

জীবানন্দ। খুব পারব। কিন্তু সামান্য একটু প্রসাদ। কিন্তু সে ত নিশ্চয় তোমার নিজের জন্য আনা অলকা ?

ষোড়শী। নইলে কি আপনার জন্যে রেখেচি এই আপনি মনে করেন ?

জীবানন্দ। (হাসিমুখে) না, তা করিনে। কিন্তু ভাবচি, তোমাকে ত বঞ্চিত করা হবে।

ষোড়শী। সে ভাবনার প্রয়োজন নেই। আমাকে বঞ্চিত করায় আপনার নূতন অপরাধ কিছু হবে না।

জীবানন্দ। না, অপরাধ আর আমার হয় না। একেবারে তার নাগালের বাইরে চলে গেছি! কিন্তু হঠাৎ একটা অদ্ভুত খেয়াল মনে উঠেচে অলকা, যদি না হাসো ত তোমাকে বলি।

ষোড়শী। বলুন।

জীবানন্দ। কি জানো, মনে হয়, হয়ত আজও বাঁচতে পারি, হয়ত আজও মানুষের মত—কিন্তু এমন কেউ নেই যে আমার—কিন্তু তুমিই পারো শুধু এই পাপিষ্ঠের ভার নিতে—নেবে অলকা ?

ষোড়শী। কি বলচেন ?

জীবনান্দ। (আত্মসমর্পণের আশ্চর্য্য কণ্ঠ-স্বরে) বলচি আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা।

ষোড়শী। (চমকিয়া, এক মুহূর্ত্ত থামিয়া) অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করচেন, আমাকে দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিতে চান্। আমার মাকে ঠকাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না।

জীবানন্দ। কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করিনি। তোমার বিচার করেচি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কেবলি মনে হয়েচে, এই কঠোর আশ্চর্য্য রমণীকে অভিভূত করেচেন সে মানুষটি কে ?

ষোড়শী। (আশ্চর্য্য হইয়া) তারা আপনার কাছে তার নাম বলেনি ?

জীবানন্দ। না। আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেচি, তারা বার বার চুপ করে গেছে। যাক্, এবার আমি যাই, কি বল ?

ষোড়শী। কিন্তু আপনার যে কি কাজের কথা ছিল ?

জীবানন্দ। কাজের কথা ? কিন্তু কি যে ছিল আমার আর মনে পড়চে না। শুধু এই কথায় মনে পড়চে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। অলকা, তোমার কি সত্যিই আবার বিয়ে হয়েছিল ?

ষোড়শী। আবার কি-রকম ? সত্যি বিয়ে আমার একবার মাত্রই হয়েচে।

জীবানন্দ। আর তোমার মা তোমাকে আমাকে দিয়েছিলেন সেটাই কি সত্য নয়।

ষোড়শী। না, সে সত্য নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেন্‌নি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্য কোথাও ছিল না।

জীবানন্দ। (কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্নের মত বসিয়া, যেন কতদূর হইতে কথা কহিল) অলকা, একথা তোমার সত্য নয়।

ষোড়শী। কোন্ কথা ?

জীবানন্দ। তুমি যা জেনে রেখেচ। ভেবেছিলাম সে কাহিনী কখনো কাউকে বলব না, কিন্তু সেই কাউকের মধ্যে আজ তোমাকে ফেলতে পারচিনে। তোমার মাকে ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু ভাগবান তোমাকে ঠকাবার সুযোগ আমাকে দেননি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে ?

ষোড়শী। বলুন ?

জীবানন্দ। আমি সত্যবাদী নই; কিন্তু আজকের কথা আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে আমি জানতাম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবার মতলব আমার ছিল না—ছিল কেবল তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য। কিন্তু সে-রাত্রে হাতে হাতে তোমাকে যখন পেলাম, তখন না বলে ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেও আর হ'লো না।

ষোড়শী। তবে কি ইচ্ছে হ'লো?

জীবানন্দ। থাক্, সে তুমি আর শুনতে চেয়ো না। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত শুনলে আপনিই বুঝবে, এবং সে বোঝায় ক্ষতি বই লাভ আমার হবে না। কিন্তু এরা তোমাকে যা বুঝিয়েছিল তা তাই নয়, আমি তোমাকে ফেলে পালাইনি।

ষোড়শী। আপনার না পালানোর ইতিবৃত্ত এখন ব্যক্ত করুন।

জীবানন্দ। আমি নির্ব্বোধ নই, যদি ব্যক্তই করি, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করব। তোমার মায়ের এতবড় ভয়ানক প্রস্তাবেও কেন রাজি হয়েছিলাম জানো? একজন স্ত্রীলোকের হার আমি চুরি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তাকে শান্ত করব। সে শান্ত হ'লো, কিন্তু পুলিশের ওয়ারেণ্ট শান্ত হ'লো না। ছ'মাস জেলে গেলাম—সেই যে শেষ রাত্রে বের হয়েছিলাম, আর ফেরবার অবকাশ হ'লো না।

ষোড়শী। (রুদ্ধ-নিশ্বাসে) তার পরে?

জীবানন্দ। (মৃদু হাসিয়া) তার পরেও মন্দ নয়। জীবানন্দবাবুর নামে আরও একটা ওয়ারেণ্ট ছিল। মাস-কয়েক পূর্ব্বে রেলগাড়িতে একজন বন্ধু সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্হিত হন। অতএব আরও দেড় বৎসর। একুনে বছর-দুই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁয়ের ভাবী জমিদারবাবু যখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করলেন, তখন কোথায় বা অলকা, আর কোথায় বা তার মা! (দু'জনেই ক্ষণিক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল) আর একবার সভায় যেতে হবে। অলকা, আসি তা হলে।

ষোড়শী। সভায় আপনার অনেক কাজ, না গেলেই নয়। কিন্তু কিছু না খেয়েও ত যেতে পারবেন না।

জীবানন্দ। পারব না? তা হলে আনো। কিন্তু মস্ত বদ অভ্যেস আমার, খেয়ে আর নড়তে পারিনে।

ষোড়শী। না পারেন, এখানেই বিশ্রাম করবেন।

জীবানন্দ। বিশ্রাম করব! যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা?

ষোড়শী। (হাসিয়া) সে সম্ভাবনা ত রইলই। কিন্তু পালাবেন না যেন? আমি খাবার নিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

[গৃহকোণে একখানা পত্রের খণ্ডাংশ পড়িয়াছিল, জীবানন্দের দৃষ্টি পড়িতেই তাহা সে তুলিয়া লইয়া দীপালোকে পড়িয়া ফেলিল। তাহার মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের সরস ও প্রফুল্ল মুখের চেহারা গম্ভীর ও অত্যন্ত গভীর হইয়া উঠিল। ষোড়শী খাবারের পাত্র লইয়া প্রবেশ করিল। তাহার মনে পড়িল ঠাঁই করা হয় নাই, তাই সে পাত্রটা তাড়াতাড়ি একধারে রাখিয়া আসনের অভাবে কম্বলই পুরু করিয়া পাতিল এবং নিজের একখানি বস্ত্র পাট করিয়া দিতেছিল, এমনি সময়ে জীবানন্দ কথা কহিলেন]

জীবানন্দ। ওটা কি হচ্চে?

ষোড়শী। আপনার ঠাঁই করচি। শুধু কম্বলটা ফুটবে।

জীবানন্দ। ফুটবে, কিন্তু আতিশয্যটা ঢের বেশী ফুটবে। যত্ন জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো।

[কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।]

জীবানন্দ। (হাতের কাগজ দেখাইয়া) ছেঁড়া চিঠি—সবটুকু নেই। যাকে লিখে-ছিলে তাঁর নামটি শুনতে পাইনে?

ষোড়শী। কার নাম?

জীবানন্দ। যিনি দৈত্য-বধের জন্যে চণ্ডীগড়ে অবতীর্ণ হবেন, যিনি দ্রৌপদীর সখা —আর বলবো?

[এই ব্যঙ্গোক্তির ষোড়শী উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার চোখের উপর হইতে ক্ষণকাল পূর্ব্বের মোহের যবনিকা খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গেল।]

জীবানন্দ। এই আহ্বান-লিপির প্রতি ছত্রটি যাঁর কর্ণে অমৃত বর্ষণ করবে তাঁর নামটি?

ষোড়শী। (আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া) তাঁর নামে আপনার প্রয়োজন?

জীবানন্দ। প্রয়োজন আছে বই কি। পূর্ব্বাহ্নে জানতে পারলে হয়ত আত্মরক্ষার একটা উপায় করতে পারি।

ষোড়শী। আত্মরক্ষার প্রয়োজন ত একা আপনারই নয় চৌধুরীমশায়। আমারও ত থাকতে পারে।

জীবানন্দ। পারে বৈ কি।

ষোড়শী। তা হলে সে নাম আপনি শুনতে পাবেন না। কারণ, আমার ও আপনার একই সঙ্গে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ। বেশ, তা যদি না থাকে রক্ষা পাওয়াটা আমারই দরকার এবং তাতে লেশমাত্র ত্রুটি হবে না জেনো। (ষোড়শী নিরুত্তর) তুমি জবাব না দিতে পারো, কিন্তু তোমার এই বীরপুরুষটির নাম যে আমি জানিনে তা না।

ষোড়শী। জানবেন বই কি। পৃথিবীর বীর পুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাকবারই ত কথা।

জীবানন্দ। সে ঠিক। কিন্তু এই কাপুরুষকে বার বার অপমান করবার ভারটা তোমার বীরপুরুষ সইতে পারলে হয়। যাক, এ চিঠি ছিঁড়লে কেন?

ষোড়শী। এর জবাব আমি দেব না।

জীবানন্দ। কিন্তু সোজা নির্ম্মল সাহেবকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন! এ শব্দভেদী বাণ কি তাঁরই শেখানো না কি?

ষোড়শী। তার পরে?

জীবানন্দ। তার পরে আজ আমার সন্দেহ গেল। বন্ধুর সংবাদ আমি অপরের কাছে শুনেচি, কিন্তু রায়মশায়কে যতই প্রশ্ন করেচি, ততই তিনি চুপ করে গেলেন। আজ বোঝা গেল তাঁর আক্রোশটাই সবচেয়ে কেন বেশি।

ষোড়শী। (সচকিতে) নির্ম্মলের সম্বন্ধে আপনি কি শুনেচেন?

জীবানন্দ। সমস্তই। তোমার চমক আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাসতে পারলাম না—আমার আনন্দ করবার এ কথা নয়। সেই ঝড় জল অন্ধকার রাত্রে একাকী তার হাত ধরে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া মনে পড়ে? তার সাক্ষী আছে। সাক্ষী ব্যাটারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে কিছুই জানবার জো নেই। আমি যখন গাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাই ভেবেছিলাম কেউ দেখেনি।

ষোড়শী। যদি সত্যই তা করে থাকি সে কি এত বড় দোষের?

জীবানন্দ। কিন্তু গোপন করার চেষ্টাটা? এই চিঠির টুকরোটা? নিজেই একবার পড়ে দেখ ত কি মনে হয়? আমার মত ইনিও একবার তোমার বিচার করতে বসেছিলেন না? দেখছি, তোমার বিচার করবার বিপদ আছে। (এই বলিয়া জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিলেন। ষোড়শী নিরুত্তর) এ আমি সঙ্গে নিয়ে চললাম, আবশ্যক হলে যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার ত্রুটি হবে না। এই ক'টা ছত্র আমার পুরুষের চোখকেই যখন ফাঁকি দিতে পারেনি, তখন আশা করি হৈমকেও ঠকাতে পারবে না।

[ষোড়শী নিরুত্তর]

জীবানন্দ। কেমন, অনেক কথাই জানি?

ষোড়শী। হাঁ।

জীবানন্দ। এ-সব তবে সত্যি বল?

ষোড়শী। হাঁ, সত্যি।

জীবানন্দ। (আহত হইয়া) ওঃ—সত্যি! (স্তিমিত দীপ-শিখাটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া ষোড়শীর মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ-চক্ষে চাহিয়া) এখন তাহলে তুমি কি করবে মনে কর?

ষোড়শী। কি আমাকে আপনি করতে বলেন?

জীবানন্দ। তোমাকে? (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া, দীপ-শিখা পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া দিয়া) তা হলে এঁরা সকলে যে তোমাকে অসতী বলে—

ষোড়শী। এঁদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে ত আমি নালিশ জানাইনি। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন। কারণ দেখাবার প্রয়োজন নেই।

জীবানন্দ। তা বটে। কিন্তু সবাই মিথ্যা কথা বলে, আর তুমি একাই সত্যবাদী, এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও অলকা?

[ষোড়শী নিরুত্তর]

জীবানন্দ। একটা উত্তর দিতেও চাও না?

ষোড়শী। (মাথা নাড়িয়া) না।

জীবানন্দ। অর্থাৎ আমার কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেয়ে দুর্নামও ভালো। বেশ, সমস্তই স্পষ্ট বোঝা গেছে। (এই বলিয়া তিনি ব্যঙ্গ করিয়া হাসিলেন।)

ষোড়শী। স্পষ্ট বোঝা যাবার পরে কি করতে হবে তাই শুধু বলুন।

[তাহার এই উত্তরে জীবানন্দের ক্রোধ ও অধৈর্য্য
শতগুণে বাড়িয়া গেল]

জীবানন্দ। কি করতে হবে সে তুমি জানো, কিন্তু আমাকে দেবমন্দিরের পবিত্রতা বাঁচাতে হবে। এর যথার্থ অভিভাবক তুমি নও, আমি। পূর্ব্বে কি হ'তো জানিনে, কিন্তু এখন থেকে ভৈরবীকে ভৈরবীর মতই থাকতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে।

ষোড়শী। বেশ তাই হবে। যথার্থ অভিভাবক কে সে নিয়ে আমি বিবাদ করব না। আপনারা যদি মনে করেন আমি গেলে মন্দিরের ভালো হবে আমি যাব।

জীবানন্দ। তুমি যে যাবে সে ঠিক। কারণ, যাতে যাও সে আমি দেখব।

ষোড়শী। কেন রাগ করচেন, আমি তো সত্যিই যেতে চাচ্চি। কিন্তু আপনার ওপর এই ভার রইল যেন মন্দিরের যথার্থই ভালো হয়।

জীবানন্দ। কবে যাবে?

ষোড়শী। যখনই আদেশ করবেন। কাল, আজ, এখন—

জীবানন্দ। কিন্তু নির্ম্মলবাবু? জামাইসাহেব?

ষোড়শী। (কাতর-কণ্ঠে) তাঁর নাম আর করবেন না।

জীবানন্দ। আমার মুখে তাঁর নামটা পর্য্যন্ত তোমার সহ্য হয় না। ভালো। কিন্তু কি তোমাকে দিতে হবে?

ষোড়শী। কিছুই না।

জীবানন্দ। এ ঘরখানা পর্য্যন্ত ছাড়তে হবে জানো? এও দেবীর।

ষোড়শী। জানি। যদি পারি, কালই ছেড়ে দেব।

জীবানন্দ। কোথায় যাবে ঠিক করেচ?

ষোড়শী। এখানে থাকব না, এর বেশী কিছুই ঠিক করিনি। একদিন কিছু না জেনেই আমি ভৈরবী হয়েছিলাম, আর বিদায় নেবার বেলাতেও এর বেশী ভাবব না। আপনি দেশের জমিদার, চণ্ডীগড়ের ভালো-মন্দের ভার আপনার 'পরে রেখে যেতে শেষ সময়ে আর আমি দ্বিধা করব না। কিন্তু আমার বাবা ভারি দুর্ব্বল, তাঁর উপরে নির্ভর করে যেন আপনি নিশ্চিন্ত হবেন না।

জীবানন্দ। তুমি কি সত্যিই চলে যেতে চাও না কি?

ষোড়শী। আর আমার দুঃখী দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা। একদিন তাদেরই সমস্ত ছিল—আজ তাদের মত নিঃস্ব নিরুপায় আর কেউ নেই। ডাকাত বলে বিনা দোষে লোকে তাদের জেলে দিয়েচে। এদের সুখ-দুঃখের ভারও আমি আপনাকেই দিয়ে গেলাম।

জীবানন্দ। আচ্ছা, তা হবে হবে। কি তারা চায় বল ত?

ষোড়শী। সে তারাই আপনাকে জানাবে।

[এই বলিয়া সে সহসা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া
দড়ির আলনা হইতে গামছা ও কাপড় হাতে লইল]

ষোড়শী। আমার স্নান করতে যাওয়ার সময় হ'লো।

জীবানন্দ। স্নানের সময়? এই রাত্রে?

ষোড়শী। রাত আর নেই—এবার আপনি বাড়ি যান। (এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইল)

জীবানন্দ। (ব্যগ্রকণ্ঠে) কিন্তু আমার সকল কথাই যে বাকী রয়ে গেল?

ষোড়শী। থাক্, আপনি বাড়ি যান।

জীবানন্দ। না। কোথায় যেন আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে অলকা, কথা আমার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি—

ষোড়শী। না সে হবে না, আপনি বাড়ি যান। আমার বহু ক্ষতিই করেছেন, এ-জীবনের শেষ সর্ব্বনাশ করতে আর আপনাকে দেব না।

জীবানন্দ। আচ্ছা, আমি চললাম অলকা।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডীগড় গ্রাম : গাজনের সঙ

গীত (১)

বড় প্যাঁচে পড়েচে এবার ভোলা দিগম্বর।
অভিমানী উমারাণী বলেনি তায় প্রাণেশ্বর॥
অনেকদিনের পরে এবার এল শ্বশুর-বাড়ি।
ভেবেছিল আসবে গৌরী পরে পাটের শাড়ি॥
চাঁদ-বদনে কইবে কথা
ঘুচবে ভোলার প্রাণের ব্যথা
কোন কথা না বলে সে পালিয়ে এল ছেড়ে ঘর।
ভাবের ঘোরে ছিল অচেতন
ভেবে চিন্তে পেল নাকো হ'লো এ কেমন—
এবার শান্ত-শিষ্ট গৃহবাসী
করবে তোমায় হে সন্ন্যাসী
জটা বাকল ছাড়িয়ে নিয়ে সাজিয়ে দেবে প্রেমের বর

গীত (২)

বৌ নিতে এসেচে এবার আপনি মহেশ্বর।
তুই নাকি সই বলেছিলি
করবি না আর স্বামীর ঘর॥

ষোড়শী

পাঁচ বছরে করে পঞ্চতপা,
তোর হাতে তোর মা-জননী সঁপেছেন ক্ষ্যাপা,
বাঁধতে যদি পারিস্‌নি তায়,
তাই বলে কি হবে সে পর ?
(তাই বলে পর হয়ে কি যায়)
একবার নাকি গিয়েছিল কুচুনী পাড়ায়
সত্যি কথা তোর কাছে সই যদিই সে ভাঁড়ায়।
ফেলার জিনিস নয় তো সে তোর বোন
ধুয়ে পুঁছে তুল গে যা তারে ঘর ॥

তৃতীয় দৃশ্য

ষোড়শীর কুটীর

[নির্ম্মলের প্রবেশ]

ষোড়শী। এ কি, এই রাত্রে আপনি যে নির্ম্মলবাবু ?

[নির্ম্মল নিরুত্তর]

(হাসিয়া) ওঃ—বুঝেচি। যাবার পূর্ব্বে লুকিয়ে বুঝি একবার দেখে যেতে এলেন ?

নির্ম্মল। আপনি কি অন্তর্যামী ?

ষোড়শী। তা নইলে কি ভৈরবী-গিরি করা যায় নির্ম্মলবাবু ? কিন্তু এখানটায় তেমন আলো নেই, আসুন, আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে বসবেন চলুন।

নির্ম্মল। রাত্রে একাকী আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যেতে চান, আপনার সাহস ত কম নয় ?

ষোড়শী। আর সে-রাত্রে অন্ধকারে যখন হাত ধরে নদী মাঠ পার করে এনেছিলাম তখন কি ভয়ের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন না কি ? সেদিনও ত এমনি একাকী।

নির্ম্মল। সত্যিই আপনার সাহসের অবধি নেই।

ষোড়শী। অবধি থাকবে কি করে নির্ম্মলবাবু, ভৈরবী যে! আসুন ঘরে।

নির্ম্মল। না, ঘরে আর যাব না, আমাকে এখনি ফিরতে হবে।

ষোড়শী। তবে এইখানেই বসুন। [উভয়ের উপবেশন]

ষোড়শী। আজ তা হলে চলে যাওয়াই স্থির?

নির্ম্মল। না, আজ যাওয়া স্থগিত রইল। রাত্রে ফিরে গিয়ে শুনতে পেলাম আজ সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরের মধ্যে আপনার বিচার হবে। সভায় আমি উপস্থিত থাকতে চাই।

ষোড়শী। কিসের জন্য? নিছক কৌতূহল, না আমাকে রক্ষে করতে চান?

নির্ম্মল। প্রাণপণে চেষ্টা করব বটে।

ষোড়শী। যদি ক্ষতি হয়, কষ্ট হয়, শ্বশুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়, তবু ও?

নির্ম্মল। হাঁ, তবুও।

[ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল]

(হাসিমুখে) আপনি হাসলেন যে বড়? বিশ্বাস হয় না?

ষোড়শী। হয়। কিন্তু হাসচি আর একটা কথা ভেবে। শুনি, আগেকার দিনে ভৈরবীরা না কি বিদেশী মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখত, আচ্ছা ভেড়া নিয়ে তারা কি করত নির্ম্মলবাবু? চরিয়ে বেড়াত, না লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তামাসা দেখত? (বলিতে বলিতে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।)

নির্ম্মল। (পরিহাসে যোগ দিয়া নিজেও হাসিয়া) হয়ত বা মাঝে মাঝে মায়ের স্থানে বলি দিয়ে খেতো।

ষোড়শী। সে ত ভয়ের কথা নির্ম্মলবাবু।

নির্ম্মল। (সহাস্যে মাথা নাড়িয়া) ভয় একটু আছে বই কি।

ষোড়শী। একটু থাকা ভালো। হৈমকেও সাবধান করে দেওয়া উচিত।

নির্ম্মল। তার মানে?

ষোড়শী। মানে কি সব কথারই থাকে না-কি? (হাসিয়া) কুটুমের অভ্যর্থনা ত হ'লো। অবশ্য হাসি-খুশি দিয়ে যতটুকু পারি ততটুকু—তার বেশী ত সম্বল নেই ভাই—এখন আসুন দু'টো কাজের কথা কওয়া যাক।

নির্ম্মল। বলুন।

ষোড়শী। (গম্ভীর হইয়া) দুটি লোক দেবতাকে বঞ্চিত করতে চায়। একটি রায় মহাশয়, আর একটি জমিদার—

নির্ম্মল। আর একটি আপনার বাবা।

ষোড়শী। বাবা? হাঁ, তিনিও বটে।

নির্ম্মল। আমার শ্বশুরের কথা বুঝি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝতে পারি, কিন্তু পারিনে এই জমিদার প্রভুটিকে বুঝতে। তিনি কিসের জন্য আপনার এত শত্রুতা করচেন?

ষোড়শী। দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রী করে ফেলতে চান। কিন্তু আমি থাকতে সে কোনমতেই হবার জো নেই।

নির্ম্মল। (সহাস্যে) সে আমি সামলাতে পারব।

ষোড়শী। কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে যা আপনিও হয়ত সামলাতে পারবেন না।

নির্ম্মল। কি সে-সব? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম?

ষোড়শী। (শান্ত-স্বরে) সে আমি ভাবিনে। দুর্নাম সত্য হোক মিথ্যে হোক, তাই নিয়েই ত ভৈরবীর জীবন নির্ম্মলবাবু। আমি এই কথাটাই তাঁদের বলতে চাই।

নির্ম্মল। (সবিস্ময়ে) নিজের মুখ দিয়ে এ-কথা যে স্বীকার করার সমান!

ষোড়শী। তা হবে।

নির্ম্মল। কিন্তু ওরা যে বলে—

ষোড়শী। কারা বলে?

নির্ম্মল। অনেকই বলে সে সময়ে, অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেটের আসার রাত্রে আপনার কোলের উপরেই নাকি—

ষোড়শী। তারা কি দেখেছিল না-কি? তা হবে, আমার ঠিক মনে নেই; যদি দেখে থাকে সে সত্যি। তাঁর সেদিন ভারী অসুখ, আমার কোলে মাথা রেখেই তিনি শুয়েছিলেন।

নির্ম্মল। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) তার পরে?

ষোড়শী। কোনমতে দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু সেদিন থেকেই কিছুতে আর মন বসাতে পারিনে, সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকচে।

নির্ম্মল। কি মিথ্যে?

ষোড়শী। সব। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা, এতদিনের যা-কিছু সমস্তই—

নির্ম্মল। তবে কিসের জন্য ভৈরবীর আসন রাখতে চান?

ষোড়শী। এমনিই। আর আপনি যদি বলেন এতে কাজ নেই—

নির্ম্মল। না না, আমি কিছুই বলিনে। কিন্তু এখন আমি উঠলাম। আপনার হয়ত কত কাজ নষ্ট করলাম।

ষোড়শী। কুটুম্বের অভ্যর্থনা, বন্ধুর মর্য্যাদা রক্ষা করা, এ কি কাজ নয় নির্ম্মলবাবু ?

নির্ম্মল। সকাল হ'লো, এখন আসি ?

ষোড়শী। আসুন। আমারও স্নানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, আমিও চললাম।

[উভয়ের প্রস্থান।]

[সাগর সর্দ্দার ও ফকিরসাহেবের প্রবেশ]

সাগর। না এ চলবে না—কোনমতেই চলবে না ফকিরসাহেব। মা নাকি বলেচেন সমস্ত ত্যাগ করে যাবেন। আপনাকে বলচি এ চলবে না।

ফকির। কেন চলবে না সাগর ?

সাগর। তা জানিনে। কিন্তু যাওয়া চলবে না। গেলে আমরা তাঁর দীন-দুঃখী প্রজারা সব থাকব কোথায় ? বাঁচব কি করে ?

ফকির। কিন্তু তোমরা কি শোননি ষোড়শী কত বড় লজ্জা এবং ঘৃণায় সমস্ত ত্যাগ করে যাচ্ছেন ?

সাগর। শুনেচি। তাই আরও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাইনি কিসের জন্যে মা সাহেবের হাত থেকে সে রাত্রে জমিদারকে বাঁচাতে গেলেন। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) ভেবে নাই পেলাম ফকিরসাহেব, কিন্তু এটুকু ত ভেবে পেয়েচি, যাঁকে মা বলে ডেকেচি সন্তান হয়ে আমরা তাঁর বিচার করতে যাব না।

ফকির। তোমরা জনকতক বিচার না করলেই কি চণ্ডীগড়ে তার বিচার করবার মানুষের অভাব হবে সাগর।

সাগর। কিন্তু তারাই কি মানুষ ? আমরা তাঁর ছেলে—আমাদের অন্তরের বিশ্বাসের চেয়ে কি তাদের বাইরের বিচারটাই বড় হবে ফকিরসাহেব ? তাদের কি আমরা চিনিনে ? একদিন যখন আমাদের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিলে তারা, সেও যেমন সত্যি-পাওনার দাবীতে আবার জেলে যখন দিলে সেও তেমনি সত্যি সাক্ষীর জোরে।

ফকির। সে আমি জানি।

সাগর। কিন্তু সব কথা ত জানো না। খুড়ো-ভাইপোয় জেল খেটে ফিরে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, আমরা যে মরি ! মা রাগ করে বললেন, তোরা ডাকাত, তোদের মরাই ভালো। অভিমানে ঘরে ফিরে গেলাম। খুড়ো বললে, ভগবান ! গরীবকে বিশ্বাস করতে কেউ নেই। পরের দিন সকালবেলা মা আমাদের ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোদের কাছে আমি মস্ত অপরাধ করেচি বাবা। আমাকে তোরা ক্ষমা কর। তোদের কেউ বিশ্বাস না করুক আমি বিশ্বাস করব। এখনো বিঘে কুড়ি

জমি আমার আছে, তাই তোরা ভাগ করে নে। চণ্ডীর খাজনা তোরা যা ইচ্ছে দিস্, কিন্তু অসৎ পথে কখনো পা দিবিনে এই আমার সর্ত্ত।

ফকির। কিন্তু লোকে যে বলে—

সাগর। বলুক। কিন্তু মা জানলেই হ'লো সে বিশ্বাস আমরা কখনো ভাঙিনি। জানো ফকিরসাহেব, আমাদের জন্যেই এককড়ি তাঁর শত্রু, আমাদের জন্যেই রায়মশায় তাঁর দুশমন। অথচ, তারা জানেও না কার দয়ায় আজও তাঁরা বেঁচে আছে।

ফকির। কিন্তু আমাকে তোরা ধরে আনলি কেন?

সাগর। কেন? শুনেচি মুসলমান হয়েও তুমি তাঁর গুরুর চেয়েও বড়। তোমার নিষেধ ছাড়া মাকে কেউ আটকাতে পারবে না।

ফকির। কিন্তু এতবড় অন্যায় নিষেধ আমি কিসের জন্যে করব সাগর?

সাগর। করবে মানুষের ভালোর জন্যে।

ফকির। কিন্তু ষোড়শী ঘরে নেই। বেলা যায়, আমিও ত আর অপেক্ষা করতে পারি না। এখন আমি চললুম।

সাগর। পারবে না থাকতে? করবে না নিষেধ? কিন্তু তার ফল ভালো হবে না।

ফকির। এ-সব কথা মুখেও এনো না সাগর।

সাগর। মা-ও বলেন ও-কথা মুখে আনিস্‌নে সাগর। বেশ মুখে আর আনব না—আমার মনের মধ্যেই থাক্।

[ফকিরের প্রস্থান]

সাগর। সন্ন্যাসী ফকির তুমি, জানো না ডাকাতের বুকের জ্বালা। আমাদের সব গেছে, এর ওপর মাও যদি ছেড়ে যায় আমরা বাকী কিছুই আর রাখব না। [প্রস্থান]

[নির্ম্মল ও ষোড়শীর প্রবেশ]

ষোড়শী। ডেকে নিয়ে এলাম সাধে! ছিঃ, ছিঃ, কি দাঁড়িয়ে যা তা শুনছিলেন বলুন ত! দেবীর মন্দির, তার উঠোনের মাঝখানে জটলা করে কতগুলো কাপুরুষে মিলে বিচারের ছলনায় দু'জন অসহায় স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করচে,—তাও আবার একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। আসুন আমার ঘরে।

[দুয়ারে আসন পাতা ছিল, নির্ম্মলকে সমাদর করিয়া তাহাতে
বসাইয়া ষোড়শী নিজে অদূরে উপবেশন করিল]

ষোড়শী। আপনি না-কি বলেচেন আমার মামলা-মোকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন। এ কি সত্যি?

নির্ম্মল। হাঁ সত্য।

ষোড়শী। কিন্তু কেন নেবেন?

নির্ম্মল। বোধ হয় আপনার প্রতি অত্যাচার হচ্ছে বলে।

ষোড়শী। কিন্তু আর কিছু বোধ করেন না ত? (এই বলিয়া সে মুচকিয়া হাসিল) থাক্, সব কথার যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। বিশেষ করে এই কুট-কচালে শাস্ত্রের, না? আচ্ছা সে যাক। মোকদ্দমার ভার যেন নিলেন, কিন্তু যদি হারি তখন ভার কে নেবে? তখন্ পেছোবেন না ত?

নির্ম্মল। না, তখনও না।

ষোড়শী। ইস্। পরোপকারের কি ঘটা! (হাসিয়া) আমি কিন্তু হৈম হলে এইসব পরোপকার-বৃত্তি ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভালোমানুষই নই—আমার কাছে ফাঁকি চলত না। রাত্রি-দিন চোখে চোখে রেখে দিতাম।

নির্ম্মল। (বিস্ময়ে, ভয়ে, আনন্দে) চোখে চোখে রাখলেই কি রাখা যায় ষোড়শী? এর বাঁধন যেখানে শুরু হয় চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পোঁছায় না, এ-কথা আজও জানতে পারনি তুমি।

ষোড়শী। পেরেচি বই কি। (হাসিল; বাহিরের শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া চাহিয়া) এই যে ইনি এসেচেন।

নির্ম্মল। কে? ফকিরসাহেব?

ষোড়শী। না, জমিদারবাবু। বলেছিলুম সভা ভাঙলে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধ হয় আসচেন।

নির্ম্মল। (বিরক্তি ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া) তা হলে আপনি আমাকে এ-কথা বলেননি কেন?

ষোড়শী। বেশ! একবার 'তুমি' একবার 'আপনি'! (হাসিয়া) ভয় নেই, উনি ভারি ভদ্রলোক; লড়াই করেন না। তা ছাড়া আপনাদের পরিচয় নেই;—সেটাও একটা লাভ। (দ্বারের নিকটে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া) আসুন।

জীবানন্দ। (প্রবেশ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া) ইনি? নির্ম্মলবাবু বোধ হয়।

ষোড়শী। হাঁ; আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) বিলক্ষণ! বন্ধু নয় ত কি? ওঁদের কৃপাতেই ত টিকে আছি, নইলে মামার জমিদারি পাওয়া পর্য্যন্ত যে-সব কীর্ত্তি করা গেছে তাতে চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জের বদলে ত এতদিন আন্দামনের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হ'তো।

ষোড়শী। চৌধুরীমশাই, উকিল-ব্যারিস্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওঁরাই পাবেন। আন্দামান প্রভৃতি বড় ব্যাপারে না হোক, কিন্তু ছোট বলে এদেশের শ্রীঘরগুলোও ত মনোরম স্থান নয়,—দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি একটু ধন্যবাদ পেতেও পারে না?

জীবানন্দ। (অপ্রস্তুত হইয়া) ধন্যবাদ পাবার সময় হলেই পাবে।

ষোড়শী। (হাসিয়া) এই যেমন সভায় দাঁড়িয়ে এইমাত্র এক দফা নিয়ে এলেন?

[জীবানন্দ স্তব্ধ হইয়া রহিল।]

ষোড়শী। নির্ম্মলবাবু না থাকলে আজ আপনার সঙ্গে আমি ভারী ঝগড়া করতাম। ছি—এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই সাজে?—তা ছাড়া কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? সেদিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন করব। আপনিও আপনার হুকুম স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন। এই নিন সিন্দুকের চাবি এবং এই নিন হিসাবের খাতা। (অঞ্চল হইতে সিন্দুকের চাবি খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দের পায়ের কাছে রাখিয়া দিল)—মায়ের যা-কিছু অলঙ্কার, যত-কিছু দলিল-পত্র সিন্দুকের ভিতরেই পাবেন, এবং আর একখানা কাগজ ঐ খাতার মধ্যে পাবেন যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েছি।

জীবানন্দ। (অবিশ্বাস করিয়া) বল কি! কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী। তাতেই লেখা আছে দেখতে পাবেন।

জীবানন্দ। তাই যদি হয় ত এই চাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

ষোড়শী। তাঁকেই যে দিলাম।

জীবানন্দ। (মলিন-মুখে ও সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে) কিন্তু এ তো আমি নিতে পারিনে ষোড়শী। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে সিন্দুকে রাখা জিনিসগুলোও যে এক হবে, সে আমি কি করে বিশ্বাস করব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাঁচজনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) আমার সে আবশ্যক নেই। কিন্তু চৌধুরীমশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। চোখ বুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ চাবিটুকু নেবার সাহস নেই, এ আমি মানিনে। নিন, ধরুন। (খাতা ও চাবি তুলিয়া জীবানন্দের হাতের মধ্যে একরকম জোর করিয়া গুঁজিয়া দিল) আজ আমি বাঁচলাম। (কোমল কণ্ঠস্বরে) আর একটিমাত্র ভার

আপনাকে দিয়ে যাব, সে আমার গরীব-দুঃখী প্রজাদের ভবিষ্যৎ। আমি শত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারিনি—কিন্তু আপনি অনায়াসে পারবেন। (নির্ম্মলের প্রতি) আমার কথাবার্ত্তা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, না নির্ম্মলবাবু ?

নির্ম্মল। (মাথা নাড়িয়া) শুধু আশ্চর্য্য নয়, আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েচি। ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পর্য্যন্ত সই করে রেখেচেন, এ খবর ত আমাকে ঘুণাগ্রে জানাননি ?

ষোড়শী। আমার অনেক কথাই আপনাকে জানান হয়নি, কিন্তু একদিন হয়ত সমস্তই জানতে পারবেন। কেবল একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন যাঁকে সকল কথাই জানিয়েচি, সে আমার ফকির সাহেব।

নির্ম্মল। এ-সকল পরামর্শ বোধ হয় তিনিই দিয়েচেন ?

ষোড়শী। না, তিনি এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানেননি, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলচেন সে আমার একটু আগের রচনা। যিনি এ-কাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েচেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখব।

জীবানন্দ। মনে হচ্ছে যেন ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড তামাসা করচ ষোড়শী। এ বিশ্বাস করা যেন সেই 'মরফিয়া' খাওয়ার চেয়েও শক্ত ঠেকচে।

নির্ম্মল। (হাসিয়া জীবানন্দের প্রতি চাহিয়া) আপনি তবু এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাসা দেখচেন, কিন্তু আমাকে কাজ-কর্ম্ম, বাড়ি-ঘর ফেলে রেখে এই তামাসা দেখতে হচ্ছে। আর এ যদি সত্য হয় ত আপনি যা চেয়েছিলেন সেটা অন্ততঃ পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে ষোল আনাই লোকসান। (ষোড়শীকে) বাস্তবিক এ সকল ত আপনার পরিহাস নয় ?

ষোড়শী। না নির্ম্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি-তামাসার সময় ? আমি সত্যসত্যই অবসর নিলাম।

নির্ম্মল। তা হলে বড় দুঃখে পড়েই এ-কাজ আপনাকে করতে হ'লো। আমি আপনাকে বাঁচাতেও হয়ত পারতাম, কিন্তু কেন যে তা করতে দিলেন না তা আমি বুঝেচি। বিষয় রক্ষা হ'তো, কিন্তু কুৎসার ঢেউ তাতে উত্তাল হয়ে উঠত। সে থামাবার সাধ্য আমার ছিল না। (এই বলিয়া সে কটাক্ষে জীবানন্দের প্রতি চাহিল।)

নির্ম্মল। এখন তা হলে কি করবেন স্থির করেচেন ?

ষোড়শী। সে আপনাকে পরে জানাব।

নির্ম্মল। কোথায় থাকবেন ?

ষোড়শী। এ খবরও আপনাকে আমি পরে দেব।

নির্ম্মল। (হাতঘড়ি দেখিয়া) রাত প্রায় দশটা। আচ্ছা এখন আসি তা হলে—আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই ?

ষোড়শী। এতবড় অহঙ্কারের কথা কি বলতে পারি নির্ম্মলবাবু? তবে মন্দির নিয়ে আর বোধ হয় আমার কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার প্রয়োজন হবে না।

নির্ম্মল। আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি ?

ষোড়শী (মাথা নাড়িয়া) না।

নির্ম্মল। হৈম আপনাকে বড় ভালবাসে। যদি অবকাশ পান মাঝে মাঝে একটা খবর দেবেন।

[নির্ম্মল প্রস্থান করিল]

জীবানন্দ। ভদ্রলোকটিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ষোড়শী। না পারলেও আপনার ক্ষতি হবে না।

জীবানন্দ। আমার না হোক তোমার ত হতে পারে। মনে রাখবার জন্যে কি ব্যাকুল প্রার্থনাই জানিয়ে গেলেন।

ষোড়শী। সে শুনেচি। কিন্তু আমি তাঁকে যতখানি জানি তার অর্দ্ধেকও আমাকে জানলে আজ এতবড় বাহুল্য আবেদন তাঁর করতে হ'তো না।

জীবানন্দ। অর্থাৎ ?

ষোড়শী। অর্থাৎ, এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী-পদ অনায়াসে জীর্ণ-বস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্ছি সে শিক্ষা কোথায় পেলাম জানেন ? ওঁদের কাছে। মেয়েমানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে, সে বুঝেচি কেবল হৈমকে দেখে। অথচ এর বাষ্পও কোনদিন তাঁরা জানতে পারবেন না।

জীবানন্দ। তথাপি এ হেঁয়ালি হেঁয়ালিই রয়ে গেল অলকা। একটা কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারী লজ্জা করে ; কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্য জবাব দিতে পারবে ?

ষোড়শী। (সহাস্যে) আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য্য কাজ করতে পারতেন, তখন আমিও তেমনি কোন একটা অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কি না, এ আমি জানিনে—কিন্তু আশ্চর্য্য কাজ করবার আপনার প্রয়োজন নেই, আমি বুঝেচি। অপবাদ সকলে মিলে দিয়েচে বলেই তাকে সত্য করে তুলতে হবে তার অর্থ নেই। আমি কিছুর জন্যেই কখনো কারও আশ্রয় গ্রহণ করব না। আমার স্বামী আছেন, কোন লোভেই সে-কথা আমি ভুলতে পারব না। এই ভয়ানক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরীমশাই ?

জীবানন্দ। তুমি আমাকে চৌধুরীমশাই বল কেন?

ষোড়শী। তবে কি বলব? হুজুর?

জীবানন্দ। না। অনেকে যা বলে ডাকে—জীবানন্দবাবু।

ষোড়শী। বেশ ভবিষ্যতে তাই হবে। কিন্তু রাত্রি হয়ে যাচ্চে আপনি বাড়ি গেলেন না? আপনার লোকজন কই?

জীবানন্দ। আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েচি।

ষোড়শী। একলা বাড়ি যেতে আপনার ভয় করবে না?

জীবানন্দ। না, আমার পিস্তল আছে।

ষোড়শী। তবে তাই নিয়ে যান, আমার ঢের কাজ আছে।

জীবানন্দ। তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমি এখন যাব না।

ষোড়শী। (প্রখর চোখে, অথচ শান্ত-স্বরে) আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিচ্ছি, তারা বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জীবানন্দ। (অপ্রতিভ হইয়া) ডাকতে কাউকে হবে না, আমি আপনিই যাচ্ছি। যেতে আমার ইচ্ছে হয় না। তাই শুধু আমি বলছিলাম। তুমি কি সত্যিই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা?

ষোড়শী। (ঘাড় নাড়িয়া) হাঁ।

জীবানন্দ। কবে যাবে?

ষোড়শী। কি জানি, হয়ত কালই যেতে পারি।

জীবানন্দ। কাল? কালই যেতে পার? (একান্ত স্তব্ধ রহিয়া) আশ্চর্য্য! মানুষের নিজের মন বুঝতেই কি ভুল হয়! যাতে তুমি যাও সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেচি—অথচ, তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুকনো হয়ে গেল। তোমাকে তাড়াতে পারলে, ঐ যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রী করেচি সে নিয়ে আর গোলমাল হবে না,—কতকগুলো নগদ টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর,—আর, তোমাকে যা হুকুম করব তাই তুমি করতে বাধ্য হবে, এই দিকটাই কেবল দেখতে পেয়েচি। কিন্তু আরও যে একটা দিক আছে, স্বেচ্ছায় তুমি সমস্ত ত্যাগ করে আমার মাথাতেই বোঝা চাপিয়ে দিলে সে ভার বইতে পারব কি না, এ-কথা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি। আচ্ছা অলকা, এমন ত হতে পারে আমার মত তোমারও ভুল হচ্ছে,—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটা পাওনি! জবাব দাও না যে?

ষোড়শী। জবাব খুঁজে পাইনে। হঠাৎ বিস্ময় লাগে এ কি আপনার কথা!

জীবানন্দ। তবে এই কথাটা বল, সেখানে তোমার চলবে কি করে?

ষোড়শী। অত্যন্ত অনাবশ্যক কৌতূহল চৌধুরীমশায়।

জীবানন্দ। তাই বটে, অলকা তাই বটে। আজ আমার আবশ্যক অনাবশ্যক তোমাকে বোঝাব আমি কি দিয়ে!

[বাহিরে পূজারীর কাশি ও পায়ের শব্দ শুনা গেল। অতঃপর তিনি প্রবেশ করিলেন]

পূজারী। মা, সকলের সম্মুখে মন্দিরের চাবিটা আমি তারাদাস ঠাকুরের হাতেই দিলাম। রায়মশায়, শিরোমণি—এঁরা উপস্থিত ছিলেন।

ষোড়শী। ঠিকই হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি সাগরের ওখানে একবার যাব।

জীবানন্দ। এগুলোও তা হলে তুমি রায়মশায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী। না, সিন্দুকের চাবি আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না।

জীবানন্দ। তবে কি বিশ্বাস হবে শুধু আমাকেই?

[ষোড়শী কোন উত্তর না দিয়া জীবানন্দের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ে অভিভূত পূজারীকে কহিল]

ষোড়শী। চল বাবা, আর দেরি ক'রো না।

পূজারী। চল, মা চল।

[পূজারী ও ষোড়শী প্রস্থান করিলে একাকী জীবানন্দ সেই জনহীন কুটীর অঙ্গনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নাটমন্দির

[চণ্ডীর প্রাঙ্গণস্থিত নাটমন্দিরের একাংশ। সময়—অপরাহ্ণ। উপস্থিত—শিরোমণি, জনার্দ্দন রায় এবং আরও দুই-চারিজন গ্রামের ভদ্রব্যক্তি।]

শিরোমণি। (আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে ডান হাত তুলিয়া জনার্দ্দনের প্রতি) আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী হও, ভায়া, সংসারে এসে বুদ্ধি ধরেছিলে বটে।

জনার্দ্দন। (হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া) আজ এই নিয়ে নির্ম্মলকে দুটো তিরস্কার করতে হ'লো শিরোমণিমশাই, মনটা তেমন ভালো নেই।

শিরোমণি। না থাকবারই কথা। কিন্তু এ একপ্রকার ভালই হ'লো ভায়া। এখন বাবাজীর চৈতন্যোদয় হবে যে, শ্বশুর এবং পিতৃব্যস্থানীয়দের বিরুদ্ধাচারণ করায় প্রত্যবায় আছে। আর, এ যে হতেই হবে। সর্ব্বমঙ্গলময়ী চণ্ডীমাতার ইচ্ছা কি না।

প্রথম ভদ্রলোক। সমস্তই মায়ের ইচ্ছা। তা নইলে কি ষোড়শী ভৈরবী বিনা বাক্য-ব্যয়ে চলে যেতে চায়!

শিরোমণি। নিঃসন্দেহ। মন্দিরের চাবিটা ত পূজারীর কাছ থেকে কৌশলে আদায় হয়েচে, কিন্তু আসল চাবিটা শুনচি নাকি গিয়ে পড়েচে জমিদারের হাতে। ব্যাটা পাঁড় মাতাল, দেখো ভায়া, শেষকালে মায়ের সিন্দুকের সোনারূপো না ঢুকে যায় শুঁড়ির সিন্দুকে। পাপের আর অবধি থাকবে না।

জনার্দ্দন। ঐটে খেয়াল করা হয়নি।

শিরোমণি। না, এখন সহজে দিলে হয়। দশদিন পরে হয়ত বলে বসবে, কই, কিছুই ত সিন্দুকে ছিল না! কিন্তু আমরা সবাই জানি ভায়া, ষোড়শী আর যাই কেন না করুক, মায়ের সম্পত্তি অপহরণ করবে না—একটি পাই-পয়সা না।

[অনেকেই এ-কথা স্বীকার করিল।]

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। এর চেয়ে বরঞ্চ সে-ই ছিল ভালো।

শিরোমণি। চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই।

অনেকে। চাই চাই—অবিলম্বে চাই।

প্রথম ভদ্রলোক। আমি বলি, চলুন, আমরা দল বেঁধে যাই জমিদারের কাছে। বলি গে, চাবিটা দিন, কি আছে মিলিয়ে দেখি গে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। আমিও তাই বলি।

প্রথম ভদ্রলোক। কাল বেলা তৃতীয় প্রহরে—হুজুর ঘুমটি থেকে উঠে মদ খেতে বসেচেন, মেজাজ খুশ্ আছে—ঠিক এমনি সময়টিতে।

অনেকে। ঠিক ঠিক, এই ঠিক মতলব।

শিরোমণি। (সভয়ে) কিন্তু অত্যন্ত মদ্যপান করে থাকলে যাওয়া সঙ্গত হবে না। কি বল জনার্দ্দন ?

[অকস্মাৎ ইঁহাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কে একজন কহিল, 'স্বয়ং হুজুর আসচেন যে!' পরক্ষণেই জীবানন্দ ও প্রফুল্ল প্রবেশ করিলেন। যাহারা বসিয়াছিল অভ্যর্থনা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ নাটমন্দিরে উঠিবার সিঁড়ির উপরে বসিতে যাইতেছিলেন, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'আসন, আসন, শীঘ্র একটা আসন নিয়ে এস'।]

জীবানন্দ। (উপবেশন করিয়া) আসনের প্রয়োজন নেই।—দেবীর মন্দির, এর সর্ব্বত্রই ত আসন বিছানো।

জনার্দ্দন। তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু এ আপনারই যোগ্য কথা।

[প্রফুল্ল সিঁড়ির একাংশে গিয়া বসিল, এবং হাতে তাহার যে খবরের কাগজ-খানা ছিল তাহাই খুলিয়া নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল।]

শিরোমণি। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। মেঘ না চাইতে জল। আজই দ্বিপ্রহরে আমরা হুজুরের কাছে যাব স্থির করেছিলাম, কিন্তু পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এইজন্যই—

জীবানন্দ। যাননি ? কিন্তু হুজুর ত দিনের বেলা নিদ্রা দেন না।

শিরোমণি। কিন্তু আমরা যে শুনি হুজুর—

জীবানন্দ। শোনেন ? তা আপনারা অনেক কথা শোনেন যা সত্য নয় এবং অনেক কথা বলেন যা মিথ্যা। এই যেমন, আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা—

[এই বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার দল থতমত খাইয়া একেবারে মুসড়িয়া গেল।]

জনার্দ্দন। মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি করতে পারা যাবে তা আশা ছিল না। নির্ম্মল যে-রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—

জীবানন্দ। তিনি সোজা হলেন কি প্রকারে?

শিরোমণি। (খুশী হইয়া সদর্পে) সমস্তই মায়ের ইচ্ছা হুজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আর বইতে পারছিলেন না।

জীবানন্দ। তাই হবে। তার পরে?

শিরোমণি। কিন্তু পাপ দূর হ'লো, এখন,—বল না জনার্দ্দন, হুজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বল না।

জনার্দ্দন। (চকিত হইয়া) মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিইয়েচি। আজ তিনিই সকালে মায়ের দোর খুলেচেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা শুনতে পেলাম ষোড়শী হুজুরের হাতে সমর্পণ করেচে।

জীবানন্দ। তা করেচে। জমা-খরচের খাতাও একখানা দিয়েচে।

শিরোমণি। বেটি এখনও আছে, কিন্তু কখন্ কোথায় চলে যায় সে ত বলা যায় না।

জীবানন্দ। (মুহূর্ত্তকাল বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া) কিন্তু সেজন্য আপনাদের উদ্বেগ কিসের? তাকে তাড়ানও ত চাই। কি বলেন রায়মশায়?

জনার্দ্দন। দলিল-পত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা-কিছু আছে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণিমশায় বলচেন যে, ষোড়শী থাকতে থাকতেই সেগুলো সব মিলিয়ে দেখলে ভালো হয়। হয়ত—

জীবানন্দ। হয়ত নেই? এই না? কিন্তু না থাকলেই বা আপনারা আদায় করবেন কি করে?

জনার্দ্দন। (হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে বলিলেন) কি জানেন, তবু ত জানা যাবে হুজুর।

জীবানন্দ। তা যাবে। কিন্তু শুধু শুধু জানা গিয়ে আর লাভ কি?

শিরোমণি। (প্রথম ভদ্রলোকের প্রতি অলক্ষ্যে) সেরেচে!

জনার্দ্দন। কিন্তু কোনদিন ত জানতেই হবে হুজুর।

জীবানন্দ। তা হবে। কিন্তু আজ আর আমার সময় নেই রায়মশায়।

শিরোমণি। (ব্যগ্র হইয়া) আমাদের সময় আছে হুজুর। চাবিটা জনার্দ্দন ভায়ার হাতে দিলেই সন্ধ্যার পরে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখতে পারি। হুজুরেরও কোনও দায়িত্ব থাকে না—কি আছে না আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল হে তোমরা? ঠিক বলেচি কি না?

[সকলেই এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিল, দিল না শুধু সে যাহার হাতে চাবি)

জীবানন্দ। (ঈষৎ হাসিয়া) ব্যস্ত কি শিরোমণিমশাই, যদি কিছু নষ্ট হয়েই থাকে ত ভিখিরীর কাছ থেকে আর আদায় হবে না। আজ থাক্, যেদিন আমার অবসর হবে আপনাদের খবর দেব।

[মনে মনে সকলেই ক্রুদ্ধ হইল]

জনার্দ্দন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কিন্তু দায়িত্ব একটা—

জীবানন্দ। সে ত ঠিক কথা রায় মহাশয়। দায়িত্ব একটা আমার রইল বই কি।

[সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। চলিতে চলিতে জমিদারের শ্রুতিপথের বাহিরে আসিয়া]

শিরোমণি। (জনার্দ্দনের গা টিপিয়া) দেখলে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোঝাই ভার। গুয়োটা কথা কয় যেন হেঁয়ালি। মদে চুর হয়ে আছে। বাঁচবে না বেশীদিন।

জনার্দ্দন। হুঁ। যা ভয় করা গেল তাই হ'লো দেখচি।

শিরোমণি। এবার গেল সব শুঁড়ির দোকানে। বেটি যাবার সময় আচ্ছা জব্দ করে গেল।

প্রথম ভদ্রলোক। হুজুর চাবি আর দিচ্চেন না।

শিরোমণি। আবার? এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে। (কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।)

[সকলের প্রস্থান]

প্রফুল্ল। (খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) দাদা, আবার একটা নূতন হাঙ্গামা জড়ালেন কেন? চাবিটা ওদের দিয়ে দিলেই ত হ'তো।

জীবানন্দ। হ'তো না প্রফুল্ল, হলে দিতাম। পাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েচে।

প্রফুল্ল। সিন্দুকে আছে কি?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) কি আছে? আজ সকালে তাই আমি খাতাখানা পড়ে দেখছিলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পান্না, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানা রকমের জড়োয়া গয়না, কত কি দলিল-পত্র, তা ছাড়া সোনা-রূপার বাসন-কোসনও কম নয়। কতকাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চণ্ডীগড়ের ঠাকুরের যে এত সম্পত্তি সঞ্চিত আছে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভৈরবীরা বোধ করি কাউকে জানতেও দিত না।

প্রফুল্ল। (সভয়ে) বলেন কি? তার চাবি আপনার কাছে! একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে?

জীবানন্দ। নিতান্ত মিথ্যে বলনি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। অথচ এ আমি চাইনি। যতই তাকে পীড়াপীড়ি করলাম জনার্দ্দনকে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

প্রফুল্ল। এর কারণ?

জীবানন্দ। বোধ হয় সে ভেবেছিল এ দুর্নামের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপালে তার আর সইবে না। এদের সে চিনেছিল।

প্রফুল্ল। কিন্তু আপনাকে সে চিনতে পারেনি!

জীবানন্দ। (হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না) সে দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আর যত দিকেই করে থাকি প্রফুল্ল, আমাকে চিনতে না দেওয়ার অপরাধ করিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য এর মানুষের মন। এ যে কি থেকে কি স্থির করে নেয় কিছুই বলবার জো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে একদিন মরফিয়া চেয়ে নিয়ে চোখ বুজে খেয়েছিলাম, সেই হ'লো তার সকল তর্কের বড় তর্ক—সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু সে রাত্রে আর যে কোন উপায় ছিল না—সে ছাড়া যে আর কারও পানে চাইবার কোথাও কেউ ছিল না—এ-সব যোড়শী একেবারে ভুলে গেছে। কেবল একটি কথা তার মনে জেগে আছে—যে নিজের প্রাণটা অসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি করে! ব্যস, যা কিছু ছিল চোখ বুজে দিলে আমার হাতে তুলে। প্রফুল্ল, দুনিয়ার ভয়ানক চালাক লোকেও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসারটা একেবারে মরুভূমি হয়ে যেত, কোথাও রসের বাষ্পটুকু জমবার ঠাঁই পেত না।

প্রফুল্ল। অতিশয় খাঁটি কথা দাদা! অতএব অবিলম্বে খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলে তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে ধমক দিন—জমানো মোহরগুলোয় যদি সলোমন সাহেবের দেনাটা শোধ যায় ত শুধু রসের বাষ্প কেন, মুষলধারে বর্ষণ শুরু হতে পারবে।

জীবানন্দ। প্রফুল্ল, এই জন্যই তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রফুল্ল। (হাত জোড় করিয়া) এই পছন্দ একবার একটু খাটো করতে হবে দাদা। রসের উৎস আপনার অফুরন্ত হোক, কিন্তু মোসাহেবী করে এ অধীনের গলার চুঙ্গিটা পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গেছে। এইবার একবার বাইরে গিয়ে দুটো ডালভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল-পরশু আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ। (সহাস্যে) একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে ক'বার নেওয়া হ'লো প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। বার-চারেক। (হাসিয়া ফেলিয়া) ভগবান মুখটা দিয়েছিলেন, তা বড়লোকের প্রসাদ খেয়েই দিন গেল; দুটো বড় কথাও যদি মাঝে মাঝে বার করতে না পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়! নেহাৎ অপরাধও নেই দাদা। বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নীচু বলে এ দেহটায় মেদ-মাংসই কেবল পরিপূর্ণ করেচি, সত্যিকারের রক্ত বলতে আর ছিটে-ফোঁটাও বাকী রাখিনি। আজ ভাবচি এক কাজ করব। সন্ধ্যার আবছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে খপ্ করে ভৈরবীঠাকরুণের এক খাম্‌চা পায়ের ধুলো নিয়ে গিলে ফেলব। আপনার অনেক ভালো-মন্দ দ্রব্যই ত আজ পর্য্যন্ত উদরস্থ করেচি, এ নইলে সেগুলো আর হজম হবে না, পেটে লোহার মত ফুটবে!

জীবানন্দ। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) আজ উচ্ছ্বাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্চে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। (যুক্ত হস্তে) তা হলে রস্থন দাদা, এটা শেষ করি। মোসাহেবীর পেন্সন বলে সেদিন যে উইলখানায় হাজার-পাঁচেক টাকা লিখে রেখেচেন, সেটার ওপরে দয়া করে একটা কলমের আঁচড় দিয়ে রাখবেন—চণ্ডীর টাকাটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবে না, কিন্তু আমাকে দান করে অতগুলো টাকার আর দুর্গতি করবেন না।

জীবানন্দ। তা হলে এবার আমাকে সত্যিই ছাড়লে?

প্রফুল্ল। আশীর্ব্বাদ করুন, এই সুমতিটুকু যেন শেষ পর্য্যন্ত বজায় থাকে। কিন্তু কবে যাচ্চেন তিনি?

জীবানন্দ। জানিনে।

প্রফুল্ল। কোথায় যাচ্চেন তিনি?

জীবানন্দ। তাও জানিনে।

প্রফুল্ল। জেনেও কোন লাভ নেই দাদা। বাপ রে! মেয়েমানুষ ত নয়, যেন পুরুষের বাবা। মন্দিরে দাঁড়িয়ে সেদিন অনেকক্ষণচেয়েছিলাম, মনে হ'লো পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যেন পাথরে গড়া! ঘা মেরে মেরে গুঁড়ো করা যাবে, কিন্তু আগুনে গলিয়ে যে ইচ্ছে-মত ছাঁচে ঢেলে গড়বেন সে বস্তুই নয়। পারেন ত ও মতলবটা পরিত্যাগ করবেন।

জীবানন্দ। (বিদ্রূপের স্বরে) তা হলে প্রফুল্ল, এবার নিতান্তই যাচ্চো?

প্রফুল্ল। গুরুজনের আশীর্ব্বাদের জোর থাকে ত মনস্কামনা সিদ্ধ হবে বই কি।

জীবানন্দ। তা হতে পারে। আচ্ছা, ষোড়শী সত্যিই চলে যাবে তোমার মনে হয়?

প্রফুল্ল। হয়। কারণ, সংসারে সবাই প্রফুল্ল নয়। ভালো কথা দাদা, একটা খবর দিতে আপনাকে ভুলেছিলাম। কাল রাত্রে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই ফকির সাহেব। আপনাকে যিনি একদিন তাঁর বটগাছে ঘুঘু শিকার করতে দেননি—বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন—তিনি। কুর্নিশ করে কুশল প্রশ্ন করলাম, ইচ্ছে ছিল মুখরোচক দুটো খোসামোদ-টোসামোদ করে যদি একটা কোন ভালো রকমের ওষুধ-টষুধ বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটেণ্ট নিয়ে বেচে দু'পয়সা রোজগার করব। কিন্তু ব্যাটা ভারী চালাক, সেদিক দিয়েই গেল না। কথায় কথায় শুনলাম তাঁর ভৈরবী মাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন চলে যাচ্চেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চেন তার কাছেই শুনতে পেলাম!

জীবানন্দ। এঁর সদুপদেশের ফলেই বোধ হয়?

প্রফুল্ল। না। বরঞ্চ, উপদেশের বিরুদ্ধেই যাচ্চেন।

জীবানন্দ। বল কি হে, ফকির যে শুনি তাঁর গুরু! গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন?

প্রফুল্ল। এ-ক্ষেত্রে তাই বটে।

জীবানন্দ। কিন্তু এতবড় বিরাগের হেতু?

প্রফুল্ল। হেতু আপনি। কি জানি, এ-কথা শোনানো আপনাকে উচিত হবে কি না, কিন্তু ফকিরের বিশ্বাস আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করেন। পাছে কলহ-বিবাদের মধ্য দিয়েও আপনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়, এই তাঁর সবচেয়ে দুশ্চিন্তা। নইলে ভয় তাঁর মিথ্যে কলঙ্কেও নয়, গ্রামের লোককেও নয়।

[জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।]

প্রফুল্ল। দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় কম দেননি, কিন্তু সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনিই মারাত্মক ভুল করলেন, না, হাত পেতে নিয়ে আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাংসা আজ বাকী রয়ে গেল। বেঁচে থাকি ত একদিন দেখতে পাব আশা হয়।

[জীবানন্দ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সহসা বেহারা পাত্র ভরিয়া
মদ লইয়া প্রবেশ করিতেই]

জীবানন্দ! আঃ—এখানেও! যা নিয়ে যা—দরকার নেই।

[বেহারা প্রস্থান করিল]

প্রফুল্ল। রাগ করেন কেন দাদা, যেমন শিক্ষা। বরঞ্চ কখন দরকার সেইটেই বলে দিন না। অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে দাদা?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) অরুচি নয়, কিন্তু আর খাব না।

প্রফুল্ল। (হাসিয়া) এই নিয়ে ক'বার হ'লো দাদা?

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এই মীমাংসাটা আজ না হয় বাকী থাক প্রফুল্ল, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখতে পাবে আশা করি।

[বেহারা পুনরায় প্রবেশ করিল]

বেহারা। এই পিস্তলটা ভুলে টেবিলের ওপর ফেলে রেখে এসেছিলেন।

জীবানন্দ। ভুলেই এসেছিলাম বটে, কিন্তু ওতেও আর কাজ নেই, তুই নিয়ে যা।

প্রফুল্ল। কিন্তু রাত প্রায় এগারটা হ'লো, বাড়ি চলুন?

জীবানন্দ। না, বাড়ি নয় প্রফুল্ল, এখন একলা অন্ধকারে একটু ঘুরতে বার হবো।

প্রফুল্ল। একলা? নিরস্ত্র? না না, সে হয় না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে-ঘাটে আপনার অনেক শত্রু। অন্ততঃ নিত্য-সহচরটিকে সঙ্গে রাখুন। (এই বলিয়া সে ভৃত্যের হাত হইতে পিস্তল লইয়া দিতে গেল।)

জীবানন্দ। (পিছাইয়া গিয়া) এ-জীবনে ওকে আর আমি ছুঁচিনে প্রফুল্ল। আজ থেকে আমি এমনি একাকী বার হবো, যেন কোথাও কোন শত্রু নেই আমার। আমার থেকেও কারও কোন না ভয় হোক; তার পরে যা হয় তা ঘটুক, আমি কারও কাছে নালিশ করব না।

প্রফুল্ল। হঠাৎ হ'লো কি? না হয়, পাইকদের কাউকে ডেকে দিই?

জীবানন্দ। না পাইক-পিয়াদা আর নয়। তোমরা বাড়ি যাও।

প্রফুল্ল। আপনার অবাধ্য হবো না দাদা, আমরা চললাম, কিন্তু আপনিও বেশী বিলম্ব করবেন না আমার অনুরোধ।

(প্রফুল্ল ও বেহারা প্রস্থান করিল। জীবানন্দ ধীরে ধীরে নাটমন্দিরের আর একটা দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন থাম ঠেস দিয়া বসিয়া মৃদু-কণ্ঠে নাম-গান করিতেছিল এবং অদূরে চার-পাঁচজন লোক চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিল। জীবানন্দ হেঁট হইয়া অন্ধকারে তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন।)

গীত

পূজা করে তোরে তারা
সার যদি হয় নয়নধারা,
শুভঙ্করী নাম তবে মা
ধরিস্ কেন দুঃখ-হরা।

কি পাপেতে বল্‌ মা কালি
মাখালি কলঙ্ক-কালি—
এখন ভরসা কেবল কালি
তুই মা বরাভয়-করা।

জীবানন্দ। তুমি কে হে?

পথিক। আজ্ঞে, আমি একজন যাত্রী বাবু।

জীবানন্দ। বাবু বলে আমাকে চিনলে কি করে?

পথিক। আজ্ঞে, তা আর চেনা যায় না? ভদ্দরলোক ছাড়া এমন ধপধপে জামা-কাপড় আর কাদের থাকে বাবু?

জীবানন্দ। ওঃ—তাই বটে। কোথা থেকে আসচ? কোথায় যাবে? এরা বুঝি তোমার সঙ্গী?

পথিক। আসচি মানভূম জেলা থেকে বাবু, যাব পুরীধামে। এদের কারও বাড়ি মেদিনীপুরে, কারও বাড়ি আর কোথাও—কোথায় যাবে তাও জানিনে।

জীবানন্দ। আচ্ছা, কত লোক এখানে রোজ আসে? যারা থাকে তারা দু'বেলা খেতে পায়, না?

পথিক। (লজ্জিত হইয়া) কেবল খাবার জন্যই নয় বাবু। আমার পা কেটে গিয়ে ঘায়ের মত হয়েচে দেখেই মা-ভৈরবী নিজে হুকুম দিয়েছিলেন যত দিন না সারে তুমি থাকো।

জীবানন্দ। তোমাকে যেতে বলিনি ভাই, বেশ ত থাকো না। জায়গার ত আর অভাব নেই।

পথিক। কিন্তু ভৈরবী মা ত আর নেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ। এরই মধ্যে শুনতে পেয়েচ? তা নাই তিনি থাকলেন তাঁর হুকুম ত আছে? তোমাকে যেতে বলে কার সাধ্য! বাড়ি কোথায় তোমার ভাই?

পথিক। বাড়ি আমার ছিল বাবু মানভুঁয়ের বংশীতট গাঁয়ে। গাঁয়ে অন্ন নেই, জল নেই, ডাক্তার-বদ্যি নেই—জমিদার থাকেন কলকাতায়, কখনো তাঁকে কেউ দুঃখ জানাতে পারিনে। আছে শুধু গোমস্তা টাকা আদায়ের জন্যে।

[জীবানন্দ নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন।]

পথিক। উপরি উপরি দু'সন্‌ বৃষ্টি হ'লো না, ক্ষেতের ফসল জ্বলে-পুড়ে গেল, এও সয়েছিল বাপু,—কিন্তু—(কান্নায় তাহার গলা বুজিয়া আসিল।)

জীবানন্দ। তাই বুঝি তীর্থ-দর্শনে একবার বেরিয়ে পড়লে?

পথিক। (মাথা নাড়িয়া) এই ফাল্গুনে পরিবার মারা গেল, একে একে দুই ছেলে ওলাউঠায় চোখের সামনে মারা গেল বাবু, একফোঁটা ওষুধ কাউকে দিতে পারলাম না।

[বলিতে বলিতে লোকটি উচ্ছ্বসিত শোকে কাঁদিয়া ফেলিল। জীবানন্দ জামার হাতায় চোখ মুছিতে লাগিলেন।]

পথিক। মনে মনে বললাম, আর কেন? ভাঙা কুঁড়েখানি বিধবা ভাইঝিকে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—বাবু, আমার চেয়ে দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ। ওরে ভাই, সংসারটা ঢের বড় জায়গা, এর কোথায় কে কিভাবে আছে বলবার যো নেই।

পথিক। কিন্তু আমার মত—

জীবানন্দ। দুঃখী? কিন্তু দুঃখীদের কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বাঁধানো রাস্তা নেই। তা হলে সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে পারত। হুড়মুড় করে যখন ঘাড়ে এসে পড়ে তখনই কেবল মানুষে টের পায়। আমার সব কথা তুমি বুঝবে না ভাই, কিন্তু সংসারে তুমি একলা নও। অন্ততঃ একজন সাথী তোমার বড় কাছেই আছে, তাকে তুমি চিনতেও পারোনি। কিন্তু তুমি মায়ের নাম করছিলে—

[সহসা সাগর ও হরিহর দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।]

হরিহর। আমাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেচে তার সর্ব্বনাশ না করে আমরা কিছুতে ছাড়ব না।

সাগর। মায়ের চৌকাঠ ছুঁয়ে দিব্যি করলাম খুড়ো, ফাঁসি যেতে হয় তাও যাব।

হরিহর। হঃ—আমাদের আবার জেল, আমাদের আবার ফাঁসি! মা আগে যাক—

হরিহর ও সাগর। জয় মা চণ্ডী!

[উভয়ের প্রস্থান]

জীবানন্দ। বাস্তবিক, ঠাকুর-দেবতার মত এমন সহৃদয় শ্রোতা আর নেই। হোক না মিথ্যা দম্ভ, তবু তার দাম আছে। দুর্ব্বলের ব্যর্থ পৌরুষ তবু একটু গৌরবের স্বাদ পায়।

পথিক। কি বললেন বাবু?

জীবানন্দ। কিছু না ভাই, মায়ের নাম করছিলে আমি বাধা দিলাম। আবার শুরু কর, আমি চললাম। কাল এমনি সময়ে হয়ত আবার দেখা পাবে।

পথিক। আর ত দেখা হবে না বাবু, আমি পাঁচদিন আছি, কালই সকালে চলে যেতে হবে।

জীবানন্দ। চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বললে তোমার পা এখনো সারেনি, তুমি হাঁটতে পার না?

পথিক। মায়ের মন্দির এখন রাজাবাবুর। হুজুরের হুকুম তিনদিনের বেশী কেউ থাকতে পারবে না।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) ভৈরবী এখনও যায়নি, এরই মধ্যে হুজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে? মা-চণ্ডীর কপাল ভালো! আচ্ছা, আজ অতিথিদের সেবা হ'লো কিরকম। কি খেলে ভাই?

পথিক। যাদের তিনদিনের বেশী হয়নি তারা মায়ের প্রসাদ সবাই পেলে।

জীবানন্দ। আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশী হয়ে গেছে?

পথিক। ঠাকুরমশাই কি করবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কিনা।

জীবানন্দ। তাই হবে। (এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন।)

জীবানন্দ। কাল আমি আবার আসব, কিন্তু ভাই, চুপিচুপি চলে যেতে পাবে না।

পথিক। ঠাকুরমশাই যদি কিছু বলে?

জীবানন্দ। বললেই বা। এত দুঃখ সইতে পারলে, আর বামুনের একটা কথা সইতে পারবে না? রাত হ'লো, এখন যাই, কিন্তু মনে থাকে যেন।

[এমনি সময়ে ষোড়শী প্রদীপ-হস্তে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মন্দিরের দ্বারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, জীবানন্দ পিছন হইতে ডাক দিল]

জীবানন্দ। অলকা।

ষোড়শী। (চমকিয়া) আপনি? এত রাত্রে আপনি এখানে কেন?

জীবানন্দ। কি জানি, এমনি এসেছিলাম। তুমি যাবার আগে ঠাকুর-প্রণাম করতে যাচ্ছ, না? চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

ষোড়শী। আমার সঙ্গে যাবার বিপদ আছে সে ত আপনি জানেন?

জীবানন্দ। বিপদ? জানি। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ-জীবনে আর যাই কেন না স্বীকার করি আমার শত্রু আছে এ আমি একটা দিনও আর মানব না।

ষোড়শী। কিন্তু কি হবে আমার সঙ্গে গিয়ে?

জীবানন্দ। কিছুই না। শুধু যতক্ষণ আছ সঙ্গে থাকব, তার পর যখন সময় হবে তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাব। যাবার দিনে আজ আর

আমাকে তুমি অবিশ্বাস ক'রো না। আমার আয়ুর দাম তো জানো, হয়ত আর দেখাও হবে না। আমাকে যে তুমি কতরকমে দয়া করে গেলে, শেষদিন পর্য্যন্ত আমি সেই কথাই স্মরণ করব।

ষোড়শী। আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে।

[রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে গিয়া ষোড়শী প্রণাম করিল। জীবানন্দ বলিতে লাগিলেন]

জীবানন্দ। তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন অলকা। দুটো দিনও কি আর তোমার থাকা চলে না?

ষোড়শী। না!

জীবানন্দ। একটা দিন?

ষোড়শী। না।

জীবানন্দ। তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে ক্ষমা কর।

ষোড়শী। কিন্তু তাতে কি আপনার প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ। এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি। উঃ—নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায়, সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বুঝি আর কেউ নেই।

[ষোড়শী জীবানন্দের কাছে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া নীরবে দাঁড়াইল।]

জীবানন্দ। (দাঁড়াইয়া) আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ অলকা, সবাই জানবে আমি শাস্তি দিয়েচি, তুমি সহ্য করেচ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। এত বড় মিথ্যে কলঙ্ক আমি সইব কেমন করে? তাও সয় যদি একটি দিন—শুধু কেবল একটি দিনও তোমাকে কাছে রাখতে পারি।

ষোড়শী। (পিছাইয়া গিয়া) চৌধুরীমশাই, কিসের জন্য এত অনুনয়-বিনয়? আপনার পাইক-পিয়াদাদের গায়ের জোরের ত আজও অভাব হয়নি। আপনি ত জানেন, আমি কারো কাছে নালিশ করবো না।

জীবানন্দ। (পথ ছাড়িয়া সরিয়া) তা হলে তুমি যাও। অসম্ভবের লোভে তোমাকে আমি পীড়ন করব না। পাইক-পিয়াদা সবাই আছে অলকা, তাদের জোরের অভাব হয়নি। কিন্তু যে নিজে ধরা দিলে না, জোর করে ধরে রেখে তার বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর আর আমার গায়ে নেই।

ষোড়শী। (গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া) আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—

জীবানন্দ। কি অনুরোধ অলকা?

[বাহিরে গরুর গাড়ি দাড়ানোর শব্দ হইল।]

ষোড়শী। দয়া করে একটু সাবধানে থাকবেন।

জীবানন্দ। সাবধানে থাকব! কি জানি, সে বোধ হয় আর পেরে উঠব না। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই মন্দিরে কে দু'জন দেবতার চৌকাঠ ছুঁয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল, তাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেচে, তার সর্ব্বনাশ না করে তারা বিশ্রাম করবে না—আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সব শুনলুম—দু'দিন আগে হলে হয়ত মনে হ'তো, আমিই বুঝি তাদের লক্ষ্য—দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না, কিন্তু আজ কিছু মনেই হ'লো না—কি অলকা? চমকালে কেন?

ষোড়শী। (পাংশু-মুখে) না কিছু না। এইবারে ত আপনার চণ্ডীগড় ছেড়ে বাড়ি যাওয়া উচিত? আর ত এখানে আপনার কাজ নেই।

জীবানন্দ। (অন্যমনস্কতায়) কাজ নেই?

ষোড়শী। কই আমি ত আর দেখতে পাইনে। এ গ্রাম আপনার, একে নিষ্পাপ করবার জন্যই আপনি এসেছিলেন। আমার মত অসতীকে নির্ব্বাসিত করার পরে আর এখানে আপনার কি আবশ্যক আছে আমি ত দেখতে পাইনে।

জীবানন্দ। (চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিয়া) কিন্তু তুমি ত অসতী নও।

[গাড়োয়ানের প্রবেশ]

গাড়োয়ান। মা, আর কি বেশী দেরি হবে?

ষোড়শী। না বাবা, আর বেশী দেরি হবে না।

[গাড়োয়ান প্রস্থান করিল]

চণ্ডীগড় থেকে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে তা বলে দিচ্চি।

জীবানন্দ। কোথায় যাব বল?

ষোড়শী। কেন, আপনার বীজগাঁয়ে।

জীবানন্দ। বেশ, তাই যাব।

ষোড়শী। কিন্তু কালকেই যেতে হবে।

জীবানন্দ। (মুখ তুলিয়া) কালই? কিন্তু কাজ আছে যে। মাঠের জলনিকাশের একটা সাঁকো করা দরকার। এদের জমিগুলো সব ফিরিয়ে দিতে হবে, সে ত তোমারই হুকুম। তা ছাড়া মন্দিরের একটা ভালো বিলি-ব্যবস্থা হওয়া চাই,—অতিথি-অভ্যাগত যারা আসে তাদের ওপর না অত্যাচার হয়—এ-সব না করেই কি তুমি চলে যেতে বলচ?

ষোড়শী। (মুস্কিলে পড়িয়া) এ-সব সাধু সঙ্কল্প কি কাল সকাল পর্য্যন্ত থাকবে? (জীবানন্দ নীরব রহিলেন) কিন্তু আবশ্যকের চেয়ে একটা দিনও বেশী থাকবেন না আমাকে কথা দিন। এবং সে-ক'টা দিন আগেকার মত সাবধানে থাকবেন বলুন?

জীবানন্দ। (সে-কথায় কান না দিয়া) আমার কৃতকর্ম্মের ফল যদি আমি ভোগ করি সে অভিযোগ আমি কারু কাছে করব না—কিন্তু যাবার সময় তোমার কাছে আমার শুধু একটিমাত্র দাবী আছে—(পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া ষোড়শীর হাতে দিয়া) এই চিঠিখানি ফকিরসাহেবকে দিয়ো।

ষোড়শী। দেবো। কিন্তু এ পত্র আমি কি পড়তে পারিনে?

জীবানন্দ। পার, কিন্তু আবশ্যক নেই। এর জবাব দেবার ত প্রয়োজন হবে না। আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে তার ঢের বেশি দুঃখ তুমি নিজে নিয়েচ। নইলে এমন করে হয়ত আমাকে—কিন্তু যাক সে! আমার শেষ অনুরোধ এতেই লেখা আছে, তা যদি রাখতে পার, তার চেয়ে আনন্দ আর আমার নেই।

ষোড়শী। তাহলে পড়ি?

[ষোড়শী নীরবে চিঠিখানি পড়িল, তাহার মুখে ভাবের একান্ত পরিবর্ত্তন ঘটিল; জীবানন্দকে আড়াল করিয়া তাড়াতাড়ি সজল চক্ষু মুছিয়া ফেলিল।]

ষোড়শী। আমি যে কুষ্ঠাশ্রমের দাসী হয়ে যাচ্ছি এ খবর তুমি জানলে কি করে?

জীবানন্দ। কুষ্ঠাশ্রমের কথা অনেকেই জানে। আর তোমার কথা? আজই দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে যারা শপথ করে গেল, নিজের কানে শুনেও আমি যাদের চিনতে পারিনি, তুমি তাদের চিনলে কি করে?

ষোড়শী। তোমার আর সংসারে কি মন নেই? সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে তুমি কি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে চাও নাকি?

জীবানন্দ। (সহসা উত্তেজিত হইয়া) আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। আমি বাঁচতে চাই—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ি চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, সন্তান চাই—আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই। কিন্তু এ প্রার্থনা জানাব আমি কার কাছে?

[গাড়োয়ানের প্রবেশ]

গাড়োয়ান। মা, শৈবালদীঘি সাত-আট কোশের পথ, এখন বার না হলে পৌঁছাতে বেলা হয়ে যাবে।

যোড়শী। চল বাবা, যাচ্চি।

(গাড়োয়ান প্রস্থান করিল। যোড়শী পুনরায় জীবানন্দকে প্রণাম করিয়া) আমি চললাম।

জীবানন্দ। এখনি? এত রাত্রে?

যোড়শী। প্রজারা জানে আমি ভোরবেলায় যাত্রা করব, তারা এসে পড়বার পূর্ব্বেই আমার বিদায় হওয়া চাই।

(প্রস্থান)

জীবানন্দ (একাকী অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া) অলকা! অলকা! একদিন তোমার মা আমার হাতে তোমাকে দিয়েছিলেন; তবু তোমাকে পেলাম না; কিন্তু সেদিন আমাকে যদি কেউ তোমার হাতে সঁপে দিতেন, আজ বোধ হয় তুমি অন্ধকারে আমাকে এমন করে ফেলে যেতে পারতে না।

[বাহির হইতে গরুর গাড়ি চালানোর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল।]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(জমিদারের 'শান্তিকুঞ্জ' তিন-চার দিন হইল ভস্মীভূত হইয়াছে। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বহু চিহ্ন তখনও বিদ্যমান। সবই পুড়িয়াছে, মাত্র ভৃত্যদের খান-দুই ঘর রক্ষা পাইয়াছে। ইহার মধ্যেই জীবানন্দ আশ্রয় লইয়াছেন। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া বারুই নদের জল দেখা যাইতেছে; প্রভাত-বেলায় সেইদিকে চোখ মেলিয়া জীবানন্দ নিঃশব্দে বসিয়াছিলেন। মুখে চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার কোন প্রকাশ নাই, শুধু সারারাত্রি ধরিয়া উৎকট রোগ-ভোগের একটা অবসন্ন ম্লান ছায়া তাঁহার সর্ব্বদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে।)

[প্রফুল্ল প্রবেশ করিল]

প্রফুল্ল। এখন কেমন আছেন দাদা ?

জীবানন্দ। ভালো আছি।

প্রফুল্ল। বহুকালের অভ্যাস, ওষুধ বলেও যদি এক-আধ আউন্স—

জীবানন্দ। (সহাস্যে) ওষুধই বটে। না প্রফুল্ল, মদ আমি খাব না।

প্রফুল্ল। রাত্রিটা কাল কি উৎকণ্ঠাতেই আমার কেটেচে। যন্ত্রণায় হাত-পা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল।

জীবানন্দ। তাই এই গরম করার প্রস্তাব ?

প্রফুল্ল। বল্লভ ডাক্তারের ভয়, হয়ত হঠাৎ হার্টফেল করতে পারে।

জীবানন্দ। হার্ট ত হঠাৎই ফেল করে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। কিন্তু সেজন্যে ত একটা—

জীবানন্দ। (নিজের হার্ট হাত দিয়া দেখাইয়া) ভায়া, এ বেচারা বহু উপদ্রবেও সমানে চলচে, কোনদিন ফেল করেনি। দৈবাৎ একদিন একটা অকাজ যদি করেই বসে ত মাপ করা উচিত।

প্রফুল্ল। কি একগুঁয়ে মানুষ আপনি দাদা। ভাবি, এতবড় জিদ্ এতকাল কোথায় লুকানো ছিল!

জীবানন্দ। ভালো কথা, তোমার ডাল-ভাতের যোগাড়ে বার হবার যে একটা সাধু প্রস্তাব ছিল তার কতদূর ?

প্রফুল্ল। ঘাট হয়েচে দাদা। আপনি ভালো হয়ে উঠুন, ডাল-ভাতের চিন্তা তার পরেই করব।

জীবানন্দ। আমার ভালো হবার পরে ত ? যাক তা হলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

[তারাদাস ও পূজারীর প্রবেশ]

তারাদাস। মন্দিরের খান-কয়েক থালা-ঘটি-বাটি পাওয়া যাচ্চে না।

জীবানন্দ। না গেলে সেগুলো আবার কিনে নিতে হবে।

[ব্যস্ত হইয়া এককড়ির প্রবেশ]

এককড়ি। (ডাক ছাড়িয়া) এ-কাজ সাগর সর্দ্দারের। আজ খবর পাওয়া গেল, তাকে আর তার দু'জন সঙ্গীকে সেদিন অনেক রাত পর্য্যন্ত এদিকে ঘুরে বেড়াতে লোকে দেখেচে। থানায় সংবাদ পাঠিয়েচি, পুলিশ এল বলে। সমস্ত ভূমিজ গুষ্টিকে যদি না আমি এই ব্যাপারে আন্দামানে পাঠাতে পারি ত আমার নামই এককড়ি নন্দী নয়—বৃথাই আমি এতকাল হুজুরের সরকারে গোলামি করে মরেচি।

জীবানন্দ। (একটু হাসিয়া) তা হলে তোমাকেও ত এদের সঙ্গে যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গোমস্তাগিরির কাজে তুমি যাদের ঘর জালিয়েচ সে ত আমি জানি। এদের আগুন দিতে কেউ চোখে দেখেনি, কেবল সন্দেহের উপর যদি তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়, জানা অপরাধের জন্য তোমাকেও ত তার ভাগ নিতে হয়।

এককড়ি। (প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া, পরে শুষ্ক হাস্যের সহিত) হুজুর মা-বাপ। আমাদের সাত-পুরুষ হুজুরের গোলাম। হুজুরের আদেশে শুধু জেল কেন, ফাঁসি যাওয়ায় আমাদের অহঙ্কার।

জীবানন্দ। যা পুড়েচে সে আর ফিরবে না; কিন্তু এর পর যদি পুলিশের সঙ্গে জুটে নতুন হাঙ্গামা বাধিয়ে দু'পয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা কর, তা হলে হুজুরের লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে এককড়ি।

পূজারী। মিস্ত্রী এসেছে হুজুরের কাছে নালিশ জানাতে।

জীবানন্দ। কিসের নালিশ?

পূজারী। মন্দিরের মেরামতি কাজে ঘটনাচক্রে তার বিশেষ লোকসান হয়ে যায়। মা বলেছিলেন, কাজ শেষ হলে তার ক্ষতিপূরণ দেবেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম হুজুর।

জীবানন্দ। তবে দেওয়া হয় না কেন?

পূজারী। (তারাদাসকে ইঙ্গিত করিয়া) উনি বলেন, যে বলেছিল তার কাছে গিয়ে আদায় করতে।

[জীবানন্দ ক্রুদ্ধ চক্ষে তারাদাসের প্রতি চাহিতে]

তারাদাস। অনেকগুলো টাকা—

জীবানন্দ। অনেকগুলো টাকাই দেবে ঠাকুর।

তারাদাস। কিন্তু খরচটা ন্যায্য কিনা—

জীবানন্দ। দেখ তারাদাস, ও সব শয়তানি মতলব তুমি ছাড়ো। ষোড়শীর ন্যায়-অন্যায় বিচারের ভার তোমার ওপরে নেই। যা বলে গেছেন তাই কর গে। (পূজারীর প্রতি) মিস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে?

পূজারী। আছে হুজুর।

জীবানন্দ। চল, আমি নিজের গিয়ে সমস্ত মিটিয়ে দিচ্চি।

[জীবানন্দ, প্রফুল্ল, তারাদাস ও পূজারীর প্রস্থান। রহিল শুধু এককড়ি। শিরোমণি ও জনার্দ্দন রায়ের প্রবেশ]

জনার্দ্দন। বাবু গেলেন কোথা?

এককড়ি। (তিক্ত-কণ্ঠে) কে জানে!

জনার্দ্দন। কে জানে কি হে? পুলিশে খবর দেওয়ার কথাটা তাঁকে বলেছিলে?

এককড়ি। পারেন, আপনিই বলুন না।

জনার্দ্দন। ব্যাপার কি এককড়ি?

এককড়ি। কে জানে কি ব্যাপার। না আছে মেজাজের ঠিক, না পাই কোন কথার ঠিকানা। তারা ঠাকুরকে তেড়ে মারতে গেলেন, আমাকে পাঠাতে চাইলেন জেলে—

শিরোমণি। অত্যধিক মদ্যপানের ফল। হুজুর কি এখনি ফিরে আসবেন মনে হয়?

এককড়ি। বুঝলেন রায়মশাই, মিথ্যে সন্দেহ করে সাগর সর্দ্দারের নাম পুলিশে জানানো চলবে না।

জনার্দ্দন। মিথ্যে সন্দেহ কি হে? এ যে একরকম স্পষ্ট চোখে দেখা!

শিরোমণি। একেবারে প্রত্যক্ষ বললেই হয়।

এককড়ি। বেশ, তাই একবার বলে দেখুন না?

জনার্দ্দন। বলবই ত হে। নইলে কি গুষ্টিবর্গ মিলে পুড়ে কয়লা হবো! ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে আমিও ত একজন উদ্যোগী।

শিরোমণি। আমার কথাই না কোন্ তারা শুনেচে!

জনার্দ্দন। যারা এতবড় জমিদারের বাড়িতে আগুন দিতে পারে তারা পারে না কি?

এককড়ি। আমিও তাই ভাবি।

জনার্দ্দন। ভেবো পরে। এখন শীঘ্র কিছু একটা করো। এখানে যদি প্রশ্রয় পায় ত আমাকে ঘরে শিকল দিয়ে মানকচুর মত সেদ্ধ করে ছাড়বে।

শিরোমণি। ব্যাটারা গুরুর দোহাই মানবে না। ডাকাত কি না। হয়ত বা ব্রহ্ম-হত্যাই করে বসবে! (শিহরিয়া উঠিলেন)

জনার্দ্দন। আর শুধু কি কেবল বাড়ি? আমার কত ধানের গোলা, কত খড়ের মরাই, সব-শুদ্ধ যদি—

শিরোমণি। দেখ ভায়া, আমি বরঞ্চ দিন-কতক শিষ্যবাড়ি থেকে ঘুরে আসি গে।

জনার্দ্দন। কিন্তু আমার ত শিষ্যবাড়ি নেই? আমার থাকলেও ত ধানের গোলা, খড়ের মরাই নিয়ে শিষ্যবাড়ি ওঠা যায় না?

শিরোমণি। না। গেলেও ও-সকল ফিরিয়ে আনা কঠিন। আজকালকার শিষ্য-সেবকদের মতি-গতিও হয়েচে অন্য প্রকার।

এককড়ি। চারিদিকে কড়া পাহারা মোতায়েন করে রাখুন।

জনার্দ্দন। তা ত রেখেচি, কিন্তু পাহারা কি তোমাদের কম ছিল এককড়ি।

এককড়ি। আর একটা কথা শুনেচেন? ভূমিজ প্রজারা গিয়ে কাল আদালতে নালিশ করে এসেচে। শুনেচি কান্না-কাটি শুনে স্বয়ং হাকিম আসবেন সরজমিন তদারকে।

জনার্দ্দন। বল কি হে! চণ্ডীগড়ে বাস করে জমিদার আর আমার নামে নালিশ?

শিরোমণি। শিষ্যগণের আহ্বান উপেক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য নয় জনার্দ্দন।

এককড়ি। দেখুন আস্পর্দ্ধা! জীবনে বেশীদিন যারা পেট-ভরে খেতে পায় না, শীতের রাতে যারা বঁসে কাটায়, মড়কের দিনে যারা কুকুর-বেড়ালের মত মরে—

জনার্দ্দন। আবার আবাদের দিনে একমুঠা বীজের জন্য আমারই দরজার বাইরে পড়ে হত্যা দেয়—

এককড়ি। সেই নিমকহারাম বেটারা আদালতে দাঁড়াবার টাকা পেলেই বা কোথা? এ ছুর্ম্মতি দিলেই বা তাদের কে?

জনার্দ্দন। এই সোজা কথাটা ব্যাটারা বোঝে না যে, কেবল জেলা আদালতেই নয়, হাইকোর্ট বলেও একটা কিছু আছে যেখানে জীবানন্দ চৌধুরী জনার্দ্দন রায়কে ডিঙিয়ে সাগর সর্দ্দার যেতে পারে না।

এককড়ি। নিশ্চয়। টাকা যার মোকদ্দমা তার। আপনার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, ব্যারিস্টার জামাই আছে, কত উকিল-মোক্তার আছে; নালিশ যদি করেই, আপনার ভাবনা কিসের?

জনার্দ্দন। (চিন্তিতভাবে) না এককড়ি, কেবল জমি বিক্রীই ত নয় (ইঙ্গিত করিয়া) আরো যে-সব কাজ করা গেছে ফৌজদারী দণ্ডবিধি কেতাবের পাতায় তার ফলশ্রুতি ত সহজ নয়!

এককড়ি। তা জানি। কিন্তু এই ছোটলোক চাষার দল হাকিমের কাছে আমল পেলে ত!

জনার্দ্দন। বলা যায় না; এই কথাটাই আজ তোমার মনিবের কাছে পাড়ো গে! এখন চললাম।

এককড়ি। আসুন। আমিও ইতিমধ্যে একটা কাজ সেরে রাখি গে।

[শিরোমণি, এককড়ি ও জনার্দ্দনের প্রস্থান]

[কথা কহিতে কহিতে জীবানন্দ ও প্রফুল্ল প্রবেশ করিলেন]

জীবানন্দ। না প্রফুল্ল, সে হয় না। মাঠের জল-নিকাশী সাঁকো তৈরীর পয়সা যদি নায়েবমশায়ের তবিলে না থাকে ত এখানকার বাড়ি মেরামতও বন্ধ থাক্।

প্রফুল্ল। বেশ থাক্। কিন্তু ফিরে চলুন।

জীবানন্দ। না।

প্রফুল্ল। না কি-রকম? এ-বাড়িতে আপনি থাকবেন কি করে?

জীবানন্দ। যেমন করে আছি। এ সহ্য হয়ে যাবে। মানুষের অনেক-কিছুই সয় প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল। সয় না দাদা, তারও সীমা আছে। শরীরটা যে হঠাৎ ভয়ানক ভেঙে গেল। বর্ষা সুমুখে। এই ভাঙা মন্দিরে কি এই ভাঙা দেহ সে দুর্য্যোগ সইবে? রক্ষে করুন, এবার বাড়ি চলুন।

জীবানন্দ। (হাসিয়া) এই ভাঙা দেহের দেহ-তত্ত্বের আলোচনা আর একদিন করা যাবে ভায়া, এখন কিন্তু নায়েবকে চিঠি লিখে দাও এ টাকা আমার চাই-ই। প্রজারা বছর বছর টাকা যোগাচ্চে আর মরচে, এবার তাদের মরণ আটকাতে যদি জমিদারীটা মরে ত মরুক না।

[দ্রুতপদে জনার্দ্দনের প্রবেশ]

জনার্দ্দন। হুজুর কি নিজে—স্বয়ং হুকুম দিয়ে আমার—

জীবানন্দ। কি হুকুম রায়মশায়?

জনার্দ্দন। আমার পুকুরধারের জায়গার বেড়া ভেঙে মন্দিরের জমির সঙ্গে এক করিয়ে দিয়েচেন?

জীবানন্দ। কোন্ জায়গাটা বলচেন? যেখানে বছর-কুড়ি পূর্ব্বে মন্দিরের গোশালা ছিল?

জনার্দ্দন। আমি ত জানিনে কবে আবার—

জীবানন্দ। অনেকদিন হয়ে গেল কি-না। বোধ হয় নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে কথাটা ভুলে গেছেন।

জনার্দ্দন। (দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া) কিন্তু এ-সব করার আগে হুজুর ত আমার কাছে একটা খবর পাঠাতে পারতেন।

জীবানন্দ। খবর পৌঁছোবেই জানি। দু'দণ্ড আগে আর পরে। কিছু মনে করবেন না।

জনার্দ্দন। কিন্তু আগে জানলে মামলা-মোকদ্দমা হয়ত বাধত না।

জীবানন্দ। এতেও বাধা দেওয়া উচিত নয় রায়মশায়। ভৈরবীদের হাতে দেবীর বহু সম্পত্তিই বেহাত হয়ে গেছে। এখন সেগুলো হাত-বদল হওয়া দরকার।

জনার্দ্দন। (শুষ্ক হাস্য করিয়া) তার চেয়ে আর ভালো কথা কি আছে হুজুর। শুনতে পাই সমস্ত গ্রামখানাই একদিন মা-চণ্ডীর ছিল। এখন কিন্তু—

জীবানন্দ। জমিদারের গর্ভে গেছে। তা গেছে। তারও ত্রুটি হবে না রায়মশায়। মন্দিরের দলিল, নক্‌শা, ম্যাপ প্রভৃতি যা-কিছু আছে কলকাতায় এটর্নির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েচি। কিন্তু আমার একলার সাধ্য কি? আপনারা এ-কাজে আমার সহায় থাকবেন।

জনার্দ্দন। থাকব বই কি হুজুর! আমরা চিরকাল হুজুর সরকারের চাকর বই ত নয়।

[জনার্দ্দন প্রস্থান করিল। জীবানন্দ সকৌতুক হাসিমুখে তাহার প্রতি
দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

প্রফুল্ল। দাদা কি শেষে একটা লঙ্কাকাণ্ড বাধাবেন না কি?

জীবানন্দ। যদি বাধে সে ভাগ্যের কথা প্রফুল্ল। তার জন্যে দেবতাদের একদিন তপস্যা করতে হয়েছিল।

প্রফুল্ল। দেবতারা পারেন করুন, লঙ্কার বাইরে বসে তপস্যা করায় পুণ্যও আছে, দুশ্চিন্তাও কম। কিন্তু লঙ্কার ভিতরে যারা বাস করে, লঙ্কাকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের ভাগ্যকে ঠিক সৌভাগ্য বলা চলে না। এসে পর্য্যন্ত গ্রামশুদ্ধ লোকের সঙ্গে বিবাদ করে বেড়ানো আপনার গৌরবেরও নয়, প্রয়োজনও নয়। ইতিমধ্যে নানাপ্রকার কার্য্যই ত করা গেল, এখন ক্ষান্ত দিয়ে চলুন বাড়ি ফিরে যাওয়া যাক।

জীবানন্দ। সময় হলেই যাব।

প্রফুল্ল। তাই যাবেন। যাই হোক দাদা, আপনার যাবার সময়ের তবু একটা আন্দাজ পাওয়া গেল, কিন্তু আমার যাবার সময় যে কবে আসবে তার কূল-কিনারাও চোখে পড়ে না।

[এককড়ির প্রবেশ]

এককড়ি। মিস্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। পুলের কাজটা কোথা থেকে আরম্ভ হবে জানতে চায়।

জীবানন্দ। চল না প্রফুল্ল, একবার মাঠে গিয়ে তাদের কাজটা দেখিয়ে দিয়ে আসি গে।

প্রফুল্ল। চলুন।

[জীবানন্দ প্রফুল্লকে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। অন্যদিক দিয়া শিরোমণি ও জনার্দ্দন রায় প্রবেশ করিলেন]

জনার্দ্দন। বাবু গেলেন কোথায় এককড়ি?

এককড়ি। মিস্ত্রীকে দেখাতে গেলেন। মাঠে সাঁকো তৈরী হবে।

জনার্দ্দন। পাগলের খেয়াল।

শিরোমণি। মদ্যপান-জনিত বুদ্ধি-বিকৃতি।

এককড়ি। এই শনিবারে হাকিম সরজমিন তদন্তে আসবেন। ছোটলোক ব্যাটাদের বুদ্ধি এবং টাকা কে যোগাচ্ছে ঠিক জানতে পারলাম না, কিন্তু এইটুকু জানতে পারলাম তারা সাক্ষী মানলে হুজুর গোপন কিছুই করবেন না, দলিল তৈরীর কথা পর্য্যন্ত না।

জনার্দ্দন। (সহাস্যে) আমার বয়সটা কত হয়েচে ঠাওরাও এককড়ি? চণ্ডীগড়ের জনার্দ্দন রায়কে ও ধাপ্পায় কাৎ করা যাবে না, বাপু, আর কোন মতলব ভেঁজে এসো গে। (এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া) তবে, এ-কথা মানি তোমার হাতে গিয়ে একটু পড়েচি। মোচড় দিয়ে দু'পয়সা উপরি রোজগারের সময় এই বটে। কিন্তু তাই বলে যা রয় সয় কর।

এককড়ি। সত্যি বলচি আপনাকে রায়মশায়—

জনার্দ্দন। আহা, সত্যিই ত বলচ! এককড়ি নন্দী আবার মিথ্যে কবে বলেন? সে-কথা নয় ভায়া, আমার না হয় শ'খানেক বিঘের টান ধরবে, কিন্তু তাঁর নিজের যাবে কত? সেটা কি তোমার মনিব খতিয়ে দেখেননি? না দেখে থাকেন ত দেখাও যে চোখে আঙুল দিয়ে। তার পরে না হয় আমাকে প্যাঁচ ক'সো।

এককড়ি। জায়গা-জমির কথাই হচ্চে না রায়মশাই, কথা হচ্চে দলিল-পত্র তৈরী করার। জিজ্ঞাসা করলে সমস্তই বলবেন, কিছুই গোপন করবেন না।

জনার্দ্দন। তার হেতু? শ্রীঘরে যাবার বাসনা ত? কিন্তু একা জনার্দ্দন যাবে না এককড়ি, মহারাণী হুজুর বলে রেয়াত করবে না, কথাটা তাঁকে ব'লো।

এককড়ি। (অভিমান-স্বরে) বলতে হয় আপনি নিজেই বলবেন।

জনার্দ্দন। বলব বই কি হে। ভালো করেই বলব। হাকিমের কাছে কবুল জবাব দিয়ে সাধু সাজা ঠাট্টা তামাসা নয়। (ইঙ্গিতে দেখাইয়া) হাতকড়ি পড়বে।

এককড়ি। সে আপনি বুঝবেন আর তিনি বুঝবেন।

জনার্দ্দন। আর তুমি? শ্রীমান এককড়ি নন্দী? বাড়ি যখনি পুড়েচে তখনি জানি কি-একটা ভেতরে ভেতরে হচ্চে। কিন্তু জনার্দ্দন অত নরম মাটি

ঠাউরো না ভায়া, পস্তাবে। নির্মলকে আটকে রেখেছি, সে-ই তোমাদের বুঝিয়ে দেবে।

এককড়ি। আমার ওপরে মিথ্যে রাগ করচেন রায়মশায়, যা জানি তাই শুধু জানিয়েচি। বিশ্বাস না হয়, হুজুর ত এই সামনের মাঠেই আছেন, একটু ঘুরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে যান না।

জনার্দ্দন। তাই যাব। শিরোমণিমশাই, আসুন ত?

শিরোমণি। চল না ভায়া, ভয় কিসের?

[দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া সহসা পিছন ফিরিয়া]

শিরোমণি। (এককড়ির প্রতি) বলি, অত্যাধিক মদ্যপান করে নেই ত? তা হলে না হয়—

এককড়ি। মদ তিনি খান না। (হঠাৎ কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া) কিন্তু যেতেও আর হবে না। হুজুর নিজেই আসচেন।

[জীবানন্দ ও প্রফুল্ল তর্ক করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন]

জনার্দ্দন। (কাছে গিয়ে স্বাভাবিক ব্যাকুলতার সহিত) হুজুর, সমস্ত ব্যাপার একবার মনে করে দেখুন।

জীবানন্দ। কিসের রায়মশায়?

জনার্দ্দন। জমি বিক্রীর ব্যাপারে হাকিম নিজে আসচেন তদন্ত করতে। হয়ত ভারী মোকদ্দমাই বাধবে। কিন্তু আপনি না কি—

জীবানন্দ। ওঃ! কিন্তু উপায় কি রায়মশায়? সাহেব জমি ছাড়তে চায় না, সে সস্তায় কিনেচে। মোকদ্দমা ত বাধবেই। সুতরাং মামলা জেতা ছাড়া প্রজাদের আর ত পথ দেখিনে।

জনার্দ্দন। (আকুল হইয়া) কিন্তু আমাদের পথ?

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) সে ঠিক, আমাদের পথও খুব দুর্গম মনে হয়।

জনার্দ্দন। (মরিয়া হইয়া) এককড়ি তা হলে সত্যই বলেচে! কিন্তু হুজুর, পথ শুধু দুর্গম নয়—জেল খাটতে হবে, এবং আমরা একা নয়, আপনিও বাদ যাবেন না।

জীবানন্দ। (একটুখানি হাসিয়া) তাই বা কি করা যাবে রায়মশায়। সখ করে যখন গাছ পোঁতা গেছে, ফল তার খেতে হবে বই কি।

জনার্দ্দন। (চীৎকার করিয়া) এ আমাদের সর্ব্বনাশ করবে এককড়ি।

[পাগলের মত ঝড়ের বেগে জনার্দ্দন বাহির হইয়া গেলেন, তাঁহার পিছনে এককড়ি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল, নেপথ্যে কোলাহল।]

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) কারা যায় প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। বোধ হয় আপনার মাটি-কাটা ধাঙড়-কুলীর দল।

জীবানন্দ। একবার ডাকো তো হে। শুনি আজ বাঁধের কাজ কতখানি করলে।

প্রফুল্ল। (ঈষৎ অগ্রসর হইয়া) ওহে, ও সর্দ্দার? শোন শোন, একবার শুনে যাও।

[স্ত্রী ও পুরুষ কুলীদের প্রবেশ]

সর্দ্দার। কি রে, ডাকচিস্ কেনে?

জীবানন্দ। বাবারা, কোথায় চলেচিস্ বল্ ত?

সর্দ্দার। ভাত খাবার লাগি রে?

জীবানন্দ। দেখিস্ বাবারা, আমার বাঁধের কাজ যেন বর্ষার আগেই শেষ হয়।

সকলে। (সমস্বরে) সব হোয়ে যাবে রে, সব হোয়ে যাবে। তুই কিছু ভাবিস্ না। চল্।

[কুলীদের প্রস্থান]

[নির্ম্মল প্রবেশ করিল]

জীবানন্দ। (সাদরে) আসুন, আসুন, নির্ম্মলবাবু।

নির্ম্মল। (নমস্কার করিয়া) আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

জীবানন্দ। আর একদিন হলে হয় না।

নির্ম্মল। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবানন্দ। তা বটে। অকাজের বোঝা টানতে যাঁকে আটকে থাকতে হয় তাঁর সময় নষ্ট করা চলে না।

নির্ম্মল। অকাজ মানুষে করে বলেই ত সংসারে আমাদের প্রয়োজন চৌধুরীমশাই।

জীবানন্দ। কিন্তু কাজের ধারণা ত সকলের এক নয় নির্ম্মলবাবু। রায়মশায়ের আমি অকল্যাণ কামনা করিনে, এবং আপনার উদ্দেশ্য সফল হলে আমি বাস্তবিকই খুশী হব, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যও আমি স্থির করে ফেলেচি, এ থেকে নড়চড় করা আর সম্ভব হবে না।

নির্ম্মল। এ কথা সত্য যে আপনি সমস্তই স্বীকার করবেন?

জীবানন্দ। সত্য বই কি।

নির্ম্মল। এমন ত হতে পারে আপনার কবুল জবাবে আপনিই শুধু শাস্তি পাবেন, কিন্তু আর সকলে বেঁচে যাবেন।

জীবানন্দ। খুব সম্ভব বটে। কিন্তু সেজন্যে আমার কোন অভিযোগ নেই নির্ম্মলবাবু। নিজের কৃতকর্ম্মের ফল আমি একা ভোগ করলেই যথেষ্ট। নইলে রায়মশায় নিস্তার লাভ করে সুস্থদেহে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে থাকুন, এবং আমার এককড়ি নন্দীমশায়ও আর কোথাও গোমস্তাগিরির কর্ম্মে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকুন, কারও প্রতি আমার আক্রোশ নেই।

নির্ম্মল। আত্মরক্ষায় সকলেরই ত অধিকার আছে, অতএব শ্বশুরমশায়কেও করতে হবে। আপনি নিজে জমিদার, আপনার কাছে মামলা-মোকদ্দমার বিবরণ দিতে যাওয়া বাহুল্য—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা বিষ দিয়েই বিষের চিকিৎসা করতে হবে।

জীবানন্দ। চিকিৎসক কি জাল-করার বিষে খুন করার ব্যবস্থা দেবেন?

নির্ম্মল। (রাগ সংবরণ করিয়া) এমন ত হতে পারে কারও কোন শাস্তিভোগ করারই আবশ্যক হবে না, অথচ ক্ষতিও কাউকে স্বীকার করতে হবে না।

জীবানন্দ। (তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া) বেশ ত পারেন ভালোই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ এ শুধু অন্নবস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাত-পুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে। (একটু চুপ করিয়া) আপনি ভালোই জানেন, অন্য পক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোর-জুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষীদের উপর, কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসচে, আর হতে আমি দেব না।

নির্ম্মল। আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারী; এই ক'টা চাষার কি আর তাতে স্থান হবে না? কোথাও না কোথাও—

জীবানন্দ। না না, আর কোথাও না—চণ্ডীগড়ে। এইখানে আমি জোর করে সেদিন তাদের কাছে অনেক টাকা আদায় করেচি—আর সে টাকা যুগিয়েচেন জনার্দ্দন রায়। এ ঋণ-পরিশোধ করতে আমাকে হবেই; এবং আরও যে কত বড় একটা শূল তাদের বিদ্ধ করেচি, সে-কথা শুধু আমিই জানি। কিন্তু থাক্। অপ্রীতিকর আলোচনায় আর আমার প্রবৃত্তি নেই নির্ম্মলবাবু, আমি মনস্থির করেচি।

[জীবানন্দ প্রস্থান করিলেন। সেইদিকে চাহিয়া নির্ম্মল অভিভূতের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। এমনি সময়ে ফকিরসাহেব প্রবেশ করিলেন]

ফকির। জামাইবাবু, সেলাম। বাবু কই?

নির্ম্মল। (অভিবাদন করিয়া) জানিনে। ফকিরসাহেব, ষোড়শীকে আমাদের বড় প্রয়োজন। তিনি যেখানেই থাকুন একবার আমাকে দেখা করতেই হবে। বলুন, কোথায় আছেন।

ফকির। আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই। কারণ, একদিন যখন সবাই তাঁর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছিল, তখন আপনিই শুধু তাঁকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন।

নির্ম্মল। আজ আবার ঠিক সেইটি উল্টে দাঁড়িয়েচে ফকিরসাহেব। এখন কেউ যদি তাঁদের বাঁচাতে পারে ত শুধু তিনিই। কোথায় আছেন এখন?

ফকির। শৈবালদীঘির কুষ্ঠাশ্রমে।

নির্ম্মল। কুষ্ঠাশ্রমে? সেখানে কি সুখে আছেন?

ফকির। (মৃদু হাসিয়া) এই নিন। মেয়েমানুষের সুখে থাকার খবর দেবতারা জানেন না, আমি ত আবার সন্ন্যাসীমানুষ। তবে, মা আমার শান্তিতে আছেন এইটুকু অনুমান করতে পারি।

নির্ম্মল। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) এখানে আপনি কোথায় এসেছিলেন।

ফকির। জমিদার জীবানন্দের এই চিঠি পেয়ে তাঁরই সঙ্গে একবার দেখা করতে। এই চিঠি আপনাদের পড়া প্রয়োজন। নিন পড়ুন। (চিঠিখানা দিতে গেলেন)

নির্ম্মল। (সসঙ্কোচে) জীবানন্দের লেখা? এ আমি ছোঁব না। প্রয়োজন থাকে আপনিই পড়ুন।

ফকির। প্রয়োজন আছে। নইলে বলতাম না। পত্র আমাকেই লেখা।

[ফকির ধীরে ধীরে চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন এবং নির্ম্মলের মুখের ভাব সংশয় ও বিস্ময়ে কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল।]

ফকির। (পত্রপাঠ)—

"ফকিরসাহেব,—

ষোড়শীর আসল নাম অলকা। সে আমার স্ত্রী। আপনার কুষ্ঠাশ্রমের কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু তাহাকে দিয়া কোন ছোটকাজ করাইবেন না। আশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সে আমার নয়, কিন্তু তাহার সংলগ্ন শৈবালদীঘি আমার। এই গ্রামের মুনাফা প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার টাকা। আপনাকে জানি। কিন্তু আপনার অবর্ত্তমানে পাছে কেহ তাহাকে নিরুপায় মনে করিয়া অমর্য্যাদা করে, এই ভয়ে আশ্রমের জন্যই গ্রামখানি তাহাকে দিলাম। আপনি নিজে একদিন আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন, এই দান পাকা করিয়া লইতে যাহা কিছু প্রয়োজন

করিবেন, সে খরচ আমিই দিব। কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে আমি সহি করিয়া রেজেস্টারী করিয়া দিব।

শ্রীজীবানন্দ চৌধুরী।"

ফকির। (নির্ম্মলের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া) সংসারে কত বিস্ময়ই না আছে!

নির্ম্মল। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ঘাড় নাড়িয়া) হাঁ। কিন্তু এ যে সত্য তার প্রমাণ কি?

ফকির। সত্য না হলে এ দান নেবার জন্যে যোড়শীকে কিছুতেই আনতে পারতাম না।

নির্ম্মল। (ব্যগ্র-কণ্ঠে) কিন্তু তিনি কি এসেচেন? কোথায় আছেন?

ফকির। আছেন আমার কুটীরে, নদীর পরপারে।

নির্ম্মল। আমার যে এখনি একবার যাওয়া চাই ফকিরসাহেব।

ফকির। চলুন। (হাসিয়া) কিন্তু বেলা পড়ে এল, আবার না তাঁকে হাতে ধরে রেখে যেতে হয়।

[উভয়ের প্রস্থান]

[সহসা অন্তরাল হইতে কয়েকজনের সতর্ক চাপা কোলাহলের মধ্য হইতে প্রফুল্লর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা গেল—"সাবধানে! সাবধানে! দেখো যেন ধাক্কা না লাগে!" এবং পরক্ষণেই তাহারা ধরাধরি করিয়া জীবানন্দকে বহিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত। সঙ্গে প্রফুল্ল]

প্রফুল্ল। এখন কেমন মনে হচ্ছে দাদা?

জীবানন্দ। ভালো না। আমি অজ্ঞান হয়ে সাঁকো থেকে কি পড়ে গিয়েছিলাম প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। না দাদা, আমরা ধরে ফেলেছিলাম। কতবার বলেচি এ রুগ্নদেহে এত পরিশ্রম সইবে না, কিন্তু কিছুতেই কান দিলেন না। কি সর্ব্বনাশ করলেন বলুন ত?

জীবানন্দ। (চক্ষু মেলিয়া) সর্ব্বনাশ কোথায় প্রফুল্ল, এই ত আমার পার হবার পাথেয়। এ-ছাড়া এ-জীবনে আর সম্বল ছিল কই?

[দ্রুতবেগে এককড়ি প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একটা কাঁচের শিশি]

এককড়ি। (প্রফুল্লর প্রতি) এখ্খুনি হুজুরকে এটা খাইয়ে দিন। বল্লভ ডাক্তার দৌড়ে আসচে—এলো বলে।

প্রফুল্ল। (শিশি হাতে লইয়া জীবানন্দের কাছে গিয়া) দাদা! এই ওষুধটুকু যে খেতে হবে।

জীবানন্দ। (চক্ষু মুদ্রিত) খেতে হবে? দাও। (ঔষধ পান করিয়া) কোথায় যেন ভয়ানক ব্যথা, প্রফুল্ল, যেন এ ব্যথার আর সীমা নেই। উঃ—

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল-কণ্ঠে) এককড়ি, দেখ না একবার ডাক্তার কত দূরে—যাও না আর একবার ছুটে।

এককড়ি। ছুটেই যাচ্চি বাবু—

[দ্রুতপদে প্রস্থান]

জীবানন্দ। ছুটোছুটিতে আর কি হবে প্রফুল্ল। মনে হচ্চে যেন আজ আর তোমরা ছুটে আমার নাগাল পাবে না।

প্রফুল্ল। (নিকটে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) এমন ত কতবার হয়েচে, কতবার সেরে গেছে দাদা। আজ কেন এ-রকম ভাবচেন?

জীবানন্দ। ভাবচি? না প্রফুল্ল, ভাবিনি। (ঈষৎ হাসিয়া) অসুখ বহুবার হয়েচে এবং বহুবার সেরেচে সে ঠিক প্রফুল্ল। কিন্তু এবার যে আর কিছুতেই সারবে না সেও ত এমনিই ঠিক প্রফুল্ল।

[এককড়ি ও বল্লভ ডাক্তারের প্রবেশ]

প্রফুল্ল। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আসুন ডাক্তারবাবু।

বল্লভ। হুজুরের অসুখ—ছুটতে ছুটতে আসচি। ওষুধটা খাওয়ানো হয়েচে ত?

এককড়ি। হয়েচে ডাক্তারবাবু, তথ্‌খুনি হয়েচে! ওষুধের শিশি হাতে উঠি ত পড়ি করে ছুটে এসেচি।

[বল্লভ কাছে আসিয়া বসিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিল। মাথা নাড়িয়া প্রফুল্লকে ইঙ্গিতে জানাইল যে অবস্থা ভালো ঠেকিতেছে না।]

এককড়ি। (আকুল-কণ্ঠে) কি হবে ডাক্তারবাবু? খুব ভালো জোরালো একটা ওষুধ দিন—আমরা ডবল্‌ ভিজিট দেব, যা চাইবেন দেব—

প্রফুল্ল। যা চাইবেন দেব? শুধু এই? সে আর কতটুকু এককড়ি? আমরা তারও অনেক, অনেক বেশী দেব। আমার নিজের প্রাণের দাম বেশী নয়, কিন্তু সে দেওয়াও ত আজ অতি তুচ্ছ মনে হয় ডাক্তারবাবু।

বল্লভ। (উপরের দিকে মুখ তুলিয়া) সমস্তই ওঁর হাতে প্রফুল্লবাবু, নইলে আমার আর কি! নিমিত্তমাত্র। লোকে শুধু মিথ্যে ভাবে বই ত না যে, চণ্ডীগড়ের বল্লভ ডাক্তার মরা বাঁচাতে পারে! ওষুধের বাক্স সঙ্গেই এনেচি, এ-সব ভুল আমার হয় না। চলুন নন্দীমশাই, শীগ্‌গির একটা মিক্‌চার তৈরী করে দিই।

[এককড়ি ও বল্লভের প্রস্থান]

জীবানন্দ। চোখ বুঁজে শুয়ে কত কি মনে হচ্ছিল প্রফুল্ল। মনে হচ্ছিল, আশ্চর্য্য এই পৃথিবী। নইলে আমার জন্যে চোখের জল ফেলতে তোমাকে পেয়েছিলাম কি করে?

প্রফুল্ল। আপনি ত জানেন—

জীবানন্দ। জানি বই কি প্রফুল্ল। কিন্তু এককড়ি তার কি জানে? সে জানে তারই মত তুমিও শুধু একজন কর্ম্মচারী, এক পাষণ্ড জমিদারের তেমনি অসাধু সঙ্গী। কত যে করেচ, নীরবে কত যে সয়েচ, বাইরের লোকে তার কি খবর রাখে। মাঝে মাঝে যখন অসহ্য হয়েচে দুটো ভাত-ডাল যোগাড়ের ছল করে ত্যাগ করে যেতে চেয়েচ, কিন্তু যেতে আমি দিইনি। আজ ভাবি ভালোই করেছি। সত্যই ছেড়ে চলে যদি যেতে প্রফুল্ল, আজকের দুঃখ রাখবার জায়গা পেতে কোথায়?

প্রফুল্ল। দাদা—

জীবানন্দ। একটুখানি কাগজ-কলম আনো না প্রফুল্ল, তোমার দাদার স্নেহের দান—

প্রফুল্ল। (পদতলে নতজানু হইয়া বসিয়া) স্নেহ আপনার অনেক পেয়েচি দাদা, সেই শুধু আমার সম্বল হয়ে থাক্। আপনি কেবল আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, নিজের পরিশ্রমে যা-কিছু পাই এ জীবনে তার বেশী না লোভ করি।

জীবানন্দ। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) বেশ, তাই হোক প্রফুল্ল। দান করে তোমাকে আমি খাটো করে যাবো না। কিন্তু লোভী তুমি ত কোনদিনই নও!

[বল্লভ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া ঔষধের পাত্র প্রফুল্লর হাতে দিয়া তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।]

প্রফুল্ল। দাদা? এই ওষুধটুকু খান।

[প্রফুল্ল কাছে আসিয়া ঔষধ জীবানন্দের মুখে ঢালিয়া দিয়া নিজের কোঁচার খুঁট দিয়া তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত মুছাইয়া দিল]

জীবানন্দ। কি ভয়ানক অন্ধকার প্রফুল্ল। রাত্রি কত হ'লো ভাই?

প্রফুল্ল। রাত্রি ত এখনো হয়নি দাদা।

জীবানন্দ। হয়নি? তবে আমার দু'চোখে এ নিবিড় আঁধার কিসের প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল। অন্ধকার ত নেই দাদা। এখনো যে সূর্য্যাস্তও হয়নি।

জীবানন্দ। হয়নি? যায়নি সূর্য্য এখনো ডুবে? তবে খোল, খোল আমার সুমুখের জানালা, খুলে দাও প্রফুল্ল, একবার দেখি তাঁকে। যাবার আগে আমার শেষ নমস্কার জানিয়ে যাই।

[প্রফুল্ল সম্মুখের বাতায়ন খুলিয়া দিল এবং কাছে আসিয়া জীবানন্দের
ইঙ্গিত-মত তাঁহার মাথাটি সযত্নে উঁচু করিয়া দিল। অদূরে
বারুইয়ের শীর্ণ জলধারা মন্দবেগে বহিতেছে। পরপারে
সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ। দূরে নীল বনানী আরক্ত
আভায় রঞ্জিত। তটে ধূসর বালুকারাশি
উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।]

জীবানন্দ। (চোখ মেলিয়া কম্পিত দুই হস্ত যুক্ত করিয়া ললাটে স্পর্শ করাইলেন। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) বিশ্বদেব! কে বলে তুমি অচেনা? তুমি চির-রহস্যে ঢাকা? জন্মান্তরের সহস্র পরিচয় যে আজ যাবার দিনে তোমার মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম! (একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া) ভেবেছিলাম হয়ত তোমাকে দেখে ভয় হবে—হয়ত এ-জীবনের শতেক গ্লানি দীর্ঘ কালো ছায়া মেলে আজ মুখ তোমার ঢেকে দেবে, কিন্তু সে ত হতে দাওনি! বন্ধু, এ-জন্মের শেষ নমস্কার তুমি গ্রহণ কর। (শ্রান্তিতে ঢলিয়া পড়িয়া) উঃ—কি ব্যথা!

প্রফুল্ল। (ব্যাকুল-কণ্ঠে) ব্যথা কোথায় দাদা?

জীবানন্দ। কোথায়? মাথায়, বুকে, আমার সর্ব্বাঙ্গে, প্রফুল্ল—উঃ—

[দ্রুতপদে ষোড়শী প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে
এককড়ি ও বল্লভ ডাক্তার]

ষোড়শী। একি কথা এরা সব বলে প্রফুল্ল! (জীবানন্দের পদতলে বসিয়া পড়িল)

ষোড়শী। তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে যে আজ সমস্ত ছেড়ে চলে এসেচি! কিন্তু নিষ্ঠুর—অভিমানে এ কি করলে তুমি!

প্রফুল্ল। দাদা, চেয়ে দেখুন অলকা এসেছেন।

জীবানন্দ। অলকা? এলে তুমি? (ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া) কিন্তু সময় নেই আর।

ষোড়শী। কিন্তু, এই যে সেদিন বললে, তুমি সংসারে বাঁচতে চাও—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত হয়ে। তুমি বাড়ি চাও, ঘর চাও, স্ত্রী চাও, সন্তান চাও—

জীবানন্দ। (মাথা নাড়িয়া) না। আজ ফাঁকি দিয়ে আর কিছুই চাইনে অলকা। চিরদিন কেবল ফাঁকি দিয়ে পেয়ে পেয়েই স্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়েছিল, ভেবেছিলাম এমনিই বুঝি। কিন্তু আজ তার কৈফিয়ৎ দেবার দিন এসেচে। যে সৌভাগ্য এ-জীবনে অর্জ্জন করিনি অলকা, সেই ত ঋণ—সে বোঝা আর যেন আমার না বাড়ে!

[ষোড়শী জীবানন্দের বুকের উপরে মাথা রাখিতে তিনি ধীরে ধীরে তাঁহার অক্ষম হাতখানি ষোড়শীর মাথার 'পরে রাখিলেন]

জীবানন্দ। অভিমান ছিল বই কি একটু। তবু যাবার আগে এই ত তোমাকে পেলাম। এর অধিক পাওয়া সংসারের নিত্য কাজে হয়ত বা কখনো ক্ষুণ্ণ, কখনো বা ম্লান হ'তো, কিন্তু সে ভয় আর রইল না। এ মিলনের আর বিচ্ছেদ নেই, অলকা এই ভালো। এই ভালো।

[ষোড়শী কথা কহিতে পারিল না, দুঃসহ রোদনের বেগে তাহার সমস্ত বক্ষ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল]

জীবানন্দ। উঃ। পৃথিবীতে কি আর হাওয়া নেই প্রফুল্ল ?

প্রফুল্ল। কষ্ট কি খুব বেশী হচ্চে দাদা ? ডাক্তারকে কি একবার ডাকব ?

জীবানন্দ। না না, আর ডাক্তার-বদ্যি নয় প্রফুল্ল, শুধু তুমি আর অলকা। উঃ—কি অন্ধকার ! সূর্য্য কি অস্ত গেল ভাই ?

প্রফুল্ল। এইমাত্র গেল দাদা !

জীবানন্দ। তাই। হাওয়া নেই, আলো নেই; বিশ্বদেব ! এ-জীবনের শেষ দান কি তবে নিঃশেষ করেই নিলে ! উঃ—

ষোড়শী। স্বামী !

প্রফুল্ল। প্রফুল্লকে কি আজ সত্যিই ছুটি দিলে দাদা !

যবনিকা

বৈকুণ্ঠের উইল

বৈকুণ্ঠের উইল

১

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মুদির দোকান যখন অনেক প্রকার ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করিয়াও টিকিয়া গেল, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ, কি করিয়া যে বৈকুণ্ঠ তাল সামলাইল তাহা কেহই জানে না। সেই অবধি দোকানখানি ধীরে ধীরে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছিল।

আবার তেমন দুঃখ-কষ্ট আর যখন রহিল না, অথচ বৈকুণ্ঠ তাহার বড়ছেলে গোকুলকে ইস্কুল ছাড়াইয়া নিজের দোকানে ভর্ত্তি করিয়া দিল, তখন পাড়ার পাঁচজন কম আশ্চর্য্য বোধ করিল না। তাহারা বৈকুণ্ঠের আচরণ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিল, দেখলে বুড়োর ব্যবহার। না হয় ছেলেটির তেমন ধার নাই—এক বছর না হয় কেলাসে উঠতেই পারে নাই; তাই বলে এই কাজ! ওর মা বেঁচে থাকলে কি এরূপ করতে পারত! কই ছাড়িয়ে দিক দেখি ওর ছোটছেলে বিনোদকে! ছোটগিন্নী ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে।

বস্তুতঃ গোকুল ছেলেটি মেধাবী ছিল না। ক্লাসে সে কোনদিনই প্রায় ভাল পড়া বলিতে পারিত না। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, সে মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার বিমাতার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমাতা তাহাকে কোলে টানিয়া, সস্নেহে মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ-স্বরে কহিলেন, গোকুল, বেঁচে থাকতে গেলে এমন শত শত দুঃখ সইতে হয় বাবা! মনের কষ্ট যে ছেলে হাসিমুখে সহ্য ক'রে আবার চেষ্টা করে, সে-ই ত ছেলের মত ছেলে। কেঁদো না বাবা, আবার মন দিয়ে পড়, আসচে বছর পাশ হবে।

ছোটছেলে বিনোদ, লাফাইতে লাফাইতে বাড়ি আসিল। সে দাদার চেয়ে বছর-ছয়েক ছোট, তিন-চার ক্লাস নীচেও পড়ে; কিন্তু সে একেবারে প্রথম হইয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াছে। পুত্রের সুসংবাদ শুনিয়া মা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন এবং পুলকিত-চিত্তে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সন্ধ্যার পর বৈকুণ্ঠ দোকানের কাজ সারিয়া খাতা বগলে ঘরে আসিয়া উভয় পুত্রের বিবরণ শুনিয়া ভালো-মন্দ কিছুই বলিলেন না। ছেলেদের ভার তাহাদের মায়ের উপর দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। হাত-পা ধুইয়া জল খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ধীরে-সুস্থে নিত্যনিয়মিত খাতা দেখিতে বসিয়া গেলেন।

২

আমার মা ভবানী কই গো? বলিয়া লাঠিরগোটা-দুই ঠোকা দিয়া ইস্কুলের ষষ্ঠ শিক্ষক জয়লাল বাঁড়ুয্যে সেইদিন সন্ধ্যাকালেই বৈকুণ্ঠ মজুমদারের বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের গোলদারী দোকানে চাল-ডাল-ঘি-তেল বাবদে অনেক টাকা বাকী ফেলিয়া গৃহিণীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়াছিলেন।

ভবানী সন্ধ্যার কাজকর্ম্ম সারিয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটিকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়াছিলেন। শশব্যস্তে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উপবেশন করিয়াই শুরু করিয়া দিলেন, হাঁ, রত্নগর্ভা বটে মা তুমি! ছেলে পেটে ধরেছিলে বটে। এত ছোকরার মধ্যে তোমার বিনোদ একেবারে ফার্স্ট! একেবারে ডবল প্রমোশন! ওর নম্বর পাওয়া দেখে হেডমাস্টার মশাইয়ের পর্য্যন্ত তাক্ লেগে গেছে। আজ তাঁকেও গালে হাত দিয়ে দাঁড়াতে হয়েচে! আমিও ত মা, এই ছেলে চরিয়েই বুড়ো হলুম; কিন্তু তোমার এই বিনোদ ছেলেটির মত ছেলে কখনও চোখে দেখলুম না। আমি এই বলে যাচ্ছি আজ, ও ছেলে তোমার হাইকোর্টের জজ হবে—হবেই হবে।

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর এই গোকুলো! কিসে আর কিসে! এ ছোঁড়া এত বড় গাধার সর্দ্দার মা, একজামিনের দিন আমিই ত ছিলুম এদের পাহারায়—কত ছেলে টেবিলের নীচে দিব্যি বই খুলে কপি করে দিলে—ওরই ডাইনে বাঁয়ে মল্লিকদের দুই ছেলে বই খুলে লিখতে লাগল—আমি দেখেও দেখলুম না—বরং হতভাগাটাকে চোখ টিপে একটা ইসারা পর্য্যন্ত করে দিলুম, কিন্তু সেই যা বোদা বলদের মত হাত গুটিয়ে বসে রইল, কোন-

দিকে চোখ পর্য্যন্ত ফেরালো না। নইলে আশু মল্লিকের ছেলে পাশ হয়, আর ও হতে পারে না! সত্যিই কি না, ওকেই জিজ্ঞেসা করে দেখ দেখি মা। বলিয়া জয়লাল মাস্টার লাঠিটা তুলিয়া লইয়া সহসা গোকুলের প্রতি একটা খোঁচানোর ভঙ্গী করিয়াই আপাততঃ কোনমতে তাঁর অস্থি-মজ্জাগত ছেলে-ঠ্যাঙানোর প্রবৃত্তিটা শান্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু গোকুল ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে ভবানী দুই বাহু বাড়াইয়া তাঁর এই সপত্নীপুত্রটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। গোকুলের মা নাই। মাকে তাহার মনেও পড়ে না। এই বিমাতার কাছেই সে মানুষ হইয়াছে। আজই ইস্কুল হইতে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন সে তাঁহার কাছে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর তাহাকে তিনি কাছ-ছাড়া করেন নাই এবং এতক্ষণে তাঁহাদের চুপি চুপি এই সকল কথাই হইতেছিল। গোকুলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া স্নেহার্দ্র মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, হাঁ বাবা, আর সব ছেলেরা বই দেখছিল, তুমি শুধু কোনদিকে তাকিয়ে দেখওনি?

গোকুল কিছুই বলিতে পারিল না। নিজের অক্ষমতার ইহাও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে করিয়া সে লজ্জায় একেবারে অধোবদন হইয়া গেল। কিন্তু কথাটা ঘরের মধ্যে বৈকুণ্ঠের কানে যাওয়ায় তিনি হিসাবের খাতা হইতে মুখ তুলিয়া একেবারে কান খাড়া করিয়া রহিলেন।

ভবানী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এ-বছর খুব মন দিয়ে পড়লে আসচে-বছর ও-ও ফার্স্ট হতে পারবে।

বিমাতার এই স্নেহের কণ্ঠস্বর বাঁড়ুয্যেমশাই চিনিতে পারিলেন না। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ তাঁহার কাছে এমনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, কোথাও কোন ক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, সে কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল না। ইহাকে একটা মৌখিক শিষ্টতামাত্র জ্ঞান করিয়া তিনি গোকুলকে আরও তুচ্ছ করিয়া দেখাইবার অভিপ্রায়ে জিহ্বার দ্বারা তালুতে একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিয়া বলিলেন, হায় হায়! গোকলো হবে ফার্স্ট। পূবের সূর্য্য উঠবে পশ্চিমে। যে ফার্স্ট হবে মা, সে ঐ তোমার বাঁ-দিকে শুনচে। বলিয়া তিনি অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিনোদকে নির্দ্দেশ করিয়া হঠাৎ একটুখানি কাষ্ঠহাসির রসান দিয়া বলিলেন, তাই কি ছোঁড়ার লজ্জা-সরম আছে। উল্টে ছেলেদের সঙ্গে কোঁদল করছিল যে, আমি পাশ হয়নি বটে, কিন্তু আমার ছোট ভাই যে সক্কলের প্রথম হয়েচে। তোদের ক'টা ভাই এমন ডবল প্রমোশন পেয়েচে বল্ ত রে! শোন একবার কথা মা! ছোট ফার্স্ট হয়েচে—কোথায় ও লজ্জায় মরে যাবে, না ওর দেমাক্ দেখ!

ভবানী আর থাকিতে পারিলেন না, জোর করিয়া গোকুলকে টানিয়া লইয়া তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। গোকুল লজ্জায় মরিয়া গিয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোকুল তাহার ছোট ভাইটিকে যে কত ভালবাসিত, তাহা তিনি জানিতেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই আরও গুটিকয়েক বাছা বাছা কথা বলিয়া তাঁহার বিনোদকে এই সময় হইতেই যে বাটীতে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া পড়ান উচিত ইহাই জানাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এইসময়ে পাশের ঘরের এক্ ঝলক আলো মাতা-পুত্রের গায়ের উপর আসিয়া পড়ায় তাঁহার মনে যেন একটু খটকা বাজিল। ভবানী যেমন করিয়া এই নির্ব্বোধ সপত্নীপুত্রকে বুকে লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, তাহা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনটি নয় বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। সুতরাং এই তুলনামূলক সমালোচনা সম্প্রতি আর অধিক ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কি না, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে না পারায় তাঁহাকে অন্য কথা পাড়িতে হইল।

ভবানী এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই শুনিতেছিলেন। এখনও বেশী কথা কহিলেন না। অবশেষে রাত্রি হইতেছে বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই বহুপ্রকার আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে বিনোদের জজিয়তি-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বারংবার নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরের মধ্যে বৈকুণ্ঠ ঠিক যেন এই সময়টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। সুমুখে আসিয়া কঠোরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে গোক্‌লো, সবাই বই দেখে লিখে পাশ করে গেল, তুই লিখলি না কেন?

গোকুল ভয়ে কাঁটা হইয়া পূর্ব্ববৎ লুকাইয়া রহিল। অনেক ধমক-টমকের পর সে যাহা কহিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বাহ্নেই হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া চুরি করিয়া দেখা-দেখি করিয়া লিখিতে নিষেধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, কাল থেকে আর তোকে ইস্কুলে যেতে হবে না, আমার সঙ্গে দোকানে যাবি। বলিয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজে মন দিলেন। ইহা একটা মামুলি শাসনমাত্র মনে করিয়া ভবানী তখন কথা কহিলেন না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা বৈকুণ্ঠ যখন সত্যসত্যই গোকুলকে দোকানে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তিনি আগুন হইয়া উঠিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, যে কথা নয়, সেই কথা? দুধের ছেলে যাবে তোমার দোকান করতে? সে হবে না—আমি বেঁচে থাকতে আমার গোকুলকে পড়া ছাড়তে দেব না। এমন রাগ ত দেখিনি! বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে ছেলেকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, বৈকুণ্ঠ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কে রাগ করেচে ছোটবৌ?

গৃহিণী কহিলেন, তুমি। আবার কে?

আমাকে রাগ করতে কখনও দেখেচ?

এ তবে তোমার কি-রকম কথা শুনি? ছেলেবেলা পাশ-ফেল সবাই হয়। তাই বলে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবে?

বৈকুণ্ঠ তখন গোকুলকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, ছোটবৌ, রাগ আমি করিনি। তোমার বড় ছেলেকে আজ বড় আহ্লাদ করেই আমি দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। ছোটছেলে তোমার কখনও জজিয়তি পাবে কিনা, বাঁড়ুয্যেমশায়ের মত সে ভরসা তোমাকে দিতে পারলুম না; কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে গোকুলের ওপর যে তোমরা নির্ভয়ে ভর দিতে পারবে, সে আমি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্চি।

স্বামীর অবিদ্যমানতার কথায় ভবানীর চোখের কোণ একমুহূর্ত্তেই আর্দ্র হইয়া উঠিল। বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু গোকুল যে বড্ড সোজা মানুষ—ও কি তোমার ব্যবসার ঘোর-প্যাঁচ বুঝতে পারবে? ওকে হয়ত সবাই ঠকিয়ে নেবে।

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া কহিলেন, সবাই ঠকাবে না। তবে কেউ কেউ ঠকিয়ে নেবে, সে-কথা সত্যি। তা নিক, কিন্তু ও ত কারুকে ঠকাবে না? তা হলেই হবে। মা-লক্ষ্মী ওর হাতে আপনি এসে ধরা দেবেন।—বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠের নিজের চোখও সজল হইয়া উঠিল। তিনি নিজেও খাঁটি লোক, কিন্তু মূলধনের অভাবে অনেকদিন অনেক কষ্টই ভোগ করিয়াছেন। এখন যদি-বা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে; কিন্তু সময়ও ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে শক্তি-সামর্থ্যও আর নাই। তাড়াতাড়ি চোখের উপর হাতটা বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, গিন্নী, এই বয়সে গোকুল যত বড় লোভ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেচে, সে যে কত শক্ত, তা তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না। যে এ পারে, তার ত ব্যবসার ঘোর-প্যাঁচ চোদ্দ আনা শেষ হয়ে গেছে। শুধু বাকী দুটো আনা আমি তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

কিন্তু লোকে কি বলবে?

লোকের কথা ত জানিনে ছোটবৌ। আমি শুধু আমাদের কথাই জানি। আমি জানি; ওর হাতে তোমাদের সঁপে দিয়ে আমি নির্ভয়ে দু'চক্ষু বুঁজতে পারব।

ভবানী নিজেও কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাঁর শেষ কথায় একটা আসন্ন বিপদের বার্ত্তা অনুভব করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা নিয়ে যাও। বলিয়া নিজে গিয়া গোকুলকে ডাকিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিলেন। তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে দোকানে যাও বাবা। তুমি মানুষ হলেই তবে আমরা দাঁড়াতে পারব।

গোকুল পিতা-মাতার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে বেচারা কাল রাত্রেই বিছানায় শুইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ-বৎসর যেমন করিয়া হোক উত্তীর্ণ হইবেই। ইস্কুল ছাড়িয়া দোকানে যাইতে কোন ছেলেই গৌরব বোধ করে না। কিন্তু কোনদিনই সে মায়ের অবাধ্য নহে। সহপাঠীদের বিদ্রূপের খোঁচা তাহার মনে বাজিতে লাগিল, কিন্তু সে কোন আপত্তি করিল না, নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিল।

৩

দশ বৎসর অতিক্রম হইয়া গিয়াছে, জরাগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ নিজেও মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু গোকুলের সম্বন্ধে সে ভুল করে নাই, তাহা তাঁহার বাড়িটার পানে চাহিলেই বুঝা যায়। গঞ্জের ভিতর সে মুদির দোকান আর নাই। তাহার পরিবর্ত্তে প্রকাণ্ড গোলদারী দোকান। সেখানে লাখো টাকার কারবার চলিতেছে। বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ. পড়ে। বৈকুণ্ঠ নাতি-নাতনীর মুখ দেখিয়া পরম-সুখে মরিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুদিন হইতে ছোটছেলের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত জনশ্রুতিতে তাঁহার অবশিষ্ট দিনগুলা বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন সকালে বৈকুণ্ঠ জীবনের শেষ ডাক শুনিতে পাইলেন। সর্ব্বাঙ্গে কি একপ্রকার নূতন অস্বস্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়া গৃহিণীকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ছোটবৌ, আমার ত সময় হয়েচে, তাই একটু এগিয়ে চললুম। তোমার যতদিন না আসা হয় ততদিন আমার ছেলে দু'টিকে দেখো। তোমার হাতেই তাদের দিয়ে গেলুম।

স্বামীর শীর্ণ হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া ভবানী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, গোকুলকে রেখে তার মা মারা গেলে—আমার কিছুতেই আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। আমি কোন মতেই বিয়ে করতুম না, কিন্তু যখন দেখলুম আমি একা, গোকুলকেই হয়ত বাঁচাতে পারব না, তখনই শুধু বড় কষ্টে, বড় ভয়ে ভয়ে রাজি হয়েছিলুম। ভগবান আমার মনের কথা জানতে

পেয়েছিলেন। তাই এমন স্ত্রী দিলেন যে, কোনদিন কোন দুঃখ পাইনি। শুধু বিনোদ যদি আমার শেষকালটায় এত দুঃখ না দিত, তা হলে কত সুখেই না আজ যেতে পারতুম।—বলিতে বলিতেই তাঁহার ম্লান চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ভবানী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, আমি মরতেও পারচিনে ছোটবৌ, আমার অবর্ত্তমানে আমার এত কষ্টের দোকানটি বিনোদ হাতে পেয়ে দু'দিনে নষ্ট করে ফেলবে। এ শোক আমি পরকালে বসেও সহ্য করতে পারব না। সেখানেও আমার বুকে শেল বাজবে।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুধু কি তাই? তোমার দাঁড়াবার স্থান থাকবে না—আমার গোকুলকে হয়ত ছেলে-মেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে, বলিতে বলিতেই বৈকুণ্ঠ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। এরূপ দুর্ঘটনার কল্পনামাত্রেই তাঁহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভবানী তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখের উপর মুখ আনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো, বিনোদকে তুমি কিছুই দিয়ে যেও না। তোমার গায়ের রক্ত জল-করা জিনিস আমি কারুকে দেব না। দোকান, ঘর, বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তুমি গোকুলকে লিখে দিয়ে যাও। তুমি শান্ত হও—নিশ্চিন্ত হও—আমি নিজে তার সাক্ষী হয়ে থাকব।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেবল এই কথাই দিবারাত্রি ভাবচি ছোটবৌ, আমি ভাগবানকে পর্য্যন্ত মন দিয়ে ডাকতে পারচিনে। কিন্তু তুমি কি এতে মত দিতে পারবে? বলিয়া বৈকুণ্ঠ হতাশ-ভাবে আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল। তিনি মরণোন্মুখ স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে কহিলেন, ওগো, আমি মত দিতে পারব। তোমাকে ছুঁয়ে বলচি, পারব। আমি আর কিছুই চাইনে, শুধু চাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও—সুস্থ হও। এ-সময়ে তোমার মনে যেন কোন ক্ষোভ, কোন ক্লেশ না থাকতে পায়।

বৈকুণ্ঠ আবার কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু বিনোদ?

ভবানী নিমেষমাত্র দেরি না করিয়া কহিলেন, তার কথা তুমি ভেবো না। সে লেখাপড়া শিখেচে—নিজের পথ সে নিজে করে নেবে—আর যত মন্দই হোক—গোকুল তাকে ফেলতে পারবে না—ছোটভাইকে সে দেখবেই।

বৈকুণ্ঠ আর কথা কহিলেন না। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভবানী সেইখানে একভাবে পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া

রহিলেন, নিদারুণ অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার গর্ভের সন্তানকে স্বামী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মন্দ বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন, এ দুঃখ তাঁহার বক্ষে যে কি শূল বিদ্ধ করিল, তাহা তিনি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সে মন্দ হোক, যা হোক, তিনি ত মা? সে ত তাঁহারই সন্তান? সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের অন্ধকার ভবিষ্যৎ চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় এইবার মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু পিছাইয়া পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় কোনদিকে চাহিয়া চোখে পড়িল না। মুমূর্ষু স্বামীর তৃপ্তির জন্য সন্তানের সর্ব্বনাশের পথ যখন নিজেই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন কে তাঁহার মুখ চাহিয়া সে-পথ যাচিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে আসিবে?

সেইদিনই অপরাহ্নকালে উকিল ডাকিয়া রীতিমত উইল লেখা হইয়া গেল। বৈকুণ্ঠ স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বড়ছেলেকে লিখিয়া দিলেন। সাক্ষী হইয়া নাম লিখিতে গিয়া ভবানীর হাত কাঁপিয়া গেল। মাতৃস্নেহ কোথায় অলক্ষ্যে বসিয়া বারংবার তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিল না। স্বামীর পা দুইখানি অন্তরের মধ্যে দৃঢ়-স্থাপিত করিয়া তিনি আঁকা-বাঁকা অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিলেন। বিনোদ কোন কথাই জানিল না। সে তখন কলিকাতার এক অপবিত্র পল্লীতে, ততোধিক অপবিত্র সংসর্গে মদ খাইয়া মাতাল হইয়া রহিল। বাটী হইতে যে দুইজন কর্ম্মচারী তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহারা দুইদিন পর্য্যন্ত তাঁহার বাসায় বৃথা অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। কেহই এ সংবাদ বৈকুণ্ঠকে দিতে সাহস করিল না। তিনিও এ-সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু কিছুই তাঁহার কাছে চাপা রহিল না।

আরও দিন-দুই টালে-বেটালে কাটিয়া আজ সকাল হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। সমস্তদিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি চোখ মেলিলেন। ভবানী শিয়রের কাছে বসিয়াছিলেন, গোকুল পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছিল। বৈকুণ্ঠ ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, বিনোদ বুঝি খবর পেলে না, গোকুল? নইলে সে নিশ্চয় আসত। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণ বহিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই কয়দিনের মধ্যে তিনি বিনোদের নাম একটিবারও মুখে আনেন নাই। সহসা শেষ সময়ে ছেলের নাম স্বামীর মুখে শুনিয়া ধিক্কারে বেদনায় ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

গোকুল পিতার চোখ মুছাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, চোখে তাকে দেখতে পেলুম না, কিন্তু তাকে বলিস্ আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্চি, একদিন সে ভাল হবে। এমন মায়ের পেটে জন্মে কখনো এ ভাবে চিরকাল কাটাতে পারবে না। দেখিস্ বাবা, সেদিন তোর ছোট ভাইকে যেন ফেলিসনে। আর এই তোমার মা রইলেন—অনেক তপস্যায় তবে এমন মা মেলে গোকুল।

গোকুল শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বাবা, আমার মা আমারই রইলেন, কিন্তু বিনোদকে আপনি অর্দ্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যান।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, না গোকুল, আমার অনেক দুঃখের সম্পত্তি—এ নষ্ট হতে দেখলে পরকালে বসেও আমার বুকে শেল বাজবে। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। —বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ছেলের মুখের পানে চাহিয়া, বোধ করি বা মনে মনে তাঁহার শেষ আশীর্ব্বাদ করিয়া চোখ বুজিলেন। গোকুল পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া চুপি চুপি বলিলেন, ছেলেরা রইল ছোটবৌ, আমি এবার চললুম।

আর কথা কহিলেন না। এবং পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। তখন অনেকেই অনেক কথা কহিল। বৈকুণ্ঠ পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু খাটি লোক ছিলেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে বড় হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শত্রু-মিত্র দু-ই তাঁর একটু বেশী পরিমাণে ছিল। মিত্রপক্ষের গুণগান অত্যুক্তিকে ছাড়াইয়া গেল। আবার শত্রুপক্ষেরা নিন্দা করিতেও ত্রুটি করিল না। তাহারা কৃপণ বলিয়া, চশমখোর বলিয়া, বৈকুণ্ঠ মুদীর স্ফীত অঙ্গুলির সহিত কদলী-কাণ্ডের উপমা দিয়া বোধ করি বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। তবে এই একটা অতি তুচ্ছ গুণের কথা তাহারাও অস্বীকার করিল না যে, আর যাহাই হোক লোকটা জোচ্চোর বাটপাড় ছিল না। নিজের ন্যায্য পাওনার বেশী কাহাকেও কোনদিন একটি তামার পয়সাও ফাঁকি দেয় নাই। বস্তুতঃ ব্যবসা-সম্বন্ধে এই বিদ্যাটিই তিনি বিশেষ করিয়া তাঁহার বড়ছেলেকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ বার বার বলিতেন, গোকুল, আমার এই কথাটি কোনদিন ভুলিস্নে বাবা যে, ঠকিয়ে কখনো মহাজনকে মারা যায় না। তাতে শেষ পর্য্যন্ত নিজেকেই মরতে হয়।

নিজের পলিত মস্তকটি দেখাইয়া বলিতেন, এই মাথাটার উপর দিয়ে অনেক ঝড়-বৃষ্টি বয়ে গেছে গোকুল, অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েচি, কিন্তু এর জোরে কখনো কারুর কাছে মাথা হেঁট করিনি। আমার এই মর্য্যাদাটুকু বজায় রাখিস বাবা।

৪

বিনোদ বিষয় পায় নাই, কথাটা প্রকাশ পাইবামাত্র পাড়ার দুই-চারিজন গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলকাতায় খোঁজাখুজি শুরু করিয়া দিল। তখন আর কোন কথাই চাপা রহিল না। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বিনোদের ব্যাপার নাম ধাম পরিচয় দিয়া একেবারে প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অকৃতজ্ঞ গোকুল তাহাদের এই উপকার স্বীকার করিল না। সে রাগের মাথায় একেবারে ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, শালারা সব মিথ্যেবাদী। কেবল হিংসে করে এই সব রটাচ্চে।

অতিবৃদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশাই লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া আসিয়াই একেবারে কাঁদিতে শুরু করিয়া দিলেন। অনেক কষ্টে কান্না থামিলে বলিলেন, গোকুল রে, আমার হারাণ তিনদিন তিনরাত্রি খায়নি, শোয়নি, কেবল কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েচে। পঁচিশ ত্রিশ টাকা খরচ করে তবে সন্ধান পেয়েচে, কোথায় সে ছোঁড়া থাকে। এ-ঠিকানা বার করা আর কি কারো সাধ্য ছিল!

গোকুল তিক্ত-কণ্ঠে জবাব দিল, আমি ত কাউকে টাকা খরচ করতে সাধিনি মশাই!

বাঁড়ুয্যে অবাক্ হইয়া কহিলেন, সে কি গোকুল, আমরা যে তোমাদের আপনার লোক! আর সবাই চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি কৈ?

আচ্ছা, যান যান, আপনারা কাজে যান। বলিয়া গোকুল নিতান্ত অভদ্রভাবে অন্যত্র চলিয়া গেল। একদিন দুইদিন করিয়া কাটিতে লাগিল, অথচ বিনোদ আসে না। শান্তপ্রকৃতি গোকুল একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল।

ভবানীকে দেখিলে যেন চেনা যায় না, এই কয়দিনে তাঁহার এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নীরবে নতমুখে আগামী শ্রাদ্ধের কাজ-কর্ম্ম করেন—ছেলের নাম মুখেও আনেন না।

এই একটা বৎসর বিনোদ যখন তখন নানা ছলে গোকুলের কাছে টাকা আদায় করিত। তাহার স্ত্রী মনোরমা ব্যাপারটা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া স্বামীকে বারংবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সে কান দেয় নাই। এই উল্লেখ আজ সকালে করিবামাত্রই গোকুল আগুন হইয়া কহিল, বিনোদ যখন কারুর বাপের বাড়ির টাকা নষ্ট করবে, তখন যেন তারা কথা কয়।—বলিয়া দ্রুতপদে তাহার বিমাতার ঘরের সুমুখে আসিয়া

উচ্চকণ্ঠে কহিল, অতবড় রাবণ রাজা মেয়েমানুষের পরামর্শে সবংশে ধ্বংস হয়ে গেল, তা আমরা কোন্ ছার! কি যে বাবার কানে কানে ফুস্‌ফুস্ করে উইল করার মন্তর দিলে মা, সবদিকে আমাকে মাটি করে দিলে।

ভবানী আশ্চর্য্য হইয়া মুখ তুলিবামাত্রই সে হাত-পা নাড়িয়া একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া ফেলিল, তোমাকে ভালোমানুষ বলেই জানতুম মা, তুমিও কম নয়। মেয়েমানুষের জাতটিই এমনি! বলিয়া, তাঁহাকে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। একে দোকানদার, তাহাতে মূর্খ,—গোকুলের কথাই এমনি সকলে জানিত। বিশেষতঃ রাগিলে আর তাহার মুখে বাধা-বাঁধন থাকিত না ইহা কাহারো অগোচর ছিল না। কিন্তু তাহার আজকালকার কথাবার্ত্তাগুলো বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছে বলিয়া আত্মীয়-পর সকলেরই মনে হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণবেলায় বাঁড়ুয্যেমশাই দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতেছিল—হঠাৎ গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অপমান করিলেও ত সে বড়লোক। সুতরাং তাহার আগমনে বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। গোকুল তিনখানি নোট ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া ম্লানমুখে, বিনীতকণ্ঠে বলিল, মাস্টারমশাই, হারাণের সেদিনকার খরচটা দিতে এলুম।

থাক্ থাক্, সেজন্যে আর ব্যস্ত কেন দাদা, তোমাদের কতই ত খাচ্চি নিচ্চি। —বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই সে নোট তিনখানি তুলিয়া লইলেন। গোকুলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয়ের প্রান্তে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কই আজও ত বিনোদ এলো না মাস্টারমশাই? হারাণকে সঙ্গে করে আমি একবার আজ যাব।

বাঁড়ুয্যেমশাই তীব্রভাবে সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, এমন কথা মুখেও এনো না ভাই। সে স্থানে যাবে তুমি, আমার হারাণ থাকতে? না না, তা হবে না—আমি কালই তাকে পাঠিয়ে দেব।

গোকুল মাথা নাড়িয়া কহিল, না মাস্টারমশাই, আমি না গেলে হবে না। সে বড় অভিমানী—শুধু উইলের কথা শুনেই অভিমানে আসচে না। আমার মুখ থেকে না শুনলে সে আর কারো কথাই বিশ্বাস করবে না। বাপ-মায়ে আমার কি সর্ব্বনাশই করলে!—বলিয়া গোকুল সহসা আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা দিয়া এবং তাহার এ অবস্থায় কোনমতেই সে-স্থানে যাওয়া হইতে পারে না বলিয়া, কালই হারাণের দ্বারা তাহাকে আনাইয়া দিবেন, বার বার প্রতিজ্ঞা করিলেন। গোকুল নিরুপায় হইয়া আর পাঁচখানি নোট হারাণের খরচের বাবদ ধরিয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিয়া গেল।

৫

জয়লাল মাস্টারকে গোকুল গোপনে আশী টাকা ঘুষ দিয়া আসিয়াছে—কথাটা প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত অনেকেই তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। সে বিনোদের জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, অথচ বিনোদ তাহাকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারাও গ্রাহ্য করে না—এমনধারা একটা আভাসও বাড়িশুদ্ধ সকলের চোখে-মুখে অনুভব করিয়া গোকুল মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ির গাড়ি বোধ করি এই লইয়া দশবার চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। গোকুল তাচ্ছিল্যভরে কোচম্যানকে প্রশ্ন করিল, আর কি কলকাতার গাড়ি নেই যে তোরা ফিরে এলি? যা, যা, তোরা জিরোগে যা।

কোচম্যান বিনীতভাবে কহিল, আরো দু'খানা আছে বটে, কিন্তু ঘোড়া দানা-পানি পায় নি বলেই চলে আসতে হ'লো।

গোকুল এক মিনিটেই সপ্তমে চড়িয়া ধমকাইয়া উঠিল, ছোটবাবু মেঠাই-মণ্ডা খায়কে আস্‌তা হ্যায় কি না, তাই ব্যাটাদের নবাব ঘোড়া একদণ্ড দানা-পানি না পেলেই মরে যাবে! যাও, আভি লে যাও।

কোচম্যান প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রসিক চক্রবর্ত্তী বহুদিনের কর্ম্মচারী। এ-বাটীতে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। সে কহিল, ছোটবাবু এলে গাড়ি ভাড়া করেও আসতে পারবেন। সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন বড়বাবু?

রসিক যে নিকটেই ছিল গোকুল তাহা দেখে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমি ব্যস্ত হব সে হতভাগার জন্যে? তুমি বল কি চক্কোত্তিমশাই?—বাড়িতে মেয়েরা অমন দিবারাত্রি কান্নাকাটি না করলে, আমি তো তাকে বাড়ি ঢুকতেই দিইনে। গোকুল মজুমদার রাগলে বাপের কুপুত্তুর—হ্যাঁ।

রসিকের কিছুই অবিদিত ছিল না। বাটীর মেয়েরা যে বিনোদের অদর্শনে, একটি দিনের জন্যেও চোখের জল ফেলে নাই, তাহা সে জানিত। কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্যে বড় ব্যস্ত। কিন্তু কান দু'টা তাহার গাড়ির চাকার দিকেই পড়িয়া ছিল। ঘণ্টা-দুই পরে সে বহুদূরে একটা

ভারী গাড়ির আওয়াজ পাইয়া রসিক চক্রবর্ত্তীকে শুনাইয়া একটা চাকরকে ডাকিয়া কহিল, ওরে এগিয়ে দেখ্‌ত রে, আমাদের গাড়ি কি না! ঘোড়া দুটোকে হয়রাণ ক'রে মারলে বলে রাগ করে দুটো কথা বললুম, আর বেটারা কি না সত্যি মনে করে গাড়ি নিয়ে ইস্টিশনে ফিরে গেলি! গুণধর ভায়ের জন্য আবার গাড়ি পাঠাতে হবে! সংসার রাগ হবে বলে ত আর ঘোড়া দুটোকে মেরে ফেলা যায় না!

রসিক শুনিতে পাইল, কিন্তু ভালো-মন্দ কোন কথাই কহিল না। অনতিকাল পরে খালি গাড়ি ফিরিয়া আস্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, তবে ত দুঃখে মরে গেলুম! যা, যা, বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে বল্‌ গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্ত্তি! কাল-পরশু এলে যদি তাকে ফটক পার হ'তে দিই ত তখন তোরা বলিস্—হ্যাঁ, সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়। একবার যখন বেঁকে বসেচি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না বলে দিচ্ছি। তুমি মাকে বলে দাও গে চক্কোত্তিমশাই, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে, তবু গোকুল মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এলে কিছু পেত; এখন আর একটি পয়সাও না। বাড়ি ঢুকতেই ত তাকে দেব না।—বলিয়া গোকুল হন্‌ হন্‌ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাহার উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল, তাহা বাটীর মেয়েরা টের পাইল না। দাসী দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক্ খাইয়া ফিরিয়া গেল। দোকানের গোমস্তার উপর অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ্দ প্রস্তুতের ভার ছিল। সে ঘরে আসিয়া কি একটা কথা জিজ্ঞেস করিবামাত্রই গোকুল তড়াক্ করিয়া উঠিয়া কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যাননি যে, রাজা-রাজড়ার মত পণ্ডিত-বিদায় করতে হবে! যাও, যাও, ও-সব আমিরী চাল আমার কাছে খাটবে না।

লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোনরকম অসুখ বোধ হচ্ছে গোকুল?

গোকুল যেমন শুইয়াছিল তেমনিভাবে জবাব দিল, না!

ভবানী বলিলেন, না, তবে যে কিছু খেলিনে, হঠাৎ এমন সময় এসে যে শুয়ে পড়লি?

গোকুল কহিল, পড়লুম।

ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলি যে? কাল সকালেই নিমন্ত্রণ-পত্র না পাঠালে আর সময় হবে না বাবা।

গোকুল ঠিক তেমনি করিয়া জবাব দিল, না হয় নাই হবে?

ভবানী কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ছি গোকুল, এ-সময়ে ও-রকম অধীর হলে ত হবে না। কি হয়েচে আমাকে খুলে বল্—আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল তাহার কম্বলের শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখ পাকাইয়া উঠিয়া বসিল। কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয় সে কোনদিন শিক্ষা করে নাই। কর্কশকণ্ঠে কহিল, তোমার যে মতলব শোনে মা, সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুনত বলে কি আমিও শুনব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হব, কোন জাঁক-জমক করব না।—বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভবানী শান্তস্বরে কহিলেন, ছি বাবা, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে কি এমন করে কথা কইতে আছে!

গোকুল জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, এ-রকম করলে, লোকে কি বলবে বল্ দেখি বাছা! যাদের যেমন সঙ্গতি, তাদের তেমনি কাজ করতে হয়, না করলেই অখ্যাতি রটে।

গোকুল তেমনিভাবে থাকিয়াই কহিল, রটাক্ গে শালারা। আমি কারো ধার ধারিনি যে ভয়ে মরে যাব।

ভবানী বলিলেন, কিন্তু তাঁর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তাঁর মত কাজ না করলে ত তিনি সুখী হবেন না।

ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যথার স্থানে ঘা দিলেন। পিতাকে সে যে কি ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, খরচের কথা কে বলেচে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু যত দিন যাচ্চে ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আসছে। বিনোদ অভিমান করে উদাসীন হয়ে গেল মা, আমি একলা কি করে কি করব?—বলিয়া সে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভবানী নিজেকেও আর সামলাইতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুজড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এ খবর পেয়েচে গোকুল?

গোকুল তৎক্ষণাৎ কহিল, পেয়েচে বই কি মা।

কে তাকে খবর দিলে ?

কে যে তাহাকে বাড়ির এই দুঃসংবাদ দিয়াছে, গোকুল নিজেও তাহা জানিত না। মাস্টার মহাশয়ের পুত্র হারাণের সম্বন্ধে তাহার নিজের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া যেন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া বসিয়াছিল—বিনোদ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই শুধু লজ্জা ও অভিমানেই বাড়ি আসিতেছে না। সে মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, খবর সে পেয়েচে মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায়নি ? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হা হা করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে না ? সে সব জেনেচে মা, সব জেনেচে।

ভবানী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অবশেষে যখন কথা কহিলেন, গোকুল আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিল—মায়ের সেই অশ্রুগদগদ কণ্ঠস্বর আর নেই। কিন্তু তাহাতে উত্তাপও ছিল না। সহজ-কণ্ঠে বলিলেন, গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস্‌নে। মনে কর, আমাদের বংশে আর ছেলেপিলে নেই। যে রাগের বশে মরা বাপ-মায়ের শেষ কাজ করতেও বাড়ি আসে না, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

গোকুল এ অভিযোগের যে কি জবাব দিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু জবাব দিল তাহার স্ত্রী। সে দ্বারের আড়ালে বসিয়া সমস্ত আলোচনাই শুনিতেছিল। সেইখান হইতেই বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, ঠাকুর কি না বুঝেই এমন একটা কাজ করে গেলেন ? তিনি ছিলেন অন্তর্য্যামী। তিন-চারদিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেললেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পারবে না। তুমি যাই, তাই ভাই ভাই কর, আর কেউ হলে—

টানটা আসমাপ্তই রহিল। আর কেহ হইলে কি করিত তাহা খুলিয়া বলা এক্ষেত্রে বড়বৌ বাহুল্য মনে করিল। কিন্তু ভবানী মনে মনে ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে শ্বশুর বর্ত্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোনদিন বলে নাই, এমন কি শাশুড়ীর সামনে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া উঠিল, শোন মা, শোন! ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

প্রত্যুত্তরে বড়বৌ চেঁচাইল না বটে, কিন্তু আরও একটুখানি সরল-কণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, ছাখো, যা বলবে আমাকে বল। থামকা বাপ তুলো না—আমার বাপ তোমার বাপ একই পদার্থ।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু কথা ফুটিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এখন মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, বৌমা, তোমার কথা ক'বার দরকার কি মা! যাও নিজের কাজে যাও।

বৌমা কহিল, কথা আমি কোনদিনই কইনে মা। দাসী-চাকরের মত খাটতে এসেচি, দিবারাত্রি খেটেই মরি! কিন্তু উনি যে খেতে শুতে বসতে—আমার চারটে-পাশ-করা ভাই, আমার পাঁচটা-পাশ-করা ভাই করে নাপিয়ে বেড়ান; কিন্তু ভাই ত বাড়ি এসে মুখ্যু বলে একটা কথাও কোনদিন কয় না। ওঁর নিজের লজ্জা-সরম থাকলে কি আর কথা বলবার দরকার হয়?—বলিয়া সে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া গুম্ গুম্ পায়ে অবস্থাটা জানাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আজ এতদিন পরে ভবানী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি তাঁহার বড় বধূটিকে চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ, ক্ষোভ ও শঙ্কার আর সীমা-পরিসীমা রইল না।

কিন্তু বড়বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দার একপ্রান্ত হইতে—কাহারো শুনিতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় বলিল, যখন তখন শুধু রাশ রাশ টাকা যোগাবার বেলাতেই দাদা। আমার মামাদেরও দু-পাঁচটা পাশ করে বেরুতে দেখচি ত। কিন্তু সাবধান করে দিতে গেলেই তখন বড় তেতো লাগত। তা বাবু, তেতোই লাগুক আর মিষ্টিই লাগুক, নিজের টাকা অমন করে অপব্যয় হতে থাকলে নিজের ছেলেপিলের মুখ চেয়ে আমি কিছু আর চিরকালটা মুখ বুজে থাকতে পারিনে। মুখ্যু দাদা পেয়েচে, যত পেরেচে তত ঠকিয়েচে। ঠকাক্, আমার কি? ওর নিজের ছেলেমেয়েই পথে বসবে।—বলিয়া বড়বৌ সত্য-সত্যই চলিয়া গেল।

গোকুল হাত-পা ছুঁড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। অনুপস্থিত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

কি! আমি মুখ্যু? কোন্ শালা বলে? এ-সব বিষয়-সম্পত্তি করলে কে? আমি, না বেন্দা? আমার চোখে ধূলো দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যাবে—বেন্দার বাপের সাধ্যি আছে? আমি বড়, সে ছোট। সে চারটে পাশ করে থাকে

ত আমি দশটা পাশ করতে পারি, তা জানিস্? আমি মুখ্যু? বাড়ি ঢুকলে দরওয়ান দিয়ে তাকে দূর করে দেব—দেখি, কে তাকে রাখে!

এমনি অসংলগ্ন এবং নিরর্থক কত-কি সে অবিশ্রান্ত চীৎকার করিত লাগিল। ভবানী সেই যে নীরব হইয়াছিলেন, আর কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে পাথরের মত বসিয়া থাকিয়া একসময়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

৬

তখন ঝগড়া হইল বটে, কিন্তু সেই রাত্রেই যে স্ত্রীর সহিত গোকুলের একটা মিটমাট হইতে বাকী রহিল না, সে তাহার পরদিনের ব্যবহারেই বুঝা গেল। হঠাৎ সকাল হইতে সে সমস্ত কাজকর্ম্মে হাঁকডাক করিয়া লাগিয়া গেল এবং আগামী কর্ম্মের দিনটি আসিয়া পড়িতে যে মাত্র তিনটি দিন বাকী রহিয়াছে, সে-কথা বাড়িশুদ্ধ সকলকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া ফিরিতে লাগিল। বাহিরের যে-কেহ বিনোদের নাম উত্থাপন করিলেই, আজ সে কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিল, নিজের বাপ যাকে মৃত্যুকালে ত্যাজ্যপুত্র করে যায়, তার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করবেন না। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যে ভাই ছিল সে মরে গেছে।

তাহার কথা শুনিয়া কেহ চোখ টিপিয়া আর একজনকে ইঙ্গিত করিল, কেহ অলক্ষ্যে ঘাড় নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করিল। অর্থাৎ এই সোজা কথাটি কাহারো অবিদিত রহিল না যে, বিনোদ একেবারেই পথে বসিয়াছে এবং গোকুল যে-কোন কৌশলেই হোক, ষোল-আনাই গ্রাস করিয়াছে। এখন গোপনে অনেকেই বিনোদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, সে আসিয়া এই ভয়ানক জুয়াচরির বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের নিকট সাহায্য পাইতেও পারিবে—এরূপ আভাসও কেহ কেহ দিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ জয়লাল বাঁড়ুয্যে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, মানুষকে যে চিনিতে পারা যায় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ এই গোকুল মজুমদার। শুধু তাঁহার চক্ষেই সে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই। কারণ পাড়ার সমস্ত ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষে যখন একবাক্যে গোকুলকে ন্যায়নিষ্ঠ, ভ্রাতৃবৎসল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছে, তখন তিনিই শুধু চুপ করিয়া হাসিয়াছেন, আর মনে মনে বলিয়াছেন, আরে, সৎমার ছেলে, বৈমাত্র ভাই—তার

ওপর এত টান! বেদে পুরাণে যা কস্মিন্‌কালে কখনো ঘটেনি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে! সুতরাং এতদিন তিনি শুধু মুখ বুজিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। আবশ্যক কি! বেশ জানিতেন একদিন সমস্ত প্রকাশ পাইবেই।

এখন দেখ তোমরা—এই এত ভালো, অত ভালো,—গোকুলের সম্বন্ধে যা আমি বরাবর ভেবে এসেচি, ঠিক তাই কি না!

কিন্তু কি এতদিন তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও কখন জানা ছিল না, তখন সকলকেই নীরবে তাঁহার প্রাজ্ঞতা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের আগুনের মত কথাটা মুখে মুখে প্রচার হইয়া গেল। অথচ গোকুল টের পাইল না যে, বাহিরের বিরুদ্ধ আন্দোলন তাহার বিপক্ষে এত সত্বর এরূপ তীব্র হইয়া উঠিল।

ভবানী চিরদিনই অল্প কথা কহিতেন। তাহাতে কাল রাত্রি হইতে ব্যথার ভারে তাঁহার হৃদয় একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা একসময়ে স্বামীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া এইদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, মার ভাবগতিক দেখচ?

গোকুল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, না! কি হয়েচে মার?

মনোরমা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, হবে আবার কি! সেই যে কাল বলেছিলুম ঠাকুরপোর টাকা নষ্ট করার কথা—সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা ক'ন না। তোমার সঙ্গে কথা-টথা কইচেন ত?

গোকুল শুষ্ক হইয়া কহিল, না, আমার সঙ্গেও না।

মনোরমা ঘাড়টা একটুখানি হেলাইয়া, কণ্ঠস্বর আরও নীচু করিয়া বলিল, দেখলে মজা! যে টাকাগুলো ঠাকুরপো দু'হাতে উড়িয়ে দিলে, সেগুলো থাকলে ত আমাদেরই থাকত। ঠাকুর ত আমাদেরই সব লিখে দিয়ে গেচেন। আমাদের তিনি সর্ব্বনাশ করবেন—আর সে-কথা একটু মুখ থেকে খসালেই রাগ করে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দিতে হবে? এইটে কি ব্যবহার? তুমি ত 'মা' 'মা' করে অজ্ঞান, তুমিই বল না, সত্যি না মিছে?

গোকুলের মুখখানা একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। কোনরকম জবাবই সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রী বোধ করি তাহা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, ঠাকুরপো যাই করুক আর যাই হোক, সে পেটের ছেলে। তুমি সতীন-পো বই নয়। তুমি পেলে সমস্ত বিষয়—এ কি কোন মেয়েমানুষের সহ্য হয়? না না, আমার সব কথা অমন

করে তোমার উড়িয়ে দিলে আর চলবে না। এখন থেকে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে, অমন 'মা' 'মা' করে গলে গেলে সবদিকে মাটি হতে হবে, বলে দিচ্ছি। বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস।

গোকুলের বুকের ভিতরটা অভূতপূর্ব্ব শঙ্কায় গুড়্ গুড়্ করিয়া উঠিল। সে বিবর্ণ মুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী কহিল, আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মনের ভাব যত বুঝি, তোমরা পুরুষমানুষ তা পার না। আমার কথাটা শুনো। বলিয়া সে স্বামীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, কতটা কাজ হইয়াছে অনুমান করিয়া লইয়া বেশ একটু জোর দিয়া বলিল, আর ঠাকুরপোর ত চিরদিন এমনধারা বয়াটেপনা করে বেড়ালে চলবে না। তাকে লেখাপড়া ত তুমি আর কম শেখাওনি। এখন যা হোক একটু চাকরি-বাকরি করে, মাকে নিয়ে, বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবেত তাঁকে। তিনি নিজের মাকে ত সত্যি আর বরাবর আমাদের কাছে ফেলে রাখতে পারবেন না! তা ছাড়া, মাথাগুঁজে দাঁড়াবার যা হোক একটু কুঁড়েকাঁড়াও ত করা চাই। তখন আমরাও যেমন ক্ষমতা সাহায্য করব—লোক যেন না বলতে পারে, অমুক মজুমদার তার বৈমাত্র ভাইকে দেখলে না। বৈমাত্র ভায়ের সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? যারা বলে তারা বলুক আমরা সে-কথা বলতে পারব না। সে বংশ আমাদের নয়।—বলিয়া সে স্বামীকে ভাবিবার অবকাশ দিয়া অনত্র চলিয়া গেল।

গোকুল স্বপ্নাবিষ্টের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সেইখানে বসিয়া কি সব যেন অদ্ভুত আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সব কথা ছাপাইয়া এই একটা কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস, এবং শুধু সেইজন্যই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন। তাহার মনে পড়িল তাহার স্ত্রী মিথ্যা বলে নাই। আজ সারাদিনের মধ্যে মায়ের সহিত তাহার একটা কথাও ত হয় নাই। কার্য্যোপলক্ষে তাহার সুমুখ দিয়া সে দু-তিনবার যাতায়াতও করিয়াছে, কিন্তু তিনি মুখ তুলিয়াও ত চাহেন নাই। মা চিরদিনই অত্যন্ত অল্পভাষিণী জানিয়া, সে সময়টায় গোকুলের কিছুই মনে হয় নাই বটে, কিন্তু এখন সে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক যেন জলের মতই স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। অথচ এই সমস্ত চুপচাপ নীরব বিরুদ্ধতা সহ্য করাও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মার সহিত মুখোমুখি কলহ করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঢুকিয়াই বলিল, এমনধারা মুখ ভার করে কাজ-কর্ম্মের বাড়িতে বসে থাকলে চলবে না মা।

ভবানী বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্রই গোকুল বলিয়া উঠিল, তোমার বৌ ত আর মিছে বলেনি যে, বিনোদ রাশ রাশ টাকা নষ্ট করচে! বাবা তাঁর বিষয় যদি আমাকে দিয়ে যান, তাতে আমার দোষ কি? তুমি তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া কর গে, আমাদের উপর রাগ করতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি।

ভবানী মর্ম্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি কারো ওপরেই রাগ করিনি গোকুল, কারো সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইনে।

যদি চাও না ত ওরকম করে থাকলে চলবে না। বিনোদকে ব'লো সে যেন চাকরি-বাকরি করে। আমার বাড়িতে তার জায়গা হবে না।

সে ত হবেই না গোকুল, এ আর বেশী কথা কি।—বলিয়া ভবানী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঝগড়া করিতে না পাইয়া গোকুল নিরুপায় ক্রোধে বিড় বিড় করিয়া বকিতে-বকিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, আজ স্পষ্ট বলে দিলুম মাকে, বিনোদের এখানে আর থাকা হবে না—চাকরি-বাকরি করে যা ইচ্ছে করুক, আমি কিছু জানিনে।

মনোরমা আহ্লাদে আগাইয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ জিজ্ঞাসা করিল, কি বললেন উনি।

গোকুল অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত জবাব দিল, বলবেন আবার কি! আমি বলাবলির কি ধার ধারি!

বড়বৌ চোখ ঘুরাইয়া কহিল, তবু, তবু?

গোকুল তেমনি করিয়াই কহিল, তবু আর কি? তাঁকে স্বীকার করতে হ'লো যে—না, বিনোদের এ বাড়িতে থাকা চলবে না।

তাহার স্ত্রী গলা আরো খাটো করিয়া কহিল, এ ষোল-আনা রাগের কথা, তা বুঝেচ? মার মন পড়ে রয়েচে নিজের ছেলেটির পানে—এখন তুমি হয়েচ তাঁর দু'চক্ষের বালি।

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আর বুঝিনি? আমার কাছে কি চালাকি চলে? বাহিরে আসিয়াই রসিক চক্রবর্ত্তীকে সুমুখে পাইয়া কহিল, বলি একটা নতুন খবর শুনেচ চক্কোত্তিমশাই? এতকাল এত করে এখন আমিই হয়েচি মার দু'চক্ষের বিষ! কথাবার্ত্তা আর আমাদের সঙ্গে ক'ন না, সুমুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে বসেন।

চক্রবর্ত্তী অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, না, না, বল কি বড়বাবু?

কি বলি?—ওরে ও হাবুর মা, শোন্ শোন্!

বাড়ির বুড়া ঝি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, মনিবের ডাকাডাকিতে কাছে আসিবামাত্র গোকুল চক্রবর্ত্তীর প্রতি চাহিয়া কহিল, একে জিজ্ঞেস করে দেখ।—কি বলিস্ হাবুর মা, মাকে আমার সঙ্গে কথা কইতে আর দেখচিস্? সুমুখে পড়লে বরং মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন ত?

হাবুর মা কিছুই জানিত না। সে মূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে একটু ঘাড় নাড়িয়া মনিবের মন রাখিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সত্যি মিথ্যে শুনলে ত?—বলিয়া চক্রবর্ত্তীর প্রতি একটা ইসারা করিয়া গোকুল অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেদিন পাড়ার যে-কেহ দেখাশুনা করিতে আসিল, তাহারই কাছে সে বিমাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই কথাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আমি সতীন-পো বই ত নয়! কাজেই বাবা মরতে-না-মরতেই দু'চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েচি!

সন্ধ্যার সময় বাড়ির ভিতরে আসিয়া ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার এত দায় পড়ে যায়নি যে, লোকজন পাঠিয়ে বর্দ্ধমান থেকে ছোটপিসীমাদের আনতে যাব। এত গরজ নেই—আসতে হয় তিনি নিজে আসবেন।

ভবানী মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল কাজ হবে গোকুল?

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভালো-মন্দ জানিনে। দু'হাতে টাকা ওড়াবার আমার সাধ্যি নেই। তুমি এ-নিয়ে আমাকে আর জেদ ক'রো না তা বলে দিচ্চি।

ইহাদিগকে আনাইবার জন্য ভবানীই কাল গোকুলকে আদেশ করিয়াছিল। এখন আর কিছু বলিলেন না, চুপ করিয়া হাতের কাজে মন দিলেন। তথাপি গোকুল সুমুখে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আনো বললেই ত আনতে পারিনে মা। ধার-কর্জ্জ করে ত আমি ডুবে যেতে পারব না।

ভবানী অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, বেশ ত গোকুল, ভাল বোঝ—নাই বা সেখানে লোক পাঠালে।

গোকুল বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, এখন থেকে আমাকে বুঝতেই হবে যে! আমার কি আর আপনার মা আছে! আমি ম'লেই বা কার কি—কে আর আমার আছে! এখন নিজেকে নিজে সামলানো চাই। টাকা-কড়ি বুঝে-সুঝে খরচ করা দরকার। নিজের মা ত নেই।—বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তিতে অকস্মাৎ এতবড় আসক্তি দেখিয়া ভবানী নিঃশব্দে নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু গোকুল তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি কি বুঝিনে? এটা তোমার রাগের কথা নয়? কাল নিজে তুমি বললে, গোকুল, তোর পিসীমাদের লোক

পাঠিয়ে আনা, আর আজ বলচ, যা ভাল হয় তাই কর। আমার বাপ নেই, ভাই নেই বলে আমাকে এমনি করে জব্দ করা? লোকে বলবে গোকুল বুঝি সত্যি-সত্যিই তার মায়ের কথা শোনে না।

তাহার এই একান্ত অবোধ্য অভিযোগে ভবানী বিমূঢ় হতবুদ্ধির মত একমুহূর্ত্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, গোকুল, আমি ত তোদের কিছুতেই নেই—কোন কথাই ত বলিনি বাবা।

গোকুল অকস্মাৎ দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া কহিল, তোমার কোন্ হুকুমটা শুনিনে মা, যে তুমি আমাকে এমনি করে বলচ? কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি। বেন্দা লজ্জায় ঘেন্নায় বাড়ি-ছাড়া হয়ে গেল—আমারও যেখানে দু'চক্ষু যায় চলে যাব! থাকো তুমি তোমার বিষয়-আশয় নিয়ে।—বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

৭

গোকুলের বড়মেয়ে হেমাঙ্গিনী তাহার ঠাকুরমার কাছে শুইত। সে ভোর হইতে-না-হইতে চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল, কাকা এসেচে মা, কাকা এসেচে।

পাশের ঘরে গোকুল শুইয়াছিল। সে ধড়মড় করিয়া কম্বলের শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, তাহার স্ত্রী নিরানন্দ-বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিতেছে, কখন্ এল রে তোর কাকা?

মেয়ে কহিল, অনেক রাত্তিরে মা।

মা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি কচ্চে?

মেয়ে কহিল, এখনও ওঠেননি। তিনি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

তাহার মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। গোকুল দরজা হইতে গলা বড়াইয়া হাত নাড়িয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর ঠাকুরমা তাকে কি বললে রে, হিমু?

হিমু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে ত বাবা।

গোকুল তথাপি প্রশ্ন করিল, খুব বকলে বুঝি রে?

হিমু অনিশ্চিতভাবে বার-দুই মাথা নাড়িয়া অবশেষে কি মনে করিয়া বলিল, হুঁ।

গোকুল ব্যগ্র হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কহিল, তোর ঠাকুরমা কি কি সব বললে—বল্ ত মা হিমু।

হিমু বিপদে পড়িল। কাকা যখন আসেন, তখন সে ঘুমাইতেছিল—কিছুই জানিত না। বলিল, জানিনে ত বাবা।

গোকুল বিশ্বাস করিল না। অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, এই যে বললি, জানিস্। মা তোকে মানা করে দিয়েচে, না? আমি কাউকে বলব না রে, তুই বল্ না।

জেরায় পড়িয়া হিমু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। গোকুল তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া উৎসাহ দিয়া কহিল, বল্ ত মা, কি কি কথা হ'লো? মা বুঝি বললে, বেরিয়ে যা তুই বাড়ি থেকে? এই দুটো টাকা নে—পুতুল কিনিস্। বলিয়া সে বালিশের তলা হইতে টাকা লইয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল।

হিমু শুষ্ক হইয়া বলিল, হুঁ বললে।

তার পর? তার পর?

হিমু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, তার পরে ত জানিনে বাবা।

গোকুল পুনরায় তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, জানিস বৈ কি? তোর কাকা কি বললে?

কিছু বললে না।

গোকুল বিশ্বাস করিল না। বিরক্ত ও কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, একেবারে কিছুই বললে না? তা কি হয়?

পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া হিমু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানিনে ত বাবা।

ফের জানিস্‌নে? হারামজাদা মেয়ে? বলিয়া সে চটাস করিয়া মেয়ের গালে চড় কসাইয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হ।

মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গোকুল দ্রুতপদে নীচে নামিয়া তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তা বেশ করেচ। সে বাড়ি ঢুকতে-না-ঢুকতেই নানারকম করে লাগিয়েচ, ভাঙিয়েচ—আমার ওপর যাতে তার মন ভেঙে যায়—এই ত? সে সব কিছু আমার আর শুনতে বাকী নেই। কিন্তু তোমার ছেলেকেও সাবধান করে দিয়ো—আমার সুমুখে না পড়ে, তা বলে দিয়ে যাচ্চি। বলিয়াই তেমনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ভবানী কিছুই

বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বাহিরের নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। সে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক করিয়া হাবুর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল; ও হাবুর মা, বলি, ভায়া যে বাড়ি এসেচেন, শুনেচিস্?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ বাবু, ঘোর রাত্তিরে ছোটবাবু বাড়ি এলেন।

গোকুল কহিল, সে ত জানি রে। তার পরে মায়ে-ব্যাটায় কি কি কথা হলো? আমার নামে বুঝি মা খুব করে লাগালে? বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার টাবার কথা—

ঝি বাধা দিয়া কহিল, না বড়বাবু, মা ত ওঠেননি। যদু তার ব্যাগটা নিয়ে এলে, আমি ছোটবাবুর ঘর খুলে আলো জ্বেলে দিলুম। তিনি সেই যে ঢুকলেন, আর ত বার হন নি।

গোকুল অপ্রত্যয় করিয়া কহিল, কেন ঢাকচিস্ ঝি? আমি যে সব শুনেচি।

গোকুলের কথা শুনিয়া ঝি বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তার পরে হাবুর দিব্যি করিয়া বলিল, অমন কথাটি ব'লো না বড়বাবু। আমি সর্ব্বোক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবাবুর কাজ-কর্ম্ম করে দিলুম। তিনি মাকে ডাকতে নিষেধ করে বললেন, ঝি, আর আমার কিছু দরকার নেই। তুই শুধু আলোটা জ্বেলে দিয়ে শুগে যা। আহা! চোখ-মুখ বসে গিয়ে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

গোকুলের দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল, তা আর হবে না? তুই বলিস্ কি হাবুর মা, বাবা মারা গেলেন, ছোঁড়া একবার চোখের দেখাটা দেখতে পেলে না—একটা পয়সার বিষয়-আশয় পর্য্যন্ত পেলে না—তার মনে মনে যা হচ্চে, তা সে-ই জানে। বাবাকে সে কি ভালই বাসত, তা তোরা সব জানিস্? কি বলিস্ হাবুর মা?—বলিতে বলিতেই গোকুলের চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

হাবুর মা অনেকদিনের দাসী। চোখের জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল আসিল। গাঢ়স্বরে কহিল, তা আর বলতে বড়বাবু! তেনার বাবা-অন্ত প্রাণ ছিল যে। তবে কি না বড় বড় লেখাপড়া করতে করতে মগজটা কেমনধারা যে গরম হয়ে গেল—তাই—

গোকুল হাবুর মাকে একেবারে পাইয়া বসিল। কহিল, তাই বল্ না হাবুর মা। মগজটা গরম হবে না? বিদ্যেটা কি সে কম শিখেচে। অনার গ্রাজুয়েট্! বলি এই হুগলী-চুঁচড়ো-বাবুগঞ্জে ক'টা লোক আমার ভায়ের মত বিদ্যে শিখেচে—কই দেখিয়ে দে দেখি? লাটসাহেব নিজে এসে যে তাকে হাত ধরে বসায়—সে কি একটা হেজি-পেজি মানুষ! তুই ত ঝি, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে কোন ভদ্রলোককে

বল গে দেখি যে, তুই বিনোদবাবুদের বাড়ির দাসী! তোকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে হাজারটা খবর নেবে, তা জানিস্? কিন্তু ঐ যে কথায় বলে, গাঁয়ের যুগী ভিক্ষে পায় না! এখানকার কোন ব্যাটা কি তারে চিনতে পারলে? মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে দেখলি, না রে?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মুখখানি দেখলে চোখে আর জল রাখা যায় না বড়বাবু!

গোকুলের চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয় অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, তুই তাকে মানুষ করেচিস্ হাবুর মা, তুই শুধু তাকে চিনতে পেরেচিস্। আহা! চিরটা কাল তার হেসে-খেলে আমোদ-আহ্লাদ করে লেখাপড়া নিয়েই কেটেচে। কবে এ-সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়েচে বল্ দেখি? আর উইল করে বিষয় দেব না বললেই দেব না! তার বাপের বিষয় নয়? কোন্ শালা আটকায়? কি করেচে সে? চুরি করেচে? ডাকাতি করেচে? খুন করেচে? কোন্ শালা দেখেচে? তবে কেন বিষয় পাবে না বল্ দেখি শুনি? আইন-আদালত নেই। বিনোদ নালিশ করলে আমাকে যে বাবা বলে অর্দ্ধেক বিষয় কড়ায়-গণ্ডায় তাকে চুলচিরে ভাগ করে দিতে হবে, তা জানিস্।

ঝি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হবে বই কি বাবু।

গোকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কহিল, তবে তাই বল্ না! আর এই মা-টি! তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক্ না কেন? তুই কেন উইল করার মতলব দিতে গেলি? এইটে কি তোর মায়ের মত কাজ হ'লো? ধর্ম্ম নেই? তিনি দেখচেন না? নির্দোষকে কষ্ট দিলে—তাঁর কাছে তোকে জবাব দিতে হবে না? আর বিষয়! ভারি বিষয়—আজ বাদে কাল সে যখন হাইকোর্টের জজ হবে—সে ত আর কেউ আটকাতে পারবে না—তখন কি করে রাখবি বিষয়? এ-সব ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হবে না! এখন স-মানে না দিলে তখন অপমান হয়ে দিতে হবে যে!

হাবুর মা খুশী হইয়া উঠিল। সে বিনোদকে মানুষ করিয়াছিল—এই সমস্ত উইল-টুইল তাহার একেবারে ভালই লাগে নাই; কহিল, আচ্ছা বড়বাবু, তুমি তাই কেন ছোটবাবুকে ডেকে বল না যে, তোর বিষয়-আশয় ভাই তুই নে। তুমি দিলে ত আর কারুর না বলবার জো নেই।

কিন্তু এইখানেই ছিল গোকুলের আসল খটকা। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তবে সবাই যে বলে, আমার দেবার সাধ্যি নেই। বাবার উইল ত রদ করতে পারিনে হাবুর মা। আমাদের বড়বৌর মামাতো ভাই একজন মস্ত মোক্তার—সে না-কি

তার বোনকে চিঠি লিখেচে, তা হলে জেল খাটতে হবে। তবে যদি মা রাজি হয়, বড়বৌ রাজি হয় তখন বটে।

হাবুর মা ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

গোকুল মুখ ফিরাইতেই দেখিল হিমু খেলা করিতে যাইতেছে। তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর কাকা উঠেচে রে?

হিমু ঘাড় কাত করিয়া কহিল, হুঁ, উঠেই বসবার ঘরে চলে গেলেন—কারু সঙ্গে কথা কইলেন না।

বাটীর একান্তে পথের ধারের একটা ঘরে বিনোদ বসিত। ঘরখানি ইংরেজি ধরণে সাজানো ছিল—এইখানেই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিত। গোকুল পা টিপিয়া টিপিয়া কাছে গিয়া জাঁনালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বিনোদ চৌকিতে না বসিয়া নীচে মেঝের উপর মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই বসিবার ধরণ দেখিয়াই গোকুলের দুটি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ছোট ভাইয়ের মুখখানি দেখিবার আশায় মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়া শেষে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া আসিল।

চক্রবর্তী কহিল, বড়বাবু, অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দ্দটা—

গোকুল সহসা যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল, এ-সব বিষয়ে আমাকে আর কেন জড়ান চক্কোত্তিমশাই। মা-সরস্বতী ত স্বয়ং এসে পড়েচেন। কে কত পণ্ডিত, কার কত মান-মর্য্যাদা বিনোদের কাছে ত চাপা নেই—তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নাও না কেন? আমি এর মধ্যে আর হাত দেব না, চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্ত্তী কহিল, কিন্তু ছোটবাবু ত এখনো ঘুম থেকে ওঠেননি।

গোকুল ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, ঘুম থেকে! তার কি আহার-নিদ্রে আছে? হাবুর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, যে স্বচক্ষে দেখেচে। বলে, বড়বাবু ছোটবাবুর মুখের পানে চাইলে আর চোখের জল রাখা যায় না—এমনি চেহারা হয়েছে। ভেবে ভেবে সোনার বর্ণ যেন কালিমাড়া হয়ে গেচে।—বলিয়া তাহার বসিবার ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, গিয়ে দেখ গে—সে ঠাণ্ডা মাটির উপর একলাটি চুপ করে বসে আছে। সে দেখলে কার না বুক ফেটে যায়, বল ত চক্কোত্তিমশাই?

চক্রবর্ত্তী দুঃখসূচক কি-একটা কথা অস্ফুটে কহিয়া ফর্দ্দ লইয়া যাইতেছিল, গোকুল তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিল, আচ্ছা, তুমি ত সমস্তই জানো—তাই জিজ্ঞাসা

করি, আমি থাকতে বিনোদকে আর এত কষ্ট দেওয়া কেন? উপোস-তিরেশ কি ওর ওই রোগা দেহতে সহ্য হবে? হয়ত বা অসুখ হয়ে পড়বে। আমি বলি—খাওয়া-শোওয়া ওর যেমন অভ্যাস তেমনি চলুক।

চক্রবর্ত্তী নিরুৎসাহভাবে কহিল, না পারলে—

কথাটা গোকুল শেষ করিতেই দিল না। বলিল, পারবে কি করে, তুমিই বল দেখি? আমাদের এ সব কুলি-মজুরের দেহ—এতে সব সয়। কিন্তু ওর ত তা নয়! পাঁচ-সাতটা পাশ করে যে দেশের মাথার মণি হয়েচে, তার দেহতে আর আমার দেহতে তুমি তুলনা করে বসলে? কে আছিস্ রে ওখানে—ভূতো? যা ত একবার চট করে আমাদের ভট্‌চায্যি মশাইকে ডেকে আন্! না হয় যত টাকা লাগে—শ্রাদ্ধের সময় আমি মূল্য ধরে দেব। তা বলে ত মায়ের পেটের ভাইকে মেরে ফেলতে পারব না। ওকে আমি আলো-চালের হবিষ্যি করিয়ে নিকেশ্ করতে পারব না, এতে তিনি যাই বলুন।

চক্রবর্ত্তী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সায় দিয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা বড়বাবু। তবে কিনা লোকে বলবে—

আর লোকে কি বলবে ব'লে কি নিজের ভাইটাকে মেরে ফেলব? তোমার এ সব কি বুদ্ধি হ'লো, বল ত চক্কোত্তিমশাই? না না, ফর্দ্দ-টর্দ্দ নিয়ে তোমার এখন তাকে জ্বালাতন করবার দরকার নেই। মুখে যা হোক একটু কিছু দিয়ে আগে সে সুস্থ হোক।—বলিয়া গোকুল নিতান্ত অকারণেই সে-বেচারার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

৮

চায়ের বাটীটা বিনোদ ব্রাহ্মণের হাত হইতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু সে-বস্তুটা যে কত গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পাত্রটা যে কাহার বুকের উপর গিয়া কতখানি আঘাত করিল, সে শুধু অন্তর্য্যামীই দেখিলেন।

সমস্ত দিনের মধ্যে বিনোদ অনেকেরই সহিত কিছু-কিছু কথাবার্ত্তা কহিল বটে, কিন্তু বড় ভাইয়ের ছায়া দেখিলেই সে সরিয়া যাইতে লাগিল। অথচ সে ছায়াও

তাহাকে মুহূর্ত্তের অবকাশ দেয় না। বিনোদ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, গোকুল কাজের বঞ্চাটে হঠাৎ সেই দিকেই আসিয়া পড়ে। এমনি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

অপরাহ্নবেলায় বিনোদ বসিবার ঘরে একলা বসিয়াছিল, একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল। অকারণে খানিকটা কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিল, কলিকাতার বাসা ছেড়ে তুমি হাজারিবাগে হঠাৎ চলে গেলে—বাবা মৃত্যুকালে—সে শুনচে বোধ হয়—সে একটা তামাসা আর কি?—বলিয়া গোকুল পুনরায় শুষ্ক হাসির অভিনয় করিয়া কহিল, তা তোমার যেমন কাণ্ড, একটা খবর পর্য্যন্ত দেওয়া নেই। তা যাক, সে-সব হবে এখন—কাজটা চুকে যাক—একটা দানপত্র লিখলেই—বুঝলে না বিনোদ—গোটা-কয়েক টাকা শুধু বাজে-খরচ হয়ে যাবে—বুঝলে না—আর শালার লোক যা এখানকার—জানোই ত সব—বুঝলে না ভাই—তা সে কিছুই না—বাবাও বলে গেলেন বিষয়-আশয় তোমাদের দুই ভায়ের রইল, এ একটা শুধু বুঝলে না—তা যাক—সেজন্য কিছুই আটকাবে না। আর আমারও ত মেজাজের ঠিক নেই ভাই। এই লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুমি রাখ। আবার পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়েছে,—কার কত বিদায়, কে কি দরের লোক, সে তুমি ঠিক করে না দিলে ত আর কেউ পারবে না। কিন্তু আমার ত এমন ফুরসৎ নেই যে দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে দুটো পরামর্শ করি।—বলিয়া গোকুল চাবিটা এবং কাগজখানা কোনমতে সুমুখে ধরিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল। ঘুম ভাঙিয়া অবধি এই কথাগুলাই সে মনে মনে মক্স করিতেছিল। বিনোদ হাত দিয়া সেগুলা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আমাকে এর মধ্যে আপনি জড়াবেন না—এ-সব আমি ছোঁব না।

এক মুহূর্ত্তেই গোকুলের দাঁতের হাসি পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার সারাদিনের জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। কহিল, ছোঁবে না? কেন?

বিনোদ কহিল, আমার আবশ্যক কি? আমি বাইরের লোক, দু'দিনের জন্যে এসেচি—দু'দিন পরেই চলে যাব।

গোকুল কহিল, চলে যাবে?

বিনোদ বলিল, যেতেই ত হবে! তা ছাড়া এ-সব টাকাকড়ির ব্যাপার। আমি দীন-দুঃখী, হিসাব মিলিয়ে দিতে না পারলে চোর বলে তখন আপনিই হয়ত আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট-দুটা একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। তারপর হেঁট হইয়া চাবি এবং কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। পিতৃশ্রাদ্ধে জাঁক-

জমক করিয়া নাম কিনিবার ইচ্ছা তাহার মনের ভিতর হইতে মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

অথচ আজ সকাল হইতেই তাহার উৎসাহ এবং চেঁচামেচির বিরাম ছিল না। সহসা সন্ধ্যার পরেই সে আসিয়া যখন তাহার কম্বলের শয্যাশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

তোমার কি অসুখ করেচে ?

গোকুল উদাসভাবে কহিল, না বেশ আছি।

তবে, অমন করে শুলে যে ?

গোকুল জবাব দিল না। মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা-টথা কিছু হ'লো ?

গোকুল কহিল, না।

তখন বড়বধূ অদূরে মেঝের উপর বসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, ঠাকুরপো কি ব'লে বেড়াচ্ছে শুনেচ ?

গোকুল মৌন হইয়া রহিল। মনোরমা তখন আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, বলে, বাবার ব্যামো-স্যামো কিছুই জানিনে, হাজারিবাগ না কোথায়—কত ফন্দিই জানে তোমার এই ভাইটি !

গোকুল নিরীহভাবে প্রশ্ন করিল, ফন্দি কেন ? তুমি বিশ্বাস কর না ?

মনোরমা বলিল, আমি ? ন্যাকা ? এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও করিনে।

কথাটা গোকুলের অত্যন্ত বিশ্রী লাগিল। তাহার এই অসাধারণ চারটে পাশ-করা কুলপ্রদীপ ভাইটির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু আজ নাকি তাহার বুক-জোড়া ব্যথায় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চুপ করিয়াই রহিল। ঘরে প্রদীপ ছিল বটে, কিন্তু সে আলোক তেমন উজ্জ্বল ছিল না—মনোরমা তাহার স্বামীর মুখের ভাবটা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, খুব সাবধান, খুব সাবধান ! এখন অনেকরকম ফন্দি-ফিকির হতে থাকবে—কিছুতে কান দিয়ো না। বাবাকে জিজ্ঞেসা না করে একটি কাজও করতে যেয়ো না যেন। কাল সকালের গাড়িতেই তিনি এসে পড়বেন—আমি অনেক করে চিঠি লিখে দিয়েচি। যাই বল, বাবা না এলে আমার কিছুতে ভয় ঘুচবে না।

গোকুল উঠিয়া বলিল, তোমার বাবা কি আসবেন ?

আসবেন না? তিনি না এলে এ-সময়ে সামলাবে কে? নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের বাবাই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। কিন্তু তা বলে এমন বিপদে মেয়ে-জামাইকে তিনি ত ফেলে দিতে পারবেন না!

গোকুল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। মনোরমা অত্যন্ত খুশী এবং ততোধিক উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, তোমার দোকান-পত্র যা-কিছু ফেলে দাও বাবার ঘাড়ে। আর কি কাউকে কিছু দেখতে হবে? শুধু বলবে, আমি জানিনে, বাবা জানেন। ব্যস! তখন ঠাকুরপোই বল, আর যেই বল, কারু সাধ্যি হবে না যে তাঁর কাছে দাঁত ফোটাবেন। বুঝলে না।—বলিয়া মনোরমা একান্ত অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষ করিল। ম্লান আলোকে গোকুল তাহা দেখিতে পাইল কি না, বলা যায় না, কিন্তু সে হাঁ-না কোন কথাই কহিল না। তাহার পরেও অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াও মনোরমা যখন আর স্বামীর নিকট হইতে কোন সাড়াই পাইল না, তখন বাতাসটা যে কোন্-মুখো বহিতেছে, তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া সে সে-রাত্রির মত ক্ষান্ত দিল। সকাল বেলা গোকুল অতিশয় ব্যস্তভাবে ভবানীর ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, মা, লোহার সিন্ধুকের চাবিটা কি বিনোদ তোমার কাছে রেখে গেছে?

ভবানী সংক্ষেপে বলিলেন, কই না!

চাবিটা গোকুলের নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু সে মনে মনে অনেক মতলব করিয়াই এই মিথ্যাটা আসিয়া কহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এমন জিনিসটা বিনোদের হাতে দেওয়া সম্বন্ধে মা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু মায়ের সংক্ষিপ্ত উত্তরের মুখে তাহার সমস্ত কৌশলই ভাসিয়া গেল। তখন সে ম্লানমুখে আস্তে আস্তে কহিল, কি জানি, সে-ই কোথায় রাখলে, না আমিই কোথায় ফেললুম!

ভবানী কোন কথাই কহিলেন না। এই ভিড়ের বাড়িতে সিন্ধুকের চাবির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না, এ-সংবাদেও মা যখন কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না এবং তাঁহার একান্ত নির্লিপ্ততা গোকুলের বুকে যে কি শূল বিঁধিল, তাহাও যখন তিনি চোখ তুলিয়া একবার দেখিলেন না, তখন সে যে কি বলিবে, কি করিয়া মাকে সংসার-সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে, তাহার কোন কূলকিনারাই চোখে দেখিতে পাইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, শম্ভু আর দরবারী পিসীমাদের যে আনতে গেল, কই তারাও ত এখনো এসে পড়ল না!

ভবানী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি বলতে পারিনে ত।

গোকুল বলিল, ভাগ্যে লোক পাঠাতে তুমি বলেছিলে মা। এখন না আসেন, তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু আমরা ত দোষ থেকে খালাস হয়ে গেলুম। তুমি যে কতদূর

ভেবে কাজ কর মা, তাই শুধু আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি। তুমি না থাকলে আমাদের—

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুলের মুখের এমন কথাটাতেও তাঁহার গম্ভীর বিষণ্ণ-মুখে সন্তোষ বা আনন্দের লেশমাত্র দীপ্তি প্রকাশ পাইল না। গোকুল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই গোকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে জেলার নূতন ডেপুটি এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিনোদ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

এইসমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের কাছে ছোটভায়ের পরিচয়টা কোন সুযোগে দিয়া ফেলিবার জন্য গোকুল একেবারে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। অথচ বিনোদের সমক্ষে তাহারই চারটে পাশ করার খবর দিবার উপায় ছিল না—সে তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত।

সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হাকিমের সুমুখে আসিয়া একেবারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল এবং একান্ত বিনয়ের সহিত কহিল, এটি আমার ছোটভাই বিনোদ—অনার গ্রাজুয়েট।

বিনোদ ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে বড়ভায়ের মুখের প্রতি চাহিল; কিন্তু গোকুল ভ্রূক্ষেপও করিল না, কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, আমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে আপনি এসেচেন—বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে ইংরেজীতে আলাপ ক'চ্চ না কেন? ওঁরা হাকিম, হুজুর, ওঁদের কি বাংলায় কথা কওয়া সাজে? পাঁচজনে শুনলেই বা তোমাকে বলবে কি?

আশেপাশের ভদ্রলোকেরা মুখ তুলিয়া চাহিল। ডেপুটিবাবু সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অসহ্য লজ্জায় বিনোদের সমস্ত চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে ভালমতেই জানিত। সুতরাং নিরস্ত করিতে না পারিলে দাদা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন, তাহার কোন হিসাব-নিকাশই ছিল না।

একটা কথা শুনুন, বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই হাত ধরিয়া গোকুলকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আমাকে কি এক্ষুণি বাড়ি থেকে তাড়াতে চান? এ-রকম করলে আমি ত একদণ্ডও টিকতে পারিনে।

গোকুল ভীত হইয়া কহিল, কেন? কেন ভাই?

কতদিন বলেচি, আপনার এ অত্যাচার সহ্য করতে পারিনে। তবু কি আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? আমার মতন পাশ-করা লোক গলিতে গলিতে

ঘুরে বেড়াচ্চে যে! বলিয়া বিনোদ ক্ষোভে অভিমানে মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

গোকুল লজ্জায় এতটুকু হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বোধ করি বলিতে বলিতে গেল, এরূপ কর্ম্ম সে আর করিবে না। অথচ আধ ঘণ্টা পরে বিনোদ এবং বোধ করি উপস্থিত অনেকের কানে গেল—গোকুল চীৎকার করিয়া একটা ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ছোটবাবুর অনার গ্রাজুয়েটের সোনার মেডেলটা যেন সকলে হাতে করিয়া, ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া নোংরা করিয়া না ফেলে।

ডেপুটিবাবু একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

৯

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া গোকুলের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাকা চুল, কাঁচা গোঁফ, বেঁটে আঁটসাট গড়ন। অত্যন্ত পাকা লোক। আড়তের ছোঁড়ারা আড়ালে বলিত, বাস্তুঘুঘু। শ্রাদ্ধবাটীতে একমুহূর্ত্তেই তিনি কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন এবং ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পাড়াশুদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিলেন। এই কর্ম্মদক্ষ হিসাবী শ্বশুরকে পাইয়া গোকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আত্মীয়-বান্ধবেরা সবাই শুনিল, মেয়ে-জামাইয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি ব্যবসা হাতে লইবার জন্য দয়া করিয়া আসিয়াছেন।

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে, খাওয়ান-দাওয়ানও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ত্তাবাবু আহ্বান করিয়াছেন। গোকুল সসম্ভ্রমে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুরমশাই—নিমাই রায় বহুমূল্য কার্পেটের আসনে বসিয়া দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিয়াছেন, অদূরে কন্যা মনোরমা মাথার আঁচলটা এমনি একটু টানিয়া দিয়া, সৎ-শাশুড়ীর আসল পরিচয়টা চুপি চুপি পিতৃসকাশে গোচর করিতেছে, এমনি সময়ে গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্বশুরমশাই ক্ষীরের বাটিটা এক-চুমুকে নিঃশেষ করিয়া বাটির কানায় গোঁফটা মুছিয়া লইয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে। বলি হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফস্‌কে গেলে কি আর ফেরানো যায়?

গোকুল হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, আজ্ঞে না।

নিমাই কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু স্নিগ্ধ-গম্ভীর হাস্য করিয়া জামাতাকে কহিলেন, তবে?

এই 'তবে'র উত্তর জামাতা কিন্তু আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই ভূমিকাটি ধীরে ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে লাগিলেন; কহিলেন, বাবাজী, তোমরা ছেলেমানুষ দুটিতে যে কান্নাকাটি করে আমাকে এই তুফানে হাল ধরতে ডেকে আনলে—তা হাল আমি ধরতে পারি, ধরবও; কিন্তু তোমাদের ত ছট্‌ফট্‌ করলে চলবে না বাবা। যেখানে বসতে বলব, যেখানে দাঁড়াতে বলব, ঠিক তেমনি করে থাকা চাই, তবেই ত এই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব। বিনোদ বাবাজী হাজারীবাগে ছিলেন, এই যে সব এলোমেলো কথা যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্চ, এটা কি হচ্চে? এ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হচ্চে, সেটা কি বিবেচনা করতে পারচ না?

পিতার বক্তৃতা শুনিয়া কন্যা আহ্লাদে গদগদ হইয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিতে লাগিল, হচ্ছেই ত বাবা। তাইতে ত তোমাকে আমরা ডেকে এনেচি। আমরা কিছু জানিনে—তুমি যা বলবে, যা করবে, তাই হবে। আমরা জিজ্ঞেসা পর্য্যন্ত করব না, তুমি কি করচ না করচ।

পিতা খুশী হইয়া কহিলেন, এই ত আমি চাই মা! মামলা-মকদ্দমা অতি ভয়ানক জিনিস, শোননি মা, লোকে গাল দেয় 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক'। সেই মামলা এখন তোমাদের ঘরে। আমাদের নাকি বড় পাকা মাথা, তাই সাহস করচি, তোমাদের আমি কিনারায় টেনে তুলে দিয়ে তবে যাব—এতে আমার নিজের যাই হোক। একটি একটি করে তাঁদের গলা টিপে বার করব, তবে আমার নাম বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়।—বলিয়া তিনি মুখের ভাবটা এমনধারাই করিলেন যে, ওয়াটারলুর লড়াই জিতিয়া ওয়েলিংটনের মুখেও বোধ করি অতবড় গর্ব্ব প্রকাশ পায় নাই। গলা বাড়াইয়া দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মনু, এইখানেই আমার হাতে একটু জল দে, মুখটা ধুয়ে ফেলি; আর বাইরে যাব না। আর অমনি একটু বেরিয়ে দেখ মা, কেউ কোথাও কান পেতে-টেতে আছে কিনা। বলা যায় না ত—এ হ'লো শত্রুর পুরী।

মনোরমা যথানির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিল। গোকুল বিহ্বলবিবর্ণ মুখে একবার স্ত্রীর প্রতি, একবার শ্বশুরের প্রতি চাহিতে লাগিল। এতক্ষণ ধরিয়া পিতা-পুত্রীতে যত কথা হইল, তাহার একটা বর্ণও গোকুল বুঝিতে পারিল না। এ কাহাদের কথা, কাহার ঘরে মামলা ঢুকিল, কাহাকে গলা টিপিয়া কে বাহির করিতে চায়, কাহার কি সর্ব্বনাশ হইল—প্রভৃতি ইসারা-ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

নিমাই কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবাজী, একটু স্থির হয়ে বসো—দুটো কথাবার্ত্তা হয়ে যাক।

গোকুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই তোমাদের সুসময়। যা করে নিতে পার বাবা এইবেলা। কিন্তু একটা সর্ব্বনেশে মকদ্দমা যে বাধবে, সেও চোখের উপরই দেখতে পাচ্চি তা বাধুক, আমি তাতে ভয় খাইনে—সে জানে হাটখোলার যদু উকিল আর তারিণী মোক্তার। বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের নাম শুনলে বড় বড় উকিল ব্যারিস্টার কৌঁসুলীর মুখ শুকিয়ে যায়—তা এ তো একফোঁটা ছোঁড়া—না হয় দু'পাত ইংরিজিই পড়েচে।

গোকুল আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, আপনি কার কথা বলচেন? কাদের মকদ্দমা?

এবার অবাক হইবার পালা—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের! প্রশ্ন শুনিয়া তিনি গম্ভীর বিস্ময়ে গোকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া সজোরে বলিয়া উঠিল, দেখলে বাবা, যা বলেচি তাই। জিজ্ঞাসা করচেন কার মোকদ্দমা! তোমার দিব্যি করে বলচি বাবা, এঁর মত সোজা মানুষ আর ভূ-ভারতে নেই। এঁকে যে ঠাকুরপো ঠকিয়ে সর্ব্বস্ব নেবে, সে কি বেশী কথা? তুমি এসেচ, এই যা ভরসা, নইলে সোম-বচ্ছরের মধ্যে দেখতে পেতে বাবা, তোমার নাতি-নাতকুড়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েচে।

নিমাই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। তা যাক, আর সে ভয় নেই—আমি এসে পড়েচি। কিন্তু তোমাদের আড়তের ঐ-সব চক্কোত্তি-ফক্কোত্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্ছে—বরের মাসী কনের পিসী, বুঝলে না মা। ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয় ত আমার নামই নিমাই রায় নয়। লোকের ছায়া দেখলে তার মনের কথা বলতে পারি।—বলিয়াই নিমাই একবার গোকুলের প্রতি, একবার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল, এখ্‌খুনি এখ্‌খুনি! আমি আর জানিনে বাবা, সব জানি! জেনে-শুনেও বোকা হয়ে বসে আছি। তোমার যাকে খুশি রাখো, যাকে খুশি তাড়াও, আমরা কথাটি ক'ব না।

এতক্ষণে গোকুল সমস্তটা বুঝিতে পারিল। তাহার ছোটভাই বিনোদ তাহারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে। অথচ ইহারা যখন তাহার সমস্ত অভিসন্ধিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে, সে শুধু নির্ব্বোধের মত সেই ছোটভাইকে প্রসন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রথমটা তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত নিবিয়া গিয়া, নিদারুণ অন্ধকারে তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধি, তাহার চৈতন্যকে পর্য্যন্ত যেন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার দুই কানের মধ্যে কত লোক যেন ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—বিনোদ তাহার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছে। নিমাই কহিলেন, টাকার দিকে চাইলে হবে না বাবাজী, সাক্ষীদের হাত করা চাই। তাঁদের মুখেই মকদ্দমা। বুঝলে না বাবাজী!

গোকুল মাথা ঝুঁকাইয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, বুঝিল কি না তাহার জবাব দিল না। বোধ করি কথাটা তাহার কানেও যায় নাই।

কিন্তু তাঁহার কন্যার কানে গিয়াছিল। সে ঢালা হুকুমও দিল, অবশ্য কন্যা এবং জামাতা একই পদার্থ এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর কথাতেই কাজ চলিতে পারে বটে; কিন্তু এই সাক্ষীর বাবদে গোপনে টাকা খরচ করিবার অবারিত হুকুমটা জামাতা-বাবাজীর মুখ হইতে ঠিক না পাইয়া রায় মহাশয়ের উৎসাহের প্রাখর্য্যটা যেন ঢিমা পড়িয়া গেল। বলিলেন, আচ্ছা সে-সব পরামর্শ কাল-পরশু একদিন ধীরে সুস্থে হবে এখন। আজ যাও বাবাজী, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জলটল খাও, সারাদিন—

কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গোকুল হঠাৎ উঠিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রায়মহাশয় মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবাজী ত কথাই কইলে না। টাকা ছাড়া কি মামলা-মকদ্দমা করা যায়? রিপক্ষের সাক্ষী ভাঙ্গিয়ে নেওয়া কি শুধু-হাতে হয় রে বাপু! ভয় করলে চলবে কেন?

নিমাই পাকা লোক। মানুষের ছায়া দেখিলে তার মনের ভাব টের পান। সুতরাং গোকুলের এই নিরুদ্যম স্তব্ধতা শুধু যে টাকা খরচের ভয়েই, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের এই ঘোর বিপদের দিনেও ত তিনি আর অভিমান করিয়া দূরে থাকিতে পারেন না। বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার গুরুভার তাঁর মত আপনার লোক ছাড়া কে আর মাথায় লইতে আসিবে?

কাজেই নিজের যতই কেন ক্ষতি হোক না, এমন কি কুণ্ডুদের আড়তের কাজটা গেলেও তাঁর পশ্চাদপদ হইবার জো নাই। লোকে শুনিলে যে গায়ে থুথু দিবে। গোকুল চলিয়া গেলে, এমনি অনেক প্রকারের কথায়, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি তাঁর বিপদগ্রস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

১০

সামান্য কারণেই গোকুলের চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিত। তাহাতে সারারাত্রি জাগিয়া সকালবেলা যখন সে তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই একান্ত রুক্ষ মূর্ত্তি দেখিয়া ভবানী ভীত হইলেন। গোকুল ঘরে পা দিয়া কহিল, ওঃ—সৎমা যে কেমন তা জানা গেল।

একে ত এই কথাটা সে আজকাল পুনঃ পুনঃ কহিতেছে; তাহাতে ও অন্যান্য নানা প্রকারে উত্যক্ত হইয়া ভবানীর নিজের স্বাভাবিক মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহিরের লোক, আত্মীয়-কুটুম্বেরা তখনও নাকি বাটীতে ছিল, তাই তিনি কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, কি হয়েচে ?

গোকুল লাফাইয়া উঠিল। কহিল, হবে কি ? কি করতে পার তোমরা ? বেন্দা নালিশ করে কিছু করতে পারবে না তা বলে দিয়ে যাচ্চি—এদিকে ঈশের মূল আছে। নিমাই রায়—বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়, সোজা লোক নয়, তা জেনে রেখো।

ভবানী ক্রোধ ভুলিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ নালিশ করবে, এ-কথা তোমাকে কে বললে ?

গোকুল কহিল, সবাই বললে। কে না জানে যে, বিনোদ আমার নামে নালিশ করবে ?

ভবানী বলিলেন, কই আমি ত জানিনে।

আচ্ছা, জানো কি না, সে আমরা দেখে নিচ্চি।—বলিয়া গোকুল সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তাহার শ্বশুরের কথাটাই

মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমাদের মত শত্রুদের আমি ত আর বাড়িতে রাখতে পারিনে!

কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুদ্রমূর্ত্তি ভয়ে বিবর্ণ এবং ক্ষুদ্র হইয়া গেল। এবং ব্যাধের আকৃষ্ট ধনুর সম্মুখ হইতে ভয়ার্ত্ত মৃগ যেমন করিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পালায়, গোকুলও ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সুমুখ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। সে যে কি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে তাহা সে জানে, তাই সেদিন সমস্ত দিবা-রাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার সাড়া-শব্দ পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। কুটুম্ব-ভোজনের সময়েও সে উপস্থিত রহিল না। ভবানী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, বড়বাবু জরুরি তাগাদায় বাহির হইয়া গিয়াছেন, কখন আসিবেন কাহাকেও বলিয়া যান নাই। নিমাই রায় কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়া আদর-আপ্যায়ন কাহাকেও কম করিলেন না। বাহিরের নিমন্ত্রিত যে কয়জন আসিয়াছিলেন, বিনোদ তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল।

ঝড়ের পূর্ব্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজন সত্ত্বেও সমস্ত বাড়িটা সেইরূপ অশুভ ভাব ধরিয়া রহিল। বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও, চাকর-দাসীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া আরও দুইদিন কাটিল। যাঁহারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে আসিয়াছিলেন তাঁহারা একে একে বিদায় লইলেন। পিসীমা তাঁহার ছেলে-মেয়ে লইয়া বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়াই সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কাহারো সহিত বাক্যালাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্ব্বাক্ হইয়া গিয়াছেন। গোকুল পলাইয়া বেড়ায়, ভিতরে-বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চারদিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্র-কন্যা ছাড়া এ-বাড়িতে আর যেন কোন মানুষ নাই।

নিমাই রায় তাঁহার কলিকাতার সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেদিন সকালবেলা, বোধ করি বা কুণ্ডদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াই, মেয়ে-জামাইকে কূলে তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আজ সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটিও আসিয়াছিল। আগমনের হেতুটা যদিচ তখনও পরিষ্কার হয় নাই, কিন্তু সে যে তাহার ভগিনী ও ভগ্নিপতিকে শুধু দেখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আসে নাই সেটুকু বুঝা গিয়াছিল। এ-কয়দিন অতিপ্রাজ্ঞ শ্বশুরের সবল উৎসাহের অভাবে গোকুল যেরূপ ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, আজ তাহারও সে ভাব ছিল না। মনোরমার ত কথাই নাই। সকাল হইতে সমস্ত বাড়িটা যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মনোরমার ঘরের মধ্যেই

ইহাদের বৈঠক বসিল; এবং অল্পকালের বাদানুবাদেই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। আজ চক্রবর্ত্তীর তলব হইয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বে সমস্ত কাগজপত্র নিমাই তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একান্ত পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সে বেচারা না পারে সব কথার জবাব দিতে, না পারে ঠিকমত হিসাব বুঝাইতে। ক্রমাগতই সে ধমক খাইতেছিল এবং বাপ-ব্যাটার কড়া জেরার চোটে, সে যে একজন পাকা চোর ইহাই নিজেকে প্রতিপন্ন করিতেছিল।

নিমাই কহিলেন, আমি ছিলাম না, তাই অনেক টাকাই তুমি আমার খেয়েচ, কিন্তু আর না, যাও তোমাকে জবাব দিলুম।

চক্রবর্ত্তীর দু চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; কহিল, বাবু, আমি আজকের চাকর নই, কর্ত্তামশাই আমাকে জানতেন।

গোকুল ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুখ খিঁচাইয়া কহিল, তোমার কর্ত্তামশায়ের মত কি বাবাকে গরু পেয়েচ, হ্যাঁ? আর মায়া বাড়াতে হবে না, সরে পড়।

এই নাবালক শ্যালকের একান্ত অভদ্র তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্ত্তী চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গোকুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাবু, আমার চার মাসের মাইনে—

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে ত আছেই চক্কোত্তিমশাই, আরও যদি—

কথাটা শেষ হইল না। নিমাই ডান হাত প্রসারিত করিয়া গোকুলকে থামাইয়া দিয়া জলদ্‌গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, তুমি থাম না বাবাজী! চক্রবর্ত্তীকে কহিলেন, বাবু উনি নয়, বাবু আমি। আমি যা করব, তাই হবে। মাইনে তুমি পাবে না। তোমাকে যে জেলে দিচ্চিনে, এই তোমার বাপের ভাগ্যি বলে মানো।

চক্রবর্ত্তী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

মনোরমা এতক্ষণ কথা কহিতে না পাইয়া ফুলিতেছিল। সে যাইবামাত্রই মুখখানি গম্ভীর করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কণ্ঠস্বরে আব্‌দার মাখাইয়া দিয়া ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিল, ফের যদি তুমি বাবার কথায় কথা কবে—আমি হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরব, না হয় সবাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।

গোকুল জবাব দিল না, নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে স্বামীর এই একান্ত বাধ্যতায় সুখে গর্ব্বে গলিয়া গিয়া মনোরমা আধ-আধ স্বরে কহিল, আচ্ছা বাবা, আমাদের নন্দদুলালকে কেন দোকানের একটা কাজে লাগিয়ে দাও না?

নিমাই বলিলেন, তাই ত ছোঁড়াটাকে সঙ্গে আনলুম, মা। আমি ত আর বেশী দিন এখানে থাকতে পারব না ; আমাদের নিজেদের চালানি কাজটা তা হলে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কি আসবার জো ছিল মা, বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেচি। তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, রায়মশাই, তুমি না ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে থাকবে। দিবারাত্রি তোমার পথ চেয়ে বসেই আমার দিন যাবে। তাই মনে করচি মা, আমার নন্দদুলালকেই দেখিয়ে শুনিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে যাব। আর যাই হোক, ও আমারই ত ছেলে।

তাই করে যাও বাবা। আমি সেইজন্যেই ত—

হঠাৎ মনোরমা মাথার আঁচল সবেগে টানিয়া দিয়া চুপ করিল। ঘরের সম্মুখে চক্রবর্ত্তী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল বাবু, মা এসেচে—

অকস্মাৎ মা আসিয়াছেন শুনিয়া গোকুল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আজ সাত-আট দিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই। কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী সহজ-কণ্ঠে ডাকিলেন, গোকুল !

গোকুল তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কেন মা ?

ভবানী অন্তরালে থাকিয়াই তেমনই পরিষ্কার-কণ্ঠে কহিলেন, এ-সব পাগলামি করতে তোমাকে কে বললে ? চক্রবর্ত্তীমশাই অনেকদিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বাহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধকরি লোকে এত আশ্চর্য্য হইত না। ভবানী এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর একটা কথা। বেয়াইমশাই দয়া করে এসেচেন—কুটুমের আদরে দু'দিন থাকুন, দেখুন-শুনুন ; কিন্তু দোকানে আমার চুরি হচ্চে কি না হচ্চে, সে চিন্তা করবার তাঁর আবশ্যক নাই। চক্রবর্ত্তীমশাই, আপনি দেরি করবেন না, যান। আমার ইচ্ছে নয়, বাইরের লোক দোকানে ঢুকে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে। গোকুল চাবি দে, উনি যান। বলিয়া কাহারো উত্তরের জন্য তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়া গেলে, নিমাই রায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারি। হুকুম দেবার ঘটাটা একবার দেখলে বাবাজী !

বাবাজী কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিল তাঁহার নিজের পুত্ররত্নটি। সে কহিল, এ ত জানা কথাই বাবা, তুমি থাকলে ত আর চুরি চলবে না ! বলিহারি হুকুমকে !

পিতা সায় দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই বটে! এবং চক্রবর্ত্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে স্যাঙাত, বিদায় হও না! আবার গিন্নীকে ডেকে আনা হয়েচে? নেমকহারাম। জেলে দিলুম না কি না, তাই। দূর হও সুমুখ থেকে। বামুন বলে মনে করেছিলুম—যাক মরুক গে; যা করেচে তা করেচে; না হয় দু-পাঁচ টাকা দিয়ে দেব—কিন্তু আবার! তোমাকে শ্রীঘরে পোরাই কর্ত্তব্য ছিল আমার।

কিন্তু মনোরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কথাটি কহিতে সাহস করিল না। গোকুল সেই যে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া একভাবে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

চক্রবর্ত্তী কাহারও কোন কথার জবাব না দিয়া প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া নম্রস্বরে কহিল, তা হলে খাতাপত্রগুলো আমি নিয়ে চললুম। সিন্দুকের চাবিটা দিন।

গোকুল বিনাবাক্যব্যয়ে কোমর হইতে চাবির তোড়াটা চক্রবর্ত্তীর পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্ত্তী চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, খাতা বগলে পুরিয়া, হাসি চাপিয়া হেলিয়া দুলিয়া প্রস্থান করিল। তাহার এই প্রস্থানের অর্থ যথেষ্ট প্রাঞ্জল। সুতরাং কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই, বদ্দিপাড়ার নিমাই রায়ের কালো মুখের উপর কে যেন সংসারের সমস্ত কালি ঢালিয়া দিয়া গেল।

অতঃপর এই মন্ত্রণাগৃহের মধ্যে যে দৃশ্যটি ঘটিল, তাহা সত্যই অনির্ব্বচনীয়। পিতা ও ভ্রাতার এই অচিন্ত্যনীয় বিকট লাঞ্ছনায় মনোরমা জ্ঞানশূন্যা হইয়া স্বামীর প্রতি উৎকট তিরস্কার, গঞ্জনা, সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা-প্রদর্শন, অনুনয়-বিনয় এবং পরিশেষে মর্ম্মান্তিক বিলাপ করিয়াও যখন তাঁহার মুখ হইতে পিতার স্বপক্ষে একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল।

গোকুল লজ্জায় ক্ষোভে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন, সে আমি কি করে জানব?

নিমাই একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল। একটা মস্ত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়ালুম। ওদিকে শিবতুল্য মনিব আমার কাঁদা-কাটা করচে—আমার কি কোথাও থাকবার জো আছে! তা ছাড়া, দরকার কি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে! কিন্তু মা মনু, ছেলে-পিলের হাত ধরে যদি পথে দাঁড়াও—সে ত দাঁড়াতেই হবে, চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি—তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না যে, বাবা একবার ফিরেও তাকালে না। সে বাবা আমি নই, তা বলে যাচ্চি—তা মেয়েই হও আর জামাতাই হও। বলিয়া তিনি জামাতার প্রতিই একটা

তীব্র বক্র কটাক্ষ করিলেন। কিন্তু সে কটাক্ষ ছেলে ছাড়া আর কাহারও কাজে লাগিল না। তিনি তখন আবার প্রদীপ্ত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এখনো বেঁকে বসিনি বটে, কিন্তু বেঁকলে নিমাই রায় কারু নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধ্য—তা তোমরা দু'জনে একবার ভেবে দেখো। বাবা নন্দলাল, আড়াইটে বেজেচে, সাড়ে-তিনটের গাড়িতে আমি যাব। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—জানো ত তোমার বাপের কথার নড়চড় পৃথিবী উল্‌টে গেলেও হবার জো নেই। বলিয়া সদর্পে ছেলের হাত ধরিয়া মেয়ে-জামাইকে ভাবিবার এক ঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া বাইরে চলিয়া-গেলেন।

কিন্তু কোন কাজই হইল না। একঘণ্টা অতি অল্প সময়—তিনদিন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, অবিশ্রাম মান-অভিমান রাগারাগি এবং কটূক্তি করিয়াও গোকুলের মুখ হইতে দ্বিতীয় কথা বাহির করা গেল না। শ্বশুরের এই অত্যন্ত অপমানে তাহার নিজেরই লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মায়ের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে সে যে কি করিবে, তাহা কোনদিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়াই, সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

১১

নিমাই যখন দেখিল তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন সে ভীষণ হইয়া উঠিল এবং স্পষ্ট শাসাইয়া দিতে বাধ্য হইল যে তাঁহাকে চাকরি ছাড়াইয়া আনার দরুণ ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তিনি বাড়ুয্যেমশাইকে ইতিমধ্যে হাত করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া গোকুলকে নির্ব্বোধ বলিয়া, অন্ধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এমন একটা ভয়ানক ইঙ্গিত করিলেন, যাহাতে বুঝা গেল, নিমাই রায়কে অপমান করিলে সে বিনোদকে গিয়াও সাহায্য করিতে পারে।

গোকুল কাতরকণ্ঠে কহিল, কি করব মাস্টারমশাই, মা যে তাঁকে বাড়িতে রাখতেই চান না। চক্রবর্ত্তীমশাইকে হুকুম দিয়েচেন দোকানে পর্য্যন্ত যেন তিনি না ঢোকেন।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন, কারবার, বিষয়-আশয় তোমার, না তোমার মায়ের, গোকুল? তা ছাড়া, তোমার বিমাতা এখন তোমার শত্রুপক্ষে, সে সংবাদ রেখেচ ত?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে বাঁড়ুয্যেমশাই খুশী হইয়া বলিলেন, তবে পাগলামি করো না ভায়া; রায়মশাইকে বিষয়-আশয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বুঝিয়ে, চুপটি করে বসে বসে শুধু মজা দেখ। আমার কথা ছেড়ে দাও, নইলে অমন পাকা লোক একটা এ তল্লাটে খুঁজলে পাবে না।

গোকুল কহিল, সে ত জানি মাস্টারমশাই। কিন্তু মায়ের অমতে কোন কাজ করতে বাবা যে নিষেধ করে গেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ! মা যে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সে কি তোমার বাবা জেনে গিয়েছিলেন? নিষেধ করলেই তো হ'লো না। নিষেধ শুনতে গিয়ে কি বিষয়টি খোয়াবে? তা বল? গোকুলের তরফে এ-সকল প্রশ্নের জবাব ছিল না; তাই সে ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রায়মশাই নেপথ্যে থাকিয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। এবার সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই দুইজন মহারথীর সমবেত জেরার মুখে গোকুল অকূলে ভাসিয়া গেল। তাহাকে অধোবদন এবং নিরুত্তর দেখিয়া উভয়েই প্রীত হইলেন এবং তাহার এই সুবুদ্ধির জন্য তাহাকে বারংবার প্রশংসা করিলেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সফল-মনোরথ রায়মশাই আজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তিনি সস্নেহে গোকুলের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, আমি আশীর্ব্বাদ করচি গোকুল, তুমি যেমন তোমার যথা-সর্ব্বস্ব আমাদের হাতে সঁপে দিলে—তোমার তেমনি গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত আমরা লাগতে দেব না। কি বল রায়মশাই?

রায়মশাই আনন্দে বিনয়ে গদগদ হইয়া কহিলেন, আপনার আশীর্ব্বাদে সে দেশের পাঁচজন দেখতেই পাবে। কিন্তু শত্রুদের আর আমি এ-বাড়িতে একটি দিনও থাকতে দেব না, তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্চি বাঁড়ুয্যেমশাই। তা তাঁরা আমার বাবাজীর মা-ই হোন, আর ভাই-ই হোন। আর সেই ব্যাটা চক্কোত্তিকে আমি তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ করব। কে আছিস্ রে ওখানে? ব্যাটা বামুনকে ডেকে আন্ দোকান থেকে! বলিয়া রায়মশাই ইহারই মধ্যে ষোল আনা ছাপাইয়া সতর আনার মত একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

গোকুল সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, না না, এখন তাঁকে ডাকবার আবশ্যক নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, গোকুল, এ-সব চক্ষু-লজ্জায় কাজ নয়। তাকে আমরা রাখতে পারব না— কোনমতেই না। তার বড় আস্পর্দ্ধা। আমরা তাকে চাইনে তা বলে দিচ্চি।

প্রত্যুত্তরে গোকুল তেমনি বিনীত-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মা তাঁকে চান। তিনি যাঁকে বাহাল করেচেন তাঁকে ছাড়িয়ে দেবার সাধ্য কারুর নেই। বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যাননি; বলিয়া গোকুল পুনরায় মুখ হেঁট করিল। তাহার এই একান্ত অপ্রত্যাশিত উত্তর, এই শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই কহিলেন, তা হলে সে থাকবে বল?

গোকুল কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। চক্কোত্তিমশায়ের উপর আমার আর কোন হাত নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই ভয়ে বলিলেন, তা হলে রায়মশায়ের কি-রকম হবে?

গোকুল কহিল, উনি বাড়ি যান। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখতে চান না। আর চাকরি ছাড়ায় ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি মাকে জিজ্ঞেসা করে পাঠিয়ে দেব। বলিয়া কাহারও উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া প্রস্থান করিল।

সবাই মনে করিয়াছিল এতবড় অপমানের পর রায়মশাই আর তিলার্দ্ধ অবস্থান করিবেন না। কিন্তু আট-দশদিন কাটিয়া গেল—এই মনে করার বিশেষ কোন মূল্য দেখা গেল না। বোধ করি বা কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমতাবশতঃই তিনি ছোট কথা কানে তুলিলেন না এবং সরেজমিনে উপস্থিত থাকিয়া অহর্নিশি তাহাদের হিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে এক-দিকে গোকুল নিজে যেমন পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে বাটীর মধ্যে ভবানীও তেমনি প্রতি মুহূর্ত্তেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বধূ ও তাহার পিতার পরিত্যক্ত শব্দভেদী বাণ খাইতে-শুইতে-বসিতে তাঁহার দুই কানের মধ্যে দিয়া অবিশ্রাম বুকে বিঁধিতে লাগিল।

সেদিন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, বৌমা, গোকুল কি চায় না যে, আমি বাড়িতে থাকি?

বৌমা জবাব ইচ্ছা করিয়াই দিল না—মাথা হেঁট করিয়া নখের কোণ খুঁটিতে লাগিল।

ভবানী কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিলেন, বেশ, তাই যদি তার ইচ্ছে, সে নিজে এসে স্পষ্ট করে বলে না কেন? এমন করে তোমার ভাইকে দিয়ে, তোমার বাপকে দিয়ে আমাকে দিবারাত্র অপমান করাচ্ছে কেন?

অথচ গোকুল যে ইহার বাষ্পও না জানিতে পারে, এমন কি তাহাকে সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই যে এই ক্ষুদ্রাশয়েরা তাহাদের বিষদন্ত বাহির করিয়া দংশন করিয়া ফিরিতেছিল, এ-কথা ভবানীর একবার মনেও হইল না। কিন্তু বধূ ত আর সে বধূ নাই। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, অপমান কে কাকে করেচে, সে কথা দেশশুদ্ধ লোক জানে। আমার নিজের জিনিস যদি আমি চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমার বাপ-ভাইকে তুলে দিতে যাই, তাতে তোমার বুকে শূল বেঁধে কেন মা? আর একজনের জন্য আর একজনের সর্ব্বনাশ করাটাই কি ভালো?

ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, আমি কার সর্ব্বনাশ করেচি মা?

বধূ কহিল, যাদের করেচ তারাই গাল দিচ্চে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা করব কি! ইঁট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ করলে ত চলে না মা। বলিয়া বধূ চলিয়া গেল।

ভবানী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার সেই গোকুল এবং সেই গোকুলের স্ত্রীর কথা মনে করিয়া, অনেকদিন পরে আজ আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজ আর কোন মতেই মন হইতে এ অনুশোচনা দূর করিতে পারিলেন না যে, নির্ব্বোধ তিনি শুধু নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করেন নাই, ছেলের পায়েও করিয়াছেন। অমন করিয়া যাচিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য গোকুলকে লিখাইয়া না দিলে ত এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। বিনোদ যত মন্দই হোক, কিছুতেই সে জননীকে এমন করিয়া অপমান ও নির্য্যাতন করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদ যে গোপনে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছিল তাহা কেহ জানিত না। সে আদালতে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া লইয়া এবং শহরের একপ্রান্তে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া, সন্ধ্যার পর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাল সকালেই সে তাহার নূতন বাসায় যাইবে।

ভবানী আগ্রহে বসিয়া বলিলেন, বিনোদ, আমাকেও নিয়ে চল্‌ বাবা, এ অপমান আমি আর সইতে পারিনে। তুই যেমন করে রাখবি, আমি তেমনি করে থাকব; কিন্তু এ-বাড়ি থেকে আমাকে মুক্ত করে দে। বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তার পর একটি একটি করিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া লইয়া বিনোদ বাহিরে যাইতেছিল, পথে গোকুলের সহিত দেখা হইল। সে দোকানের কাজকর্ম্ম সারিয়া ঘরে আসিতেছিল। অন্যদিন এ অবস্থায় বিনোদ দূর হইতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া

যাইত, আজ দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ কাছে আসিয়া কহিল, কাল সকালেই মাকে নিয়ে আমি নূতন বাসায় যাব।

গোকুল অবাক্ হইয়া কহিল, নূতন বাসায়? আমাকে না জিজ্ঞাসা করেই বাসা করা হয়েচে না কি?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

এম. এ. পড়া তাহলে ছাড়লে বল?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

সংবাদটা গোকুলকে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনোদ তাহা দেখিতে পাইল না। ছোট ভাইয়ের এই এম. এ. পাশের স্বপ্ন সে শিশু-কাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে। পরিচিতের মধ্যে যেখানে যে-কেহ কোন-একটা পাশ করিয়াছে—খবর পাইলেই গোকুল উপযাচক হইয়া সেখানে গিয়া হাজির হইত এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া শেষে এম. এ. পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার জন্য অত্যন্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। ব্যাপারটা যাহারা জানিত, তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিত। যাহারা জানিত না, তাহারা উদ্বেগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেই 'আমার ছোটভাই বিনোদের অনার গ্রাজুয়েটে'র কথাটা উঠিয়া পড়িত। তখন কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া বিনোদের সোনার মেডেলটাও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু কি করিয়া যে মখমলের বাক্সশুদ্ধ জিনিসটা গোকুলের পকেটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হেতুই সে স্মরণ করিতে পারিত না। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল, স্যাক্‌রা ডাকাইয়া এই দুর্ল্লভ বস্তুটি সে নিজের ঘড়ির চেনের সঙ্গে জুড়িয়া লয় এবং এতদিন তাহা সমাধা হইয়াও যাইত—যদি না বিনোদ ভয় দেখাইত—এরূপ পাগলামি করিলে সে সমস্ত টান মারিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবে। গোকুল উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, এম. এ.-র মেডেলটা না-জানি কিরূপ দেখিতে হইবে এবং এ-বস্তু ঘরে আসিলে কোথায় কিভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

এ-হেন এম. এ. পাশের পড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল শুনিয়া গোকুলের বুকে তপ্ত শেল বিঁধিল। কিন্তু আজ সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, তা বেশ, কিন্তু মাকে নূতন বাসায় নিয়ে খাওয়াবে কি শুনি?

সে দেখা যাবে। বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল। সে নিজেও মায়ের মত অল্প-ভাষী; যে-সকল কথা সে এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই দাদার কাছে প্রকাশ করিল না।

গোকুল বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই, হাবুর মা সংবাদ দিল, মা একবার ডেকেছিলেন। গোকুল সোজা মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি এমন সন্ধ্যার সময়েও নির্জ্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া আছেন। ভবানী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, গোকুল, কাল সকালেই আমি এ-বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

সে এইমাত্র বিনোদের কাছে শুনিয়া মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমায় পায়ে ত আমরা কেউ দড়ি দিয়ে রাখিনি মা। যেখানে খুশি যাও, আমাদের তাতে কি? গেলেই বাঁচি। বলিয়া গোকুল মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলায় ভবানী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, হাবুর মা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। গোকুল উঠানের উপর দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, হাবুর মা, আজ ওঁর যাওয়া হতে পারে না, বলে দে।

হাবুর মা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বড়বাবু?

গোকুল কহিল, আজ দশমী না? ছেলে-পিলে নিয়ে ঘর করি, আজ গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়। আজ আমি কিছুতেই বাড়ি থেকে যেতে দিতে পারব না, বলে দে। ইচ্ছা হয় কাল যাবেন—আমি গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েচি। বলিয়া গোকুল দ্রুত-পদে প্রস্থান করিতেছিল, মনোরমা হাত নাড়িয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তর্জ্জন করিয়া কহিল, যাচ্ছিলেন, আটকাতে গেলে কেন?

এ-কয়দিন স্ত্রীর সহিত গোকুলের বেশ বনিবনাও হইতেছিল। আজ সে অকস্মাৎ মুখ ভ্যাঙচাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আটকালুম আমার খুশি। বাড়ির গিন্নি, অদিনে, অক্ষণে বাড়ি থেকে গেলে ছেলে-পিলেগুলো পট্‌ পট্‌ করে মরে যাবে না? বলিয়া তেমনি দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেল।

রকম ভাখো! বলিয়া মনোরমা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল।

১২

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল, মাকে পাঠাইবার মত তিথি-নক্ষত্র গোকুলের চোখে পড়িল না। ত্রয়োদশীর দিন বাটীর পুরোহিত নিজে আসিয়া সুদিনের সংবাদ দিবামাত্র গোকুল অকারণে গরম হইয়া কহিল, তুমি যার খাবে, তারই সর্ব্বনাশ করবে? যাও, নিজের কাজে যাও, আমি মাকে কোথাও যেতে দিতে পারব না।

মনোরমা সেদিন ধমক খাইয়া অবধি নিজে কিছু বলিত না, আজ সে তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দিল।

নিমাই আসিয়া কহিল, এটা ত ভাল কাজ হচ্চে না বাবাজী!

গোকুল কোনদিন খবরের কাগজ পড়ে না, কিন্তু আজ পড়িতে বসিয়াছিল।

কহিল, কোন্‌টা?

বেয়ানঠাকরুণ তাঁর নিজের ছেলের বাসায় যখন স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাচ্ছেন, তখন আমাদের বাধা দেওয়া ত উচিত হয় না।

গোকুল পড়িতে পড়িতে কহিল, পাড়ার লোক শুনলে আমার অখ্যাতি করবে।

নিমাই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, অখ্যাতি করবার আমি ত কোন কারণ দেখতে পাইনে।

গোকুল শ্বশুরকে এতদিন মান্য করিয়াই কথা কহিত। আজ হঠাৎ আগুন হইয়া কহিল, আপনার দেখবার ত কোন প্রয়োজন দেখিনে! আমার মাকে আমি কারু কাছে পাঠাব না—বাস্, সাফ্ কথা। যে যা পারে আমার করুক।

গোকুলের এই সাফ্ কথাটা বিনোদের কানে-গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। প্রত্যহ বাধা দিয়া গাড়ি ফেরত দেওয়ায় সে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। আজ অত্যন্ত রাগিয়া আসিয়া কহিল, দাদা, মাকে আমি আজ নিয়ে যাব। আপনি অনর্থক বাধা দেবেন না।

গোকুল সংবাদপত্রে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া কহিল, আজকে ত হতে পারবে না।

বিনোদ কহিল, খুব পারবে। আমি এখনি নিয়ে যাচ্ছি।

তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোকুল হাতের কাগজটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যাচ্ছি বললেই কি হবে? বাবা মরবার সময় মাকে আমায় দিয়ে গেছেন—তোমাকে দেননি। আমি কোথাও পাঠাব না।

বিনোদ কহিল, সে ভার যদি আপনি বাস্তবিক নিতেন দাদা, তা হলে এমন করে মাকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা অপমান ভোগ করতে হ'তো না। মা, বেরিয়ে এসো, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বলিয়া বিনোদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই ভবানী বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা গোকুল জানিত না। তাঁহাকে সোজা গিয়া গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া গোকুল আড়ষ্ট হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পিছনে পিছনে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, এমন জোর করে চলে গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না তা বলে দিচ্চি মা।

ভবানী জবাব দিলেন না; বিনোদ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ করিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিতেই গোকুল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নই? আমাকে কি তোমায় মানুষ করতে হয়নি?

গাড়ির চাকার শব্দে সে-কথা ভবানীর কানে গেল না, কিন্তু বিনোদের কানে গেল। সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গোকুল কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং ভিতরে ঢুকিয়া সে বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার এই ব্যবহার অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া নিমাই কিছু উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন, কিন্তু খানিক পরে সে যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইল এবং যথা-সময়ে স্নানাহার করিয়া দোকানে চলিয়া গেল, তখন তাহার চোখে-মুখে এবং আচরণে বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং নির্ব্বিঘ্ন হইয়া তিনি এইবার নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ সাপ যেমন করিয়া তাহার শিকার ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ঠিক তেমনি করিয়া তিনি জামাতাকে মহা-আনন্দে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষণও বেশ অনুকূল বলিয়াই মনে হইল। গোকুল পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অত্যন্ত উগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করিত; কিন্তু যেদিন ভবানী চলিয়া গেলেন, সেইদিন হইতে সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেল। কাহারও কোন কথায় রাগও করিত না, প্রতিবাদও করিত না। ইহাতে নিমাই যত পুলকিতই হউন তাঁহার কন্যা খুশী হইতে পারিল না। গোকুলকে সে চিনিত। সে যখন দেখিল, স্বামী খাওয়া-দাওয়া লইয়া হাঙ্গামা করে না, যা পায় নীরবে খাইয়া উঠিয়া যায়, তখন সে ভয় পাইল। এই জিনিসটাতেই গোকুলের ছেলেবেলা হইতেই একটু বিশেষ সখ ছিল। খাইতে এবং খাওয়াইতেই সে ভালবাসিত। প্রতি রবিবারেই সে বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এ রবিবারে তাহার কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া মনোরমা প্রশ্ন করিল।

গোকুল উদাসভাবে জবাব দিল, সে-সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে—রেঁধে খাওয়াবে কে? মনোরমা অভিমানভরে কহিল, রাঁধতে কি শুধু মা-ই শিখেছিলেন—আমরা শিখিনি? গোকুল কহিল, সে তোমার বাপ ভাইকে খাইয়ো, আমার দরকার নেই।

মনোরমার মা কালীঘাটের ফেরত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৎ-শাশুড়ী রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মেয়ের ভাঙা সংসার গুছান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি দুই-চারিদিন থাকিয়া যাইতেই মনস্থ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিকল সংসার মেরামত হইয়া আবার সুন্দর চলিতে লাগিল, এবং কর্ণধার হইয়া দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাড়ার লোকেরা প্রথমে কথাটা লইয়া আন্দোলন করিল, কিন্তু কলিকালের স্বধর্ম্মে দুই-চারিদিনেই নিরস্ত হইল।

হাবুর মার ঘর এই পথে। সে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইত। তার মুখে ভবানী গোকুলের নূতন সংসারের কাহিনী শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভালো-মন্দ কোন কথা কহিলেন না।

সেদিন আসিবার সময় সেই যে গোকুল গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্ত সম্বন্ধের এই শেষ, তখন নিজের অভিমানের কথাটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু একমাসকাল যখন কাটিয়া গেল, গোকুল তাঁহার সংবাদ লইল না, তখন তিনি মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। সে যে সত্যসত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, ছোটভাইকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে, এত কাণ্ড, এত রাগারাগির পরেও সে-কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ হাবুর মার মুখে ঘরের মধ্যে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার বার্ত্তা পাইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন।

নূতন বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন মাত্র বিনোদ সংযত ছিল, তার পরেই সে স্বরূপ প্রকাশ করিল। মায়ের কোন তত্ত্বই প্রায় সে লইত না; রাত্রে বাড়িতে থাকিত না; সকালে যখন ঘরে আসিত, তখন দুঃখে লজ্জায় ভবানী তাহার প্রতি চাহিতে পারিতেন না।

এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, সে চাকরি করে। কিন্তু কি চাকরি, কত মাহিনা, কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এখন এইটাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, আর যাই হোক, তিনি ছেলেকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত হইয়া অন্যায় করেন

নাই; কারণ গোকুল স্ত্রী-শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রভাবে তাঁহাদের প্রতি যত অন্যায়ই করুক, সে স্বামীর এত দুঃখের দোকানটি অন্ততঃ বজায় করিয়া রাখিবে, স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করিয়া তিনি এ চিন্তাতেও কতকটা সুখ পাইতেন। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল।

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। প্রতি বৎসর এইদিনে ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। কিন্তু এবার নিজের কাছে টাকা না থাকায় এবং কথা-প্রসঙ্গে বিনোদকে বার-দুই জানাইয়াও তাহার কাছে সাড়া না পাওয়ায় এ-বৎসর ভবানী সে সঙ্কল্পই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সহসা অতি প্রত্যূষে ভয়ানক ডাকাডাকি; হাবুর মা সদর দরজা খুলিয়া দিতেই গোকুল ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার অনেক লোক, ঘি, ময়দা, বহুপ্রকার মিষ্টান্ন, ঝুড়িভরা পাকা আম। ঢুকিয়াই কহিল, আমাদের পাড়ার সমস্ত বামুনদের নেমন্তন্ন করে এসেচি—সে বাঁদরটার পিত্যেশে ত আর ফেলে রাখতে পারিনে। মা কই? এখনো ওঠেননি বুঝি? যাই, কাজকর্ম্ম করবার লোকজন গিয়ে পাঠিয়ে দিই গে। যেমন মা—তেমনি ব্যাটা, কারো চাড়ই নেই, যেন আমারই বড় মাথাব্যথা! মাকে খবর দি গে হাবুর মা, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসচি। বলিয়া গোকুল যেমন ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভবানী অনেকক্ষণ উঠিয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। গোকুল চলিয়া যাইবামাত্র অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা আসিয়া তাঁহার দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া গেল। সেদিন ছিল রবিবার। 'শনিবারের রাত্রি' করিয়া অনেক বেলায় বিনোদ বাড়ি ঢুকিয়া অবাক্ হইয়া গেল! হাবুর মার কাছে সমস্ত অবগত হইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিয়ে এর মধ্যে না এনে আমাকে জানালেই ত হ'তো। আমার যে এতে অপমান হয়।

ভবানী সমস্ত বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন।

গোকুল ফিরিয়া আসিয়া বিনোদকে দেখিয়াও দেখিল না। কাজকর্ম্মের তদারক করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মণভোজন সমাধা হইয়া গেলে, কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে সকলের মধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ব'সো।

আজ তিনিও গোকুলের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাহারই টাকায় পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া সেদিনের অপমানের শোধ তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মজুমদারদের অনেক অন্নই নাকি তিনি হজম করিয়াছিলেন, তাই নিমাই

রায়ের দরুণ সেদিনের লাঞ্ছনাটা তাঁহাকেই বেশী বাজিয়াছিল। সর্ব্বসমক্ষে বিনোদকে উদ্দেশ করিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, বলি ভায়া, দাদার আজকের চালটা টের পেয়েচ ত ?

কথার ধরণে গোকুল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

বিনোদ সংক্ষেপে কহিল, না।

বাঁড়ুয্যেমশাই মৃদু-গম্ভীর হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই দেখচি মকদ্দমা জিতেচ! বি. এ., এম. এ. পাশ করলে ভাই, আর এটা ঠাওর হ'লো না যে, মাকে হাত করাটাই হচ্চে যে আজকের চাল। তাঁর ওপরেই যে মকদ্দমা!

গোকুল চোখ-মুখ কালিবর্ণ করিয়া—কখ্খনো না মাস্টারমশাই, কখ্খনো না! বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান করিল।

বাঁড়ুয্যেমশাই চেঁচাইয়া বলিলেন, এখানে ঢুকতে দিয়ো না ভায়া, সর্ব্বনাশ করে তোমার ছাড়বে।

এ কথাটাও গোকুলের কানে পৌঁছিল।

বিনোদ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। দাদাকে সে যে না চিনিত, তাহা নয়। একটা উদ্দেশ্য লইয়া আর একটা কাজ করা যে তাহার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব, তাহাও সে জানিত। তাই বাঁড়ুয্যের কথাগুলো যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল তাহা নয়, এত লোকের সমক্ষে দাদার এই অপমান তাকে অত্যন্ত বিঁধিল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে বিনোদ ভিতরে গিয়া দেখিল—মা ঘরে দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা যে তাঁর কানে গিয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিনোদ টের পাইল।

দোকানের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর গোকুল নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সেখানেও একটা বিরাট মুখভারীর অভিনয় চলিতেছে। স্বয়ং রায়মশাই খাটের উপর মুখখানা অতি বিশ্রী করিয়া বসিয়া আছেন এবং নীচে মেঝের উপর বসিয়া তাঁহার কন্যা হিমুকে কাছে লইয়া পিতৃ-মুখের অনুকরণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই রায়মশাই কহিলেন, বাবাজী, নির্ব্বোধের মত তুমি এই যে আমাদের আজ তোমার মাকে দিয়ে অপমান করালে, তার প্রতিকার কি বল ?

একে গোকুলের যারপরনাই মন খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে সারাদিনের পরিশ্রমে অতিশয় শ্রান্ত। অভিযোগের ধরণটায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

মনোরমা ফোঁস ফোঁস্ করিয়া কাঁদিয়া কহিল, আর যদি কোনদিন তুমি ওখানে যাও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

মেয়ের উৎসাহ পাইয়া রায়মশাই অধিকতর গম্ভীরভাবে কহিলেন, সে মাগী কি সোজা—

গোকুল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—চোপরাও বলচি। আমার মায়ের নামে ও রকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব। বলিয়া নিজেই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রায়মশায় ও তাঁহার কন্যা বজ্রাহতের ন্যায় পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল এ কি করিল! পূজ্যপাদ শ্বশুর-মহাশয়কে এ কি ভয়ঙ্কর অপমান করিয়া বসিল!

১৩

বিনোদের বেশ একটি বন্ধুর দল জুটিয়াছিল যাহারা প্রতিনিয়তই তাহাকে মকদ্দমায় উৎসাহিত করিতেছিল। কারণ, হারিলে তাহাদের ক্ষতি নাই—জিতিলে পরম লাভ। অনেকদিনের অনেক আমোদ-প্রমোদের খোরাক সংগ্রহ হয়। আবার মকদ্দমা যে করিতেই হইবে, তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছিল। যে-হেতু বিনোদের তরফ হইতে যে বন্ধুটি আপোষে মিটমাট করিবার প্রস্তাব লইয়া একদিন গোকুলের কাছে গিয়াছিল, গোকুল তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বয়াটে নচ্ছার পা জকে এক সিকি-পয়সার বিষয় দেব না—যা পারে সে করুক।

কিন্তু এতবড় বিষয়ের জন্য মামলা রুজু করিতে একটু বেশী টাকার আবশ্যক। সেইটুকুর জন্যই বিনোদের কালবিলম্ব হইয়া যাইতেছিল।

দাদার উপর বিনোদের যত রাগই থাকুক, সেইদিন হইতেই কেমন যেন তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অত লোকের সম্মুখে অপমানিত হইয়া যেমন করিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, তাহার মুখের সে আর্ত্ত ছবিটা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। বুকের ভিতরে কে যেন অনুক্ষণ বলিতেছিল—অন্যায়, অন্যায়,

অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদে অবিহিত করিয়া দাদাকে বিদায় করা হইয়াছে। সেই দাদা যে জীবনে কোনদিন এ-পথ মাড়াইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বিনোদ বুঝিয়াছিল।

দেশের কৃতবিদ্য যুবকদের অনেকেই বিনোদের বন্ধু। সকলেরই পূর্ণ সহানুভূতি বিনোদের উপরে। সেদিন সকালে তাঁহারা বাহিরের ঘরে বসিয়া মাস্টারমশাইকে ডাকিয়া আনিয়া অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির করিয়াছিলেন, কথার ফাঁদে গোকুলকে জড়াইতে না পারিলে সুবিধা নাই। গোকুল মূর্খ এবং অত্যন্ত নির্ব্বোধ তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন; সুতরাং তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তাহারই মুখের কথায় তাহাকেই জব্দ করিয়া সাক্ষীর সৃষ্টি করা কঠিন হইবে না। কথা ছিল আগামী রবিবার সকালবেলায় দেশের দশজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া গোকুলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথার ফেরে বাঁধিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে কত তামাসা বিদ্রূপ অনুপস্থিত হতভাগ্য গোকুলের মাথায় বর্ষিত হইল; কে কি বলিবেন এবং করিবেন, সকলেই একে একে তাহার মহড়া দিলেন, শুধু বিনোদ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার উৎসাহের অভাব নিজেদের উৎসাহের বাহুল্যে কেহ লক্ষ্যই করিলেন না।

আজ বিনোদ কাজে বাহির হয় নাই, আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে বসিয়াছিল; বেলা একটার সময় হঠাৎ গোকুল—কই রে হাবুর মা, খাওয়া-দাওয়া চুকল? বলিয়া প্রবেশ করিল।

হাবুর মা শশব্যস্তে বড় বাবুকে আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, না বড়বাবু, এখনো শেষ হয়নি।

হয়নি? বলিয়া গোকুল আসনটা তুলিয়া আনিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় পাতিল। বসিয়া কহিল, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দিকি হাবুর মা। তাগাদায় বেরিয়ে এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে একবারে হয়রান হয়ে গেছি। মা কই রে?

ভবানী রান্নাঘরেই ছিলেন; কিন্তু সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিপুল লজ্জায় হঠাৎ সম্মুখে আসিতেই পারিলেন না।

বিনোদ কাজে গিয়াছে, ঘরে নাই,—গোকুল ইহাই জানিত। কহিল, সব মিথ্যে হাবুর মা, সব মিথ্যে। কলিকাল—আর কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বললেন, বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা। আমি ভালো-

মানুষ—নইলে বেন্দার বাপের সাধ্যি কি, সে মাকে আমার জোর করে নিয়ে আসে? কেন, আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে পারিনে? বাবার এই হ'লো আসল উইল—তা জানিস্ হাবুর মা? শুধু দু'কলম লিখে দিলেই উইল হয় না।

হাবুর মা চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইল বিনোদ ঘরে আছে। গোকুল জলের গেলাসটা রাখিয়া দিয়া জুতা পায়ে দিয়া দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নটা-দশটার সময় হঠাৎ দোকানের চক্রবর্ত্তী আসিয়া হাজির। জিজ্ঞাসা করিল, মা, বড়বাবু এখনো বাড়ি যাননি—এখান থেকে খেয়ে কখন্ গেলেন?

ভবানী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, সে ত এখানে খায়নি। তাগাদার পথে শুধু এক গেলাশ জল খেয়ে চলে গেল।

চক্রবর্ত্তী কহিল, এই নাও। আজ বড়বাবুর জন্মতিথি। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বলে এসেচে, মায়ের প্রসাদ পেতে যাচ্ছি। তা হলে সারাদিন খাওয়াই হয়নি দেখচি!

শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদ পাশের ঘরেই ছিল, চক্রবর্ত্তীর সাড়া পাইয়া কাছে আসিয়া বসিল। তামাসা করিয়া কহিল, কি চক্রবর্ত্তীমশাই, নিমাই রায়ের তাঁবে চাকরি হচ্চে কেমন?

চক্রবর্ত্তী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, নিমাই রায়? রামঃ—সে কি দোকানে ঢুকতে পারে না কি?

বিনোদ বলিল, শুনতে পাই দাদাকে সে গ্রাস করে বসে আছে?

চক্রবর্ত্তী ভবানীকে দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, উনি বেঁচে থাকতে সেটি হবার জো নেই ছোটবাবু! আমাকে তাড়িয়ে সর্ব্বস্বর মালিক হতেই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মায়ের একটা হুকুমে সব ফেঁসে গেল। এখন ঠকিয়ে-মজিয়ে ছ্যাচড়ামি করে যা দু'পয়সা আদায় হয়, দোকানে হাত দেবার জো নেই। বলিয়া চক্রবর্ত্তী সেদিনের সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, বড়বাবু একটুখানি বড্ড সোজা মানুষ কি না, লোকের প্যাঁচ-স্যাচ ধরতে পারে না। কিন্তু তা হলে কি হয়, পিতৃমাতৃভক্তি যে অচলা—সেই যে বললেন, মায়ের হুকুম রদ করবার আমার সাধ্যি নেই—তা এত কাঁদা-কাটি, ঝগড়া-ঝাটি—না, কিছুতে না। আমার বাপের হুকুম—মায়ের হুকুম! আমি যেমন কর্ত্তা ছিলাম—তেমনি আছি ছোটবাবু।

বিনোদের দু'চক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল। চক্রবর্ত্তী কহিতে লাগিল, এমন বড়ভাই কি কারু হয় ছোটবাবু? মুখে কেবল বিনোদ আর বিনোদ। আমার বিনোদের মত পাশ কেউ করেনি, আমার বিনোদের মত লেখাপড়া কেউ শেখেনি, আমার বিনোদের মত ভাই কারু জন্মায়নি। লোকে তোমার নামে কত অপবাদ দিয়েচে ছোটবাবু, আমার কাছে এসে হেসে বলেন, চক্কোত্তিমশাই, শালারা কেবল আমার ভায়ের হিংসে করে দুর্নাম রটায়! আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করব, আমাকে এমনি বোকাই ঠাউরেচে শালারা!

একটু থামিয়া কহিল, এই সেদিন কে এক কাশীর পণ্ডিত এসে তোমার মন ভাল করে দেবে বলে একশ-আট সোনার তুলসীপাতার দাম প্রায় পাঁচশ টাকা বড়বাবুর কাছে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কত নিষেধ করলুম, কিছুতেই শুনলেন না; বললেন, আমার বিনোদের যদি সুমতি হয়, আমার বিনোদ যদি এম. এ. পাশ করে—যায় যাক আমার পাঁচশ টাকা।

বিনোদ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, কত লোক যে আমার নাম করে দাদাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আমিও শুনেচি চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্ত্তী গলা খাটো করিয়া কহিল, এই জয়লাল বাঁড়ুয্যেই কি কম টাকা মেরে নিয়েচে ছোটবাবু। ওই ব্যাটাই ত যত নষ্টের গোড়া। বলিয়া সে কর্ত্তার মৃত্যুর পরে সেই ঠিকানা বাহির করিয়া দিবার গল্প করিল।

ভবানী কোন কথায় একটি কথাও কহেন নাই—শুধু তাঁরই দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

চক্রবর্ত্তী বিদায় লইলে বিনোদ শুইতে গেল; কিন্তু সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না। কেন এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিল, পিতা তাহাকে একভাবে বঞ্চিত করিয়া গেলেন, দাদা তাহাকে কিছুই দিতে চাহিতেছে না, চক্রবর্ত্তীর মুখে আজ সেই ইতিহাস অবগত হইয়া সে ক্রমাগত ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

বিনোদের বন্ধুরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন সম্রান্ত ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া রবিবারের সকালবেলা গোকুলের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকুল দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এতগুলি ভদ্রলোকের আকস্মিক অভ্যাগমে তটস্থ হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া ডেপুটিবাবুকে এবং সদরআলা গিরিশবাবুকে দেখিয়া তাঁহাদের যে কোথায় বসাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। বিনোদ

নিঃশব্দে মলিন মুখে একধারে গিয়া বসিল। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহাকে যেন বলি দেবার জন্যে ধরিয়া আনা হইয়াছে।

বাঁড়ুয্যেমশাই ছিলেন, কথাটা তিনিই পাড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে গোকুলের চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, ওঃ, তাই এত লোক! যান আপনারা নালিশ করুন গে, আমি এক সিকি-পয়সা ওই হতভাগা নচ্ছারকে দেব না। ও মদ খায়।

আর সকলে মৌন হইয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই ভঙ্গি করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেশ, তাই যেন খায়, কিন্তু তুমি ওর হক্কের বিষয় আটকাবার কে? তুমি যে তোমার বাপের মরণকালে জোচ্চুরি করে উইল লিখে নাওনি তার প্রমাণ কি?

গোকুল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, জোচ্চুরি করেচি? আমি জোচ্চোর? কোন শালা বলে?

গিরিশবাবু প্রাচীন লোক। তিনি মৃদু-কণ্ঠে কহিলেন, গোকুলবাবু, অমন উতলা হবেন না, একটু শান্ত হয়ে জবাব দিন।

বাঁড়ুয্যেমশাই পুরানোদিনের অনেক কথাই নাকি জানিতেন, তাই চোখ ঘুরাইয় কহিলেন, তা হলে আদালতে গিয়ে তোমার মাকে সাক্ষী দিতে হবে গোকুল।

তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাই। গোকুল উন্মত্ত হইয়া উঠিল—কি, আমার মাকে দাঁড় করাবে আদালতে? সাক্ষীর কাঠগড়ায়? নি গে যা তোরা সব বিষয়-আশয়—নি গে যা—আমি চাইনে। আমি যাব না আদালতে; মাকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হবো।

নিমাই রায়ও উপস্থিত ছিলেন, চোখ টিপিয়া বলিলেন, আহা হা, থাক্ না গোকুল। কর কি, কি সব বলচ?

গোকুল সে-কথা কানেও তুলিল না। সকলের মুখের সম্মুখে ডান পা বাড়াইয়া দিয়া বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তেমনি চীৎকারে কহিল, আয় হতভাগা, এদিকে আয়, এই পা বাড়িয়ে দিয়েচি—ছুঁয়ে বল—তোর দাদা জোচ্চোর। সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই ত আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের ছেলে নই।

নিমাই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, আহা হা, কর কি বাবাজী! করুক না ওরা নালিশ—বিচারে যা হয় তাই হবে—এ-সব দিব্যি-দিলেশা কেন? চল চল, বাড়ির ভেতরে চল। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিনোদ মাথা তুলিয়া চাহিল না, একটা কথার জবাবও দিল না—একভাবে নীরবে বসিয়া রহিল।

গোকুল সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না, আমি এক পা নড়ব না। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাবা শুনচেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন কি না, গোকুল, এই রইল তোমাদের দু'ভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে তখন দিয়ো বাবা তার যা-কিছু পাওনা। ওপর থেকে বাবা দেখচেন, সেই বিষয় আমি যক্ষের মত আগলে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমার ঘরে ফিরে আসবে—দিবারাত্রি ভগবানকে ডাকচি—আর ও বলে আমি জোচ্চোর। আয়, এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এদের সামনে বলে যা, তোর বড়ভাই চুরি করে তোর বিষয় নিয়েচে।

বন্ধুবান্ধবেরা বিনোদকে চারিদিক হইতে ঠেলিতে লাগিলেন, কিন্তু সে উঠে না। বাঁড়ুয্যেমশাই খাড়া হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিলেন, বল না বিনোদ, পা ছুঁয়ে। ভয় কি তোমার? এমন সুযোগ আর পাবে কবে?

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, এমন সুযোগ আর পাব না। বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, তোমার পা ছুঁতে বলছিলে দাদা, এই ছুঁয়েচি। আমি মদ খাই—আর যাই খাই দাদা, তোমাকে চিনি। তোমার পা ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চোর বলি দাদা, ডান হাত আমার এইখানেই খসে পড়ে যাবে। সে আমি বলতে পারব না; কিন্তু আজ এই পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলচি, মদ আর আমি ছোঁব না। আশীর্ব্বাদ কর দাদা, তোমার ছোটভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি। তোমার মান রেখে যেন তোমার পায়ের তলাতেই চিরকাল কাটাতে পারি। বলিয়া বিনোদ অগ্রজের সেই প্রসারিত পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

———

অনুরাধা

অনুরাধা

এক

কন্যার বিবাহযোগ্য বয়সের সম্বন্ধে যত মিথ্যা চালানো যায় চালাইয়াও সীমানা ডিঙাইয়াছে। বিবাহের আশাও শেষ হইযাছে।—ওমা, সে কি কথা! হইতে আরম্ভ করিয়া চোখ টিপিয়া কন্যার ছেলে-মেয়েরা সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিয়াও এখন আর কেহ রস পায় না, সমাজে এ রসিকতাও বাহুল্য হইয়াছে। এমনি দশা অনুরাধার। অথচ ঘটনা সে-যুগের নয়, নিতান্তই আধুনিককালের। এমন দিনেও যে কেবল মাত্র গণ-পণ, ঠিকুজি-কোষ্ঠী ও কুল-শীলের যাচাই বাছাই করিতে এমনটা ঘটিল—অনুরাধার বয়স তেইশ পার হইয়া গেল, বর জুটিল না এ-কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। তবু ঘটনা সত্য।

সকালে এই গল্পই চলিতেছিল আজ জমিদারের কাছারিতে। নূতন জমিদারের নাম হরিহর ঘোষাল, কলিকাতাবাসী—তাঁর ছোট ছেলে বিজয় আসিয়াছে গ্রামে।

বিজয় মুখের চুরুটটা নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বললে গগন চাটুয্যের বোন? বাড়ি ছাড়বে না?

যে লোকটা খবর আনিয়াছিল সে কহিল, বললে—যা বলবার ছোটবাবু এলে তাঁকেই বলব।

বিজয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তার বলবার আছে কি? এর মানে তাদের বার করে দিতে আমাকে যেতে হবে নিজে। লোক দিয়ে হবে না?

লোকটা চুপ করিয়া রহিল। বিজয় পুনশ্চ কহিল, বলবার তার কিছুই নেই বিনোদ, কিছুই আমি শুনব না। তবু তাঁরি জন্যে আমাকেই যেতে হবে তাঁর কাছে—তিনি নিজে এসে দুঃখ জানাতে পারবেন না।

বিনোদ কহিল, আমি তাও বলেছিলাম। অনুরাধা বললে, আমিও ভদ্র-গেরস্থ ঘরের মেয়ে বিনোদদা, বাড়ি ছেড়ে যদি বার হতেই হয় তাঁকে জানিয়ে একেবারেই বার হয়ে যাব, বার বার বাইরে আসতে পারব না।

কি নাম বললে হে, অনুরাধা? নামের ত দেখি ভারি চটক্—তাই বুঝি এখনো অহঙ্কার ঘুচল না?

আজ্ঞে না।

বিনোদ গ্রামের লোক, অনুরাধাদের দুর্দ্দশার ইতিহাস সে-ই বলিতেছিল। কিন্তু অনতিপূর্ব্ব ইতিহাসেরও একটা অতিপূর্ব্ব ইতিহাস থাকে— সেইটা বলি।

এই গ্রামখানির নাম গণেশপুর, একদিন ইহা অনুরাধাদেরই ছিল, বছর-পাঁচেক হইল হাত-বদল হইয়াছে। সম্পত্তির মুনাফা হাজার-দুয়ের বেশী নয়, কিন্তু অনুরাধার পিতা অমর চাটুয্যের চাল-চলন ছিল বিশ হাজারের মত। অতএব ঋণের দায়ে ভদ্রাসন পর্য্যন্ত গেল ডিক্রি হইয়া। ডিক্রি হইল, কিন্তু জারি হইল না; মহাজন ভয়ে থামিয়া রহিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন যেমন বড় কুলীন, তেমনি ছিল প্রচণ্ড তাঁর জপ-তপ ক্রিয়াকর্ম্মের খ্যাতি। তলা-ফুটা সংসার-তরণী অপব্যয়ের লোনা-জলে কানায় কানায় পূর্ণ হইল, কিন্তু ডুবিল না। হিন্দু গোঁড়ামির পরিস্ফীত পালে সর্ব্বসাধারণের ভক্তি-শ্রদ্ধার ঝোড়ো হাওয়া এই নিমজ্জিত নৌকাখানিকে ঠেলিতে ঠেলিতে দিল অমর চাটুয্যের আয়ুষ্কালের সীমানা উত্তীর্ণ করিয়া। অতএব চাটুয্যের জীবদ্দশাটা একপ্রকার ভালই কাটিল। তিনি মরিলেনও ঘটা করিয়া, শ্রাদ্ধশান্তিও নির্ব্বাহিত হইল ঘটা করিয়া, কিন্তু সম্পত্তির পরিসমাপ্তিও ঘটিল এইখানে। একদিন নাকটুকু মাত্র ভাসাইয়া যে-তরণী কোনমতে নিশ্বাস টানিতেছিল, এইবার 'বাবুদের বাড়ি'র সমস্ত মর্য্যাদা লইয়া অতলে তলাইতে আর কালবিলম্ব করিল না।

পিতার মৃত্যুতে গগন পাইল এক জরা-জীর্ণ ডিক্রি-করা পৈতৃক বাস্তুভিটা, আকণ্ঠ ঋণ-ভারগ্রস্ত গ্রাম্য সম্পত্তি, গোটাকয়েক গরু-ছাগল-কুকুর-বিড়াল এবং ঘাড়ে পড়িল পিতার দ্বিতীয় পক্ষের অনূঢ়া কন্যা অনুরাধা।

এইবার পাত্র জুটিল গ্রামেরই এক ভদ্র ব্যক্তি। গোটা পাঁচ-ছয় ছেলে-মেয়ে ও নাতি-পুতি রাখিয়া বছর-দুই হইল তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, সে বিবাহ করিতে চায়।

অনুরাধা বলিল, দাদা, কপালে রাজপুত্র ত জুটল না, তুমি এইখানেই আমার বিয়ে দাও। লোকটার টাকাকড়ি আছে, তবু দুটো খেতে পরতে পাব।

গগন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সে কি কথা! ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর পয়সা আছে মানি, কিন্তু ওর ঠাকুদ্দাদা কুল ভেঙে সতীপুরের চক্রবর্ত্তীদের ঘরে বিয়ে করেছিল জানিস্? ওদের আছে কি?

বোন বলিল, আর কিছু না থাক্, টাকা আছে। কুল নিয়ে উপবাস করার চেয়ে দু-মুঠো ভাত-ডাল পাওয়া ভালো দাদা।

গগন মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হয় না—হবার নয়।

কেন নয় বল ত? বাবা ও-সব মানতেন, কিন্তু তোমার ত কোন বালাই নেই।

এখানে বলা আবশ্যক পিতার গোঁড়ামি পুত্রের ছিল না। মদ্য-মাংস ও আরও একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ মোহমুক্ত পুরুষ। পত্নী-বিয়োগের পরে ভিন্ন-পল্লীর কে একটি নীচজাতিয় স্ত্রীলোক আজও তাহার অভাব মোচন করিতেছে এ-কথা সকলেই জানে।

গগন ইঙ্গিতটা বুঝিল, গর্জ্জিয়া বলিল, আমার বাজে গোঁড়ামি নেই, কিন্তু কন্যাগত কুলের শাস্ত্রাচার কি তোর জন্যে জলাঞ্জলি দিয়ে চৌদ্দপুরুষ নরকে ডোবাব! কৃষ্ণের সন্তান, স্বভাব-কুলীন আমরা—যা যা, এমন নোঙরা কথা আর কখনো মুখে আনিস্‌নে। বলিয়া সে রাগ করিয়া চলিয়া গেল, ত্রিলোচন গাঙ্গুলীর প্রস্তাবটা এইখানেই চাপা পড়িল।

গগন হরিহর ঘোষালকে ধরিয়া পড়িল—কুলীন ব্রাহ্মণকে ঋণমুক্ত করিতে হইবে। কলিকাতার কাঠের ব্যবসায়ে হরিহর লক্ষপতি ধনী। একদিন তাঁহার মাতুলালয় ছিল এই গ্রামে, বাল্যে বাবুদের বহু সুদিন তিনি চোখে দেখিয়াছেন, বহু কাজ-কর্ম্মে পেট ভরিয়া লুচি-মণ্ডা আহার করিয়া গিয়াছেন। টাকাটা তাঁহার পক্ষে বেশী নয়, তিনি সম্মত হইলেন চাটুয্যেদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া হরিহর গণেশপুর ক্রয় করিলেন, কুণ্ডুদের ডিক্রির টাকা দিয়া উদ্রাসন ফিরাইয়া লইলেন, কেবল মৌখিক সর্ত্ত এই রহিল যে, বাহিরের গোটা দুই-তিন ঘর কাছারির জন্য ছাড়িয়া দিয়া গগন অন্দরের দিকটা যেমন বাস করিতেছে তেমনই করিবে।

তালুক খরিদ হইল, কিন্তু প্রজারা মানিতে চাহিল না। সম্পত্তি ক্ষুদ্র, আদায় সামান্য, সুতরাং বড় রকমের কোন ব্যবস্থা করা চলে না। কিন্তু অল্পের মধ্যেই কি কৌশল যে গগন খেলিতে লাগিল, হরিহরের পক্ষের কোন কর্ম্মচারী গিয়াই গণেশপুরে টিকিতে পারিল না। অবশেষে গগনের নিজেরই প্রস্তাবে সে নিজেই নিযুক্ত হইল কর্ম্মচারী; অর্থাৎ ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামী সাজিলেন বর্ত্তমান জমিদারের গোমস্তা। মহাল শাসনে আসিল, হরিহর হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিলেন, কিন্তু আদায়ের দিক দিয়া রহিল যথাপূর্ব্বস্তথা পরঃ। এক পয়সা তহবিলে জমা পড়িল না। এমনিভাবে গোলমালে আরও বছর-দুই কাটিল, তার পরে হঠাৎ একদিন খবর আসিল, গোমস্তাবাবু গগন চাটুয্যেকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। সদর হইতে হরিহরের লোক আসিয়া খোঁজ-খবর তত্ত্ব-তল্লাস করিয়া জানিল, আদায় যা হইবার হইয়াছে, সমস্তই গগন আত্মসাৎ করিয়া সম্প্রতি গা-ঢাকা দিয়াছে। পুলিশে ডায়েরি, আদালতে নালিশ, বাড়ি থানা-তল্লাসী, প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সবই হইল, কিন্তু না টাকা, না গগন, কাহারও সন্ধান মিলিল না। গগনের ভগিনী অনুরাধা ও দূর-সম্পর্কের একটি

ছেলেমানুষ ভাগিনেয় বাটীতে থাকিত, পুলিশের লোক তাহাদের বিধিমত কথামাজা ও নাড়াচাড়া দিল, কিন্তু কোন তথ্যই বাহির হইল না।

বিজয় বিলাত-ফেরত। তাহার পুনঃ পুনঃ একজামিন ফেল করার রসদ যোগাইতে হরিহরকে অনেক টাকা গনিতে হইয়াছে। পাশ করিতে সে পারে নাই, কিন্তু বিজ্ঞতার ফলস্বরূপ মেজাজ গরম করিয়া বছর-দুই পূর্ব্বে দেশে ফিরিয়াছে। বিজয় বলে, বিলাতে পাশ-ফেলের কোন প্রভেদ নাই। বই মুখস্থ করিয়া পাশ করিতে গাধাতেও পারে, সে উদ্দেশ্য থাকিলে সে এখানে বসিয়াই বই মুখস্থ করিত, য়ুরোপ যাইত না। বাড়ি আসিয়া সে পিতার কাঠের ব্যবসায়ের কাল্পনিক দুরবস্থায় শঙ্কা প্রকাশ করিল এবং নড়-বড়ে, পড়ো-পড়ো কারবার ম্যানেজ করিতে আত্মনিয়োগ করিল। কর্ম্মচারী-মহলে ইতিমধ্যেই নাম হইয়াছে—কেরানীরা তাহাকে বাঘের মত ভয় করে। কাজের চাপে যখন নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই এমনি সময়ে আসিয়া পৌঁছিল গণেশপুরের বিবরণ। সে কহিল, এ ত জানা কথা, বাবা যা করবেন তা এইরকম হতে বাধ্য। কিন্তু উপায় নাই, অবহেলা করিলে চলিবে না—তাহাকে সরেজমিনে নিজে গিয়া একটি বিহিত করিতে হইবে। এজন্যই তাহার গণেশপুরে আসা। কিন্তু এই ছোট কাজে বেশিদিন পল্লীগ্রামে থাকা চলে না, যত শীঘ্র সম্ভব একটা ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। সমস্তই যে একা তাহারি মাথায়। বড় ভাই অজয় এটর্নী। অত্যন্ত স্বার্থপর, নিজের অফিস ও স্ত্রী-পুত্রকে লইয়াই ব্যস্ত, সংসারের সকল বিষয়েই অন্ধ, শুধু ভাগাভাগির ব্যাপারে তাহার এক-জোড়া চক্ষু দশ-জোড়ার কাজ করে। স্ত্রী প্রভাময়ী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, বাড়ির লোকজনের সংবাদ লওয়া ত দূরের কথা, শ্বশুর-শাশুড়ী বাঁচিয়া আছে কি না খবর লইবারও সে বেশী অবকাশ পায় না। গোটা পাঁচ-ছয় ঘর লইয়া বাটীর যে অংশে তাহার মহল সেখানে পরিজনবর্গের গতিবিধি সঙ্কুচিত, তাহার ঝি-চাকর আলাদা—উড়ে বেহারা আছে। শুধু বুড়ো কর্ত্তার অত্যন্ত নিষেধ থাকায় আজও মুসলমান বাবুর্চ্চি নিযুক্ত হইতে পারে নাই। এই অভাবটা প্রভাকে পীড়া দেয়। আশা আছে শ্বশুর মরিলেই ইহার প্রতিকার হইবে। দেবর বিজয়ের প্রতি তাহার চিরদিনই অবজ্ঞা, শুধু বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। দুই-চারিদিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে রাঁধিয়া ডিনার খাওয়াইয়াছে, সেখানে ছোটবোন অনিতার সহিত বিজয়ের পরিচয় হইয়াছে। সে এবার বি. এ. পরীক্ষায় অনার্সে পাশ করিয়া এম. এ. পড়ার আয়োজন করিতেছে।

বিজয় বিপত্নীক। স্ত্রী মরার পরেই সে বিলাত যায়। সেখানে কি করিয়াছে, না করিয়াছে, খোঁজ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু ফিরিয়া পর্য্যন্ত অনেকদিন দেখা গিয়াছে স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধে তাহার মেজাজটা কিছু রুক্ষ। মা বিবাহের কথা বলায় সে জোর গলায় আপত্তি জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল। তখন হইতে অদ্যাবধি প্রসঙ্গটা গোলমালেই কাটিয়াছে।

গণেশপুরে আসিয়া একজন প্রজার সদরে গোটা-দুই ঘর লইয়া বিজয় নূতন কাছারি ফাঁদিয়া বসিয়াছে। সেরেস্তার কাগজ-পত্র গগনের গৃহে যাহা পাওয়া গিয়াছে জোর করিয়া এখানে আনা হইয়াছে এবং এখন চেষ্টা চলিতেছে তাহার ভগিনী অনুরাধা ও দূর-সম্পর্কের সেই ভাগিনের ছোঁড়াটাকে বহিষ্কৃত করার। বিনোদ ঘোষের সহিত এইমাত্র সেই পরামর্শ-ই হইতেছিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় বিজয় তাহার সাত-আট বছরের ছেলে কুমারকে সঙ্গে আনিয়াছে।

পল্লীগ্রামের সাপ-খোপ বিছা-ব্যাঙের ভয়ে ভয়ে মা আপত্তি করিলে বিজয় বলিয়াছিল, মা, তোমার বড়বৌয়ের প্রসাদে তোমায় নাড়ুগোপাল নাতি-নাতনীর অভাব নেই, কিন্তু এটাকে আর তা ক'রো না। বিপদে-আপদে মানুষ হতে দাও।

শুনা যায়, বিলাতের সাহেবরাও নাকি ঠিক এমনিই বলিয়া থাকে। কিন্তু সাহেবদের কথা ছাড়াও এ-ক্ষেত্রে একটু গোপন ব্যাপার আছে। বিজয় যখন বিলাতে, তখন মাতৃহীন ছেলেটার একটু অযত্নেই দিন গিয়াছে। তাহার ভগ্ন-স্বাস্থ্য। পিতামহী অধিকাংশ সময়েই থাকেন শয্যাগত, সুতরাং যথেষ্ট বিত্ত-বিভব থাকা সত্ত্বেও কুমারকে দেখিবার কেহ ছিল না, কাজেই দুঃখে-কষ্টেই সে-বেচারা বড় হইয়াছে। বিলাত হইতে বাড়ি ফিরিয়া এই খবরটা বিজয়ের কানে গিয়াছিল।

গণেশপুরে আসিবার কালে বৌদিদি হঠাৎ দরদ দেখাইয়া বলিয়াছিল, ছেলেটা সঙ্গে যাচ্চে ঠাকুরপো, পাড়াগাঁ জায়গা, একটু সাবধানে থেকো। কবে ফিরবে?

যত শীঘ্র পারি।

শুনেচি আমাদের সেখানে একটা বড় বাড়ি আছে—বাবা কিনেছিলেন।

কিনেছিলেন, কিন্তু কেনা মানেই থাকা নয় বৌদি। বাড়ি আছে, কিন্তু দখল নেই।

কিন্তু তুমি যখন নিজে যাচ্চো ঠাকুরপো, তখন দখল আসতেও দেরি হবে না।

আশা ত তাই করি।

দখল এলে কিন্তু একটা খবর দিও।

কেন বৌদি?

ইহার উত্তরে প্রভা বলিয়াছিল, এই ত কাছে, পাড়াগাঁ কখনো চোখে দেখিনি, গিয়ে একদিন দেখে আসব। অনুরও কলেজ বন্ধ, সেও হয়ত সঙ্গে যেতে চাইবে।

এ প্রস্তাবে বিজয় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিয়াছিল, আমি দখল নিয়েই তোমাকে খবর পাঠব বৌদি, তখন কিন্তু না বলতে পাবে না। বোনটিকে সঙ্গে নেওয়া চাই।

অনিতা যুবতী, সে দেখিতে সুশ্রী ও অনার্সে বি. এ. পাশ করিয়াছে। সাধারণ স্ত্রী-জাতির বিরুদ্ধে বিজয়ের বাহ্যিক অবজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও রমণী-বিশেষের একাধারে এতগুলো গুণ সে মনে মনে যে তুচ্ছ করে তাহা নয়। সেখানে শান্ত পল্লীর নির্জ্জন প্রান্তরে কখনো,—কখনো প্রাচীন বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথের একান্তে সহসা মুখোমুখি আসিয়া পড়ার সম্ভাবনা তাহার মনের মধ্যে সেদিন বারবার করিয়া দোল দিয়া গিয়াছিল।

বিজয়ের পরনে খাঁটি সাহেবি পোষাক, মাথায় শোলার টুপি, মুখে কড়া চুরুট, পকেটে রিভলবার, চেরির ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাবুদের বাড়ির সদর-বাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে মস্ত লাঠি হাতে দু'জন হিন্দুস্থানী দারোয়ান, অনেক-গুলি অনুগত প্রজা, বিনোদ ঘোষ ও পুত্র কুমার। সম্পত্তি দখল করার ব্যাপারে যদিচ হাঙ্গামার ভয় আছে, তথাপি ছেলেকে নাড়ুগোপাল করার পরিবর্ত্তে মজবুত করিয়া গড়িয়া তোলার এ হইল বড় শিক্ষা—তাই ছেলেও আসিয়াছে সঙ্গে। বিনোদ বরাবর ভরসা দিয়াছে যে, অনুরাধা একাকী স্ত্রীলোক, কোনমতেই জোরে পারিবে না। তবুও বিভলবার যখন আছে, তখন সঙ্গে লওয়াই ভালো।

বিজয় বলিল, মেয়েটা শুনেচি ভারি বজ্জাত, লোক জড়ো করে তুলতে পারে। ও-ই ত গগন চাটুয্যের পরামর্শদাতা। স্বভাব-চরিত্রও মন্দ।

বিনোদ বলিল, আজ্ঞে, তা ত শুনিনি।

আমি শুনেচি।

কোথাও কেহ নাই, শূন্য প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বিজয় চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। বাবুদের বাড়ি বলা যায় বটে। সম্মুখে পূজার দালান এখনো ভাঙে নাই, কিন্তু

জীর্ণতার শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। একপাশে সারি সারি বসিবার ঘর ও বৈঠকখানা—দশা একই। পায়রা, চড়াই ও চামচিকার স্থায়ী আশ্রম বানাইয়াছে।

দারওয়ান হাঁকিল, কোই হ্যায় ?

তাহার সম্ভ্রমবিহীন চড়া-গলার চীৎকারে বিনোদ ঘোষ ও অন্যান্য অনেকেই যেন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বিনোদ বলিল, রাধুদিদিকে আমি গিয়ে খবর দিয়ে আসচি বাবু। বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

তাহার কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গিতে বুঝা গেল, আজও এ-বাড়ির অমর্য্যাদা করিতে তাহাদের বাধে।

অনুরাধা রাঁধিতেছিল ; বিনোদ গিয়া সবিনয়ে জানাইল, দিদি, ছোটবাবু বাইরে এসেচেন।

সে এ দুর্দ্দৈব প্রত্যহই আশঙ্কা করিতেছিল। হাত ধুইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সন্তোষকে ডাকিয়া কহিল, বাইরে একটা সতরঞ্চি পেতে দিয়ে এসো বাবা, বল গে মাসীমা আসচেন। বিনোদকে বলিল, আমার বেশী দেরি হবে না—বাবু রাগ করেন না যেন বিনোদদা, আমার হয়ে তাঁকে বসতে বলগে।

বিনোদ লজ্জিত-মুখে কহিল, কি করব দিদি, আমরা গরীব প্রজা, জমিদার হুকুম করলে না বলতে পারিনে, কাজেই—

সে আমি বুঝি বিনোদদা।

বিনোদ চলিয়া গেল। বাহিরে সতরঞ্চি পাতা হইল, কিন্তু কেহ তাহাতে বসিল না। বিজয় ছড়ি ঘুরাইয়া পায়চারি করিতে করিতে চুরুট টানিতে লাগিল।

মিনিট-পাঁচেক পরে সন্তোষ বাহিরে আসিয়া ইঙ্গিতে দ্বারের প্রতি চাহিয়া সভয়ে কহিল, মাসীমা এসেচেন।

বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রঘরের কন্যা, তাহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত, সে দ্বিধায় পড়িল। কিন্তু দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইলে চলিবে না, অতএব পুরুষ-কণ্ঠে অন্তরালবর্ত্তিনীর উদ্দেশে কহিল, এ-বাড়ি আমাদের তুমি জানো ?

উত্তর আসিল, জানি।

তবে ছেড়ে দিচ্চো না কেন ?

অনুরাধা তেমনি আড়ালে দাঁড়াইয়া বোনপোর জবানিতে বক্তব্য বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ছেলেটা চালাক-চৌকশ নয়, নূতন জমিদারের কড়া মেজাজের জনশ্রুতিও তাহার কানে পৌঁছিয়াছে, ভয়ে ভয়ে কেবলি থতমত খাইতে লাগিল, একটা কথাও সুস্পষ্ট হইল না।

বিজয় মিনিট পাঁচ-ছয় ধৈর্য্য ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল, তার পরে হঠাৎ একটা ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার মাসীর বলার কিছু থাকলে সামনে এসে বলুক। নষ্ট করার সময় আমার নেই আমি বাঘ-ভালুকও নয়, তাকে খেয়ে ফেলব না। বাড়ি ছাড়বে না কেন বলুক।

অনুরাধা বাহিরে আসিল না, কিন্তু কথা কহিল। সন্তোষের মুখে নয়, নিজের মুখে স্পষ্ট করিয়া বলিল, বাড়ি ছাড়ার কথা ছিল না। আপনার বাবা হরিহরবাবু বলেছিলেন, এর ভেতরের অংশে আমরা বাস করতে পারি।

কোন লেখা-পড়া আছে?

না নেই। কিন্তু তিনি এখনো জীবিত, তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবেন।

জিজ্ঞেসা করার গরজ আমার নেই। এই যদি সর্ত্ত, তাঁর কাছে লিখে নাওনি কেন?

দাদা বোধ হয় প্রয়োজন মনে করেননি। তাঁর মুখের কথার চেয়ে লিখে নেওয়া বড় হবে এ হয়ত দাদার মনে হয়নি।

এ-কথার সঙ্গত উত্তর বিজয় খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই জবাব আসিল ভিতর হইতেই।

অনুরাধা কহিল, কিন্তু দাদা নিজের সর্ত্ত ভঙ্গ করায় এখন সকল সর্ত্তই ভেঙে গেছে। এ-বাড়িতে থাকবার অধিকার আর আমাদের নেই। কিন্তু আমি একা স্ত্রীলোক, আর এই অনাথ ছেলেটা। ওর মা-বাপ নেই, আমি মানুষ করচি, আমাদের এই দুর্দ্দশায় দয়া করে দু'দিন থাকতে না দিলে একলা হঠাৎ কোথায় যাই এই আমার ভাবনা।

বিজয় বলিল, এর জবাব কি আমার দেবার? তোমার দাদা কোথায়?

মেয়েটি বলিল, আমি জানিনে তিনি কোথায়। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে এত-দিন দেখা করতে পারিনি সে শুধু এই ভয়ে, পাছে আপনি বিরক্ত হন। বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বোধ করি সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, কহিল, আপনি মনিব, আপনার কাছে কিছুই লুকোব না। অকপটে আমাদের বিপদের কথা জানালুম, নইলে একটা দিনও জোর করে এ-বাড়িতে বাস করার দাবী আমি করিনে। এই ক'টা দিন বাদে আমরা আপনিই চলে যাব।

তাহার কণ্ঠস্বরে বাহির হইতেও বুঝা গেল মেয়েটির চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। বিজয় দুঃখিত হইল, মনে মনে খুশীও হইল। সে ভাবিয়াছিল ইহাকে বে-দখল করিতে না জানি কত সময় ও কত হাঙ্গামাই পোহাইতে হইবে, কিন্তু কিছুই হইল না, সে অশ্রুজলে শুধু দয়া ভিক্ষা চাহিল। তাহার পকেটের পিস্তল এবং

দরওয়ানের লাঠি-সোটা তাহাকে গোপনে তিরস্কার করিল, কিন্তু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করাও চলে না। বলিল, থাকতে দিতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাড়িটা আমার নিজের বড় দরকার। যেখানে আছি সেখানে খুব অসুবিধে, তা ছাড়া আমাদের বাড়ির মেয়েরা একবার দেখতে আসতে চান।

মেয়েটি বলিল, বেশ ত, আসুন না। বাইরের ঘরগুলোতে আপনি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন, এবং ভিতরে দোতলায় অনেকগুলো ঘর। মেয়েরা অনায়াসে থাকতে পারেন, কোন কষ্ট হবে না। আর বিদেশে তাঁদের ত লোকের আবশ্যক, আমি অনেক কাজ করে দিতে পারব।

এবার বিজয় সলজ্জ আপত্তি করিয়া কহিল, না না, সে কি কখনো হতে পারে। তাঁদের সঙ্গে লোকজন সবাই আসবে, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কিন্তু ভিতরের ঘরগুলো কি আমি একবার দেখতে পারি?

উত্তর হইল, কেন পারবেন না, এ ত আপনারই বাড়ি। আসুন।

ভিতরে ঢুকিয়া বিজয় পলকের জন্য তাহার সমস্ত মুখখানি দেখিতে পাইল। মাথায় কাপড় আছে, কিন্তু ঘোমটায় ঢাকা নয়। পরণে একখানি আধময়লা আটপৌরে কাপড়, গায়ে গহনা নাই, শুধু দু'হাতে কয়েকগাছি সোনার চুড়ি—সাবেক-কালের। আড়াল হইতে তাহার অশ্রু-সিঞ্চিত কণ্ঠস্বর বিজয়ের কানে বড় মধুর ঠেকিয়াছিল, ভাবিয়াছিল মানুষটিও হয়ত এমনি হইবে। বিশেষতঃ, দরিদ্র হইলেও সে ত বড়ঘরের মেয়ে, কিন্তু দেখিতে পাইল তাহার প্রত্যাশার সঙ্গে কিছুই মিলিল না। রঙ ফর্সা নয়, মাজা শ্যাম। বরঞ্চ একটু কালোর দিকেই। সাধারণ পল্লীগ্রামের মেয়ে, আরও পাঁচজনকে যেমন দেখতে তেমনি। শরীর কৃশ, কিন্তু বেশ দৃঢ় বলিয়াই মনে হয়। শুইয়া বসিয়া ইহার আলস্যে দিন কাটে নাই, তাহাতে সন্দেহ হয় না। শুধু বিশেষত্ব চোখে পড়িল ইহার ললাটে—একেবারে আশ্চর্য্য নিখুঁত গঠন।

মেয়েটি কহিল, বিনোদদা, বাবুকে তুমি সব দেখিয়ে আনো, আমি রান্নাঘরে আছি।

তুমি সঙ্গে যাবে না রাধুদিদি?

না।

উপরে উঠিয়া বিজয় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল। ঘর অনেকগুলি। সাবেক-কালের অনেক আসবাব এখনো ঘরে ঘরে, কতক ভাঙ্গিয়াছে, কতক ভাঙ্গার পথে। এখন তাহাদের মূল্য সামান্যই, কিন্তু একদিন ছিল। সদর-বাটীর মত ঘরগুলিও জরাজীর্ণ, হাড়-পাঁজরা বার করা। দারিদ্র্যের দাগ সকল বস্তুতেই গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে।

বিজয় নীচে নামিয়া আসিলে অনুরাধা রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দরিদ্র ও দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও ভদ্রঘরের মেয়ে; এবার 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতে বিজয়ের লজ্জা পাইল, কহিল, আপনি কতদিন এ-বাড়িতে থাকতে চান?

ঠিক করে ত এক্ষুনি বলতে পারিনে, যে-ক'টা দিন আপনি দয়া করে থাকতে দেন।

দিন-কয়েক পারি, কিন্তু বেশীদিন ত পারব না। তখন কোথায় যাবেন?

সেই চিন্তাই ত দিনরাত করি।

লোকে বলে, আপনি গগন চটুয্যের ঠিকানা জানেন।

তারা আর কি বলে?

বিজয় এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। অনুরাধা কহিল, জানিনে তা আপনাকে আগেই বলেছি, কিন্তু জানলেও নিজের ভাইকে ধরিয়ে দেব এই কি আপনি আদেশ করেন?

তাহার কণ্ঠস্বরে তিরস্কার মাখানো। বিজয় ভারি অপ্রতিভ হইল, বুঝিল আভিজাত্যের চিহ্ন ইহার মন হইতে এখনো বিলুপ্ত হয় নাই। বলিল, না, সে কাজ আপনাকে আমি করতে বলিনে, পারি নিজেই খুঁজে বার করব, তাকে পালাতে দেব না। কিন্তু এতকাল ধরে সে যে আমাদের এই সর্ব্বনাশ করছিল এও কি আপনি জানতে পারেন নি বলতে চান?

কোন উত্তর আসিল না।

বিজয় বলিতে লাগিল, সংসারে কৃতজ্ঞতা বলে ত একটা কথা আছে। নিজের ভাইকে এই পরামর্শও কি কোনদিন দিতে পারেননি? আমার বাবা নিতান্ত নিরীহ মানুষ, আপনাদের বংশের প্রতি তাঁর অত্যন্ত মমতা, বিশ্বাসও ছিল তেমনি বড়, তাই গগনকে দিয়েছিলেন সমস্ত সঁপে, এ কি তারই প্রতিফল? কিন্তু নিশ্চিত জানাবেন আমি দেশে থাকলে কখনও এমন ঘটতে পারত না।

অনুরাধা নীরব। কোন কথারই জবাব পাইল না দেখিয়া বিজয় মনে মনে আবার উষ্ণ হইয়া উঠিল। তাহার যেটুকু করুণা জন্মিয়াছিল সমস্ত উবিয়া গেল, কঠিন হইয়া বলিল, সবাই জানে আমি কড়া লোক, বাজে দয়া-মায়া করিনে, দোষ করে আমার হাতে কেউ রেহাই পায় না, দাদার সঙ্গে দেখা হলে এটুকু অন্ততঃ তাকে জানিয়ে দেবেন।

অনুরাধা তেমনি মৌন হইয়া রহিল।

বিজয় কহিল, আজ সমস্ত বাড়িটার আমি দখল করে নিলাম। বাইরের ঘরগুলো পরিষ্কার হলে দিন-দুই পরে এখানে চলে আসব, মেয়েরা আসবেন তার পরে।

আপনি নীচের একটা ঘরে থাকুন যে কয়দিন না যেতে পারেন, কিন্তু কোন জিনিস-পত্র সরাবার চেষ্টা করবেন না।

কুমার বলিল, বাবা, তেষ্টা পেয়েচে আমি জল খাব।

এখানে জল পাবো কোথায় ?

অনুরাধা হাত নাড়িয়া ইসারায় তাহাকে কাছে ডাকিল, রান্নাঘরের ভিতরে আনিয়া কহিল, ডাব আছে, খাবে বাবা ?

হাঁ খাব।

সন্তোষ কাটিয়া দিতে ছেলেটা পেট ভরিয়া শাঁস ও জল খাইয়া বাহিরে আসিল, কহিল, বাবা তুমি খাবে ? খুব মিষ্টি।

না।

খাও না বাবা অনেক আছে। সব তো আমাদের।

কথাটা কিছুই নয়, তথাপি এতগুলি লোকের মধ্যে ছেলের মুখ হইতে কথাটা শুনিয়া হঠাৎ কেমন তাহার লজ্জা করিয়া উঠিল, কহিল, না না খাব না, তুই চলে আয়।

তিন

বাবুদের বাড়ির সদর অধিকার করিয়া বিজয় চাপিয়া বসিল। গোটা-দুই তাহার নিজের জন্য, বাকীগুলো হইল কাছারি। বিনোদ ঘোষ কোন-একসময়ে জমিদারী সেরেস্তায় চাকরি করিয়াছিল, সেই সুপারিশে নিযুক্ত হইল নূতন গোমস্তা। কিন্তু ঝঞ্ঝাট মিটিল না। প্রধান কারণ, গগন চাটুয্যে টাকা আদায় করিয়া হাতে হাতে রসিদ লিখিয়া দেওয়া অপমানকর জ্ঞান করিত, যেহেতু তাহাতে অবিশ্বাসের গন্ধ আছে—সেটা চাটুয্যে-বংশের অগৌরব। সুতরাং তাহার অন্তর্ধানের পরে প্রজারা বিপদে পড়িয়াছে, মৌখিক সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া নিত্যই হাজির হইতেছে, কাঁদা-কাটা করিতেছে—কে কত দিয়াছে, কত বাকী রাখিয়াছে নিরূপণ করা একটা কষ্টসাধ্য জটিল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। বিজয় যত শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিবে মনে করিয়াছিল তাহা হইল

না, একদিন দুইদিন করিয়া দশ-বারোদিন কাটিয়া গেল। এদিকে ছেলেটা হইয়াছে সন্তোষের বন্ধু, বয়সে তিন-চার বছরের ছোট, সামাজিক ও সাংসারিক ব্যবধানও অত্যন্ত বৃহৎ, কিন্তু অন্য সঙ্গীর অভাবে সে মিশিয়া গেছে ইহারই সঙ্গে। ইহারই সঙ্গে থাকে বাটীর ভিতরে, ঘুরিয়া বেড়ায় বাগানে বাগানে নদীর ধারে—কাঁচা আম কুড়াইয়া, পাখীর বাসা খুঁজিয়া। খায় অধিকাংশ সময়ে সন্তোষের মাসীর কাছে, ডাকে তাহারি দেখাদেখি মাসীমা বলিয়া। বাহিরে টাকা-কড়ি হিসাব-পত্র লইয়া বিজয় বিব্রত, সকল সময়ে ছেলের খোঁজ করিতে পারে না, যখন পারে তখন তাহার দেখা মিলে না। হঠাৎ কোনদিন হয়ত বকাঝকা করে, রাগ করিয়া কাছে বসাইয়া রাখে, কিন্তু ছাড়া পাইলেই ছেলেটা দৌড় মারে মাসীমার রান্নাঘরে। সন্তোষের পাশে বসিয়া খায় দুপুরবেলা ভাত, বিকালে তাহারি সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া লয় রুটি ও নারিকেল-নাড়ু।

সেদিন বিকালে লোকজন তখনো কেহ আসিয়া পৌঁছায় নাই, বিজয় চা খাইয়া চুরুট ধরাইয়া ভাবিল নদীর ধারটা খানিক ঘুরিয়া আসে। হঠাৎ মনে পড়িল সমস্ত-দিন ছেলেটার দেখা নাই। পুরাতন চাকরটা দাঁড়াইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, কুমার কোথা রে?

সে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, বাড়ির মধ্যে।

ভাত খেয়েছিল?

না।

জোর করে ধরে এনে খাওয়াস্‌নে কেন?

এখানে খেতে চায় না, রাগ করে ছড়িয়ে ফেলে দেয়।

কাল থেকে আমার সঙ্গে ওর খাবার জায়গা করে দিস্‌, বলিয়া কি ভাবিয়া আর সে বেড়াইতে গেল না, সোজা ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত হইতে পুত্রের কণ্ঠস্বর কানে গেল—মাসীমা, আর একখানা রুটি আর দুটো নারকেল-নাড়ু—শীগ্‌গির!

যাহাকে আদেশ করা হইল সে কহিল, নেবে আয় না বাবা, তোদের মত আমি কি গাছে উঠতে পারি?

জবাব হইল—পারবে মাসীমা, কিচ্ছু শক্ত নয়। এই মোটা ডালটায় পা দিয়ে ওই ছোট ডালাটা ধরে এক টান দিলেই উঠে পড়বে।

বিজয় কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘরের সম্মুখে একটা বড় আম গাছ, তাহার দু'দিকের দুই মোটা ডালে বসিয়া কুমার ও বন্ধু সন্তোষ। পা ঝুলাইয়া গুঁড়িতে ঠেস

দিয়া উভয়ের ভোজন-কার্য্য চলিতেছে, তাহাকে দেখিয়া দু'জনেই ত্রস্ত হইয়া উঠিল। অনুরাধা রান্নাঘরের দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, ওই কি ওদের খাবার যায়গা নাকি?

কেহ উত্তর দিল না। বিজয় অন্তরালবর্ত্তিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আপনার ওপর দেখচি ও খুব অত্যাচার করচে।

এবার অনুরাধা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, বলিল, হাঁ।

তবু ত প্রশ্রয় কম দিচ্চেন না-- কেন দিচ্চেন?

না দিলে আরও বেশী উপদ্রব করবে সেই ভয়ে।

কিন্তু বাড়িতে ত এ-রকম উৎপাত করে না শুনেচি।

হয়ত করে না। ওর মা নেই, ঠাকুরমা প্রায়ই শয্যাগত, বাপ থাকেন বাইরে কাজ-কর্ম্ম নিয়ে, উৎপাত করবে কার ওপর?

বিজয় ইহা জানে না তাহা নয়, তথাপি ছেলেটার যে মা নাই এই কথাটা পরের মুখে শুনিয়া তাহার ক্লেশ বোধ হইল, কহিল, আপনি দেখচি অনেক বিষয় জানেন, কে বললে আপনাকে? কুমার?

অনুরাধা ধীরে ধীরে কহিল, বলবার বয়েস ওর হয়নি, তবু ওর মুখ থেকেই শুনতে পাই। দুপুরবেলা রোদ্দুরে ওদের আমি বেরাতে দিইনে, তবু ফাঁকি দিয়ে পালায়। যেদিন পারে না আমার কাছে শুয়ে বাড়ির গল্প করে।

বিজয় তাহার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু সেই প্রথম দিনটির মত আজো সেই কণ্ঠস্বর বড় মধুর লাগিল; তাই বলার জন্য নয়, কেবল শোনার জন্যই কহিল, এবার বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর মুস্কিল হবে।

কেন?

তার কারণ উপদ্রব জিনিসটা নেশার মত। না পেলে কষ্ট হয়, শরীর আই-ঢাই করে। কিন্তু সেখানে ওর নেশার খোরাক যোগাবে কে? দু'দিনেই ত পালাই পালাই করবে।

অনুরাধা আস্তে আস্তে বলিল, না ভুলে যাবে— কুমার, নেবে এসো বাবা, রুটি নিয়ে যাও।

কুমার বাটি হাতে করিয়া নামিয়া আসিল এবং মাসীর হাত হইতে আরও কয়েকটা রুটি ও নারিকেল-নাড়ু লইয়া তাঁহারই গা ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া আহার করিতে লাগিল, গাছে উঠিল না। বিজয় চাহিয়া দেখিল, সেগুলি তাহাদের ধনী-গৃহের তুলনায় পদ-গৌরবে যেমনি হীন হোক, সত্যকার মর্য্যাদায় কিছু মাত্র খাটো নয়। কেন যে ছেলেটা মাসীর রান্নাঘরের প্রতি এত আসক্ত বিজয় তাহার কারণ বুঝিল।

সে ভাবিয়া আসিয়াছিল কুমারের লুব্ধতায় তাঁহার অহেতুক ও অতিরিক্ত ব্যয়ের কথা তুলিয়া প্রচলিত শিষ্টবাক্যে পুত্রের জন্য সঙ্কোচ প্রকাশ করিবে এবং করিতেও যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। কুমার বলিল, মাসীমা, কালকের মত চন্দ্রপুলি করতে আজও যে তোমাকে বলেছিলুম, করোনি কেন?

মাসীমা কহিল, অন্যায় হয়ে গেছে বাবা, সাবধান হইনি। সমস্ত দুধ বেড়ালে উল্টে ফেলে দিয়েচে—কাল আর এমন হবে না।

কোন্ বিড়ালটা বল ত? শাদাটা?

সেইটেই বোধ হয়, বলিয়া অনুরাধা হাতে দিয়া তাঁহার মাথার এলো-মেলো চুলগুলি সোজা করিয়া দিতে লাগিল।

বিজয় কহিল, উৎপাত ত দেখচি ক্রমশঃ জুলুমে গিয়ে ঠেকেচে।

কুমার বলিল, খাবার জল কৈ!

ঐ যাঃ—ভুলে গেচি বাবা, এনে দিচ্চি।

তুমি সবই ভুলে যাও মাসীমা। তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না।

বিজয় বলিল, আপনার বকুনি খাওয়াই উচিত। ত্রুটি পদে পদে।

হাঁ, বলিয়া অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল। অসতর্কতাবশতঃ এ হাসি বিজয়ের চোখে পড়িল। পুত্রের অবৈধ আচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করা আর হইল না, পাছে তাহার ভদ্রবাক্য অভদ্র ব্যঙ্গের মত শুনায়, পাছে এই মেয়েটির মনে হয় তাহার দৈন্য ও দুর্দ্দশাকে সে কটাক্ষ করিতেছে।

পরদিন দুপুরবেলা অনুরাধা কুমার ও সন্তোষকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তরকারি পরিবেশন করিতেছে, তাহার মাথায় কাপড় খোলা, গায়ের বস্ত্র অসংবৃত, অকস্মাৎ দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িতে অনুরাধা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, ছোটবাবু। শশব্যস্তে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয় বলিল, একটা অত্যন্ত জরুরি পরামর্শের জন্য আপনার কাছে এলুম। বিনোদ ঘোষ গ্রামের লোক, অনেকদিন দেখেচেন, ও কি-রকম লোক বলতে পারেন। ওকে গণেশপুরের নতুন গোমস্তা বহাল করেচি, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় কি না— আপনার কি মনে হয়?

বিনোদ এক সপ্তাহের অধিক কাজ করিতেছে, যথাসাধ্য ভালো কাজই করিতেছে, কোন গোলযোগ ঘটায় নাই। সহসা হন্তদন্ত হইয়া তাঁহার চরিত্রের খোঁজ-তল্লাস করিবার

এখনই কি প্রয়োজন হইল অনুরাধা ভাবিয়া পাইল না। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, বিনোদদা কি কিছু করেচেন?

এখনো কিছু করেনি, কিন্তু সতর্ক হওয়া ত প্রয়োজন।

তাঁকে ভালো লোক বলেই ত জানি।

সত্যি জানেন, না, নিন্দে করবেন না বলেই ভালো বলচেন?

আমার ভালো-মন্দ বলার কি কিছু দাম আছে?

আছে বই কি। সে যে আপনাকেই প্রামাণ্য সাক্ষী মেনে বসেচে।

অনুরাধা একটু ভাবিয়া বলিল, উনি ভালো লোকই বটে। শুধু একটু চোখ রাখবেন। নিজের অবহেলায় ভালো লোকও মন্দ হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

বিজয় কহিল, সত্যই তাই। কারণ, অপরাধের হেতু খুঁজতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই অবাক্ হতে হয়।

ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোর ভাগ্য ভালো যে হঠাৎ এক মাসীমা পেয়ে গেছিস, নইলে এই বন-বাদাড়ের দেশে অর্দ্ধেক দিন না খেয়ে কাটাতে হ'তো।

অনুরাধা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি এখানে খাবার কষ্ট হচ্চে?

বিজয় হাসিয়া বলিল, না, এমনিই বললুম। চিরকাল বিদেশে বিদেশে কাটিয়েচি, খাবার কষ্ট বড় গ্রাহ্য করিনে। বলিয়া চলিয়া গেল। অনুরাধা জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল তাহার স্নান পর্য্যন্ত এখনো হয় নাই।

চার

এ-বাড়িতে আসিয়া একটা পুরাতন আরাম-কেদারা যোগাড় হইয়াছিল, বিকালের দিকে তাহারি দুই হাতলে পা ছড়াইয়া দিয়া বিজয় চোখ বুজিয়া চুরুট টানিতেছিল, কানে গেল—বাবুমশাই! চোখ মেলিয়া দেখিল, অনতিদূরে দাঁড়াইয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাকে সসম্মান সম্বোধন করিতেছে। বিজয় উঠিয়া বসিল। ভদ্রলোকের বয়স ষাটের উপরে গিয়াছে, কিন্তু দিব্য গোলগাল বেঁটে-খাটো শক্ত-সমর্থ দেহ। গোঁফ পাকিয়া শাদা হইয়াছে, কিন্তু মাথার প্রশস্ত টাকের আশে-পাশের চুলগুলি

ভ্রমর-কৃষ্ণ। সম্মুখের গোটা-কয়েক ছাড়া দাঁতগুলি প্রায় সমস্ত বিদ্যমান। গায়ে তসরের কোট, গরদের চাদর, পায়ে চীনা-বাড়ির বার্নিশকরা জুতা, ঘড়ির সোনার চেন হইতে সোনা-বাঁধানো বাঘের নক ঝুলিতেছে। পল্লী-অঞ্চলে ভদ্রলোকটিকে অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। পাশে একটা ভাঙা টুলের উপর বিজয়ের চুরুটের সাজ-সরঞ্জাম থাকিত, সরাইয়া লইয়া তাঁহাকে বসিতে দিল।

ভদ্রলোক বসিয়া বলিলেন, নমস্কার বাবু।

বিজয় কহিল, নমস্কার।

আগন্তুক বলিলেন, আপনারা গ্রামের জমিদার, মহাশয়ের পিতাঠাকুর হচ্ছেন কৃতি ব্যক্তি—লক্ষপতি। নাম করলে সুপ্রভাত হয়—আপনি তাঁরই সুসন্তান। স্ত্রীলোকটিকে দয়া না করলে সে যে ভেসে যায়।

কে স্ত্রীলোক? কত টাকা বাকী?

ভদ্রলোক বলিলেন, টাকার ব্যাপার নয়। স্ত্রীলোকটি হচ্চে ঈশ্বর অমর চাটুয্যের কন্যা—প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি—গগন চাটুয্যের বৈমাত্রেয় ভগিনী। এ তার পৈতৃক গৃহ। সে থাকবে না, চলে যাবে—তার ব্যবস্থাও হয়েচে—কিন্তু আপনি যে তাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিচ্চেন, এ কি মহাশয়ের কর্ত্তব্য?

এই অশিক্ষিত বৃদ্ধের প্রতি ক্রোধ করা চলে না বিজয় মনে মনে বুঝিল, কিন্তু কথা বলার ধরণে জ্বলিয়া গেল। কহিল, আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝব, কিন্তু আপনি কে যে তাঁর হয়ে ওকালতি করতে এসেচেন?

বৃদ্ধ বলিলেন, আমার নাম ত্রিলোচন গাঙ্গুলি, পাশের গ্রামে মসজিদপুরে বাড়ি—সবাই চেনে। আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে আমার কাছে গিয়ে হাত পাততে হয় না এমন লোক এদিকে কম। বিশ্বাস না হয় বিনোদ ঘোষকে জিজ্ঞেস করবেন।

বিজয় কহিল, আমার হাত পাতবার দরকার হলে মশায়ের খোঁজ নেব, কিন্তু যাঁর ওকালতি করতে এসেচেন তাঁর আপনি কে জানতে পারি কি?

ভদ্রলোক রসিকতার ছলে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, কুটুম্ব। বোশেখের এই ক'টা দিন বাদে আমি ওঁকে বিবাহ করব।

বিজয় চকিত হইয়া কহিল, আপনি বিবাহ করবেন অনুরাধাকে?

আজ্ঞে হাঁ। আমার স্থির সঙ্কল্প। জ্যৈষ্ঠ ছাড়া আর দিন নেই, নইলে এই মাসেই শুভকর্ম্ম সমাধা হয়ে যেত, থাকতে দেবার কথা আপনাকে আমার বলতেও হ'তো না।

বিজয় কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া প্রশ্ন করিল, বিয়ের ঘটকালী করলে কে? গগন চাটুয্যে?

বৃদ্ধ রোষ-কষায়িত চক্ষে কহিলেন, সে ত ফেরারী আসামী মশাই—প্রজাদের সর্ব্বনাশ করে চম্পট দিয়েচে। এতদিন সেই ত বাধা দিচ্ছিল, নইলে অঘ্রাণেই বিবাহ হয়ে যেত। বলে, স্বভাব-কুলীন, আমরা কৃষ্ণের সন্তান—বংশজের ঘরে বোন দেব না। এই ছিল তার বুলি। এখন সে গুমোর রইল কোথায়? বংশজের ঘরে যেচে আসতে হ'লো যে! এখনকার দিনে কুল কে খোঁজে মশাই? টাকাই কুল, টাকাই মান, টাকাই সব—বলুন ঠিক কি না?

বিজয় বলিল, হাঁ ঠিক। অনুরাধা স্বীকার করেচেন?

ভদ্রলোক সদম্ভে জানুতে চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন, স্বীকার? বলচেন কি মশাই, যাচা-যাচি! শহর থেকে এসে আপনি একটা তাড়া লাগাতেই দু'চোখে অন্ধকার—যাই মা তারা দাঁড়াই কোথা! নইলে আমার ত মতলব ঘুরে গিয়েছিল। ছেলেদের অমত, বৌমাদের অমত, মেয়ে-জামাইরা সব বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—আমিও ভেবেছিলুম, দূর হোগ গে, দু-সংসার তো হ'লো, আর না। কিন্তু লোক দিয়ে নিজে ডেকে পাঠিয়ে রাধা কেঁদে বললে, 'গাঙুলীমশাই, পায়ে স্থান দাও। তোমার ঘরে উঠোন ঝাঁট দিয়ে খাব সেও আমার ভালো। কি করি, স্বীকার করলুম।

বিজয় নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া রহিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, বিবাহও এ-বাড়িতেই হবে। দেখতে একটু খারাপ দেখাবে, নইলে আমার বাড়িতেই হতে পারত। গগন চাটুয্যের কে এক পিসী আছে সে-ই কন্যা সম্প্রদান করবে। এখন কেবল মশাই রাজি হলেই হয়।

বিজয় মুখ তুলিয়া বলিল, রাজি হয়ে আমাকে কি করতে হবে বলুন? তাড়া দেব না—এই ত? বেশ, তাই হবে। এখন আপনি আসুন, নমস্কার।

নমস্কার মশাই, নমস্কার। হবেই ত, হবেই ত। আপনার ঠাকুর হলেন লক্ষপতি! প্রাতঃস্মরণীয় লোক, নাম করলে সুপ্রভাত হয়।

তা হয়, আপনি এখন আসুন।

আসি মশাই, আসি—নমস্কার! বলিয়া ত্রিলোচন প্রস্থান করিলেন।

লোকটি চলিয়া গেলে বিজয় চুপ করিয়া বসিয়া নিজেকে বুঝাইতেছিল যে, তাহার মাথা-ব্যথা করিবার কি আছে? বস্তুতঃ এ-ছাড়া মেয়েটিরই বা উপায় কি? ব্যাপারটা অভাবিতপূর্ব্বও নয়, সংসারে ঘটে না তাও নয়, তবে তাহার দুশ্চিন্তা কিসের? হঠাৎ বিনোদ ঘোষের কথা মনে পড়িল, সেদিন সে বলিতেছিল, অনুরাধা দাদার সঙ্গে এই বলিয়া ঝগড়া করিয়াছে যে, কুলের গৌরব লইয়া সে কি করিবে, সহজে দুটা খাইতে-পরিতে যদি পায় সেই যথেষ্ট।

প্রতিবাদে গগন রাগ করিয়া বলিয়াছিল, তুই কি বাপ-পিতামহের নাম ডোবাতে চাস্ ? অনুরাধা জবাব দিয়াছিল, তুমি তাদের বংশধর, নাম বজায় রাখতে পার রেখো, আমি পারব না।

এ-কথার বেদনা বিজয় বুঝিল না, নিজেও সে যে কৌলিন্য-সম্মান এতটুকু বিশ্বাস করে তাও না, কিন্তু তবুও তাহার সহানুভূতি গিয়া পড়িল গগনের 'পরে এবং অনুরাধার তীক্ষ্ণ প্রত্যুত্তর যতই সে মনে মনে তোলাপাড়া করিতে লাগিল ততই তাহাকে লজ্জাহীন, লোভী ও হীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

এদিকে উঠানে ক্রমশঃ লোক জমিতেছে, এইবার তাহাদিগকে লইয়া কাজ শুরু করিতে হইবে, কিন্তু আজ তাঁহার কিছুই ভাল লাগিল না। দরওয়ানকে দিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিল এবং একাকী বসিয়া থাকিতে না পারিয়া কি ভাবিয়া সে একেবারে বাটীর মধ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। রান্নাঘরের সম্মুখেই খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অনুরাধা শুইয়া, তাহার দুইপাশে দুই ছেলে কুমার ও সন্তোষ—মহাভারতের গল্প চলিতেছে। রাত্রের রান্নাটা বেলা-বেলি সারিয়া লইয়া নিত্যই সে এমনি ছেলেদের লইয়া সন্ধ্যার পরে গল্প করে, তারপরে কুমারকে খাওয়াইয়া বাইরে তাহার পিতার কাছে পাঠাইয়া দেয়। জ্যোৎস্না রাত্রি, ঘন-পল্লব আমগাছের পাতার ফাঁক দিয়া আসিয়া টুকরা চাঁদের আলো স্থানে স্থানে তাহাদের গায়ের 'পরে, মুখের 'পরে পড়িয়াছে।

গাছের ছায়ায় একটা লোককে এদিকে আসিতে দেখিয়া অনুরাধা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ?

আমি বিজয়।

তিনজনেই শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল। সন্তোষ ছোটবাবুকে অত্যন্ত ভয় করে, প্রথম দিনের স্মৃতি সে ভুলে নাই, উসখুস্ করিয়া উঠিয়া গেল, কুমারও বন্ধুর অনুসরণ করিল।

বিজয় বলিল, ত্রিলোচন গাঙ্গুলীকে আপনি চেনেন ? আজ তিনি আমার কাছে এসেছিলেন।

অনুরাধা বিস্মিত হইল,—আপনার কাছে ? কিন্তু আপনি ত তাঁর খাতক ন'ন।

না। কিন্তু হলে হয়ত আপনার সুবিধে হ'তো, আমার একদিনের অত্যাচার আপনি আর একদিন শোধ দিতে পারতেন।

অনুরাধা চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় বলিল, তিনি জানিয়ে গেলেন, আপনার সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হয়েচে। এ কি সত্য ?

হাঁ।

আপনি নিজে উপযাচক হয়ে তাঁকে রাজি করিয়েচেন?

হাঁ তাই।

তাই যদি হয়ে থাকে এ অত্যন্ত লজ্জাকর কথা। শুধু আপনার নয়, আমারও।

আপনার লজ্জা কিসের?

সেই কথা জানাতেই আমি এসেচি। ত্রিলোচন বলে গেল, শুধু আমার তাড়াতেই বিভ্রান্ত হয়ে নাকি আপনি এ প্রস্তাব করেচেন। বলেচেন, আপনার দাঁড়াবার স্থান নেই এবং বহু সাধ্য-সাধনায় তাকে সম্মত করিয়েচেন, নইলে এ-বয়সে বিবাহের ইচ্ছে সে ত্যাগ করেছিল। শুধু আপনার কান্নাকাটিতে দয়া করে ত্রিলোচন রাজি হয়েচে।

হাঁ, এ-সবই সত্যি।

বিজয় কহিল, আমার তাড়া দেওয়া আমি প্রত্যাহার করচি, এবং নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করচি।

অনুরাধা চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় বলিল, এবার নিজের তরফ থেকে আপনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন।

না, সে হয় না। আমি কথা দিয়েচি -সবাই শুনেচে—লোকে তাঁকে উপহাস করবে।

এতে করবে না? বরঞ্চ ঢের বেশী করবে। তার উপযুক্ত ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিবাদ বাধবে, তাদের সংসারে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, আপনার নিজের অশান্তির সীমা থাকবে না, এ-সব কি ভেবে দেখেননি?

অনুরাধা মৃদু-কণ্ঠে বলিল, দেখেচি। আমার বিশ্বাস এ-সব কিছুই হবে না।

শুনিয়া বিজয় অবাক্ হইয়া গেল, কহিল, সে বৃদ্ধ ক'টা দিন বাঁচবে আশা করেন?

অনুরাধা বলিল, স্বামীর পরমায়ু সংসারে সকল স্ত্রীই বেশী আশা করে। এমনও হতে পারে হাতের নোয়া নিয়ে আমি আগে চলে যাব।

বিজয় এ-কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এমনি নীরবে কাটিলে অনুরাধা বিনীত-স্বরে কহিল, আপনি আমাকে চলে যেতে হুকুম করেচেন সত্যি, কিন্তু কোনদিন তার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নি। দয়ার যোগ্য নই, তবু যথেষ্ট দয়া করেচেন, মনে মনে আমি যে কত কৃতজ্ঞ তা জানাতে পারিনে।

বিজয়ের কাছে উত্তর না পাইয়া সে বলিতে লাগিল, ভগবান জানেন আপনার বিরুদ্ধে কারো কাছে আমি একটা কথাও বলিনি। বললে আমার অন্যায় হ'তো,

আমার মিছে কথা হ'তো। গাঙ্গুলীমশাই যদি কিছু বলে থাকেন সে তাঁর নিজের কথা, আমার নয়। তবু তাঁর হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের কবে বিয়ে, তেরই জ্যৈষ্ঠ? তা হলে প্রায় মাস-খানেক বাকী রইল– না?

হাঁ, তাই।

এর আর পরিবর্ত্তন নেই বোধ করি?

বোধ হয় নেই। অন্ততঃ সেই ভরসাই তিনি দিয়ে গেছেন।

বিজয় বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, তা হলে আর কিছু আমার বলবার নেই, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটা একবার ভেবে দেখলেন না আমার এই বড় পরিতাপ।

অনুরাধা বলিল, একবার নয়, একশোবার ভেবে দেখেছি ছোটবাবু। এই আমার রাত্রিদিনের চিন্তা। আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সত্যিই ভাষা খুঁজে পাইনে, কিন্তু আপনি নিজে একবার আমার কথা ভেবে দেখুন দিকি। অর্থ নেই, রূপ নেই, গৃহ নেই, অভিভাবকহীন একাকী, পল্লীগ্রামের অনাচার-অত্যাচার থেকে কোথাও গিয়ে দাঁড়াবার স্থান নেই—বয়স হলো তেইশ-চব্বিশ—ইনি ছাড়া আমাকে কে বিয়ে করতে চাইবে বলুন ত? তখন অন্নের জন্য কার কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াব? শুনে আপনারই বা কি মনে হবে?

এ সবই সত্য, প্রতিবাদে কিছুই বলিবার নাই। মিনিট দুই-তিন নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া বিজয় গভীর অনুতাপের সহিত বলিল, এ-সময়ে আপনার কি আমি কোন উপকারই করতে পারিনে? পারলে খুশী হবো।

অনুরাধা কহিল, আপনি আমার অনেক উপকার করেচেন যা কেউ করত না। আপনার আশ্রয়ে আমি নির্ভয়ে আছি—ছেলে দুটি আমার চন্দ্র-সূর্য্যি--এই আমার ঢের। আপনার কাছে প্রার্থনা, শুধু মনে মনে আর আমাকে আমার দাদার দোষের ভাগী করে রাখবেন না, আমি জেনে কোন অপরাধ করিনি।

সে আমি জানতে পেরেচি, আপনাকে বলতে হবে না। বলিয়া বিজয় ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল।

পাঁচ

কলিকাতা হইতে কিছু তরি-তরকারি ও ফল-মূল মিষ্টান্ন আসিয়াছিল; বিজয় চাকরকে দিয়া ঝুড়িটা আনিয়া রান্নাঘরের সুমুখে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, ঘরে আছেন নিশ্চয়ই—

ভিতর হইতে মৃদু-কণ্ঠে সাড়া আসিল, আছি।

বিজয় বলিল, মুস্কিল হয়েচে আপনাকে ডাকায়। আমাদের সমাজে হলে মিস্ চ্যাটার্জি কিংবা মিস্ অনুরাধা বলে অনায়াসে ডাকা চলত, কিন্তু এখানে তা অচল। আপনার ছেলে দুটোর কেউ উপস্থিত থাকলে 'তোদের মাসীকে ডেকে দে' বলে কাজ চালাতুম, কিন্তু তারাও ফেরার। কি বলে ডাকি বলুন ত?

অনুরাধা দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, আপনি মনিব, আমাকে রাধা বলে ডাকবেন।

বিজয় বলিল, ডাকতে আপত্তি নেই, কিন্তু মনিবানা-স্বত্বের জোরে নয়। দায় ছিল গগন চাটুয্যের, কিন্তু সে দিলে গা-ঢাকা; মনিব বলে আপনি কেন মানতে যাবেন? আপনার গরজ কিসের?

ভিতর হইতে শুধু শোনা গেল, ও-কথা বলবেন না, আপনি মনিব বই কি।

বিজয় বলিল, সে দাবী করিনে, কিন্তু বয়সের দাবী করি। আমি অনেক বড়, নাম ধরে ডাকলে যেন রাগ করবেন না।

না।

বিজয় এটা দেখিয়াছে যে ঘনিষ্ঠতা করার আগ্রহ তাহার দিক দিয়া যত প্রবলই হোক, ও-পক্ষ হইতে লেশমাত্র নাই। সে কিছুতে সুমুখে আসে না এবং সংক্ষেপে ও সম্ভ্রমের সঙ্গে বারবরই আড়াল হইতে উত্তর দেয়।

বিজয় বলিল, বাড়ি থেকে কিছু তরি-তরকারি, কিছু ফল-মূল মিষ্টি এসে পৌঁছেচে। ঝুড়িটি তুলে রাখুন, ছেলেদের দেবেন।

থাক্। দরকার-মত রেখে আপনার বাইরে পাঠিয়ে দেব।

না, সে করবেন না। আমার বামুনটা রাঁধতেও জানে না, দুপুর থেকে দেখচি চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। কি জানি আপনাদের দেশের ম্যালেরিয়া তাকে ধরলে কি না। তা হলে ভোগাবে।

কিন্তু ম্যালেরিয়া ত আমাদের দেশে নেই। বামুন না উঠলে এ-বেলা আপনার রাঁধবে কে?

বিজয় বলিল, এ-বেলার কথা ছেড়ে দিন, ভেবে দেখব কাল সকালে। আর কুকারটা ত সঙ্গেই আছে, শেষ পর্যন্ত চাকরকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে পারব।

কিন্তু তাতে কষ্ট হবে ত?

না। নিজের অভ্যাস আছে, শুধু কষ্ট হতে পারত ছেলের খাবার কষ্ট চোখে দেখলে। কিন্তু সে ভার সে ত আপনি নিয়েচেন। কি রাঁধচেন এ বেলা? ঝুড়িটা খুলে দেখুন না যদি কাজে লাগে।

কাজে লাগবে বই কি। কিন্তু এ-বেলা আমার রান্না নেই।

নেই? কেন?

কুমারের একটু গা গরম হয়েচে, রাধলে সে খাবার উপদ্রব করবে। ও-বেলার যা আছে তাতে সন্তোষের চলে যাবে।

গা গরম হয়েচে তার? কোথায় আছে সে?

আছে আমার বিছানায় শুয়ে—সন্তোষের সঙ্গে গল্প করচে। আর বলছিল বাইরে যাবে না, আমার কাছে শোবে।

বিজয় বলিল, তা শুক, কিন্তু, বেশী আদর পেলে মাসীকে ছেড়ে ও বাড়ি যেতে চাইবে না। তখন ওকে নিয়ে বিভ্রাট বাধবে।

না, বাধবে না। কুমার অবাধ্য ছেলে নয়।

বিজয় বলিল, কি হলে অবাধ্য হয় সে আপনি জানেন, কিন্তু শুনতে পাই আপনার 'পরে সে কম উৎপাত করে না।

অনুরাধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও উপদ্রব যদি করে আমার ওপরেই করে, আর কারো ওপরে না।

বিজয় বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু মাসীই না হয় সহ্য করলে, কিন্তু জ্যাঠাইমা সইবে না। তার বিমাতা যদি আসেন তিনি এতটুকু অত্যাচারও বরদাস্ত করবেন না। অভ্যাস বিগড়লে ওর বিপদ ঘটবে যে!

ছেলের বিপদ ঘটবে এমন বিমাতা ঘরে আনবেন কেন? না-ই বা আনলেন।

বিজয় বলিল, আনতে হয় না, ছেলের কপাল ভাঙলে বিমাতা আপনি এসে ঘরে ঢোকেন। তখন বিপদ ঠেকাতে মাসীর শরণাপন্ন হতে হয়, অবশ্য তিনি যদি রাজি হন।

অনুরাধা বলিল, যার মা নেই, মাসী তাকে ফেলতে পারে না। যত দুঃখে হোক মানুষ করে তোলেই।

কথাটা শুনে রাখলুম, বলিয়া বিজয় চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া আসিয়া কহিল, যদি অবিনয় না মনে করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

করুন।

কুমারের চিন্তা পরে করা যাবে, কারণ তার বাপ বেঁচে আছে। তাকে যত পাষণ্ড লোকে ভাবে সে তা নয়। কিন্তু সন্তোষ? তার বাপ-মা দুই-ই গেছে, নতুন মেসো ত্রিলোচনের ঘরে যদি তার ঠাঁই না হয়, কি করবেন তাকে নিয়ে? ভেবেচেন সে-কথা?

অনুরাধা বলিল, মাসীর ঠাঁই হবে বোনপোর হবে না?

হওয়াই উচিত, কিন্তু যেটুকু তাঁর দেখতে পেলুম তাতে ভরসা বড় হয় না।

এ-কথার জবাব অনুরাধা তৎক্ষণাৎ দিতে পারিল না, ভাবিতে একটু সময় লাগিল, তার পর শান্ত দৃঢ়-কণ্ঠে কহিল, তখন গাছতলায় দু'জনের স্থান হবে। সে কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

বিজয় বলিল, মাসীর যোগ্য কথা অস্বীকার করিনে, কিন্তু সে সম্ভব নয়। তখন আমার কাছে তাকে পাঠিয়ে দেবেন। কুমারের বন্ধু ও, সে যদি মানুষ হয় সন্তোষও হবে।

ভিতর হইতে আর কোন জবাব আসিল না, বিজয় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই-তিন পরে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সন্তোষ বলিল, মাসীমা আপনাকে খেতে ডাকচেন।

আমাকে?

হাঁ, বলিয়াই সে প্রস্থান করিল।

অনুরাধার রান্নাঘরে খাবার ঠাঁই করা। বিজয় আসনে বসিয়া বলিল, রাত্রিটা অনায়াসে কেটে যেত, কেন আবার কষ্ট করলেন?

অনুরাধা অনতিদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, চুপ করিয়া রহিল।

ভোজ্যবস্তুর বাহুল্য নাই, কিন্তু যত্নের পরিচয় প্রত্যেকটি জিনিসে। কি পরিপাটি করিয়াই না খাবারগুলি সাজানো। আহারে বসিয়া বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, কুমার কি খেলে?

সাগু খেয়ে সে ঘুমিয়েচে।

ঝগড়া করেনি আজ?

অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আমার কাছে শোবে বলে আজ ও ভারী শান্ত। মোটে ঝগড়া করেনি।

বিজয় বলিল, ওকে নিয়ে আপনার ঝঞ্ঝাট বেড়েচে, কিন্তু আমার দোষে নয়। ও নিজেই কি করে যে আপনার সংসারের মধ্যে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল তাই আমি ভাবি।

আমিও ঠিক তাই ভাবি।

মনে হয়, ও বাড়ি চলে গেলে আপনার কষ্ট হবে।

অনুরাধা চুপ করিয়া কহিল, পরে বলিল, নিয়ে যাবার আগে কিন্তু আপনাকে একটি কথা দিয়ে যেতে হবে। আপনাকে চোখ রাখতে হবে ও যেন কষ্ট না পায়।

কিন্তু আমি ত থাকি বাইরে নানা কাজে ব্যস্ত, কথা রাখতে পারব বলে ভরসা হয় না।

তা হলে আমার কাছে ওকে দিয়ে যেতে হবে।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে সে আরও অসম্ভব। বলিয়া বিজয় হাসিয়া খাওয়ায় মন দিল। একসময়ে বলিল, আমার বৌদিদিদের আসার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা বোধ করি আর এলেন না।

কেন?

যে খেয়ালে বলেছিলেন সম্ভবতঃ সেটা গেছে। শহরের লোক পাড়াগাঁয়ে সহজে পা বাড়াতে চান না। একপ্রকার ভালই হয়েচে। একা আমিই ত আপনার যথেষ্ট অসুবিধে ঘটিয়েছি, তাঁরা এলে সেটা বাড়ত।

অনুরাধা এ-কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ বলা আপনার অন্যায়। বাড়ি আমার নয়, আপনাদের। তবু আমিই সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে থাকব, তাঁরা এলে রাগ করব, এর চেয়ে অন্যায় হতেই পারে না। আমার সম্বন্ধে এমন কথা ভাবা আমার প্রতি সত্যিই আপনার অবিচার। যত দয়া আমাকে করেচেন আমার দিক থেকে এই কি তার প্রতিদান?

এত কথা এমন করিয়া সে কখনো বলে নাই। জবাব শুনিয়া বিজয় আশ্চর্য্য হইয়া গেল—যতটা অশিক্ষিত এই পাড়াগাঁয়ের মেয়েটিকে সে ভাবিয়াছিল তাহা নয়। একটুখানি স্থির থাকিয়া আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিল, সত্যই এ-কথা বলা আমার উচিত হয়নি। যাদের সম্বন্ধে এ-কথা খাটে আপনি তাদের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু দু-তিনদিন পরেই আমি বাড়ি চলে যাব, এখানে এসে প্রথমে আপনার প্রতি নানা দুর্ব্যবহার করেচি, কিন্তু সে না-জানার জন্যে। অথচ সংসারে এমনিই হয়, এমনিই ঘটে। তবু যাবার আগে আমি গভীর লজ্জার সঙ্গে আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করি।

অনুরাধা মৃদু-কণ্ঠে বলিল, ক্ষমা আপনি পাবেন না।

পাব না? কেন?

এসে পর্য্যন্ত যে অত্যাচার করেচেন তার ক্ষমা নেই, বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

প্রদীপে স্বল্প আলোকে তাহার হাসি-মুখ বিজয়ের চোখে পড়িল এবং মুহূর্ত্তকালের এক অজানা বিস্ময়ে সমস্ত অন্তরটা দুলিয়া উঠিয়াই আবার স্থির হইল। ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিল, সেই ভালো, ক্ষমায় কাজ নেই। অপরাধী বলেই যেন চিরকাল মনে পড়ে।

উভয়েই নীরব। মিনিট দুই-তিন ঘরটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

নিঃশব্দতা ভঙ্গ করিল অনুরাধা। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আবার কবে আসবেন?

মাঝে মাঝে আসতেই হবে জানি, যদিচ দেখা আর হবে না।

ও-পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ আসিল না, বুঝা গেল ইহা সত্য।

খাওয়া শেষ হইলে বিজয় বাহিরে যাইবার সময়ে অনুরাধা বলিল, ঝুড়িটায় অনেক রকম তরকারি আছে, কিন্তু বাইরে আর পাঠালুম না। কাল সকালেও আপনি এখানেই খাবেন।

তথাস্তু। কিন্তু বুঝেচেন বোধ করি সাধারণের চেয়ে ক্ষিদেটা আমার বেশী। নইলে প্রস্তাব করতুম শুধু সকালে নয়, নেমন্তন্নর মেয়াদটা বাড়িয়ে দিন যে-কটা দিন থাকি। আপনার হাতে খেয়েই যেন বাড়ি চলে যেতে পারি।

উত্তর আসিল, সে আমার সৌভাগ্য।

পরদিন প্রভাতেই বহুবিধ আহার্য্য-দ্রব্য অনুরাধার রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া পৌঁছিল। সে আপত্তি করিল না, তুলিয়া রাখিল।

ইহার পরে তিনদিনের স্থলে পাঁচদিন কাটিল। কুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। এই কয়দিন বিজয় ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিল যে, আতিথ্যের ত্রুটি কোনদিকে নাই, কিন্তু পরিচয়ে দূরত্ব তেমনি অবিচলিত রহিল, কোন ছলেই তিলার্দ্ধ সন্নিকটবর্ত্তী হইল না। বারান্দায় খাবার যায়গা করিয়া দিয়া অনুরাধা ঘরের মধ্য হইতে সাজাইয়া গুছাইয়া দেয়, পরিবেশন করে সন্তোষ। কুমার আসিয়া বলে, বাবা, মাসীমা বললেন মাছের তরকারিটা অতখানি পড়ে থাকলে চলবে না, আর একটু খেতে হবে। বিজয় বলে, তোমার মাসীমাকে বল গে বাবাকে রাক্ষস ভাবা তাঁর অন্যায়। কুমার ফিরিয়া

আসিয়া বলে, মাছের তরকারি থাক, ও বোধ হয় ভালো হয়নি। কিন্তু কালকের মত বাটিতে দুধ পড়ে থাকলে তিনি দুঃখ করবেন। বিজয় শুনাইয়া বলিল, তোমার মাসী যেন কাল থেকে গামলার বদলে বাটিতে করেই দুধ দেন, তা হলে পড়ে থাকবে না।

ছয়

এমনি করিয়া এই পাঁচটা দিন কাটিল। মেয়েদের যত্নের ছবিটা বিজয়ের মনে ছিল চিরদিনই অস্পষ্ট, মাকে সে ছেলেবেলা হইতে অসুস্থ ও অপটু দেখিয়াছে, গৃহিণীপনার কোন কর্ত্তব্যই তিনি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই—নিজের স্ত্রীও ছিল মাত্র বছর-দুই জীবিত—তখন তাহার পাঠ্যাবস্থা। ইহার পর হইতে দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল সুদূর প্রবাসে। সেদিকের অভিজ্ঞতার ভালো-মন্দ অনেক স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে পড়ে, কিন্তু সমস্তই যেন অবাস্তব বইয়ে-পড়া কল্পিত কাহিনী। জীবনের সত্য প্রয়োজনে একেবারে সম্বন্ধবিহীন।

আর আছে তাহার দাদার স্ত্রী প্রভাময়ী! যে-পরিবারে বৌদিদির বিচার চলে, ভালো-মন্দর আলোচনা হয়, সে পরিবার তাহাদের নয়। মাকে অনেকদিন কাঁদিতে দেখিয়াছে, বাবা বিরক্ত ও বিমর্ষ হইয়াছেন, কিন্তু এ-সকল সে নিজেই অসঙ্গত ও অনধিকার-চর্চ্চা মনে করিয়াছে। জ্যাঠাইমা দেবর-পুত্রের খোঁজ না রাখিলে, বধূ শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা না করিলে যে প্রচণ্ড অপরাধ হয়, এ ধারণা তাহার নয়। তাহার নিজের স্ত্রীকেও অনুরূপ আচরণ করিতে দেখিলে সে মর্ম্মাহত হইত তাহাও নয়। কিন্তু তাহার এতকালের ধারণাটাকে এই শেষের পাঁচটা দিন যেন ধাক্কা দিয়া নড়বড়ে করিয়া দিল। আজ সন্ধ্যার ট্রেনে তাহার যাত্রা করিবার সময়, চাকর জিনিস-পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত করিতেছে, আর ঘণ্টা-খানেক মাত্র দেরি, সন্তোষ আসিয়া আড়াল হইতে বলিল, মাসীমা খেতে ডাকচেন।

এমন সময়ে ?

হাঁ, বলিয়াই সে সরিয়া পড়িল।

বিজয় ভিতরে আসিয়া দেখিল, যথারীতি বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে। মাসীর গলা ধরিয়া কুমার ঝুলিতেছিল, তাহার হাত হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া অনুরাধা রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

আসনে বসিয়া বিজয় কহিল, এ কি ব্যাপার!

ভিতর হইতে অনুরাধা বলিল, দুটি খিচুড়ি রেঁধে রেখেচি, খেতে বসুন।

জবাব দিতে গিয়া আজ বিজয়কে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইল, কহিল, অসময়ে কেন আবার কষ্ট করতে গেলেন? আর যদি করলেন, খান-কতক লুচি ভেজে দিলেই হ'তো।

অনুরাধা কহিল, লুচি ত আপনি খান না। বাড়ি পৌঁছতে রাত্রি দুটো-তিনটে বাজবে, না খেয়ে উপোস করে গেলেই কি কষ্ট আমার কম হবে? কেবলি মনে পড়বে ছেলেটা না খেয়ে গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েচে।

বিজয় নীরবে কিছুক্ষণ আহার করিয়া বলিল, বিনোদকে বলে গেলুম সে যেন আপনাকে দেখে। যে-ক'টা দিন এ-বাড়িতে আছেন যেন অসুবিধে কিছু না হয়।

সে আবার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, আর একটা কথা জানিয়ে যাই। যদি দেখা হয় গগনকে বলবেন, আমি তাকে মাপ করেচি, কিন্তু এ-গাঁয়ে যেন আর না সে আসে। এলে ক্ষমা করব না।

কখনো দেখা হলে তাঁকে জানাব, বলিয়া অনুরাধা মৌন থাকিয়া কহিল, মুস্কিল হয়েচে কুমারকে নিয়ে। আজ সে কিছুতেই যেতে চাচ্চে না। অথচ কেন যে চাচ্চে না তাও বলে না।

বিজয় কহিল, বলতে চায় না নিজেই জানে না বলে। অথচ মনে মনে বোঝে সেখানে গেলে ওর কষ্ট হবে।

কষ্ট হবে কেন?

সে-বাড়ির নিয়ম ওই। কিন্তু হ'লোই বা কষ্ট, এর মধ্যে দিয়েই ত ও এত' ব'ড় হ'লো।

তা হলে গিয়ে কাজ নেই। থাক আমার কাছে।

বিজয় সহাস্যে কহিল, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বড় জোর এই মাসটা, তার বেশী ত থাকতে পারবে না—তাতে লাভ কি?

উত্তরেই মৌন হইয়া রহিল।

অনুরাধা বলিল, ওর বিমাতা যিনি আসবেন শুনেচি তিনি শিক্ষিতা মেয়ে।

হ্যাঁ, তিনি বি. এ. পাশ করেচেন।

কিন্তু বি. এ. পাশ ত ওর জ্যাঠাইমাও করেচেন।

নিশ্চয় করেচেন। কিন্তু বি. এ. পাশের কেতাবের মধ্যে দেওরপোকে যত্ন করবার কথা লেখা নেই। সে পরীক্ষা তাঁকে দিতে হয়নি।

কিন্তু রুগ্ন শ্বশুর-শাশুড়ী? সে-কথাও কি কেতাবে লেখে না?

না। এ প্রস্তাব আরও হাস্যকর।

হাস্যকর নয় এমন কি কিছু আছে?

আছে। বিন্দুমাত্র অনুযোগ না করাই হচ্ছে আমাদের সমাজের সুভদ্র বিধি।

অনুরাধা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, এ বিধি আপনাদেরই থাক্। কিন্তু—যে-বিধি সকলের সমান সে হচ্চে এই যে, ছেলের চেয়ে বি. এ. পাশ বড় নয়। এমন মেয়েকে ঘরে আনা অনুচিত।

কিন্তু আনতে কাউকে ত হবেই। যে-দলের আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে আমরা দাঁড়িয়েচি সেখানে বি. এ. পাশ নইলে মানও বাঁচে না, মনও বোঝে না, এবং বোধ হয় ঘরও চলে না। মা-বাপ-মরা বোনপোদের জন্যে গাছতলা স্বীকার করে নিতে চায় এমন মেয়ে নিয়ে আমাদের বনবাস করা চলে, কিন্তু সমাজে বাস করা চলে না।

অনুরাধার কণ্ঠস্বর পলকের জন্য তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল—না, সে হবে না। একজন নির্দ্দয় বিমাতার হাতে তুলে দিতে ওকে আপনি পারবেন না।

বিজয় কহিল, সে ভয় নেই। কারণ তুলে দিলেও হাত থেকে আপনিই গড়িয়ে কুমার নীচে এসে পড়বে। কিন্তু তাই বলে তিনি নির্দ্দয়ও নন, এবং আমার ভাবী-পত্নীর স্বপক্ষে আপনার কথার আমি তীব্র প্রতিবাদ করি। মার্জ্জিত রুচিসম্মত উদাস অবহেলায় তাঁদের নেতিয়ে-পড়া আত্মীয়তায় বর্ব্বরতার লেশ নাই। ও দোষটা দেবেন না।

অনুরাধা হাসিয়া বলিল, প্রতিবাদ যত খুশি করুন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নেতিয়ে-পড়া আত্মীয়তার মানেটা হ'লো কি?

বিজয় বলিল, ও আমাদের বড় সার্কেলের পারিবারিক বন্ধন। ওর কোড আলাদা, চেহারা স্বতন্ত্র। ওর শেকড় টানে না রস, পাতার রঙ সবুজ না হতেই ধরে হলুদের বর্ণ। আপনি পাড়াগাঁয়ে গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, ইস্কুলে-কলেজে পড়ে পাশ করেননি, পার্টিতে পিক্‌নিকে মেশেননি, ওর নিগূঢ় অর্থ আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না। কেবল এইটুকু আশ্বাস দিতে পারি, কুমারের বিমাতা এসে তাকে বিষ

খাওয়াবার আয়োজনও করবেন না, চাবুক-হাতে তাড়া করেও বেড়াবেন না। কারণ সে মার্জ্জিত রুচিবিরুদ্ধ আচরণ। সুতরাং সেদিকে নির্ভয় হতে পারেন।

অনুরাধা বলিল, আমি তার কথা ছেড়ে দিলুম, কিন্তু আপনি নিজে দেখবেন কথা দিন। এই আমার মিনতি।

বিজয় কহিল, কথা দিতেই ইচ্ছে করে, কিন্তু, আমার স্বভাবও আলাদা, অভ্যাসও আলাদা। আপনার আগ্রহ স্মরণ করে মাঝে মাঝে দেখবার চেষ্টা করব, কিন্তু যতটা আপনি চান তা পেরে উঠব মনে হয় না। কিন্তু আমার খাওয়া শেষ হ'লো, এখন যাই। যাবার উদ্যোগ করি গে। বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল, কহিল, রইল কুমার আপনার কাছে, ওকে ছাড়বার দিন এলে দেবেন বিনোদকে দিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে। প্রয়োজন হয় অসঙ্কোচে সন্তোষকেও সঙ্গে দেবেন। প্রথমে এসে যে ব্যবহার করেচি ঠিক সেই আমার প্রকৃতি নয়। এ ভরসা আর একবার দিয়ে চললুম—আমার বাড়িতে কুমারের চেয়ে বেশী অনাদর সন্তোষের ঘটবে না।

বাড়ির সম্মুখে ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া, জিনিস-পত্র বোঝাই দেওয়া হইয়াছে; বিজয় উঠিতে যাইতেছে, কুমার বলিল, বাবা, মাসীমা ডাকচেন একবার।

সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া অনুরাধা কহিল, প্রণাম করব বলে ডেকে পাঠালুম, আবার কবে যে করতে পারব জানিনে। বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া দূর হইতে প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুমারকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ঠাকুরমাকে ভাবতে বারণ করবেন। যে-ক'টা দিন ছেলেটা আমার কাছে রইল অযত্ন হবে না।

বিজয় হাসিয়া বলিল, বিশ্বাস করা কঠিন।

কঠিন কার কাছে? আপনার কাছেও নাকি? বলিয়া সেও হাসিতে গিয়া দু'জনের চোখা-চোখি হইল; বিজয় স্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার চোখের পাতা দুটি জলে ভিজা। মুখ নামাইয়া বলিল, কুমারকে নিয়ে গিয়ে কিন্তু কষ্ট দেবেন না যেন। আর বলতে পাব না বলেই বার বার করে বলে রাখচি। আপনাদের বাড়ির কথা মনে হলে ওকে পাঠাতে আমার ইচ্ছে হয় না।

না-ই বা পাঠালেন।

প্রত্যুত্তরে সে শুধু একটা নিশ্বাস চাপিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিজয় বলিল, যাবার পূর্ব্বে আপনার প্রতিশ্রুতির কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই। কথা দিয়েচেন কখনো কিছু প্রয়োজন হলে চিঠি লিখে আমাকে জানাবেন।

আমার মনে আছে। জানি গাঙ্গুলীমশায়ের কাছে ভিক্ষুকের মতই আমাকে চাইতে হবে, মনের সমস্ত ধিক্কার বিসর্জ্জন দিয়েই চাইতে হবে, কিন্তু আপনার কাছে তা নয়। যা চাইব স্বচ্ছন্দে চাইব।

কিন্তু মনে থাকে যেন, বলিয়া বিজয় যাইতে উদ্যত হইলে সে কহিল, তবে আপনিও একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। বলুন প্রয়োজন হলে আমাকেও জানাবেন?

জানাবার মত আমার কি প্রয়োজন হবে, অনুরাধা?

তা কি করে জানব। আমার আর কিছু নেই, কিন্তু প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়ে সেবা করতেও ত পারব।

আপনাকে ওরা করতে দেবে কেন?

আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

সাত

কুমার আসে নাই শুনিয়া মা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন—সে কি কথা রে! যার সঙ্গে ঝগড়া তার কাছেই ছেলে রেখে এলি?

বিজয় বলিল, যার সঙ্গে ঝগড়া সে গিয়ে পাতালে ঢুকেচে মা, তাকে খুঁজে বার করে কার সাধ্য! তোমার নাতি রইল তার মাসীর কাছে। দিন-কয়েক পরেই আসবে।

হঠাৎ মাসী এল কোথা থেকে রে?

বিজয় বলিল, ভগবানের তৈরী সংসারে হঠাৎ কে যে কোথা থেকে এসে পৌঁছায় মা, কেউ বলতে পারে না। যে তোমার টাকা-কড়ি নিয়ে ডুব মেরেচে এ সেই গগন চাটুয্যের ছোটবোন। বাড়ি থেকে একেই তাড়াব বলে লাটি-সোটা পিয়াদা-পাইক নিয়ে রণ-সজ্জায় যাত্রা করেছিলুম, কিন্তু তোমার আপনার নাতিই করলে গোল। এমনি তার আঁচল চেপে রইল যে দু'জনকে একসঙ্গে না তাড়ালে আর তাড়ানো চলল না।

মা ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমার বুঝি তার খুব অনুগত হয়ে পড়েছে? মেয়েটা খুব যত্ন-আত্তি করে বুঝি? বাছা যত্ন ত কখনো পায় না।—বলিয়া তিনি নিজের অস্বাস্থ্য স্মরণ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বিজয় বলিল, আমি ছিলুম বাইরের বাড়িতে, ভেতরে কে কাকে কি যত্ন করত দেখিনি, কিন্তু আসবার সময়ে কুমার মাসীকে ছেড়ে কিছুতে আসতে চাইলে না।

মার তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না, বলিলেন, ওরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কত রকম জানে। সঙ্গে না এনে ভাল করিস নি বাবা।

বিজয় বলিল, তুমি নিজে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হয়ে পাড়াগাঁয়ের বিরুদ্ধে তোমার এই নালিশ! শেষকালে তোমার বিশ্বাস গিয়ে পড়ল বুঝি শহরের মেয়ের ওপর?

শহরের মেয়ে! তাঁদের চরণে কোটী কোটী নমস্কার!—বলিয়া মা দুই হাত এক করিয়া কপালে ঠেকাইলেন।

বিজয় হাসিয়া উঠিল।

মা বলিলেন, হাসচিস্ কি রে! আমার দুঃখ কেবল আমিই জানি, আর জানেন তিনি। বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল, কহিলেন, আমরা যখনকার, সে পাড়াগাঁ কি আর আছে বাবা! দিন-কাল সব বদলে গেছে।

বিজয় বলিল, অনেক বদলেচে, কিন্তু যতদিন তোমরা বেঁচে আছ, বোধ হয় তোমাদের পুণ্যেই এখনো কিছু বাকী আছে মা, একবারে লোপ পাইনি। তারই একটুখানি এবারে দেখে এলুম। কিন্তু তোমাকে যে সে জিনিস দেখাবার জো নেই এই দুঃখটাই মনে রইল।—বলিয়া সে অফিসে বাহির হইয়া গেল। অফিসের কাজের তাড়াতেই ব্যস্ত হইয়া তাহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছে।

বিকালে অফিস হইতে ফিরিয়া বিজয় ও-মহলে বৌদিদির সঙ্গে দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল সেখানে বাধিয়াছে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। প্রসাধনের জিনিস-পত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, দাদা ইজিচেয়ারের হাতলে বসিয়া প্রবল-কণ্ঠে বলিতেছেন, কখ্খনো না। যেতে হয় একলা যাও। এমন কুটুম্বিতেয় আমি দাঁড়িয়ে—ইত্যাদি।

অকস্মাৎ বিজয়কে দেখিয়া প্রভা হাউ মাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—ঠাকুরপো, তারা যদি সিতাংশুর সঙ্গে অনিতার বিয়ে ঠিক করে থাকে সে কি আমার দোষ? আজ পাকা-দেখা, উনি বলচেন যাবেন না। তার মানে আমাকেও যেতে দেবেন না।

দাদা গর্জ্জিয়া উঠিলেন—তুমি জানতে না বলতে চাও? আমাদের সঙ্গে এ জুচ্চুরি চালাবার এতদিন কি দরকার ছিল?

কথাটা সহসা ধরিতে না পারিয়া বিজয় হতবুদ্ধি হইল, কিন্তু বুঝিতেও বিলম্ব হইল না; কহিল, রোসো রোসো। হয়েচে কি বল ত? অনিতার সঙ্গে সিতাংশু ঘোষালের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েচে? আজই তার পাকা-দেখা? I am thrown completely over board!

দাদা হুঙ্কার দিলেন, হুঁ। আর উনি বলতে চান কিছুই জানতেন না!

প্রভা কাঁদিয়া বলিল, আমি কি করতে পারি ঠাকুরপো! দাদা রয়েচেন, মা রয়েচেন, মেয়ে নিজে বড় হয়েচে, তারা যদি কথা ভাঙে আমার দোষ কি?

দাদা বলিলেন, দোষ এই যে তারা ধাপ্পাবাজ ভণ্ড মিথ্যাবাদী। একদিকে কথা দিয়ে আর একদিকে টোপ ফেলে বসেছিল। এখন লোকে মুখ টিপে হাসবে—আমি ক্লাবে পার্টিতে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

প্রভা তেমনি কান্নার সুরে বলিতে লাগিল, এমন ধারা কি আর হয় না? তাতে তোমার লজ্জা কিসের?

আমার লজ্জা সে তোমার বোন বলে। আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই জোচ্চর বলে। তাতে তোমারও একটা বড় অংশ আছে বলে।

দাদার মুখের প্রতি চাহিয়া এবার বিজয় হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া প্রভার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া প্রসন্ন-মুখে কহিল, বৌদিদি, দাদা যত গর্জ্জনই করুন, আমি রাগ বা দুঃখ ত করবই না, বরঞ্চ সত্যই যদি এতে তোমার অংশ থাকে তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাদা, রাগ করা তোমার সত্যিই বড় অন্যায়। এ ব্যাপারে কথা দেওয়ার কোন অর্থ নেই যদি পরিবর্ত্তনের সুযোগ থাকে। বিয়েটা ত ছেলেখেলা নয়! সিতাংশু আই. সি. এস. হয়ে ফিরেচে। সে একটা বড়-দরের লোক। অনিতা দেখতে ভালো, বি. এ. পাশ করেচে —আর আমি? এখানেও পাশ করিনি, বিলাতেও সাত-আট বছর কাটিয়ে একটা ডিগ্রী যোগাড় করতে পারিনি—সম্প্রতি কাঠের দোকানে কাঠ বিক্রী করে খাই, না আছে পদ-গৌরব, না আছে খেতাব। অনিতা কোন অন্যায় করেনি দাদা।

দাদা সরোষে কহিলেন, একশোবার অন্যায় করেচে। তুই বলতে চাস এতে তোর কোন কষ্টই হয়নি?

বিজয় কহিল, দাদা, তুমি গুরুজন—মিথ্যে বলব না—এই তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, আমার এতটুকুও দুঃখ নেই। নিজের পুণ্যে ত নয়, কার পুণ্যে ঘটল জানিনে,

কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমি বেঁচে গেলুম! বৌদি, চল আমি তোমাকে নিয়ে যাই। দাদার ইচ্ছে হয় রাগ করে ঘরে বসে থাকুন, কিন্তু আমরা চল তোমার বোনের পাকা-দেখায় পেট-পুরে খেয়ে আসি গে।

প্রভা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করছ ঠাকুরপো?

না বৌদি, ঠাট্টা করিনি। আজ একান্ত মনে তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, তোমার বরে ভাগ্য যেন এবার আমাকে মুখ তুলে চায়। কিন্তু আর দেরি ক'রো না, তুমি কাপড় পরে নাও, আমিও আফিসের পোষাক ছেড়ে আসি গে। বলিয়া সে দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল, দাদা বলিলেন, তোর নেমন্তন্ন নেই, তুই সেখানে যাবি কি করে?

বিজয় থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা বটে। তারা হয়ত লজ্জা পাবে। কিন্তু বিনা আহ্বানে যে কোথাও যেতেই আজ আমার সঙ্কোচ নেই, ছুটে গিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, অনিতা, তুমি আমাকে ঠকাওনি, তোমার উপর আমার রাগ নেই, জ্বালা নেই, প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও। দাদা, আমার মিনতি রাখো রাগ করে থেকো না, বৌদিদিকে নিয়ে যাও, অন্ততঃ আমার হয়েও অনিতাকে আশীর্ব্বাদ করে এসো তোমরা।

দাদা ও বৌদি উভয়েই হতবুদ্ধির মত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। সহসা-উভয়েরই চোখে পড়িল বিজয়ের মুখের পরে বিদ্রূপের সত্যই কোন চিহ্ন নেই, ক্রোধের অভিমানের লেশমাত্র ছায়া কণ্ঠস্বরে পড়ে নাই—সত্যই কোন সুনিশ্চিত বিপদের ফাঁস এড়াইয়া মন তাহার অকৃত্রিম পুলকে ভরিয়া গেছে। বোনের কাছে এ ইঙ্গিত উপভোগ্য নয়, অপমানের ধাক্কায় প্রভার অন্তরটা সহসা জ্বলিয়া গেল, কি যেন একটা বলিতেও চাহিল, কিন্তু রুদ্ধ হইয়া রহিল।

বিজয় বলিল, বৌদি, আমার সকল কথা বলবার আজও সময় আসেনি, কখনো আসবে কি-না তাও জানিনে, যদি আসে কোনদিন, সেদিন কিন্তু তুমিও বলবে, ঠাকুরপো, তুমি ভাগ্যবান ভাই! তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।

হরিলক্ষ্মী

হরিলক্ষ্মী

এক

যাহা লইয়া এই গল্পের উৎপত্তি, তাহা ছোট ; তথাপি এই ছোট ব্যাপারটুকু অবলম্বন করিয়া হরিলক্ষ্মীর জীবনে যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা ক্ষুদ্রও নহে, তুচ্ছও নহে। সংসারে এমনই হয়। বেলপুরের দুই সরিক, শান্ত নদীকূলে জাহাজের পাশে জেলে-ডিঙ্গীর মত একটি অপরটির পার্শ্বে নিরুপদ্রবেই বাঁধা ছিল, অকস্মাৎ কোথাকার একটা উড়ো ঝড়ে তরঙ্গ তুলিয়া জাহাজের দড়ি কাটিল, নোঙ্গর ছিঁড়িল, একমুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র তরণী কি করিয়া যে বিধ্বস্ত হইয়া গেল, তাহার হিসাব পাওয়াই গেল না।

বেলপুর তালুকটুকু বড় ব্যাপার নয়। উঠিতে বসিতে প্রজা ঠেঙ্গাইয়া হাজার বারোর উপরে উঠে না, কিন্তু সাড়ে-পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের কাছে দু'পাই অংশের বিপিনবিহারীকে যদি জাহাজের সঙ্গে জেলে-ডিঙ্গীর তুলনাই করিয়া থাকি ত, বোধ করি, অতিশয়োক্তির অপরাধ করি নাই।

দূর হইলেও জ্ঞাতি এবং ছয়-সাত পুরুষ পূর্ব্বে ভদ্রাসন উভয়ের একত্রই ছিল, কিন্তু আজ একজনের ত্রিতল অট্টালিকা গ্রামের মাথায় চড়িয়াছে এবং অপরের জীর্ণ-গৃহ দিনের পর দিন ভূমিশয্যা-গ্রহণের দিকেই মনোনিবেশ করিয়াছে।

তবু এমনইভাবে দিন কাটিতেছিল এবং এমনই করিয়াই ত বাকী দিনগুলা বিপিনের সুখ-দুঃখে নির্ব্বিবাদেই কাটিতে পারিত ; কিন্তু যে মেঘখণ্ডটুকু উপলক্ষ করিয়া অকালে ঝঞ্ঝা উঠিয়া সমস্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল তাহা এইরূপ।

সাড়ে-পোনর আনার অংশীদার শিবচরণের হঠাৎ পত্নীবিয়োগ ঘটিলে বন্ধুরা কহিলেন, চল্লিশ-একচল্লিশ কি আবার একটা বয়স! তুমি আবার বিবাহ কর। শত্রু-পক্ষীয়রা শুনিয়া হাসিল, চল্লিশ ত শিবচরণের চল্লিশ বছর আগে পার হয়ে গেছে! অর্থাৎ কোনটাই সত্য নয়। আসল কথা, বড়বাবুর দিব্য গৌরবর্ণ নাদুস-নদুস দেহ, সুস্পষ্ট-মুখের 'পরে রোমের চিহ্নমাত্র নাই। যথাকালে দাড়িগোঁফ না গজানোর সুবিধা হয়ত কিছু আছে, কিন্তু অসুবিধাও বিস্তর। বয়স আন্দাজ করা ব্যাপারে যাহারা নীচের দিকে যাইতে চাহে না, উপরের দিকে তাহারা যে অঙ্কের কোন্ কোঠায় গিয়া ভর দিয়া দাঁড়াইবে, তাহা নিজেরাই ঠাওর করিতে পারে না। সে যাই

হোক, অর্থশালী পুরুষের যে কোন দেশেই বয়সের অজুহাতে বিবাহ আটকায় না, বাঙলাদেশে ত নয়-ই। মাস-দেড়েক শোক-তাপ ও না, না করিয়া গেল, তাহার পরে হরিলক্ষ্মীকে বিবাহ করিয়া শিবচরণ বাড়ি আনিলেন। শূন্য গৃহ একদিনেই ষোলকলায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কারণ, শত্রুপক্ষ যাহাই কেন না বলুক, প্রজাপতি যে সত্যই তাঁহার প্রতি এবার অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, তাহা মানিতেই হইবে। তাহারা গোপনে বলাবলি করিল, পাত্রের তুলনায় নববধূ বয়সের দিক দিয়া একেবারেই মানান হয় নাই, তবে দুই-একটি ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া ঘরে ঢুকিলে আর খুঁত ধরিবার কিছু থাকিত না। তবে সে যে সুন্দরী একথা তাহারা স্বীকার করিল। ফল কথা, সচরাচর বড় বয়সের চেয়েও লক্ষ্মীর বয়সটা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল, বোধ করি, উনিশের কম হইবে না। তাহার পিতা আধুনিক নব্যতন্ত্রের লোক, যত্ন করিয়া মেয়েকে বেশী বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়া ম্যাট্রিক পাশ করাইয়াছিলেন। তাঁহার অন্য ইচ্ছা ছিল, শুধু ব্যবসা ফেল পড়িয়া আকস্মিক দারিদ্র্যের জন্যই এই সুপাত্রে কন্যা অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মী শহরের মেয়ে, স্বামীকে দুই-চারি দিনেই চিনিয়া ফেলিল। তাহার মুস্কিল হইল এই যে, আত্মীয় আশ্রিত বহুপরিজন-পরিবৃত বৃহৎ সংসারের মধ্যে সে মন খুলিয়া কাহারও সহিত মিশিতে পারিল না। ওদিকে শিবচরণের ভালোবাসার ত অন্ত রহিল না। শুধু কেবল বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা বলিয়াই নয়, সে যেন একেবারে অমূল্য নিধি লাভ করিল। বাটীর আত্মীয়-আত্মীয়ার দল কোথায় কি করিয়া যে তাহার মন যোগাইবে খুঁজিয়া পাইল না। একটা কথা সে প্রায়ই শুনিতে পাইত—এইবার মেজবৌয়ের মুখে কালি পড়িল। কি রূপে, কি গুণে, কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে এতদিনে তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইল।

কিন্তু এত করিয়াও সুবিধা হইল না, মাস-দুয়েকের মধ্যে লক্ষ্মী অসুখে পড়িল। এই অসুখের মধ্যেই একদিন মেজবউয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলল। তিনি বিপিনের স্ত্রী, বড়-বাড়ির নূতন বধূর জ্বর শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলেন। বয়সে বোধ হয় দুই-তিন বছরের বড়; তিনি যে সুন্দরী, তাহা মনে মনে লক্ষ্মী স্বীকার করিল। কিন্তু এই বয়সেই দারিদ্র্যের ভীষণ কশাঘাতের চিহ্ন তাহার সর্ব্বাঙ্গে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে বছর-ছয়েকের একটি ছেলে, সেও রোগা। লক্ষ্মী শয্যার একধারে সযত্নে বসিতে স্থান দিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হাতে কয়েকগাছি সোনার

চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই, পরণে ঈষৎ মলিন একখানি রাঙা-পাড়ের ধুতি, বোধ হয় তাহার স্বামীর হইবে, পল্লীগ্রামের প্রথামত ছেলেটি দিগম্বর নয়, তাহারও কোমরে একখানি শিউলিফুলে ছোপানো ছোট কাপড় জড়ানো।

লক্ষ্মী তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, ভাগ্যে জ্বর হয়েছিল, তাই ত আপনার দেখা পেলুম। কিন্তু সম্পর্কে আমি বড় জা হই মেজবৌ। শুনেচি মেজঠাকুরপো এঁর চেয়ে ঢের ছোট।

মেজবৌ হাসিমুখে কহিল, সম্পর্কে ছোট হলে, কি তাকে আপনি বলে?

লক্ষ্মী কহিল, প্রথম দিন এই যা বললুম, নইলে আপনি বলার লোক আমি নই। কিন্তু তাই বলে তুমিও যেন আমাকে দিদি বলে ডেকো না—ও আমি সইতে পারব না। আমার নাম লক্ষ্মী।

মেজবৌ কহিল, নামটি বলে দিতে হয় না দিদি, আপনাকে দেখলেই জানা যায়। আর আমার নাম—কি জানি, কে যে ঠাট্টা করে কমলা রেখেছিলেন—এই বলিয়া সে সকৌতুকে একটুখানি হাসিল মাত্র।

হরিলক্ষ্মী ইচ্ছা করিল, সেও প্রতিবাদ করিয়া বলে, তোমার পানে তাকালেও তোমার নামটি বুঝা যায়, কিন্তু অনুকৃতির মত শুনাইবার ভয়ে বলিতে পারিল না।

কহিল, আমাদের নামের মানে এক। কিন্তু মেজবৌ, আমি তোমাকে তুমি বলতে পারলুম, তুমি পারলে না।

মেজবৌ সহাস্যে জবাব দিল, হঠাৎ না-ই পারলুম দিদি। এক বয়স ছাড়া আপনি সকল বিষয়েই আমার বড়। যাক না দু'দিন—দরকার হলে বদলে নিতে কতক্ষণ?

হরিলক্ষ্মীর মুখে সহসা ইহার প্রত্যুত্তর যোগাইল না, কিন্তু সে মনে মনে বুঝিল, এই মেয়েটি প্রথম দিনের পরিচয়টিকে মাখামাখিতে পরিণত করিতে চাহে না। কিন্তু কিছু একটা বলিবার পূর্ব্বেই মেজবৌ উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, এখন তা হলে উঠি দিদি, কাল আবার—

লক্ষ্মী বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, এখনই যাবে কি-রকম, একটু ব'সো!

মেজবৌ কহিল, আপনি হুকুম করলে তো বসতেই হবে, কিন্তু আজ যাই দিদি, ওঁর আসবার সময় হ'লো। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছেলের হাত ধরিয়া যাই-বার পূর্ব্বে সহাস্যবদনে কহিল, আসি দিদি। কাল একটু সকালসকাল আসব, কেমন? বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

বিপিনের স্ত্রী চলিয়া গেলে হরিলক্ষ্মী সেইদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। এখন জ্বর ছিল না, কিন্তু গ্লানি ছিল। তথাপি কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত সে ভুলিয়া

গেল। এতদিন গ্রাম ঝাঁটাইয়া কত বৌ-ঝি যে আসিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু পাশের বাড়ির দরিদ্র-ঘরের এই বধূর সহিত তাহাদের তুলনা হয় না। তাহারা যাচিয়া আসিয়াছে, উঠিতে চাহে নাই আর বসিতে বলিলে ত কথাই নাই। সে কত প্রগল্‌ভতা, কত বাচালতা, মনোরঞ্জন করিবার কত কি লজ্জাকর প্রয়াস! ভারাক্রান্ত মন তাহার মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ইহাদেরই মধ্য হইতে অকস্মাৎ কে আসিয়া তাহার রোগশয্যায় মুহূর্ত্ত-কয়েকের তরে নিজের পরিচয় দিয়া গেল! তাহার বাপের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করিবার সময় হয় নাই, কিন্তু প্রশ্ন না করিয়াও লক্ষ্মী কি জানি কেমন করিয়া অনুভব করিল—তাহার মত সে কিছুতেই কলিকাতার মেয়ে নয়। পল্লীঅঞ্চলে লেখাপড়া জানে বলিয়া বিপিনের স্ত্রীর একটা খ্যাতি আছে। লক্ষ্মী ভাবিল, খুব সম্ভব বৌটি সুর করিয়া রামায়ণ-মহাভারত পড়িতে পারে, কিন্তু তাহার বেশী নহে। যে পিতা বিপিনের মত দীন-দুঃখীর হাতে মেয়ে দিয়াছে, সে কিছু আর মাস্টার রাখিয়া স্কুলে পড়াইয়া পাশ করাইয়া কন্যা সম্প্রদান করে নাই। উজ্জ্বল শ্যাম—ফর্সা বলা চলে না। কিন্তু রূপের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, শিক্ষা, সংসর্গ, অবস্থা; কিছুতেই ত বিপিনের স্ত্রী তাহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কিন্তু একটা ব্যাপারে লক্ষ্মীর নিজেকে যেন ছোট মনে হইল। তাহার কণ্ঠস্বর—সে যেন গানের মত, আর বলিবার ধরণটি একেবারে মধু দিয়া ভরা। এতটুকু জড়িমা নাই, কথাগুলি যেন সে বাড়ি হইতে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিয়াছিল এমনই সহজ। কিন্তু সবচেয়ে যে বস্তু তাহাকে বেশি বিদ্ধ করিল, সে ঐ মেয়েটির দূরত্ব। সে যে দরিদ্র-ঘরের বধূ, তাহা মুখে না বলিয়াও এমন করিয়াই প্রকাশ করিল, যেন ইহাই তাহার স্বাভাবিক, যেন এ-ছাড়া আর কিছু তাহাকে কোন মতেই মানাইত না। দরিদ্র, কিন্তু কাঙাল নয়। এক পরিবারের বধূ, একজনের পীড়ায় আর একজন তাহার তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—ইহার অতিরিক্ত লেশমাত্রও অন্য উদ্দেশ্য নাই।

সন্ধ্যার পর স্বামী দেখিতে আসিলে হরিলক্ষ্মী নানা কথার পরে কহিল, আজ ও-বাড়ির মেজবৌ-ঠাকুরুণকে দেখলাম।

শিবচরণ কহিল, কাকে? বিপিনের বৌকে?

লক্ষ্মী কহিল, হ্যাঁ। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, এতকাল পরে আমাকে নিজেই দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের বেশী বসতে পারলেন না, কাজ আছে বলে উঠে গেলেন।

শিবচরণ কহিল, কাজ? আরে, ওদের দাসী আছে, না চাকর আছে? বাসন-মাজা থেকে হাঁড়ি-ঠেলা পর্য্যন্ত—কই তোমার মত শুয়ে বসে গায়ে ফুঁ দিয়ে কাটাক ত দেখি? এক ঘটি জল পর্য্যন্ত আর তোমাকে গড়িয়ে খেতে হয় না।

নিজের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য হরিলক্ষ্মীর অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু কথাগুলা নাকি তাহাকে বাড়াইবার জন্যই, লাঞ্ছনার জন্য নহে, এই মনে করিয়া সে রাগ করিল না, বলিল, শুনেচি নাকি মেজবৌয়ের বড় গুমোর, বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না।

শিবচরণ কহিল, যাবে কোত্থেকে? হাতে ক'গাছি চুড়ি ছাড়া আর ছাইও নেই—লজ্জায় মুখ দেখাতে পারে না।

হরিলক্ষ্মী একটুখানি হাসিয়া বলিল, লজ্জা কিসের? দেশের লোক কি ওঁর গায়ে জড়োয়া গয়না দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, না, দেখতে না পেলে ছি ছি করে?

শিবচরণ কহিল, জড়োয়া গয়না! আমি যা তোমাকে দিয়েচি, কোন্ শালার বেটা তা চোখে দেখেচে? পরিবারকে আজ পর্য্যন্ত দু'গাছা চুড়ি ছাড়া আর গড়িয়ে দিতে পারলিনে! বাবা! টাকার জোর বড় জোর! জুতো মারবো আর—

হরিলক্ষ্মী ক্ষুণ্ণ ও অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিল, ছি ছি, ও-সব তুমি কি বলচ?

শিবচরণ কহিল, না না, আমার কাছে লুকোছাপা নেই—যা বলব তা স্পষ্টাস্পষ্টি কথা।

হরিলক্ষ্মী নিরুত্তরে চোখ বুজিয়া শুইল। বলবারই বা আছে কি! ইহারা দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত রূঢ় কথা কঠোর ও কর্কশ করিয়া উচ্চারণ করাকেই একমাত্র স্পষ্টবাদিতা বলিয়া জানে। শিবচরণ শান্ত হইল না, বলিতে লাগিল, বিয়েতে যে পাঁচশ' টাকা ধার নিয়ে গেলি, সুদে-আসলে সাত-আটশ' হয়েচে, তা খেয়াল আছে? গরীব একধারে পড়ে আছিস্ থাক, ইচ্ছে করলে যে কান মলে দূর করে দিতে পারি। দাসীর যোগ্য নয়—আমার পরিবারের কাছে গুমোর!

হরিলক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শুইল। অসুখের উপরে বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার সর্ব্বশরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

পরদিন দুপুরবেলায় ঘরের মধ্যে মৃদুশব্দে চোখ চাহিয়া দেখিল, বিপিনের স্ত্রী বাহির হইয়া যাইতেছে। ডাকিয়া কহিল, মেজবৌ, চলে যাচ্চো যে?

মেজবৌ সলজ্জে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি ভেবেছিলাম, আপনি ঘুমিয়ে পড়েচেন। আজ কেমন আছেন দিদি?

হরিলক্ষ্মী কহিল, আজ ঢের ভাল আছি, কই তোমার ছেলেকে আননি?

মেজবৌ বলিল, আজ সে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল দিদি।

হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল মানে কি?

অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে বলে আমি দিনের বেলায় বড় তাকে ঘুমোতে দিইনে দিদি।

হরিলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, রোদে রোদে দুরন্তপনা করে বেড়ায় না?

মেজবৌ কহিল, করে বই কি! কিন্তু ঘুমোনোর চেয়ে সে বরঞ্চ ভালো।

তুমি নিজে বুঝি কখনো ঘুমোও না?

মেজবৌ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিলক্ষ্মী ভাবিয়াছিল, মেয়েদের স্বভাবের মত এবার হয়ত সে তাহার অনবকাশের দীর্ঘ তালিকা দিতে বসিবে, কিন্তু সে সেরূপ কিছুই করিল না। ইহার পরে অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কথায় কথায় হরিলক্ষ্মী তাহার বাপের বাড়ির কথা, ভাই-বোনের কথা, মাস্টারমশায়ের কথা, স্কুলের কথা এমনকি তাহার ম্যাট্রিক পাশ করার কথাও গল্প করিয়া ফেলিল। অনেকক্ষণ পরে যখন হুঁস হইল তখন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, শ্রোতা হিসাবে মেজবৌ যত ভালই লোক, বক্তা হিসাবে একেবারে অকিঞ্চিৎকর। নিজের কথা সে প্রায় কিছুই বলে নাই। প্রথমটা লক্ষ্মী লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু তখনই মনে করিল, আমার কাছে গল্প করবার মত তাহার আছেই বা কি! কিন্তু কাল যেমন এই বধূটির বিরুদ্ধে মন তাহার অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তেমনি ভারি একটা তৃপ্তি বোধ করিল।

দেয়ালের মূল্যবান ঘড়িতে নানাবিধ বাজনা-বাদ্য করিয়া তিনটা বাজিল। মেজবৌ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সবিনয়ে কহিল, দিদি, আজ তা হলে আসি?

লক্ষ্মী সকৌতুকে বলিল, তোমার বুঝি ভাই তিনটে পর্য্যন্তই ছুটি? ঠাকুরপো না-কি কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়ে বাড়ি ঢোকেন?

মেজবৌ কহিল, আজ তিনি বাড়িতে আছেন।

আজ কেন তবে আর একটু ব'সো না?

মেজবৌ বসিল না, কিন্তু যাবার জন্যও পা বাড়াইল না। আস্তে আস্তে বলিল, দিদি, আপনার কত শিক্ষা-দীক্ষা, কত লেখা-পড়া, আমি পাড়াগাঁয়ের—

তোমার বাপের বাড়ি বুঝি পাড়াগাঁয়ে?

হাঁ দিদি, সে একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে। না বুঝে কাল হয়ত কি বলতে কি বলে ফেলেচি, কিন্তু অসম্মান করার জন্তে—আমাকে আপনি যে দিব্বি করতে বলবেন দিদি—

হরিলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, সে কি মেজবৌ, তুমি তো আমাকে এমন কথাই বলনি!

মেজবৌ এ-কথার প্রত্যুত্তরে আর একটি কথাও কহিল না। কিন্তু 'আসি' বলিয়া পুনশ্চ বিদায় লইয়া যখন সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, তখন কণ্ঠস্বর যেন তাহার অকস্মাৎ আর একরকম শুনাইল।

রাত্রিতে শিবচরণ যখন কক্ষে প্রবেশ করিল তখন হরিলক্ষ্মী চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মেজবৌয়ের শেষের কথাগুলা আর স্মরণ ছিল না। দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ, মনও শান্ত প্রসন্ন ছিল।

শিবচরণ জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ বড়বৌ?

লক্ষ্মী উঠিয়া বসিয়া কহিল, ভাল আছি।

শিবচরণ কহিল, সকালের ব্যাপার জানো ত? বাছাধনকে ডাকিয়ে এনে সকলের সামনে এমনি কড়কে দিয়েচি যে জন্মে ভুলবে না। আমি বেলপুরের শিবচরণ! হাঁ!

হরিলক্ষ্মী ভীত হইয়া কহিল, কাকে গো?

শিবচরণ কহিল, বিপ্‌নেকে। ডেকে বলে দিলাম, তোমার পরিবার আমার পরিবারের কাছে জাঁক করে তাকে অপমান করে যায়, এত বড় আস্পর্দ্ধা! পাজি নচ্ছার, ছোটলোকের মেয়ে! তার ন্যাড়া মাথায় ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে গাঁয়ের বার করে দিতে পারি জানিস্!

হরিলক্ষ্মীর রোগক্লিষ্ট মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল—বল কি গো!

শিবচরণ নিজের বুকে তাল ঠুকিয়া সদর্পে বলিতে লাগিল, এ-গাঁয়ে জজ বল, ম্যাজিস্ট্রেট বল, আর দারোগা পুলিশ বল, সব এই শর্ম্মা! এই শর্ম্মা! মরণ-কাঠি, জীবন-কাঠি এই হাতে। তুমি বল, কাল যদি না বিপ্‌নের বৌ এসে তোমার পা টেপে ত আমি লাটু চৌধুরীর ছেলেই নই। আমি—

বিপিনের বধূকে সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার বিবরণ ও ব্যথায় লাটু চৌধুরীর ছেলে অ-কথা কু-কথার আর শেষ রাখিল না। আর তাহারই সম্মুখে নির্নিমেষ-চক্ষুতে চাহিয়া হরিলক্ষ্মীর মনে হইতে লাগিল, ধরিত্রী দ্বিধা হও!

দুই

দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্য্যার দেহরক্ষার জন্য শিবচরণ কেবলমাত্র নিজের দেহ ভিন্ন আর সমস্তই দিতে পারিত। হরিলক্ষ্মীর সেই দেহ বেলপুরে সারিতে চাহিল না। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন হাওয়া বদলাইবার। শিবচরণ সাড়ে পোনর আনার মর্য্যাদা-মত ঘটা করিয়া হাওয়া-বদলানোর আয়োজন করিল। যাত্রার শুভ-দিনে গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল, আসিল না কেবল বিপিন ও তাহার স্ত্রী। বাহিরে শিবচরণ যাহা না বলিবার তাহা বলিতে লাগিল এবং ভিতরে বড়পিসী উদ্দাম হইয়া উঠিলেন। বাহিরেও ধূয়া ধরিবার লোকাভাব ঘটিল না, অন্তপুরেও তেমনই পিসীমার চীৎকারের আয়তন বাড়াইতে যথেষ্ট স্ত্রীলোক জুটিল। কিছুই বলিল না শুধু হরিলক্ষ্মী। মেজ-বৌয়ের প্রতি তাহার ক্ষোভ ও অভিমানের মাত্রা কাহারো অপেক্ষাই কম ছিল না; সে মনে মনে বলিতে লাগিল, তাহার বর্ব্বর স্বামী যত অন্যায়ই করিয়া থাক্, সে নিজে ত কিছুই করে নাই, কিন্তু ঘরের ও বাইরের যে-সব মেয়েরা আজ চেঁচাইতেছিল, তাহাদের সহিত কোন সূত্রেই কণ্ঠ মিলাইতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল। যাইবার পথে পাল্কীর দরজা ফাঁক করিয়া লক্ষ্মী উৎসুক-চক্ষুতে বিপিনের জীর্ণ গৃহের জানালার প্রতি চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাহারও ছায়াটুকুও তাহার চোখে পড়িল না।

কাশীতে বাড়ি ঠিক করা হইয়াছিল, তথাকার জল-বাতাসের গুণে নষ্ট-স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে লক্ষ্মীর বিলম্ব হইল না, মাস-চারেক পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তাহার দেহের কান্তি দেখিয়া মেয়েদের গোপন ঈর্ষার অবধি রহিল না।

হিম-ঋতু আগতপ্রায়, দুপুরবেলায় মেজবৌ চিররুগ্ন স্বামীর জন্য একটা গরমের গলাবন্ধ বুনিতেছিল, অনতিদূরে বসিয়া ছেলে খেলা করিতেছিল, সেই দেখিতে পাইয়া কলরব করিয়া উঠিল, মা, জ্যাঠাইমা।

মা হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া লইয়া আসন পাতিয়া দিল; স্মিতমুখে প্রশ্ন করিল, শরীর নিরাময় হয়েছে দিদি?

লক্ষ্মী কহিল, হাঁ হয়েচে। কিন্তু না হতেও পারত, না ফিরতেও পারতাম, অথচ যাবার সময়ে একটিবার খোঁজও নিলে না। সমস্ত পথটা তোমার জানালার

পানে চেয়ে চেয়ে গেলাম, একবার ছায়াটুকু চোখে পড়ল না। রোগা বোন চলে যাচ্ছে, একটুখানি মায়াও কি হ'লো না মেজবৌ? এমনি পাষাণ তুমি?

মেজবৌয়ের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল, কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

লক্ষ্মী বলিল, আমার আর যা দোষই থাক্ মেজবৌ, তোমার মত কঠিন প্রাণ আমার নয়। ভগবান না করুন, কিন্তু অমন সময়ে আমি তোমাকে না দেখে থাকতে পারতাম না।

মেজবৌ এ অভিযোগের কোন জবাব দিল না, নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লক্ষ্মী আর কখনও আসে নাই, আজ এই প্রথম এ-বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘরগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। শতবর্ষের জরাজীর্ণ গৃহ, মাত্র তিন-খানি কক্ষ কোনমতে বাসোপযোগী রহিয়াছে। দরিদ্রের আবাস, আসবাবপত্র নাই বলিলেই চলে, ঘরের চুন-বালি খসিয়াছে, সংস্কার করিবার সামর্থ্য নাই, তথাপি অনাবশ্যক অপরিচ্ছন্নতা এতটুকু কোথাও নাই। স্বল্প বিছানা ঝর্ ঝর্ করিতেছে, দুই-চারিখানি দেব-দেবীর ছবি টাঙানো আছে, আর আছে মেজবৌয়ের হাতের নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম। অধিকাংশই পশম ও সুতার কাজ, তাহা শিক্ষানবীশের হাতের লাল ঠোঁটওয়ালা সবুজ রঙের টিয়াপাখী অথবা পাঁচ-রঙা বেড়ালের মূর্ত্তি নয়। মূল্যবান ফ্রেম আঁটা লাল-নীল বেগুনী-ধূসর পাশুটে নানা বিচিত্র রঙের সমাবেশ পশমে বোনা 'ওয়েল-কম্' 'আসুন বসুন' অথবা বানান ভুল গীতার শ্লোকার্দ্ধও নয়। লক্ষ্মী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, ওটি কার ছবি মেজবৌ, চেনা চেনা ঠেকচে?

মেজবৌ সলজ্জে হাসিয়া কহিল, ওটি তিলক মহারাজের ছবি দেখে বোনবার চেষ্টা করেছিলাম দিদি, কিন্তু কিছুই হয়নি। এই কথা বলিয়া সম্মুখের দেয়ালে টাঙানো ভারতের কৌস্তভ মহাবীর তিলকের ছবি অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিল।

লক্ষ্মী বহুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চিনতে পারিনি, সে আমারই দোষ মেজবৌ, তোমার নয়। আমাকে শেখাবে ভাই? ও-বিদ্যে শিখতে যদি পারি ত তোমাকে গুরু বলে মানতে আমার আপত্তি নেই।

মেজবৌ হাসিতে লাগিল।

সেদিন ঘণ্টা তিন-চার পরে বিকেলে যখন লক্ষ্মী বাড়ি ফিরিয়া গেল তখন এই করাই স্থির করিয়া গেল যে, কলা-শিল্প শিখিতে কাল হইতে সে প্রত্যহ আসিবে।

আসিতেও লাগিল, কিন্তু দশ-পনেরো দিনেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এ-বিদ্যা শুধু কঠিন নয়, অর্জ্জন করিতেও সুদীর্ঘ সময় লাগিবে।

একদিন লক্ষ্মী কহিল, কই মেজবৌ, তুমি আমাকে যত্ন করে শেখাও না।

মেজবৌ বলিল, ঢের সময় লাগবে দিদি, তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি অন্ত বোনা শিখুন।

লক্ষ্মী মনে মনে রাগ করিল, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার শিখতে কতদিন লেগেছিল মেজবৌ?

মেজবৌ জবাব দিল, আমাকে কেউ ত শেখায়নি দিদি, নিজের চেষ্টাতেই একটু একটু করে—

লক্ষ্মী বলিল, তাইতেই! নইলে পরের কাছে শিখতে গেলে তোমারও সময়ের হিসাব থাকত।

মুখে সে যাহাই বলুক, মনে মনে নিঃসন্দেহে অনুভব করিতেছিল, মেধা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে এই মেজবৌয়ের কাছে সে দাঁড়াতেই পারে না। আজ তাহার শিক্ষার কাজ অগ্রসর হইল না এবং যথাসময়ের অনেক পূর্ব্বেই সুঁচ সুতা-প্যাটার্ন গুটাইয়া লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। পরদিন আসিল না এবং এই প্রথম প্রত্যহ আসায় তাহার ব্যাঘাত হইল।

দিন-চারেক পরে আবার একদিন হরিলক্ষ্মী তাহার সুঁচ-সুতার বাক্স হাতে করিয়া এ-বাটীতে উপস্থিত হইল।

মেজবৌ তাহার ছেলেকে রামায়ণ হইতে ছবি দেখাইয়া গল্প বলিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিল। উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, দু-তিনদিন আসেননি, আপনার শরীর ভাল না বুঝি?

লক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া কহিল, না, এমনি পাঁচ-ছ'দিন আসতে পারিনি।

মেজবৌ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, পাঁচ-ছ'দিন আসেননি? তাই হবে বোধ হয়। কিন্তু আজ তা হলে দু'ঘণ্টা বেশি থেকে কামাইটা পুষিয়ে নেওয়া চাই।

লক্ষ্মী বলিল, হুঁ। কিন্তু অসুখই যদি আমার করে থাকত মেজবৌ, তোমার ত একবার খোঁজ করা উচিত ছিল।

মেজবৌ সলজ্জে বলিল. উচিত নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সংসারের অসংখ্য রকমের কাজ—একলা মানুষ, কাকেই বা পাঠাই বলুন? কিন্তু অপরাধ হয়েচে, তা স্বীকার করচি দিদি।

লক্ষ্মী মনে মনে খুশী হইল। এ-কয়দিন সে অত্যন্ত অভিমানবশেই আসিতে পারে নাই, অথচ অহর্নিশ যাই যাই করিয়াই তাহার দিন কাটিয়াছে। এই মেজবৌ ছাড়া শুধু গৃহে কেন, সমস্ত গ্রামের মধ্যেও আর কেহ নাই যাহার সহিত সে মন খুলিয়া মিশিতে পরে।

ছেলে নিজের মনে ছবি দেখিতেছিল। হরিলক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া কহিল, নিখিল, কাছে এস ত বাবা? সে কাছে আসিলে লক্ষ্মী বাক্স খুলিয়া একগাছি সরু সোনার হার তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, যাও খেলা কর গে।

মায়ের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি ওটা দিলেন না-কি?

লক্ষ্মী স্মিতমুখে জবাব দিল, দিলাম বই কি!

মেজবৌ কহিল, আপনি দিলেই বা ও নেবে কেন?

লক্ষ্মী অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, জ্যাঠাইমা কি একটা হার দিতে পারে না?

মেজবৌ বলিল, তা জানিনে দিদি, কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানি, মা হয়ে আমি নিতে পারিনে। নিখিল, ওটা খুলে তোমার জ্যাঠাইমাকে দিয়ে দাও। দিদি, আমরা গরীব, কিন্তু ভিখিরি নই। কোন একটা দামী জিনিস পাওয়া গেল বলেই দু'হাত পেতে নেব, তা নিইনে।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। আজও তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী দ্বিধা হও। যাইবার সময় সে কহিল, কিন্তু এ-কথা তোমার ভাশুরের কানে যাবে মেজবৌ!

মেজবৌ বলিল, তাঁর অনেক কথাই আমার কানে আসে, আমার একটা কথা তাঁর কানে গেলে কান অপবিত্র হবে না।

লক্ষ্মী কহিল, বেশ, পরীক্ষা করে দেখলেই হবে। একটু থামিয়া বলিল, আমাকে খামোকা অপমান করার দরকার ছিল না মেজবৌ। আমিও শাস্তি দিতে জানি।

মেজবৌ বলিল, এ আপনার রাগের কথা। নইলে আমি যে আপনাকে অপমান করিনি, শুধু আমার স্বামীকেই খামোকা অপমান করতে আপনাকে দিই নি—এ বোঝবার শিক্ষা আপনার আছে।

লক্ষ্মী কহিল, তা আছে, নেই শুধু তোমাদের পাঁড়াগেঁয়ে মেয়েদের সঙ্গে কোঁদল করবার শিক্ষা।

মেজবৌ এই কটূক্তির জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী চলিতে উদ্যত হইয়া বলিল, ওই হারটুকুর দাম যাই হোক, ছেলেটাকে স্নেহবশেই দিয়েছিলাম, তোমার স্বামীর দুঃখ দূর হবে ভেবে দিইনি। মেজবৌ, বড়-লোক মাত্রেই গরীবকে শুধু অপমান করে বেড়ায়, এইটুকুই কেবল শিখে রেখেচ, ভালবাসতেও যে পারে, এ তুমি শেখোনি। শেখা দরকার। তখন কিন্তু গিয়ে হাতে-পায়ে প'ড়ো না।

প্রত্যুত্তরে মেজবৌ শুধু একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, না দিদি, সে ভয় তোমাকে করতে হবে না।

তিন

বন্যার চাপে মাটির বাঁধ ভাঙিতে শুরু করে, তখন তাহার অকিঞ্চিৎকর আরম্ভ দেখিয়া মনে করাও যায় না যে, অবিশ্রান্ত জলপ্রবাহ এত অল্পকালমধ্যেই ভাঙনটাকে এমন ভয়াবহ, এমন সুবিশাল করিয়া তুলিবে। ঠিক এমনই হইল হরিলক্ষ্মীর। স্বামীর কাছে বিপিন ও তাঁহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাগুলো যখন তাহার সমাপ্ত হইল, তখন তাহার পরিণাম কল্পনা করিয়া সে নিজে ভয় পাইল। মিথ্যা বলা তাহার স্বভাবও নহে, বলিতেও তাহার শিক্ষা ও মর্য্যাদায় বাঁধে, কিন্তু দুর্নিবার জলস্রোতের মত যে-সকল বাক্য আপন ঝোঁকেই তাহার মুখ দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল, তাহার অনেকগুলিই যে সত্য নহে, তাহা নিজেই সে চিনিতে পারিল। অথচ তাহার গতিরোধ করাও যে তাহার সাধ্যের বাহিরে, ইহাও অনুভব করিতে লক্ষ্মীর বাকী রহিল না। শুধু একটা ব্যাপার সে ঠিক এতখানি জানিত না, সে তাহার স্বামীর স্বভাব। তাহা যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং তেমনি বর্ব্বর। পীড়ন করিবার কোথায় যে সীমা, সে যেন তাহা জানেই না। আজ শিবচরণ আস্ফালন করিল না, সমস্তটা শুনিয়া শুধু কহিল, আচ্ছা, মাস-ছয়েক পরে দেখো। বছর ঘুরবে না, সে ঠিক।

অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা হরিলক্ষ্মীর অন্তরে জ্বলিতেছিল; বিপিনের স্ত্রী ভালরূপ শাস্তি ভোগ করে তাহা সে যথার্থ-ই চাহিতেছিল, কিন্তু শিবচরণ বাহিরে চলিয়া গেলে তাহার মুখের এই সামান্য কয়েকটি কথা বার বার মনের মধ্যে আবৃত্তি করিয়া লক্ষ্মী মনের মধ্যে আর স্বস্তি পাইল না। কোথায় যেন কি একটা ভারী খারাপ হইল, এমনই তাহার বোধ হইতে লাগিল।

দিন-কয়েক পরে কি একটা কথা প্রসঙ্গে হরিলক্ষ্মী হাসিমুখে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, ওঁদের সম্বন্ধে কিছু করচ না কি?

কাদের সম্বন্ধে?

বিপিন ঠাকুরপোদের সম্বন্ধে?

শিবচরণ নিস্পৃহভাবে কহিল, কি-ই বা করব, আর কি-ই বা করতে পারি? আমি সামান্য ব্যক্তি বৈ ত না।

হরিলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, এ কথার মানে?

শিবচরণ বলিল, মেজবৌমা বলে থাকেন কি না, রাজত্বটা ত আর বট্‌ঠাকুরের নয়—ইংরাজ গভর্নমেণ্টের!

হরিলক্ষ্মী কহিল, বলেচে না কি ? কিন্তু আচ্ছা—

কি আচ্ছা ?

স্ত্রী একটুখানি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিল, কিন্তু মেজবৌ ঠিক ওরকম কথা বড় একটা বলে না। ভয়ানক চালাক কি না ! অনেকে আবার বাড়িয়েও হয়ত তোমার কাছে বলে যায়।

শিবচরণ কহিল, আশ্চর্য্য নয়। তবে কি-না, কথাটা আমি নিজের কানে শুনেচি।

হরিলক্ষ্মী বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু তখনকার মত স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত সহসা কোপ প্রকাশ করিয়া উঠিল, বল কি গো, এতবড় অহঙ্কার। আমাকে না হয় যা খুশি বলেচে, কিন্তু ভাশুর বলে তোমার ত একটা সম্মান থাকা দরকার !

শিবচরণ বলিল, হিঁদুর ঘরে এই ত পাঁচজনে মনে করে। লেখাপড়া-জানা বিদ্বান মেয়েমানুষ কি-না। তবে আমাকে অপমান করে পার আছে, কিন্তু তোমাকে অপমান করে কারও রক্ষে নেই। সদরে একটু জরুরি কাজ আছে, আমি চললাম। বলিয়া শিবচরণ বাহির হইয়া গেল। কথাটা যে-রকম করিয়া হরিলক্ষ্মীর পাড়িবার ইচ্ছা ছিল তাহা হইল না, বরঞ্চ উল্টা হইয়া গেল। স্বামী চলিয়া গেলে ইহাই তাহার পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল।

সদরে গিয়া শিবচরণ বিপিনকে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, পাঁচ-সাত বছর থেকে তোমাকে বলে আসছি, বিপিন, গোয়ালটা তোমার সরাও, শোবার ঘরে আমি আর টিকতে পারিনে, কথাটায় কি তুমি কান দেবে না ঠিক করেছ ?

বিপিন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ আমি ত একবারও শুনিনি বড়দা ?

শিবচরণ অবলীলাক্রমে কহিল, অন্ততঃ দশবার আমি তোমাকে নিজের মুখেই বলেচি। তোমার স্মরণ না থাকলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু এতবড় জমিদারী যাকে শাসন করতে হয় তার কথা ভুলে গেলে চলে না। সে যাই হোক, তোমার আপনার ত একটা আক্কেল থাকা উচিত যে, পরের জায়গায় নিজের গোয়াল-ঘর রাখা কতদিন চলে ? কালকেই ওটা সরিয়ে ফেল গে। আমার আর সুবিধে হবে না, তোমাকে শেষবারের মত জানিয়ে দিলাম।

বিপিনের মুখে এমনিই কথা বাহির হয় না, অকস্মাৎ এই পরম বিস্ময়কর প্রস্তাবের সম্মুখে সে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পিতামহর আমল হইতে

যে গোয়াল-ঘরটাকে সে নিজেদের বলিয়া জানে, তাহা অপরের, এতবড় মিথ্যা উক্তির সে একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিল না, নীরবে বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

তাহার স্ত্রী সমস্ত বিবরণ শুনিয়া কহিল, কিন্তু রাজার আদালত খোলা আছে ত।

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। সে যত ভালমানুষই হোক, এ-কথা সে জানিত, ইংরেজ রাজার আদালতগৃহের সুবৃহৎ দ্বার যত উন্মুক্তই থাক্ দরিদ্রের প্রবেশ করিবার পথ এতটুকু খোলা নাই। হইলও তাহাই। পরদিন বড়বাবুর লোক আসিয়া প্রাচীন ও জীর্ণ গো-শালা ভাঙিয়া লম্বা প্রাচীর টানিয়া দিল। বিপিন থানায় গিয়া খবর দিয়া আসিল, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শিবচরণের পুরাতন ইটের নূতন প্রাচীর যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একটা রাঙা পাগড়িও ইহার নিকটে আসিল না। বিপিনের স্ত্রী হাতের চুড়ি বেচিয়া আদালতে নালিশ করিল, তাহাতে শুধু গহনাটাই গেল, আর কিছু হইল না।

বিপিনের পিসীমা-সম্পর্কীয়া একজন শুভানুধ্যায়িনী এই বিপদে হরিলক্ষ্মীর কাছে গিয়া পড়িতে বিপিনের স্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাহাতে সে নাকি জবাব দিয়েছিল, বাঘের কাছে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি পিসীমা? প্রাণ যা যাবার তা যাবে, কেবল অপমানটাই উপরি পাওনা হবে।

এই কথা হরিলক্ষ্মীর কানে আসিয়া পৌঁছিলে, সে চুপ করিয়া রহিল, কিছু একটা উত্তর দেবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না।

পশ্চিম হইতে ফিরিয়া অবধি শরীর তাহার কোনদিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল না, এই ঘটনার মাস-খানেকের মধ্যে সে আবার জ্বরে পড়িল। কিছুকাল গ্রামের চিকিৎসা চলিল, কিন্তু ফল যখন হইল না, তখন ডাক্তারের উপদেশমত পুনরায় তাহাকে বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

নানাবিধ কাজের তাড়ায় এবার শিবচরণ সঙ্গে যাইতে পারিল না, দেশেই রহিল। যাবার সময় সে স্বামীকে একটা কথা বলিবার জন্য মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোনমতেই সে এই লোকটির সম্মুখে সে-কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ অনুরোধ বৃথা, ইহার অর্থ সে বুঝিবে না।

হরিলক্ষ্মীর রোগগ্রস্ত দেহ সম্পূর্ণ নিরাময় হইতে এবার কিছু দীর্ঘ সময় লাগিল। প্রায় বাৎসরাধিক কাল পরে সে বোলপুরে ফিরিয়া আসিল। শুধু কেবল জমিদারের আদরের পত্নী বলিয়াই নয়, সে এতবড় সংসারের গৃহিণী। পাড়ার মেয়েরা দল বাঁধিয়া দেখিতে আসিল, যে সম্বন্ধে বড় সে আশীর্ব্বাদ করিল, যে ছোট সে প্রণাম করিয়া

পায়ের ধূলা লইল। আসিল না শুধু বিপিনের স্ত্রী। সে যে আসিবে না, হরিলক্ষ্মী তাহা জানিত। এই একটা বছরের মধ্যে তাহারা কেমন আছে, যে-সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা তাহাদের বিরুদ্ধে চলিতেছিল, তাহার ফল কি হইয়াছে, এ-সব কোন সংবাদই সে কাহারও কাছে জানিবার চেষ্টা করে নাই। শিবচরণ কখনও বাটীতে কখনও বা পশ্চিমে স্ত্রীর কাছে গিয়া বাস করিতেছিলেন। যখনই দেখা হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে ইহাদের কথাই তাহার মনে হইয়াছে, অথচ একটা দিনের জন্যও স্বামীকে প্রশ্ন করে নাই। প্রশ্ন করিতে তাহার মনে ভয় করিত। মনে করিত এতদিনে হয়ত যা হোক একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে, হয়ত ক্রোধের সে প্রখরতা আর নাই—জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে আবার সেই পূর্ব্বক্ষত বাড়িয়া উঠে এ আশঙ্কায় সে এমনই একটা ভাব ধারণ করিয়া থাকিত, যেন সে-সকল তুচ্ছ কথা আর তাহার মনেই নাই। ও-দিকে শিবচরণও নিজে হইতে কোনদিন বিপিনদের বিষয় আলোচনা করিত না। সে যে স্ত্রীর অপমানের ব্যাপার বিস্মৃত হয় নাই, বরঞ্চ তাহার অবর্ত্তমানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, এই কথাটা সে হরিলক্ষ্মীর কাছে গোপন করিয়াই রাখিত। তাহার সাধ ছিল, লক্ষ্মী গৃহে ফিরিয়া নিজের চোখেই সমস্ত দেখিতে পাইয়া আনন্দিত, বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া উঠিবে।

বেলা বাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই পিসীমার পুনঃ পুনঃ সস্নেহ তাড়নায় লক্ষ্মী স্নান করিয়া আসিলে তিনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তোমার রোগা শরীর বৌমা, নীচে গিয়ে কাজ নেই, এইখানেই ঠাঁই করে ভাত দিয়ে যাক।

লক্ষ্মী আপত্তি করিয়া সহাস্যে কহিল, শরীর আগের মতই ভাল হয়ে গেছে পিসীমা, আমি রান্নাঘরে গিয়েই খেতে পারব, ওপরে বয়ে আনবার দরকার নেই। চল নীচেই যাচ্ছি।

পিসীমা বাধা দিলেন, শিবুর নিষেধ আছে জানাইলেন এবং তাঁহারই আদেশে ঝি ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিয়া গেল। পরক্ষণে রাঁধুনি অন্নব্যঞ্জন বহিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। সে চলিয়া গেলে লক্ষ্মী আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাঁধুনীটি কে পিসীমা? আগে ত দেখিনি?

পিসীমা হাস্য করিয়া বলিলেন, চিনতে পারলে না, বৌমা, ও যে আমাদের বিপিনের বৌ।

লক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে বুঝিল, তাহাকে চমৎকৃত করিবার জন্যই এতখানি ষড়যন্ত্র এমন করিয়া গোপনে রাখা হইয়াছিল। কিছুক্ষণ আপনাকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসু-মুখে পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পিসীমা বলিলেন, বিপিন মারা গেছে, শুনেচ ত ?

লক্ষ্মী শুনে নাই কিছুই, কিন্তু এইমাত্র যে তাহার খাবার দিয়া গেল, যে সে বিধবা তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ।

পিসীমা অবশিষ্ট ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিলেন, যা ধুলোগুঁড়ো ছিল, মামলায় মামলায় সর্ব্বস্ব খুইয়ে বিপিন মারা গেল। বাকী টাকার দায়ে বাড়িটাও যেত। আমরা পরমর্শ দিলাম, মেজবৌ, বছর দু'বছর গতরে খেটে শোধ দে, তোর অপগণ্ড ছেলের মাথা গোঁজবার স্থানটুকু বাঁচুক।

লক্ষ্মী বিবর্ণ-মুখে তেমনই পলকহীন চক্ষুতে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। পিসীমা সহসা গলা খাটো করিয়া বলিলেন, তবু আমি একদিন ওকে আড়ালে ডেকে বলেছিলাম, মেজবৌ, যা হবার তা ত হ'লো, এখন ধার টার করে যেমন করে হোক, একবার কাশী গিয়ে বৌমার হাতে-পায়ে গিয়ে পড়। ছেলেটাকে তার পায়ের উপর নিয়ে ফেলে দিয়ে বল গে, দিদি, এর তো কোন দোষ নেই, একে বাঁচাও—

কথাগুলি আবৃত্তি করতেই পিসীমার চোখ জল-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, অঞ্চলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কিন্তু সেই যে মাথা গুঁজে মুখ বুজে বসে রইল, হাঁ-না একটা জবাব পর্য্যন্ত দিল না।

হরিলক্ষ্মী বুঝিল, ইহার সমস্ত অপরাধের ভারই তাহার মাথায় গিয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন তিতো বিষ হইয়া উঠিল এবং একটা গ্রাসও যেন গলা দিয়া গলিতে চাহিল না। পিসীমা কি একটা কাজে ক্ষণকালের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন, তিনি ফিরিয়া আসিয়া খাবারের অবস্থা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ডাক দিলেন, বিপিনের বৌ ! বিপিনের বৌ !

বিপিনের বৌ দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াতেই তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তাঁর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের করুণা চক্ষুর নিমেষে কোথায় উবিয়া গেল, তীক্ষ্ণ-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, এমন তাচ্ছিল্য করে কাজ করলে ত চলবে না বিপিনের বৌ ! বৌমা একটা দানা মুখে দিতে পারলে না, এমনই রেঁধেচ !

ঘরের বাহির হইতে এই তিরস্কারের কোন উত্তর আসিল না, কিন্তু অপরের অপমানের ভারে লজ্জায় ও বেদনায় ঘরের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর মাথা হেঁট হইয়া গেল।

পিসীমা পুনশ্চ কহিলেন, চাকরি করতে এসে জিনিস-পত্র নষ্ট করে ফেললে চলবে না বাছা, আরও পাঁচজনে যেমন করে কাজ করে, তোমাকে তেমনই করতে হবে, তা বলে দিচ্ছি।

বিপিনের স্ত্রী এবার আস্তে আস্তে বলিল, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই করি পিসীমা, আজ হয়ত কি-রকম হয়ে গেছে। এই বলিয়া সে নীচে চলিয়া গেলে, লক্ষ্মী উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র পিসীমা হায় হায় করিয়া উঠিলেন।

লক্ষ্মী মৃদু-কণ্ঠে কহিল, কেন দুঃখ করচ পিসীমা, আমার দেহ ভাল নেই বলেই খেতে পারলাম না—মেজবৌয়ের রান্নার ত্রুটি ছিল না।

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া নির্জ্জন ঘরের মধ্যে হরিলক্ষ্মীর যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার অপমান সহিয়াও বিপিনের স্ত্রীর হয়ত ইহার পরেও এই বাড়িতেই চাকরি করা চলিতে পারে, কিন্তু আজকের পরে গৃহিণীপনার পণ্ডশ্রম করিয়া তাহার নিজের দিন চলিবে কি করিয়া? মেজবৌয়ের একটা সান্ত্বনা তবুও বাকী আছে—তাহা বিনা দোষে দুঃখ-সহার সান্ত্বনা, কিন্তু তাহার নিজের জন্য কোথায় কি অবশিষ্ট রহিল!

রাত্রিতে স্বামীর সহিত কথা কহিবে কি, হরিলক্ষ্মী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও পারিল না। আজ তাহার মুখের একটি কথায় বিপিনের স্ত্রীর সকল দুঃখ দূর হইতে পারিত, কিন্তু নিরুপায় নারীর প্রতি যে মানুষ এতবড় শোধ লইতে পারে, তাহার পৌরুষে বাধে না, তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিবার হীনতা স্বীকার করিতে কোনমতেই লক্ষ্মীর প্রবৃত্তি হইল না।

শিবচরণ ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, মেজবৌমার সঙ্গে হ'লো দেখা? বলি কেমন রাঁধচে?

হরিলক্ষ্মী জবাব দিতে পারিল না, তাহার মনে হইল, এই লোকটাই তাহার স্বামী এবং সারাজীবন ইহারই ঘর করিতে হইবে মনে করিয়া তাহার মনে হইল, পৃথিবী দ্বিধা হও!

পরদিন সকালে উঠিয়াই লক্ষ্মী দাসীকে দিয়া পিসীমাকে বলিয়া পাঠাইল, তাহার জ্বর হইয়াছে, সে কিছুই খাইবে না।

পিসীমা ঘরে আসিয়া জেরা করিয়া লক্ষ্মীকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন—তাহার মুখের ভাবে ও কণ্ঠস্বরে তাঁহার কেমন যেন সন্দেহ হইল, লক্ষ্মী কি একটা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কহিলেন, কিন্তু তোমার ত সত্যিই অসুখ করেনি বৌমা?

লক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া জোর করিয়া বলিল, আমার জ্বর হয়েছে; আমি কিছু খাব না!

ডাক্তার আসিলে তাহাকে দ্বারের বাহির হইতে লক্ষ্মী বিদায় করিয়া দিয়া বলিল, আপনি ত জানেন, আপনার ওষুধে আমার কিছুই হয় না—আপনি যান।

শিবচরণ আসিয়া অনেক-কিছু প্রশ্ন করিল, কিন্তু একটা কথারও উত্তর পাইল না।

আরও দুই-তিন দিন যখন এমনই করিয়া কাটিয়া গেল, বাড়ির সকলেই কেমন যেন অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সেদিন বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর, লক্ষ্মী স্নানের ঘর হইতে নিঃশব্দে মৃদু-পদে প্রাঙ্গণের একধার দিয়া উপরে যাইতেছিল, পিসীমা রান্নাঘরের বারান্দা হইতে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দেখ বৌমা, বিপিনের বৌয়ের কাজ!—এঁ্যা মেজবৌ, শেষকালে চুরি শুরু করলে?

হরিলক্ষ্মী কাছে গিয়া দাঁড়াইল। মেজবৌ মেঝের উপর নির্ব্বাক্ অধোমুখে বসিয়া, একটা পাত্রে অন্ন-ব্যঞ্জন গামছা ঢাকা দেওয়া সম্মুখে রাখা; পিসীমা দেখাইয়া বলিলেন, তুমি বল বৌমা, এত ভাত-তরকারি একটা মানুষে খেতে পারে? ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্চে ছেলের জন্যে; অথচ বার বার করে মানা করে দেওয়া হয়েচে। শিবচরণের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না—ঘাড় ধরে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। বৌমা, তুমি মনিব, তুমিই এর বিচার কর। এই বলিয়া পিসীমা যেন একটা কর্ত্তব্য শেষ করিয়া হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিলেন।

তাঁহার চীৎকার-শব্দে বাড়ির চাকর, দাসী, লোকজন যে যেখানে ছিল তামাসা দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, আর তাহারই মধ্যে নিঃশব্দে বসিয়া ও-বাড়ির মেজবৌ ও তাহার কর্ত্রী এ-বাড়ির গৃহিণী।

এত ছোট, এত তুচ্ছ বস্তু লইয়া এত কদর্য্য কাণ্ড বাধিতে পারে, লক্ষ্মীর তাহা স্বপ্নের অগোচর। অভিযোগের জবাব দিবে কি, অপমানে, অভিমানে, লজ্জায় সে মুখ তুলিতেই পারিল না। লজ্জা অপরের জন্য নয়, সে নিজের জন্যই। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে লাগিল, তাহার মনে হইল, এত লোকের সম্মুখে সে-ই যেন ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং বিপিনের স্ত্রীই তাহার বিচার করিতে বসিয়াছে।

মিনিট দুই-তিন এইভাবে থাকিয়া সহসা প্রবল চেষ্টায় লক্ষ্মী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, পিসীমা, তোমরা সবাই একবার এ-ঘর থেকে যাও।

তাহার ইঙ্গিতে সকলে প্রস্থান করিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে মেজবৌয়ের কাছে গিয়া বসিল; হাত দিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, তাহারও দুইচোখ বহিয়া জল পড়িতেছে। কহিল, মেজবৌ, আমি তোমার দিদি, এই বলিয়া নিজের অঞ্চল দিয়া তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিল।

সতী

১০ম—২৮

সতী

এক

হরিশ পাবনার একজন সম্ভ্রান্ত ভাল উকিল। কেবল ওকালতি হিসাবেই নয়, মানুষ হিসাবেও বটে। দেশের সর্বপ্রকার সদানুষ্ঠানের সহিতই সে অল্প-বিস্তর সংশ্লিষ্ট। সহরের কোন কাজই তাহাকে বাদ দিয়া হয় না। সকালে 'দুর্নীতি-দমন' সমিতির কার্য্যকরী সভার একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেছে, এখন কোনমতে দুটি খাইয়া লইয়া আদালতে পৌঁছিতে পারিলে হয়। বিধবা ছোট বোন উমা কাছে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিল, পাছে বেলার অজুহাতে খাওয়ার ত্রুটি ঘটে।

স্ত্রী নির্ম্মলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অদূরে উপবেশন করিল, কহিল, কালকের কাগজে দেখলাম আমাদের লাবণ্যপ্রভা আসচেন এখানকার মেয়ে-ইস্কুলের ইন্‌স্‌-পেক্‌ট্রেস হয়ে।

এই সহজ কথা কয়টির ইঙ্গিত অতীব গভীর।

উমা চকিত হইয়া কহিল, সত্যি নাকি? তা লাবণ্য নাম এমন ত কত আছে বৌদি!

নির্ম্মলা বলিল, তা আছে। ওঁকে জিজ্ঞাসা করছি।

হরিশ মুখ তুলিয়া সহসা কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি জানব কি করে শুনি? গভর্নমেণ্ট কি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে লোক বাহাল করে নাকি?

স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিল, আহা রাগ কর কেন, রাগের কথা ত বলিনি। তোমার তদবির-তাগাদায় যদি কারও উপকার হয়ে থাকে সে ত আহ্লাদের কথা। বলিয়া, যেমন অসিয়াছিল তেমনি মন্থর মৃদু-পদে বাহির হইয়া গেল।

উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—আমার মাথা খাও দাদা, উঠো না—উঠো না—

হরিশ বিদ্যুৎ-বেগে আসন ছাড়িয়া উঠিল—নাঃ, শান্তিতে একমুঠো খাবারও জো নেই। উঃ! আত্মঘাতী না হলে আর—, বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। যাবার পথে স্ত্রীর মধুর কণ্ঠ কানে গেল, তুমি কোন দুঃখে আত্মঘাতী হবে? যে হবে সে একদিন জগৎ দেখবে।

এখানে হরিশের একটু পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলা প্রয়োজন। এখন তাহার বয়স চল্লিশের কম নয়, কিন্তু কম যখন সত্যই ছিল সেই পাঠ্যাবস্থার একটু ইতিহাস আছে। পিতা রামমোহন তখন বরিশালের সাব-জজ। হরিশ এম. এ. পরীক্ষার পড়া তৈরী করিতে কলিকাতার মেস ছাড়িয়া বরিশালে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিবেশী ছিলেন হরকুমার মজুমদার। স্কুল-ইন্সপেক্টর। লোকটি নিরীহ, নিরহঙ্কার এবং অগাধ পণ্ডিত। সরকারী কাজে ফুরসৎ পাইলে এবং সদরে থাকিলে মাঝে মাঝে আসিয়া সদরআলা বাহাদুরের বৈঠকখানায় বসিতেন। অনেকেই আসিতেন। টাকওয়ালা মুন্সেফ, দাড়ি ছাঁটা ডেপুটি, মহাস্থবির সরকারী উকিল এবং সহরের অন্যান্য মান্যগণ্যের দল সন্ধ্যার পরে কেহই প্রায় অনুপস্থিত থাকিতেন না। তাহার কারণ ছিল। সদরআলা নিজে ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু। অতএব আলাপ-আলোচনার অধিকাংশই হইত ধর্ম্ম সম্বন্ধে। এবং যেমন সর্বত্র ঘটে, এখানেও তেমনি অধ্যাত্ম-তত্ত্বকথার শাস্ত্রীয় মীমাংসা সমাধা হইত খণ্ড-যুদ্ধের অবসানে।

সেদিন এমনি একটা লড়াইয়ের মাঝখানে হরকুমার তাঁহার বাঁশের ছড়িটি হাতে করিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যাপারে কোনদিন তিনি কোন অংশ গ্রহণ করিতেন না। নিজে ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত ছিলেন বলিয়াই হোক, অথবা শান্ত মৌন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলিয়াই হোক, চুপ করিয়া শোনা ছাড়া গায়ে পড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিবার চঞ্চলতা তাঁহার একটি দিনও প্রকাশ পায় নাই। আজ কিন্তু অন্যরূপ ঘটিল। তিনি ঘরে ঢুকিতেই টাকওয়ালা মুন্সেফবাবু তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া বসিলেন। ইহার কারণ, এইবার ছুটিতে কলিকাতায় গিয়া তিনি কোথায় যেন এই লোকটির ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের একটা জনরব শুনিয়া আসিয়াছিলেন। হরকুমার স্মিতহাস্যে সম্মত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল, শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ মাত্র সম্বল করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলে না। সবাই খুশী হইলেন, হইলেন না শুধু সাব-জজ বাহাদুর নিজে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জাতি দিয়াছে তাহার আবার শাস্ত্রজ্ঞান কিসের জন্য? এবং বলিলেনও ঠিক তাই। সকলে উঠিয়া গেলে তাঁহার পরম প্রিয় সরকারী উকিলবাবুকে চোখের ইঙ্গিতে হাসিয়া কহিলেন, শুনলেন ত ভাদুড়ীমশাই; ভূতের মুখে রাম নাম আর কি!

ভাদুড়ী ঠিক সায় দিতে পারিলেন না; কহিলেন, তা বটে! কিন্তু জানে খুব। সমস্ত যেন মুখস্থ। আগে মাস্টারি করত কি-না।

হাকিম প্রসন্ন হইলেন না। বলিলেন, ও জানার মুখে আগুন। এরাই হ'লো জ্ঞান-পাপী! এদের আর মুক্তি নেই।

হরিশ সেদিন চুপ করিয়া একধারে বসিয়াছিল। এই স্বল্পভাষী প্রৌঢ়ের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং পিতার অভিমত যাহাই হোক পুত্র তাহার আসন্ন পরীক্ষা-সমুদ্র হইতে মুক্তি পাইবার ভরসায় তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া পড়িল। সাহায্য করিতে হইবে। হরকুমার সম্মত হইলেন। এইখানে তাঁহার কন্যা লাবণ্যের সহিত হরিশের পরিচয় হইল। সেও আই. এ. পরীক্ষার পড়া তৈরী করিতে কলিকাতার গণ্ডগোল ছাড়িয়া পিতার কাছে আসিয়াছিল। সেইদিন হইতে প্রতিদিনই আনাগোনায় হরিশ পাঠ্যপুস্তকের দুরূহ অংশের অর্থই শুধু জানিল না, আরও একটা জটিলতর বস্তুর স্বরূপ জানিয়া লইল যাহা তত্ত্ব হিসেবে ঢের বড়। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। ক্রমশঃ পরীক্ষার দিন কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল, হরিশ কলিকাতায় চলিয়া গেল। পরীক্ষা সে ভালই দিল এবং ভাল করিয়াই পাশ করিল।

কিছুকাল পরে আবার যখন দেখা হইল, হরিশ সমবেদনায় মুখ পাংশু করিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ফেল করলেন যে বড়?

লাবণ্য কহিল, এইটুকুও পারব না, আমি এতই অক্ষম?

হরিশ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, যা হবার হয়েচে, এবার কিন্তু খুব ভাল করে একজামিন দেওয়া চাই।

লাবণ্য কিছুমাত্র লজ্জা পাইল না, বলিল, খুব ভালো করে দিলেও আমি ফেল হবো। ও আমি পারব না।

হরিশ অবাক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, পারবেন না কি রকম?

লাবণ্য জবাব দিল, কি-রকম আবার কি? এমনি। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ক্রমশঃ কথাটা হরিশের মাতার কানে গেল।

সেদিন সকালে রামমোহনবাবু মোকদ্দমার রায় লিখিতেছিলেন। যে দুর্ভাগা হারিয়াছে তাহার আর কোথাও কোন কূল-কিনারা না থাকে, এই শুভ-সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে রায়ের মুসাবিদায় বাছিয়া বাছিয়া শব্দযোজনা করিতেছিলেন, গৃহিণীর মুখে ছেলের কাণ্ড শুনিয়া তাঁহার মাথায় আগুন ধরিয়া গেল। হরিশ নরহত্যা করিয়াছে শুনিলেও বোধ করি তিনি এতখানি বিচলিত হইতেন না। দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কি! এত বড়—! ইহার অধিক কথা তাঁহার মুখে আর যোগাইল না।

দিনাজপুরে থাকিতে একজন প্রাচীন উকিলের সহিত তাঁহার শিখার গুচ্ছ, গীতার মর্ম্মার্থ ও পেন্সনাস্তে ৺কাশীবাসের উপকারিতা লইয়া অত্যন্ত মতের মিল ও হৃদ্যতা

জন্মিয়াছিল, একটা ছুটির দিনে গিয়া তাঁহারই ছোটমেয়ে নির্ম্মলাকে আর একবার চোখে দেখিয়া ছেলের বিবাহের পাকা কথা দিয়া আসিলেন!

মেয়েটি দেখিতে ভাল; দিনাজপুরে থাকিতে গৃহিণী তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তথাপি স্বামীর কথা শুনিয়া গালে হাত দিলেন—বল কি গো, একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলে? আজকালকার ছেলে—

কর্ত্তা কহিলেন, কিন্তু আমি ত আজকালকার বাপ নই? আমি আমার সেকেলে নিয়মেই ছেলে মানুষ করতে পারি। হরিশের পছন্দ না হয় তাকে আর কোন উপায় দেখতে ব'লো।

গৃহিণী স্বামীকে চিনিতেন, তিনি নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

কর্ত্তা পুনশ্চ বলিলেন, মেয়ে ডানা-কাটা পরী না হোক ভদ্রঘরের কন্যা। সে যদি তার মায়ের সতীত্ব আর হিঁদুয়ানী নিয়ে আমাদের ঘরে আসে, তাই যেন হরিশ ভাগ্য বলে মানে।

খবরটা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। হরিশও শুনিল। প্রথমে সে মনে করিল, পলাইয়া কলিকাতায় গিয়া কিছু না জুটে, টিউশনি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে। পরে ভাবিল সন্ন্যাসী হইবে। শেষে পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ—ইত্যাদি স্মরণ করিয়া স্থির হইয়া রহিল।

কন্যার পিতা ঘটা করিয়া পাত্র দেখিতে আসিলেন, এবং আশীর্ব্বাদের কাজটাও একসঙ্গে সারিয়া লইলেন। সভায় সহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, নিরীহ হরকুমার কিছু না জানিয়াই আসিয়াছিলেন। তাহাদের সমক্ষে রায়বাহাদুর ভাবী বৈবাহিক মৈত্র মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মের প্রগাঢ় নিষ্ঠার পরিচয় দিলেন, এবং ইংরাজী-শিক্ষার সংখ্যাতীত দোষ কীর্ত্তন করিয়া অনেকটা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহাকে হাজার টাকার মাহিনার চাকুরি দেওয়া ব্যতীত ইংরেজের আর কোন গুণ নাই। আজকাল দিনক্ষণ অন্যরূপ হইয়াছে, ছেলেদের ইংরাজী না পড়াইলে চলে না। কিন্তু যে মূর্খ এই ম্লেচ্ছ-বিদ্যা ও ম্লেচ্ছ-সভ্যতা হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে টানিয়া আনে তাহার ইহকালও নাই পরকালও নাই।

একা হরকুমার ভিন্ন ইহার নিগূঢ় অর্থ কাহারও অবিদিত রহিল না; সেদিন সভা ভঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল এবং যথাকালে শুভকর্ম্ম সমাধা হইতেও বিঘ্ন ঘটিল না। কন্যাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠাইবার প্রাক্কালে মৈত্রগৃহিণী—নির্ম্মলার সতী-সাধ্বী মাতাঠাকুরাণী—বধূ-জীবনের চরম তত্ত্বটি মেয়ের কানে দিলেন,

বলিলেন, মা, পুরুষমানুষকে চোখে চোখে না রাখলেই সে গেল। সংসার করতে আর যা-ই কেন-না ভোল কখনো এ-কথাটি ভুলো না।

তাঁহার নিজের স্বামীর টিকির গোছা ও শ্রীগীতার মর্ম্মার্থ লইয়া মাতিয়া উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনেক জ্বালাইয়াছেন। আজিও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, মৈত্র-বুড়া চিতায় শয়ন না করিলে আর তাঁহার নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই।

নির্ম্মলা স্বামীর ঘর করিতে আসিল এবং সেই ঘর আজ বিশ বর্ষ ধরিয়া করিতেছে। এই সুদীর্ঘ কালে কত পরিবর্ত্তন, কত কি ঘটিল। রায়বাহাদুর মরিলেন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মৈত্র গতায়ু হইলেন, লেখাপড়া সাঙ্গ হইলে লাবণ্যের অন্যত্র বিবাহ হইল, জুনিয়ার উকিল হরিশ সিনিয়ার হইয়া উঠিলেন, বয়স তখন যৌবন পার হইয়া প্রৌঢ়ত্বে গিয়া পড়িল, কিন্তু নির্ম্মলা তাহার মাতৃদত্ত মন্ত্র আর এ-জীবনে ভুলিল না।

দুই

এই সঞ্জীব মন্ত্রের ক্রিয়া যে এত সত্বর শুরু হইবে তাহা কে জানিত। রায়বাহাদুর তখনও জীবিত, পেন্সন লইয়া পাবনার বাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন। হরিশের এক উকিল-বন্ধুর পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে একজন ভাল কীর্ত্তন-ওয়ালী আসিয়াছিল, সে দেখিতে সুশ্রী এবং বয়স কম। অনেকেরই ইচ্ছা ছিল কাজ-কর্ম্ম অন্তে একদিন ভাল করিয়া তাহার কীর্ত্তন শুনা। পরদিন হরিশের গান শুনিবার নিমন্ত্রণ হইল; শুনিয়া বাড়ি ফিরতে একটু অধিক রাত্রি হইয়া গেল।

নির্ম্মলা উপরে খোলা বারান্দায় রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, স্বামীকে উপরে উঠিতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, গান লাগল কেমন?

হরিশ খুশী হইয়া কহিল, খাসা গায়।

দেখতে কেমন?

মন্দ না, ভালই।

নির্ম্মলা কহিল, তা হলে রাতটা একেবারে কাটিয়ে এলেই ত পারতে।

এই অপ্রত্যাশিত কুৎসিত মন্তব্যে হরিশ ক্রুদ্ধ হইবে কি, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, কি-রকম ?

নির্ম্মলা সক্রোধে বলিল, রকম ভালই। আমি কচি-খুকি নই, জানি সব, বুঝি সব। আমার চোখে ধূলো দেবে তুমি ? আচ্ছা—

উমা পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া সভয়ে কহিল, তুমি করচ কি বৌদি, বাবা শুনতে পাবেন যে ?

নির্ম্মলা জবাব দিল, পেলেনই বা শুনতে। আমি ত চুপি চুপি কথা কইচিনে।

এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে যে উমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু পাছে তাহার উচ্চস্বরে বৃদ্ধ পিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এই ভয়ে সে পরক্ষণেই জোড়-হাতে রুদ্ধ চাপা গলায় মিনতি করিয়া কহিল, রক্ষে কর বৌদি, এত রাত্রে চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারী ক'রো না।

বধূর কণ্ঠস্বর ইহাতে বাড়িল বই কমিল না, কহিল, কিসের কেলেঙ্কারী! তুমি বলবে না কেন ঠাকুরঝি, তোমার বুকের ভেতরটা ত আর জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে না। বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বারে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

হরিশ কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে নীচে আসিয়া বাকী রাতটুকু মক্কেলদের বসিবার বেঞ্চের উপর শুইয়া কাটাইল। অতঃপর দিন-দশেকের মত উভয়ের বাক্যালাপ স্থগিত হইয়া গেল।

কিন্তু হরিশকেও আর সন্ধ্যার পরে বাহিরে পাওয়া যায় না। গেলেও তাহার শঙ্কাকুল ব্যাকুলতা লোকের হাসির বস্তু হইয়া উঠিল। বন্ধুরা রাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হরিশ, যত বুড়ো হ'চ্চো, রোগও যে তত বেড়ে যাচ্ছে হে ?

হরিশ অধিকাংশ স্থলেই জবাব দিত না, কেবল খোঁচা বেশী করিয়া বিঁধলেই বলিত, এই ঘেন্নায় আমাকে যদি তোমরা ত্যাগ করতে পার ত তোমরাও বাঁচো আমিও বাঁচি !

বন্ধুরা কহিতেন, বৃথা! বৃথা! ওকে লজ্জা দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই লজ্জায় মরি।

তিন

সেবার বসন্ত রোগে লোক মরিতে লাগিল খুব বেশী। হরিশকেও রোগে ধরিল। কবিরাজ আসিয়া পরীক্ষা করিয়া মুখ গম্ভীর করিলেন; কহিলেন, মারাত্মক। রক্ষা পাওয়া কঠিন।

রায়বাহাদুর তখন পরলোকে। হরিশের বৃদ্ধা মাতা আছাড় খাইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমার নোয়া-সিঁদুর ঘোচাবে সাধ্যি কার? তোমরা ওঁকে দেখো, আমি চললুম। বলিয়া সে শীতলার মন্দিরে গিয়া হত্যা দিয়া পড়িল। কহিল, উনি বাঁচেন ত আবার বাড়ি ফিরব, নইলে এইখান থেকে ওঁর সঙ্গে যাব।

সাতদিনের মধ্যে দেবতার চরণামৃত ভিন্ন কেহ তাহাকে জল পর্য্যন্ত খাওয়াইতে পারিল না।

কবিরাজ আসিয়া বলিলেন, মা, তোমার স্বামী আরোগ্য হয়েচেন, এবার তুমি ঘরে চল।

লোকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসিল। মেয়েরা পায়ের ধূলা লইল, তাহার মাথায় থাবা থাবা সিঁদুর ঘষিয়া দিল, কহিল, মানুষ ত নয়, যেন সাক্ষাৎ মা—!

বৃদ্ধেরা বলিলেন, সাবিত্রীর উপাখ্যান মিথ্যে, না, কলিতে ধর্ম্ম গেছে বলেই একেবারে ষোলো-আনা গেছে? যমের মুখ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

বন্ধুরা লাইব্রেরীর ঘরে বলাবলি করিতে লাগিল, সাধে আর মানুষে স্ত্রীর গোলাম হয় হে! বিয়ে ত আমরাও করেচি, কিন্তু এমন নইলে আর স্ত্রী! এখন বোঝা গেল হরিশ সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকত না কেন।

বীরেন উকিল ভক্ত লোক, গত বৎসর ছুটিতে কাশী গিয়া সে সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র লইয়া আসিয়াছে, টেবিলে প্রচণ্ড করাঘাত করিয়া কহিল, আমি জানতাম হরিশ মরতেই পারে না। সত্যিকার সতীত্ব জিনিসটা কি সোজা ব্যাপার হে! বাড়ি থেকে বলে গেল, যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই ত—উঃ! শরীর শিউরে ওঠে।

তারিণী চাটুয্যের বয়স হইয়াছে, আফিংখোর লোক। একধারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে তামাক খাইতেছিল, হুঁকাটা বেহারার হাতে দিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, শাস্ত্রমতে সহধর্ম্মিণী কথাটা ভারি শক্ত। আমার দেখ না কেবল মেয়েই সাতটা। বিয়ে দিতে দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম।

অনেকদিন পরে ভাল হইয়া আবার যখন হরিশ আদালতে উপস্থিত হইল তখন কত লোকে যে তাহাকে অভিনন্দন করিল তাহার সংখ্যা নাই।

ব্রজেন্দ্রবাবু সখেদে কহিলেন, ভাই হরিশ, স্ত্রৈণ বলে তোমাকে অনেক লজ্জা দিয়েচি, মাপ ক'রো। লক্ষ কেন, কোটী-কোটীর মধ্যেও তোমার মত ভাগ্যবান নেই, তুমি ধন্য।

ভক্ত বীরেন বলিল, সতী-সাবিত্রীর কথা না হয় ছেড়ে দাও, কিন্তু খনা, লীলাবতী, গার্গী আমাদের দেশেই জন্মেছিলেন। ভাই, স্বরাজ ফরাজ যাই-ই বল, কিছুতেই হবে না, মেয়েদের যতদিন না আবার তেমনি তৈরী করতে পারব। আমার ত মনে হয় শীঘ্রই পাবনায় একটা আদর্শ নারী-শিক্ষা সমিতি গড়ে তোলা প্রয়োজন; এবং যে আদর্শ মহিলা তার পার্মানেণ্ট প্রেসিডেণ্ট হবেন তাঁর নাম ত আমরা সবাই জানি।

বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে বলিলেন, সেইসঙ্গে একটা পণ-প্রথা-নিবারণী সমিতিও হওয়া আবশ্যক। দেশটা ছারখার হয়ে গেল।

ব্রজেন্দ্র কহিলেন, হরিশ, তোমার ত ছেলেবেলায় খাশা লেখার হাত ছিল, তোমার উচিত তোমার এই রিকভারি সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া।

হরিশ কোন কথারই জবাব দিতে পারিল না, কৃতজ্ঞতায় তাহার দুই চক্ষু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

চার

মৃত জমিদার গোঁসাইচরণের বিধবা পুত্রবধূর সহিত অন্যান্য পুত্রদের বিষয়-সংক্রান্ত মামলা বাধিয়াছিল। হরিশ ছিল বিধবার উকিল। জমিদারের আমলা কে যে কোন্ পক্ষে জানা কঠিন বলিয়া গোপনে পরামর্শের জন্য বিধবা নিজেই ইতিপূর্ব্বে দুই-একবার উকিলের বাড়ি আসিয়াছিল। আজ সকালেও তাহার গাড়ি আসিয়া হরিশের সদর দরজায় থামিল। হরিশ সসম্ভ্রমে তাহাকে নিজের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইল। আলোচনা পাছে ও-ঘরে মুহুরির কানে যায়, এই ভয়ে উভয়েই সাবধানে

ধীরে ধীরে কথা কহিতেছিল। বিধবার কি একটা অসংলগ্ন প্রশ্নে হরিশ হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিবার চেষ্টা করিতেই পাশের ঘরে পর্দ্দার আড়াল হইতে অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের শব্দ আসিল, আমি সব শুনেচি।

বিধবা চমকিয়া উঠিল। হরিশ লজ্জা ও শঙ্কায় কাঠ হইয়া গেল।

একজোড়া অতি সতর্ক চক্ষু কর্ণ যে তাহাকে অহরহ পাহারা দিয়া আছে, এ-কথা সে মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়াছিল।

পর্দ্দা ঠেলিয়া নির্ম্মলা রণমূর্ত্তিতে বাহির হইয়া আসিল, হাত নাড়িয়া কণ্ঠস্বরে বিষ ঢালিয়া দিয়া কহিল, ফুস্ ফুস্ করে কথা কয়ে আমাকে ফাঁকি দেবে? মনেও ক'রো না! কই, আমার সঙ্গে ত কখনো এমন হেসে কথা কইতে দেখিনি!

অভিযোগ নিতান্ত মিথ্যা নয়।

বিধবা সভয়ে কহিল, এ কি কাণ্ড হরিশবাবু!

হরিশ বিমূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পাগল।

নির্ম্মলা কহিল, পাগল? পাগলই বটে! কিন্তু করলে কে শুনি? বলিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া সহসা হাঁটু গড়িয়া বিধবার পায়ের কাছে ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল। মুহুরি কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল, একজন জুনিয়ার উকিল সেইমাত্র আসিয়াছিল, সে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল, বোস কোম্পানীর বিল-সরকার তাহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতে লাগিল, এবং তাহাদেরই চোখের সম্মুখে নির্ম্মলা মাথা খুঁড়িতে লাগিল—আমি সব জানি! আমি সব বুঝি! থাকো, তোমরাই সুখে থাকো। কিন্তু সতী মায়ের সতী কন্যা যদি হই, যদি মনে-জ্ঞানে এক বই না দুই জেনে থাকি; যদি—

এদিকে বিধবা নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিল, এ কি ব্যাপার হরিশবাবু! এ কি দুর্নাম দেওয়া—এ কি আমার—

হরিশ কাহারও কোন প্রতিবাদ করিল না। অধোমুখে দাঁড়াইয়া শুধু তাহার মনে হইতে লাগিল, পৃথিবী দ্বিধা হও না কিসের জন্য?

লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে সেদিন হরিশ সেই ঘরেই স্তব্ধ হইয়া রহিল, আদালতে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না। মধ্যাহ্নে উমা আসিয়া বহু সাধ্য-সাধনা এবং মাথার দিব্য দিয়া কিছু খাওয়াইয়া গেল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বামুনঠাকুর রূপার বাটিতে করিয়া খানিকটা জল আনিয়া পায়ের কাছে রাখিল। হরিশের প্রথমে ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া আজও পায়ের বুড়া আঙুলটা ডুবাইয়া দিল। স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া নির্ম্মলা কোনদিন জল-স্পর্শ করিত না।

রাত্রে বাহিরের ঘরে একাকী শয়ন করিয়া হরিশ ভাবিতেছিল তাহার এই দুঃখময় দুর্ভর জীবনের অবসান হইবে কবে? এমনি অনেকদিন অনেক রকমই ভাবিয়াছে, কিন্তু তাহার এই সতী স্ত্রীর একনিষ্ঠ পতিপ্রেমের সুদুঃসহ নাগপাশের বাঁধন হইতে মুক্তির কোন পথই তাহার চোখে পড়ে নাই।

পাঁচ

বছর-দুই গত হইয়াছে। নির্মলা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে যে, খবরের কাগজের খবর ঝুটা নয়। লাবণ্য যথার্থই পাবনার মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হইয়া আসিতেছে।

আজ হরিশ একটু সকাল সকাল আদালত হইতে ফিরিয়া ছোট বোন উমাকে জানাইল যে, রাত্রের ট্রেনে তাঁহাকে বিশেষ জরুরি কাজে কলকাতায় যাইতে হইবে, ফিরিতে বোধ হয় দিন-চারেক বিলম্ব হইবে। বিছানা এবং প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় যেন চাকরকে দিয়া ঠিক করিয়া রাখা হয়।

দিন-পনেরো হইল স্বামী-স্ত্রীতে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল।

রেলওয়ে স্টেশন দূরে, রাত্রি আটটার মধ্যেই মোটরে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। সন্ধ্যার পরে সে মকদ্দমার দরকারী কাগজপত্র হ্যাণ্ডব্যাগে গুছাইয়া লইতেছিল, নির্মলা আসিয়া প্রবেশ করিল।

হরিশ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কিছুই বলিল না।

নির্মলা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আজ কলকাতায় যাচ্ছ নাকি?

হরিশ কহিল, হুঁ।

কেন?

কেন আবার কি? মক্কেলের কাজ, হাইকোর্টে মকদ্দমা আছে।

চল না, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

তুমি যাবে? গিয়ে কোথায় থাকবে শুনি?

নির্ম্মলা কহিল, যেখানে হোক। তোমার সঙ্গে গাছতলায় থাকতেও আমার লজ্জা নেই।

কথাটি ভাল, এবং সতী স্ত্রীরই উপযুক্ত। কিন্তু হরিশের সর্ব্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিল। কহিল, তোমার লজ্জা না থাক্, আমার আছে। আমি গাছতলায় পরিবর্ত্তে আপাতত কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠব স্থির করেচি।

নির্ম্মলা বলিল, তাহলে ত ভালই হ'লো। তাঁর বাড়িতেও স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে, আমার কোন অসুবিধা হবে না।

হরিশ কহিল, না, সে হবে না। বলা নেই কহা নেই, বিনা আহ্বানে পরের বাড়ি তোমাকে নিয়ে গিয়ে আমি উঠতে পারব না।

নির্ম্মলা বলিল, পারবে না সে জানি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যর ওখানে ওঠা যায় না।

হরিশ ক্ষেপিয়া গেল। হাত-মুখ নাড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, তুমি যেমন নোঙরা তেমনি মন্দ। সে বিধবা ভদ্রমহিলা, আমি বা সেখানে যাব কেন, সেই বা আমাকে যেতে বলবে কেন? তা ছাড়া, আমার সময় বা কই? কলকাতায় গিয়ে পরের কাজে ত নিশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ পাব না।

পাবে গো পাবে, বলিয়া নির্ম্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দিন-তিনেক পরে হরিশ কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে স্ত্রী কহিল, চার-পাঁচ দিন বলে গেলে, তিনদিনেই ফিরে এলে যে বড়?

হরিশ কহিল, কাজ চুকে গেল, চলে এলাম।

নির্ম্মলা জোর করিয়া একটু হেসে প্রশ্ন করিল, লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়নি বুঝি?

হরিশ কহিল, না।

নির্ম্মলা অতিশয় ভালোমানুষের মত জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতাতেই যদি গেলে একবার খবর নিলে না কেন?

হরিশ জবাব দিল, সময় পাইনি।

অত কাছাকাছি গেলে, সময় একটুখানি করে নিলেই হ'তো। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ইহার মাস-খানেক পরে একদিন আদালতে বাহির হইবার সময় হরিশ ভগিনীকে ডাকিয়া কহিল, আজ আমার ফিরতে বোধ করি একটু রাত হয়ে যাবে উমা।

কেন দাদা?

উমা কাছেই ছিল, আস্তে বলিলেই চলিত, কিন্তু কণ্ঠস্বর উঁচুতে চড়াইয়া অদৃশ্য কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া হরিশ উত্তর দিল, যোগীনবাবুর বাড়িতে একটা জরুরি পরামর্শ আছে, দেরি হয়ে যেতে পারে।

ফিরিতে দেরিই হইল। রাত্রি বারোটার কম নয়। হরিশ মোটর হইতে নামিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে শুনিতে পাইল স্ত্রী উপরের জানালা হইতে সোফারকে ডাকিয়া বলিতেছে, আবদুল, যোগীনবাবুর বাড়ি থেকে এলে বুঝি?

আবদুল কহিল, নেহি মাইজী, স্টেশনসে আতেহে।

ইষ্টিশান? ইষ্টিশান কেন? গাড়িতে কেউ এলো বুঝি?

আবদুল কহিল, কলকাত্তাসে এক মাইজী আউর বাচ্চা আয়া।

কলকাতা থেকে? বাবু গিয়ে তাদের নিয়ে এসে বাসায় পৌঁছে দিলেন বুঝি?

হাঁ, বলিয়া জবাব দিয়া আবদুল গাড়ি আস্তাবলে লইয়া গেল।

ঘরের মধ্যে হরিশ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এরূপ সম্ভাবনার কথা যে তাহার মনে হয় নাই তাহা নয়, কিন্তু নিজের চাকরকে মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করিতে সে কিছুতেই পারিয়া উঠে নাই।

রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে একটা কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই লাবণ্য ছেলে লইয়া এ-বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিশ বাহিরের ঘরে ছিল, তাহাকে কহিল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় নেই, চলুন আলাপ করিয়ে দেবেন।

হরিশের বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। একবার সে এমনও বলিতে চাহিল যে, এখন অত্যন্ত কাজের তাড়া, কিন্তু সে অজুহাত খাটিল না। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া স্ত্রীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইল।

বছর-দশেকের ছেলে এবং লাবণ্য। নির্মলা তাহাদের সমাদরে গ্রহণ করিল। ছেলেকে খাবার খাইতে দিল এবং তাহার মাকে আসন পাতিয়া সযত্নে বসাইল। কহিল, আমার সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম।

লাবণ্য ইহার উত্তর দিয়া বলিল, হরিশবাবুর মুখে শুনেছিলাম আপনি ক্রমাগত বার-ব্রত আর উপবাস করে করে শরীরটাকে নষ্ট করে ফেলেচেন। এখনো ত বেশ ভাল দেখাচ্চে না।

নির্ম্মলা সহাস্যে কহিল, বাড়ানো কথা। কিন্তু এ আবার উনি কবে বললেন?

হরিশ তখনও কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

লাবণ্য কহিল, এবার কলকাতায়। খেতে বসে কেবল আপনারই কথা। ওঁর বন্ধু কুশলবাবুর বাড়ি থেকে আমাদের বাড়ি খুব কাছে কি না। ছাতের ওপর থেকে চেঁচিয়ে ডাকলে শোনা যায়।

নির্ম্মলা বলিল, খুব সুবিধে ত!

লাবণ্য হাসিয়া বলিল, কিন্তু তাতেই শুধু হয়নি, ছেলেকে পাঠিয়ে রীতিমত ধরে আনতে হ'তো।

বটে!

লাবণ্য বলিল, আবার জাতের গোঁড়ামিও কম নেই। ব্রাহ্মদের ছোঁওয়া খান না —আমার পিসীমার হাতে পর্য্যন্ত না। সমস্তই আমাকে নিজে রেঁধে নিজে পরিবেশন করতে হ'তো। এই বলিয়া সে হাসিমুখে সকৌতুকে হরিশের প্রতি চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, এর মধ্যে আপনার কি লজিক আছে বলুন ত? আমি কি ব্রাহ্ম-সমাজ ছাড়া?

হরিশের সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, তাহার মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হওয়ায় তাহার মনে হইল, এতদিনে মা বসুমতী দয়া করিয়া বোধ হয় তাহাকে জঠরে টানিয়া লইতেছেন। কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, নির্ম্মলা আজ ভয়ঙ্কর উন্মাদ কাণ্ড কিছু একটা না করিয়া স্থির হইয়া রহিল। সংশয়ের বস্তু অবিসংবাদী সত্যরূপে দেখা দিয়া বোধ হয় তাহাকেও হতচেতন করিয়া ফেলিয়াছিল।

হরিশ বাহিরে আসিয়া শুষ্ক পাংশুমুখে বসিয়া রহিল। এই ভীষণ সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়া লাবণ্যকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করিবার কথা বহুবার তাহার মনে হইয়াছে, কিন্তু আত্ম-অবমাননাকর ও একান্ত মর্য্যাদাহীন লুকোচুরির প্রস্তাব সে কোনমতেই এই শিক্ষিত ও ভদ্রমহিলাটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারে নাই।

লাবণ্য চলিয়া গেলে নির্ম্মলা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ছিঃ—তুমি এমন মিথ্যাবাদী! এত মিথ্যে কথা বল!

হরিশ চোখ রাঙাইয়া লাফাইয়া উঠিল—বেশ করি বলি। আমার খুশি।

নির্ম্মলা ক্ষণকাল স্বামীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; কহিল, বল, যত ইচ্ছে মিথ্যে বল, যত খুশি আমাকে ঠকাও। কিন্তু ধর্ম্ম যদি থাকে, যদি সতী মায়ের মেয়ে হই, যদি কায়-মনে সতী হই—আমার জন্যে তোমাকে একদিন কাঁদতে হবে, হবে, হবে! বলিয়া সে যেমনি আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

বাক্যালাপ পূর্ব্ব হইতেই বন্ধ চলিতেছিল, এখন সেটা দৃঢ়তর হইল এইমাত্র। নীচের ঘরে শয়ন ও ভোজন। হরিশ আদালতে যায় আসে, বাহিরের ঘরে একাকী বসিয়া কাটায়—নূতন কিছুই নয়। আগে সন্ধ্যার সময়ে একবার করিয়া ক্লাবে গিয়া বসিত, এখন সেটুকু বন্ধ হইয়াছে। কারণ সহরের সেইদিকে লাবণ্যর বাসা।

তাহার মনে হয় পতিপ্রাণা ভার্য্যার দুই চক্ষু দশ চক্ষু হইয়া দশ দিক হইতে পতিকে অহরহ নিরীক্ষণ করিতেছে। তাহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় তাহা নিত্য। স্নানের পরে আর্শির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইত, সতীসাধ্বীর এই অক্ষয় প্রেমের আগুনে তাহার কলুষিত দেহের নশ্বর মেদ-মজ্জা-মাংস শুদ্ধ ও নিষ্পাপ হইয়া অত্যন্ত দ্রুত উচ্চতর লোকের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। তাহার আলমারির মধ্যে একখানা কালী সিংহের মহাভারত ছিল, সময় যখন কাটিত না তখন তাহা হইতে সে বাছিয়া বাছিয়া সতী নারীর উপাখ্যান পড়িত। কি তার প্রচণ্ড বিক্রম ও কতই না অদ্ভুত কাহিনী! স্বামী পাপী-তাপী যাহাই হোক, কেবলমাত্র স্ত্রীর সতীত্বের জোরেই সমস্ত পাপ মুক্ত হইয়া অন্তে কল্পকাল তাহারা একত্রে বাস করে। কল্পকাল যে ঠিক কত হরিশ জানিত না, কিন্তু সে যে কম নহে, এবং মুনি-ঋষিদের লেখা শাস্ত্রবাক্য যে মিথ্যা নহে, এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া উঠিত। পরলোকের ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া সে বিছানায় শুইয়া মাঝে মাঝে ইহলোকের ভাবনা ভাবিত। কিন্তু কোন পথ নাই। সাহেবদের হইলে মামলা-মকদ্দমা খাড়া করিয়া এতদিনে যা-হোক একটা ছাড়-রফা করিয়া ফেলিত, মুসলমান-দের হইলে তিন তালাক দিয়া বহুপূর্ব্বেই চুকাইয়া ফেলিত; কিন্তু নিরীহ, এক পত্নীব্রত ভদ্র বাঙালী—না, কোন উপায় নাই। ইংরাজি-শিক্ষায় বহু-বিবাহ ঘুচিয়াছে, —বিশেষতঃ নির্ম্মলা, চন্দ্র-সূর্য্য তাহার মুখ দেখিতে পায় না, অতি-বড় শত্রুও যাহার সতীত্বে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক লেপন করিতে পারে না, বস্তুতঃ স্বামী ভিন্ন যাহার ধ্যান-জ্ঞান নাই, তাহাকে পরিত্যাগ! বাপ্‌রে! নির্ম্মল, নিষ্কলুষ হিন্দু-সমাজের মধ্যে কি আর মুখ দেখাইতে পারিবে! দেশের লোকে খাই খাই করিয়া হয়ত তাহাকে খাইয়াই ফেলিবে।

ভাবিতে ভাবিতে চোখ-কান গরম হইয়া উঠিত, বিছানা ছাড়িয়া মাথায় মুখে জল দিয়া বাকী রাতটুকু সে চেয়ারে বসিয়া কাটাইয়া দিত।

এমনি করিয়া বোধ হয় মাসাধিক কাল গত হইয়া গেছে, হরিশ আদালতে বাহির হইতেছিল, ঝি আসিয়া একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল। কহিল, জবাবের জন্য লোক দাঁড়িয়ে আছে।

খাম ছেঁড়া, উপরে লাবণ্যের হস্তাক্ষর। হরিশ জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি আমার খুলল কে?

ঝি কহিল, মা।

হরিশ চিঠি পড়িয়া দেখিল লাবণ্য অনেক দুঃখ করিয়া লিখিয়াছে, সেদিন আমার অসুখ চোখে দেখে গিয়েও আর একটিবার খবর নিলেন না আমি মরলুম কি বাঁচলুম। অথচ বেশ জানেন এ-বিদেশে আপনি ছাড়া আমার আপনার লোকও কেউ নেই। যাই হোক, এ-যাত্রা আমি মরিনি, বেঁচে আছি। এ চিঠি কিন্তু সে নালিশের জন্যে নয়। আজ আমার ছেলের জন্মতিথি, কোর্টের ফেরত একবার এসে তাকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন এই ভিক্ষা।—লাবণ্য

পত্রের শেষে পুনশ্চ দিয়া জানাইয়াছে যে, রাত্রির খাওয়াটা আজ এইখানেই সমাধা করিতে হইবে। একটুখানি গান-বাজনার আয়োজনও আছে।

চিঠি পড়িয়া বোধ করি সে ক্ষণকাল বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ চোখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, ঝি হাসি লুকাইতে মুখ নীচু করিল। অর্থাৎ বাটীর দাসী-চাকরের কাছেও এ যেন একটা তামাসার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। একমুহূর্ত্তে তাহার শিরার রক্ত আগুন হইয়া উঠিল—ইহার কি সীমা নাই? যতই সহিতেছি ততই কি পীড়নের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে?

জিজ্ঞাসা করিল, চিঠি কে এনেচে?

তাঁদের বাড়ির ঝি।

হরিশ কহিল, তাকে বলে দাও গে আমি কোর্টের ফেরত যাব। বলিয়া সে বীরদর্পে মোটরে গিয়া উঠিল।

সে-রাত্রে বাড়ি ফিরিতে হরিশের বস্তুতঃ অনেক রাত্রিই হইল। গাড়ি হইতে নামিতেই দেখিল তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া নির্ম্মলা পাথরের মূর্ত্তির মত শুব্ধ হইয়া আছে।

ছয়

ডাক্তারের দল অল্পক্ষণ হইল বিদায় লইয়াছেন। পারিবারিক চিকিৎসক বৃদ্ধ জ্ঞানবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, বোধ হয় সমস্ত আফিঙটাই বার করে ফেলা গেছে —বৌমার জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই।

হরিশ একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া কি ভাব যে প্রকাশ করিল, বৃদ্ধ তাহাতে মনোযোগ করিলেন না, কহিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন কাছে কাছে থেকে দিন-দুই সাবধানে রাখলেই বিপদটা কেটে যাবে।

যে আজ্ঞে, বলিয়া হরিশ স্থির হইয়া বসিয়া পড়িল।

সেদিন বার-লাইব্রেরী ঘরে আলোচনা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কঠোর হইয়া উঠিল। ভক্ত বীরেন কহিল, আমার গুরুদেব স্বামিজী বলেন, বীরেন, মানুষকে কখনো বিশ্বাস করবে না। সেদিন গোঁসাইবাবুর বিধবা পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে স্ক্যাণ্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তোমরা তা বিশ্বাস করলে না, বললে, হরিশ এ-কাজ করতেই পারে না। এখন দেখলে? গুরুদেবের কৃপায় আমি এমন অনেক জিনিস জানতে পারি তোমরা যা ড্রিম কর না।

ব্রজেন্দ্র বলিল, উঃ—হরিশটা কি স্কাউণ্ড্রেল! ও-রকম সতীসাধ্বী স্ত্রী যার, কিন্তু মজা দেখেচ সংসারে? বদমাইসগুলোর ভাগ্যেই কেবল এ-রকম স্ত্রী জোটে।

বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে হুঁকা লইয়া ঝিমাইতেছিলেন, কহিলেন, নিঃসন্দেহ। আমার ত মাথার চুল পেকে গেল, কিন্তু ক্যারেক্টারে কেউ কখনো একটা স্পট্ দিতে পারলে না। অথচ আমারই হ'লো সাত-সাতটা মেয়ে, বিয়ে দিতে দিতে দেউলে হয়ে গেলাম।

যোগীনবাবু কহিলেন, আমাদের মেয়ে-ইস্কুলের পরিদর্শক হিসাবে লাবণ্যপ্রভা মহিলাটি দেখচি একেবারে আদর্শ! গভর্নমেণ্টে বোধ করি মুভ করা উচিত।

ভক্ত বীরেন বলিলেন, আবসোলিউট্‌লি নেসেসরি।

সম্পূর্ণ একটা দিন পার হইল না, সতী-সাধ্বীর স্বামী হরিশের চরিত্র জানিতে সহরে কাহারও আর বাকী রহিল না। এবং সুহৃদবর্গের কৃপায় সকল কথাই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল।

উমা আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, দাদা, তুমি আবার বিয়ে কর।

হরিশ কহিল, পাগল!

উমা কহিল, পাগল কেন? আমাদের দেশে ত পুরুষের বহু-বিবাহ ছিল।

হরিশ কহিল, তখন আমরা বর্ব্বর ছিলাম।

উমা জিদ করিয়া বলিল, বর্ব্বর কিসের? তোমার দুঃখ আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সমস্ত জীবনটা কি এমনিই ব্যর্থ হয়েই যাবে?

হরিশ বলিল, উপায় কি বোন! স্ত্রী ত্যাগ করে আবার বিয়ে করার ব্যবস্থা পুরুষের আছে জানি, কিন্তু মেয়েদের ত নেই। তোর বৌদিরও যদি এ-পথ খোলা থাকত তোর কথায় রাজি হতাম উমা।

তুমি কি যে বল দাদা! বলিয়া উমা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। হরিশ চুপ করিয়া একাকী বসিয়া রহিল। তাহার উপায়হীন অন্ধকার চিত্ততল হইতে কেবল একটি কথাই বারংবার উত্থিত হইতে লাগিল, পথ নাই! পথ নাই! এই আনন্দহীন জীবনে দুঃখই ধ্রুব হইয়া রহিল।

তাহার বসিবার ঘরের মধ্যে তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার কানে গেল পাশের বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া বৈষ্ণব ভিখারীর দল কীর্ত্তনের সুরে দূতীর বিলাপ গাহিতেছে। দূতী মথুরায় আসিয়া ব্রজনাথের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কাহিনী বিনাইয়া বিনাইয়া নালিশ করিতেছে। সেকালে ও-অভিযোগের কিরূপ উত্তর দূতীর মিলিয়াছিল হরিশ জানিত না, কিন্তু এখানে সে ব্রজনাথের পক্ষে বিনা পয়সার উকিল দাঁড়াইয়া তর্কের উপর তর্ক জুড়িয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, ওগো দূতী, নারীর একনিষ্ঠ প্রেম খুব ভাল জিনিস, সংসারে তার তুলনা নেই। কিন্তু তুমি ত সব কথা বুঝবে না—বললেও না! কিন্তু আমি জানি ব্রজনাথ কিসের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং একশ' বছরের মধ্যে আর ও-মুখো হননি। কংস-টংস সব মিছে কথা। আসল কথা শ্রীরাধার ঐ একনিষ্ঠ প্রেম। একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, তবু ত তখনকার কালে ঢের সুবিধে ছিল, মথুরায় লুকিয়ে থাকা চলত। কিন্তু এ-কাল ঢের কঠিন! না আছে পালাবার জায়গা, না আছে মুখ দেখাবার স্থান। এখন ভুক্তভোগী ব্রজনাথ দয়া করে অধীনকে একটু শীঘ্র পায়ে স্থান দিলেই বাঁচি।

মামলার ফল

মামলার ফল

বুড়া বৃন্দাবন সামন্তের মৃত্যুর পরে তাহার দুই ছেলে শিবু ও শম্ভু সামন্ত প্রত্যহ ঝগড়া-লড়াই করিয়া মাস-ছয়েক একান্নে এক বাটীতে কাটাইল, তাহার পরে একদিন পৃথক হইয়া গেল।

গ্রামের জমিদার চৌধুরীমশাই নিজে আসিয়া তাহাদের চাষ-বাস, জমি-জমা, পুকুর-বাগান সমস্ত ভাগ করিয়া দিলেন। ছোটভাই সুমুখের পুকুরের ওধারে খান-দুই মাটির ঘর তুলিয়া ছোটবৌ এবং ছেলে-পুলে লইয়া বাস্তু ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

সমস্তই ভাগ হইয়াছিল, শুধু একটা ছোট বাঁশঝাড় ভাগ হইতে পাইল না। কারণ, শিবু আপত্তি করিয়া কহিল, চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার নিতান্তই চাই। ঘরদোর সব পুরানো হয়েচে, চালের বাতা-বাকারি বদলাতে, খোঁটাখুঁটি দিতে বাঁশ আমার নিত্য প্রয়োজন। গাঁয়ে কার কাছে চাইতে যাব বলুন?

শম্ভু প্রতিবাদের জন্য উঠিয়া বড় ভাইয়ের মুখের উপর হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, ওঁর ঘরে খোঁটাখুঁটিতেই বাঁশ চাই—আর আমার ঘরে কলাগাছ চিরে দিলেই হবে, না? সে হবে না, সে হবে না চৌধুরীমশাই, বাঁশঝাড়টা আমার না থাকলেই চলবে না, তা বলে দিচ্ছি।

মীমাংসা ঐ পর্য্যন্তই হইয়া রহিল। সুতরাং সম্পত্তিটা রহিল দুই শরিকের। তাহার ফল হইল এই যে, শম্ভু একটা কঞ্চিতে হাত দিতে আসিলেই শিবু দা লইয়া তাড়িয়া আসে, এবং শিবুর স্ত্রী বাঁশঝাড়ের তলা দিয়া হাঁটিলেই শম্ভু লাঠি লইয়া মারিতে দৌড়ায়।

সেদিন সকালে এই বাঁশঝাড় উপলক্ষ করিয়াই উভয় পরিবারে তুমুল দাঙ্গা হইয়া গেল। ষষ্ঠীপূজা কিংবা এমনি কি একটা দৈবকার্য্যে বড়বৌ গঙ্গামণির কিছু বাঁশপাতার আবশ্যক ছিল। পল্লীগ্রামে এ বস্তুটি দুর্ল্লভ নয়, অনায়াসে অন্যত্র সংগ্রহ হইতে পারিত, কিন্তু নিজের থাকিতে পরের কাছে হাত পাতিতে তাহার সরম বোধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার মনে ভরসা ছিল, দেবর এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাঠে গিয়াছে—ছোটবৌ একা আর করিবে কি।

কিন্তু কি কারণে শম্ভুর সেদিন মাঠে বাহির হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে সবে-মাত্র পান্তা-ভাত শেষ করিয়া হাত ধুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমনি সময়ে ছোটবৌ পুকুর-ঘাট হইতে উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল। শম্ভুর কোথায় রহিল জলের ঘটি—কোথায় রহিল হাত-মুখ ধোওয়া, সে রৈ-রাই শব্দে সমস্ত পাড়াটা তোলপাড় করিয়া তিন লাফে আসিয়া এঁটো-হাতেই পাতা কয়টি কাড়িয়া লইয়া টান মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বড়ভাজের প্রতি যে-সকল বাক্য প্রয়োগ করিল, সে-সকল সে আর যেখানেই শিখিয়া থাকুক, রামায়ণের লক্ষ্মণ-চরিত্র হইতে যে শিক্ষা করে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এদিকে বড়বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি গিয়া মাঠে স্বামীর নিকট খবর পাঠাইয়া দিল। শিবু লাঙ্গল ফেলিয়া কাস্তে হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল এবং বাঁশঝাড়ের অদূরে দাঁড়াইয়া অনুপস্থিত কনিষ্ঠের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ঘুরাইয়া চীৎকার করিয়া এমন কাণ্ড বাধাইল যে, ভীড় জমিয়া গেল। তাহাতেও যখন ক্ষোভ মিটিল না, তখন সে জমিদার বাড়িতে নালিশ করিতে গেল এবং এই বলিয়া শাসাইয়া গেল যে চৌধুরীমশাই এর বিচার করেন ভালই, না হইলে সে সদরে গিয়া এক নম্বর রুজু করিবে—তবে তার নাম শিবু সামন্ত।

ওদিকে শম্ভু বাঁশপাতা-কাড়ার কর্ত্তব্যটা শেষ করিয়াই মনের সুখে হাল গরু লইয়া মাঠে চলিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর নিষেধ শুনে নাই। বাটীতে ছোটবৌ একা। ইতিমধ্যে ভাশুর আসিয়া চীৎকারে পাড়া জড় করিয়া বীরদর্পে এক তরফা জয়ী হইয়া চলিয়া গেলেন, ভাদ্রবধূ হইয়া সে সমস্ত কানে শুনিয়াও একটা কথারও জবাব দিতে পারিল না। ইহাতে তাহার মনস্তাপ ও স্বামীর বিরুদ্ধে নতুন অভিমানের অবধি রহিল না। সে রান্নাঘরের দিকেও গেল না। বিরস-মুখে দাওয়ার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

শিবুর বাড়িতেও সেই দশা। বড়বৌ প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বামীর পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। হয় সে ইহার একটা বিহিত করুক, নয় সে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে না দিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। দু'টা বাঁশপাতার জন্যে দেওরের হাতে এত লাঞ্ছনা!

বেলা দেড় প্রহর হইয়া গেল, তখনও শিবুর দেখা নাই। বড়বৌ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, কি জানি চৌধুরীমশায়ের বাটী হইতেই বা তিনি এক নম্বর রজু করিতে সোজা সদরে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় বাহিরের দরজায় ঝনাৎ করিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া শম্ভুর বড়ছেলে গয়ারাম প্রবেশ করিল। বয়স তাহার ষোল-সতের, কিংবা এমনি একটা কিছু। কিন্তু

এই বয়সেই ক্রোধ এবং ভাষাটা তাহার বাপকেও ডিঙাইয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়ে। আজকাল মর্নিং-ইস্কুল, বেলা সাড়ে দশটায় ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে।

গয়ারামের যখন এক বৎসর বয়স তখন তার জননীর মৃত্যু হয়। তাহার পিতা শম্ভু পুনরায় বিবাহ করিয়া নূতন বধূ ঘরে আনিল বটে, কিন্তু এই মা-মরা ছেলেটিকে মানুষ করিবার দায় জ্যাঠাইমার উপরেই পড়িল এবং এতকাল দুই ভাই পৃথক না হওয়া পর্য্যন্ত এ-ভার তিনিই বহন করিয়া আসিতেছিলেন। বিমাতার সহিত তাহার কোনদিনই বিশেষ কোনও সম্বন্ধ ছিল না—এমন কি, তাহার নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাওয়ার পরেও গয়ারাম যেখানে যেদিন সুবিধা পাইত আহার করিয়া লইত।

আজ সে ইস্কুলের পর বাড়ি ঢুকিয়া বিমাতার মুখ এবং আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ এ-বাড়িতে আসিতেছিল। জ্যাঠাইমার মুখ দেখিয়া তাহার সেই আগুনে জল পড়িল না, কেরোসিন পড়িল। সে কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া কহিল, ভাত দে জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা কথা কহিলেন না, যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন।

ক্রুদ্ধ গয়ারাম মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া বলিল, ভাত দিবি, না দিবিনে, তা বল্!

গঙ্গামণি সক্রোধে মুখ তুলিয়া তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, তোর জন্যে ভাত রেঁধে বসে আছি—তাই দেব! বলি তোর, সৎমা আবাগী ভাত দিতে পারলে না যে এখানে এসেছিস্ হাঙ্গামা করতে?

গয়ারাম চেঁচাইয়া বলিল, সে আবাগীর কথা জানিনে। তুই দিবি কি না বল? না দিবি ত চললুম আমি তোর হাঁড়ি-কুঁড়ি ভেঙে দিতে। বলিয়া সে গোলার নীচে চ্যালাকাঠের গাদা হইতে একটা কাঠ তুলিয়া সবেগে রন্ধনশালার অভিমুখে চলিল।

জ্যাঠাইমা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, গয়া! হারামজাদা দস্যি! বাড়াবাড়ি করিসনে বলচি! দু'দিন হয়নি আমি নতুন হাঁড়ি-কুঁড়ি কেড়েচি, একটা-কিছু ভাঙলে তোর জ্যাঠাকে দিয়ে তোর একখানা পা যদি না ভাঙাই ত তখন বলিস্ হাঁ।

গয়ারাম রান্নাঘরের শিকলটায় হাত দিয়াছিল, হঠাৎ একটা নূতন কথা মনে পড়ায় সে অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা ভাত না দিস্ না দিবি। আমি চাইনে। নদীর ধারে বটতলায় বামুনদের মেয়েরা সব ধামা ধামা চিঁড়ে-মুড়কি নিয়ে পূজো করচে, যে চাইচে দিচ্ছে দেখে এলুম। আমি চললুম তেনাদের কাছে।

গঙ্গামণির তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, আজ অরণ্যষষ্ঠী, এবং একমুহূর্ত্তেই তাঁহার মেজাজ কড়ি হইতে কোমলে নামিয়া আসিল। তথাপি মুখের জোর রাখিয়া কহিলেন, তাই যা না। কেমন খেতে পাস্ দেখি?

দেখিস্ তখন, বলিয়া গয়া একখানা ছেঁড়া গামছা টানিয়া লইয়া কোমরে জড়াইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেই গঙ্গামণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে পরের ঘরে চেয়ে খেলে তোর কি দুর্গতি করি, তা দেখিস্ হতভাগা!

গয়া জবাব দিল না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া এক-খামচা তেল লইয়া মাথায় ঘষিতে ঘষিতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া জ্যাঠাইমা উঠানে নামিয়া আসিয়া ভয় দেখাইয়া কহিলেন, দস্যি কোথাকার! ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে গোঁয়ারতুমি! ডুব দিয়ে ফিরে না এলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি। আজ আমি রেগে রয়েচি।

কিন্তু গয়ারাম ভয় পাইবার ছেলে নয়। সে শুধু দাঁত বাহির করিয়া জ্যাঠাইমাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

গঙ্গামণি তাহার পিছনে পিছনে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিন কার ছেলে ভাত খায় যে, তুই ভাত খেতে চাস্? পাটালি-গুড়ের সন্দেশ দিয়ে, চাঁপা কলা দিয়ে, দুধ দই দিয়ে ফলার করা চলে না যে, তুই যাবি পরের ঘরে চেয়ে খেতে? কৈবর্ত্তের ঘরে তুমি এমনি নবাব জন্মেচ?

গয়া কিছু দূরে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে তুই দিলিনি কেন পোড়ারমুখি? কেন বললি, নেই?

গঙ্গামণি গালে হাত দিয়া অবাক্ হইয়া বলিলেন, শোন কথা ছেলের! কখন আবার বললুম তোকে, কিছু নেই? কোথায় চান, কোথায় কি, দস্যির মত ঢুকেই বলে, দে ভাত! ভাত কি আজ খেতে আছে যে দেব! আমি বলি, সবই ত মজুত, ডুবটা দিয়ে এলেই—

গয়া বলিল, ফলার তোর পচুক। রোজ রোজ আবাগীরা ঝগড়া করে রান্নাঘরের শেকল টেনে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকবে, আর রোজ আমি তিনপোর বেলায় ভাতে-ভাত খাব? না আমি তোদের কারুর কাছে খেতে চাইনে, বলিয়া সে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া গঙ্গামণি সেইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় চেঁচাইতে লাগিলেন, আজ ষষ্ঠীর দিনে কারো কাছে চেয়ে খেয়ে অমঙ্গল করিস্‌নে গয়া—লক্ষ্মী বাপ আমার— না হয় চারটে পয়সা দেবো রে, শোন্—

গয়ারাম ভ্রূক্ষেপও করিল না, দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। বলিতে বলিতে গেল, চাইনে আমি ফলার, চাইনে আমি পয়সা। তোর ফলারে আমি—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে গঙ্গামণি বাড়ি ফিরিয়া রাগে, দুঃখে, অভিমানে নির্জ্জীবের মত দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন এবং গয়ার কুব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া তাহার বিমাতার মাথা খাইতে লাগিলেন।

কিন্তু নদীর পথে চলিতে চলিতে গয়ার জ্যাঠাইমার কথাগুলা কানে বাজিতে লাগিল। একে উত্তম আহারের প্রতি স্বভাবতঃই তাহার একটু অধিক লোভ ছিল। পাটালি-গুড়ের সন্দেশ, দধি, দুগ্ধ, চাঁপাকলা—তাহার উপর চার পয়সা দক্ষিণা—মনটা তাহার দ্রুত নরম হইয়া আসিতে লাগিল।

স্নান সারিয়া গয়ারাম প্রচণ্ড ক্ষুধা লইয়া ফিরিয়া আসিল। উঠানে দাঁড়াইয়া ডাক দিল, ফলারের সব শীগ্‌গির নিয়ে আয় জ্যাঠাইমা—আমার বড্ড ক্ষিদে পেয়েচে। কিন্তু পাটালি-সন্দেশ কম দিবি ত আজ তোকেই খেয়ে ফেলব।

গঙ্গামণি সেইমাত্র গরুর কাজ করিতে গোয়ালে ঢুকিয়াছিলেন। গয়ার ডাক শুনিয়া মনে মনে প্রমাদ গনিলেন। ঘরে দুধ দই চিঁড়া গুড় ছিল বটে, কিন্তু চাঁপা-কলাও ছিল না, পাটালি-গুড়ের সন্দেশও ছিল না। তখন গয়াকে আটকাইবার জন্য যা মুখে আসিয়াছিল তাই বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিলেন।

তিনি সেইখান হইতে সাড়া দিয়া কহিলেন, তুই ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছাড় বাবা, আমি পুকুর থেকে হাত ধুয়ে আসছি।

শীগ্‌গির আয়, বলিয়া হুকুম চালাইয়া গয়া কাপড় ছাড়িয়া নিজেই একটা আসন পাতিয়া ঘটিতে জল গড়াইয়া প্রস্তুত হইয়া বসিল। গঙ্গামণি তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া আসিয়া তাহার প্রসন্ন মেজাজ দেখিয়া খুশি হইয়া বলিলেন, এই ত আমার লক্ষ্মী ছেলে। কথায় কথায় কি রাগ করতে আছে বাবা! বলিয়া তিনি ভাঁড়ার হইতে আহারের সমস্ত আয়োজন আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

গয়ারাম চক্ষের পলকে উপকরণগুলি দেখিয়া লইয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, চাঁপাকলা কই?

গঙ্গামণি ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, ঢাকা দিতে মনে নেই বাবা, সব কটা ইঁদুরে খেয়ে গেছে। একটা বেড়াল না পুষলে আর নয় দেখচি।

গয়া হাসিয়া বলিল, কলা কখন ইঁদুরে খায়? তোর ছিল না তাই কেন বল্ না?

গঙ্গামণি অবাক হইয়া কহিলেন, সে কি কথা রে। কলা ইঁদুরে খায় না?

গয়া চিঁড়া-দই মাখিতে মাখিতে বলিল, আচ্ছা খায়, খায়; কলা আমার দরকার নেই, পাটালি-গুড়ের সন্দেশ নিয়ে আয়। কম আনিস্‌নি যেন।

জ্যাঠাইমা পুনরায় ভাঁড়ারে ঢুকিয়া মিছামিছি কিছুক্ষণ হাঁড়ি-কুঁড়ি নাড়িয়া সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, যাঃ—এও ইঁদুরে খেয়ে গেছে বাবা, একফোঁটা নেই, কখন্ মন-ভুলান্তে হাঁড়ির মুখ খুলে রেখেচি—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই গয়া চোখ পাকাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, পাটালি-গুড় কখন ইঁদুরে খায় রাক্ষসী—আমার সঙ্গে চালাকি? তোর যদি কিছু নেই, তবে কেন আমাকে ডাকলি।

জ্যাঠাইমা বাহিরে আসিয়া বলিলেন, সত্যি বলচি গয়া—

গয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, তবু বলচ সত্যি, যা—আমি তোর কিচ্ছু খেতে চাইনে, বলিয়া সে পা দিয়া টান মারিয়া সমস্ত আয়োজন উঠানে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি মজা, বলিয়া সে সেই চ্যালা-কাঠটা হাতে তুলিয়া ভাঁড়ারের দিকে ছুটিল।

গঙ্গামণি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়া পড়িলেন, কিন্তু চক্ষের নিমিষে ক্রুদ্ধ গয়ারাম হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙিয়া জিনিস-পত্র ছড়াইয়া একাকার করিয়া দিল। বাধা দিতে গিয়া তিনি হাতের উপর সামান্য একটু আঘাত পাইলেন।

ঠিক এমনি সময়ে শিবু জমিদার-বাটী হইতে ফিরিয়া আসিল। হাঙ্গামা শুনিয়া চীৎকার-শব্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই গঙ্গামণি স্বামীর সাড়া পাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং গয়ারাম হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় মারিল।

শিবু ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি?

গঙ্গামণি কাঁদিয়া কহিল, গয়া আমার সর্ব্বস্ব ভেঙ্গে দিয়ে হাতে আমার এক ঘা বসিয়ে দিয়ে পালিয়েছে—এই দেখ ফুলে উঠেচে। বলিয়া সে স্বামীকে হাতটা দেখাইল।

শিবুর পশ্চাতে তাহার ছোট-সম্বন্ধী ছিল। হুঁসিয়ার এবং লেখাপড়া জানে বলিয়া জমিদার-বাটীতে যাইবার সময় শিবু তাহাকে ও-পাড়া হইতে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল। সে কহিল, সামন্তমশাই, এ সমস্ত ঐ ছোট-সামন্তর কারসাজি। ছেলেকে দিয়ে সে-ই এ-কাজ করিয়েচে। কি বল দিদি, এই নয়?

গঙ্গামণির তখন অন্তর জ্বলিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক তাই। ওই মুখপোড়াই ছোঁড়াকে শিখিয়ে দিয়ে আমাকে মার খাইয়েচে। এর কি করবে তোমরা কর, নইলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

এত বেলা পর্য্যন্ত শিবুর নাওয়া-খাওয়া নাই, জমিদারের কাছেও সুবিচার হয় নাই, তাহাতে বাড়িতে পা দিতে না দিতে এই কাণ্ড, তাহার আর হিতাহিত জ্ঞান রহিল না। সে প্রচণ্ড একটা শপথ করিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চললুম থানার দারোগার কাছে। এর বিহিত না করতে পারি ত আমি বিন্দু সামন্তর ছেলে নই।

তাহার শালা লেখাপড়া-জানা লোক, বিশেষতঃ তাহার গয়ার উপর আগে হইতেই আক্রোশ ছিল। সে কহিল, আইন-মতে এর নাম অনধিকার-প্রবেশ। লাঠি নিয়ে

বাড়ি চড়াও হওয়া, জিনিসপত্র ভাঙা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোলা—এর শাস্তি ছ'মাস জেল। সামন্তমশাই, তুমি কোমর বেঁধে দাঁড়াও দেখি, আমি কেমন না বাপ-বেটাকে একসঙ্গে জেলে পুরতে পারি।

শিবু আর দ্বিরুক্তি করিল না, সম্বন্ধীর হাত ধরিয়া থানার দারোগার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

গঙ্গামণির সকলের চেয়ে বেশী রাগ পড়িয়াছিল দেবর ও ছোটবধূর উপর। সে এই লইয়া একটা হুলস্থুল করিবার উদ্দেশ্যে কবাটে শিকল তুলিয়া দিয়া সেই চ্যালা-কাঠ হাতে করিয়া সোজা শম্ভুর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। উচ্চকণ্ঠে কহিল, কেমন গো ছোটকর্ত্তা, ছেলেকে দিয়ে আমাকে মার খাওয়াবে! এখন বাপ-বেটায় একসঙ্গে ফাটকে যাও!

শম্ভু সেইমাত্র তাহার এ-পক্ষের ছেলেটাকে লইয়া ফলার শেষ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, বড়ভাজের মূর্ত্তি এবং তাহার হাতের চ্যালা-কাঠটা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কহিল, হয়েচে কি? আমি ত কিছুই জানিনে!

গঙ্গামণি মুখ বিকৃত করিয়া জবাব দিল, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। দারোগা আসচে, তার কাছে গিয়ে ব'লো, কিছুই জান কি না?

ছোটবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া একটি খুঁটি ঠেস দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। শম্ভু মনে মনে ভয় পাইয়া কাছে আসিয়া গঙ্গামণির হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, মাইরি বলচি বড়বৌঠান, আমরা কিছুই জানিনে।

কথাটা যে সত্য, বড়বৌ তাহা নিজেও জানিত, কিন্তু তখন উদারতার সময় নয়। সে শম্ভুর মুখের উপরেই ষোল-আনা দোষ চাপাইয়া, সত্য-মিথ্যায় জড়াইয়া গয়ারামের কীর্ত্তি বিবৃত করিল। এই ছেলেটাকে যাহারা জানে, তাহাদের পক্ষে ঘটনাটা অবিশ্বাস করা শক্ত।

স্বল্পভাষিণী ছোটবৌ এতক্ষণে মুখ খুলিল; স্বামীকে কহিল, ক্যামন, যা বলেছিনু তাই হ'লো কি না— কতদিন বলি, ওগো, দস্যি ছোঁড়াটাকে আর ঘরে ঢুকতে দিয়োনি; তোমার ছোট ছেলেটাকে না-হক্ মেরে মেরে কোন্‌দিন খুন করে ফেলবে। তা গেরাহ্যিই হয় না—এখন কথা খাটল ত?

শম্ভু অনুনয় করিয়া গঙ্গামণিকে কহিল, আমার দিব্যি বড়বৌঠান, দাদা সত্যি নাকি থানায় গেছে?

তাহার করুণ কণ্ঠস্বরে কতকটা নরম হইয়া বড়বৌ জোর দিয়া বলিল, তোমার দিব্যি ঠাকুরপো গেছে, সঙ্গে আমাদের পাঁচুও গেছে।

শম্ভু অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। ছোটবৌ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, নিত্যি বলি দিদি, কোথায় যে নদীর ওপর সরকারি পুল হচ্ছে, কত লোক খাটতে যাচ্ছে, সেথায় নিয়ে গিয়ে ওরে কাজে লাগিয়ে দাও। তারা চাবুক মারবে আর কাজ করাবে—পালাবার জো-টি নেই—দু'দিনে সোজা হয়ে যাবে। তা না, ইস্কুলে দিয়েচি পড়ুক! ছেলে যেন ওঁর উকিল-মোক্তার হবে।

শম্ভু কাতর হইয়া বলিল, আরে সাধে কি দিইনি সেখানে! সবাই কি ঘরে ফিরতে পায়, অর্দ্ধেক লোক মাটি চাপা পড়ে কোথায় তলিয়ে যায় তার তল্লাসই মেলে না।

ছোটবৌ বলিল, তবে বাপ-ব্যাটাতে মিলে ফাটকে খাট গে যাও।

বড়বৌ চুপ করিয়া রহিল। শম্ভু তাহার হাতটা ধরিয়া বলিল, আমি কালই ছোঁড়াকে নিয়ে গিয়ে পাঁচলার পুলের কাজে লাগিয়ে দেব বৌঠান, দাদাকে ঠাণ্ডা কর। আর এমন হবে না।

তাহার স্ত্রী কহিল, ঝগড়া-ঝাঁটি ত শুধু ঐ ড্যাক্‌রার জন্যে। তোমাকেও ত কতবার বলিচি দিদি, ওরে ঘরে- দোরে ঢুকতে দিয়ো না—আস্কারা দিয়ো না। আমি বলিনে তাই, নইলে ও-মাসে তোমাদের মর্ত্তমান কলার কাঁদিটে রাত্তিরে কে কেটে নিয়েছিল? সে ত ঐ দস্যি। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে কি চলে? পুলের কাজে পাঠিয়ে দাও, পাড়া জুড়ুক।

শম্ভু মাতৃদিব্য করিল যে, কাল যেমন করিয়া হোক ছোঁড়াকে গ্রাম-ছাড়া করিয়া তবে সে জল-গ্রহণ করিবে।

গঙ্গামণি এ-কথাতেও কোন কথা কহিল না, হাতের কাঠটা ফেলিয়া দিয়া নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিয়া গেল।

স্বামী, ভাই এখনও অভুক্ত। অপরাহ্নবেলায় সে বিষণ্ণ-মুখে রান্নাঘরের দোরে বসিয়া তাহাদের খাবার আয়োজন করিতেছিল, গয়ারাম উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া নিঃশব্দ-পদে প্রবেশ করিল। বাটীতে আর কেহ নাই দেখিয়া সে সাহসে ভর করিয়া একেবারে পিছনে আসিয়া ডাক দিল, জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। গয়ারাম অদূরে ক্লান্তভাবে ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, আচ্ছা যা আছে তাই দে, আমার বড্ড ক্ষিধে পেয়েচে।

খাবার কথায় গঙ্গামণির শান্ত ক্রোধ মুহূর্তে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহার মুখের প্রতি না চাহিয়াই সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া! পোড়ারমুখো! আবার আমার কাছে এসেছিস্ ক্ষিদে বলে? দূর হ এখান থেকে।

গয়া কহিল, দূর হব তোর কথায়?

জ্যাঠাইমা ধমক দিয়া কহিলেন, হারামজাদা, নচ্ছার! আমি আবার দেব খেতে?

গয়া বলিল, তুই দিবিনি ত কে দেবে? কেন তুই ইঁদুরের দোষ দিয়ে মিছে কথা বললি? কেন ভাল করে বললিনি, বাবা, এই দিয়ে খা, আজ আর কিছু নেই। তা হলে ত আমার রাগ হয় না। দে না খেতে শীগ্‌গির রাক্ষুসী, আমার পেট যে জ্বলে গেল!

জ্যাঠাইমা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মনে মনে একটু নরম হইয়া বলিলেন, পেট জ্বলে থাকে তোর সৎমার কাছে যা।

বিমাতার নামে গয়া চক্ষের পলকে আগুন হইয়া উঠিল। বলিল, সে আবাগীর না-কি আমি আর মুখ দেখব? শুধু ঘরে আমার ছিপ্‌টা আনতে গেছি, বলে, দূর! দূর! এইবার জেলের ভাত খে গে যা! আমি বললুম, তোদের ভাত আমি খেতে আসিনি—আমি জ্যাঠাইমার কাছে যাচ্ছি। পোড়ারমুখী কম শয়তান! ঐ গিয়ে লাগিয়েচে বলেই ত বাবা তোর হাত থেকে বাঁশ-পাতা কেড়ে নিয়েচে। বলিয়া সে সজোরে মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া কহিল, তুই রাক্ষুসী নিজে পাতা আনতে গিয়ে অপমান হলি? কেন আমায় বললিনি? ঐ বাঁশঝাড় সমস্ত আমি যদি না আগুন দিয়ে পোড়াই ত আমার নাম গয়া নয়, তা দেখিস্। আবাগী আমাকে বললে কি জানিস জ্যাঠাইমা? বললে, তোর জ্যাঠাইমা থানায় খবর পাঠিয়েচে, দারোগা এসে বেঁধে নিয়ে তোকে জেল দেবে। শুনলি কথা হতভাগীর?

গঙ্গামণি কহিলেন, তোর জ্যাঠামশাই পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে গেছেই ত থানায়। তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্—এতবড় তোর স্পর্দ্ধা!

পাঁচুমামাকে গয়া একেবারে দেখিতে পারিত না। সে আবার যোগ দিয়াছে শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুই রাগের সময় আমায় আটকাতে গেলি?

গঙ্গামণি বলিলেন, তাই আমাকে মারবি? এখন যা, ফাটকে বাঁধা থাক্ গে যা।

গয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল, ইঃ—তুই আমাকে ফাটকে দিবি? দে না, দিয়ে একবার মজা দেখ্‌না! আপনি কেঁদে কেঁদে মরে যাবি—আমার কি হবে!

গঙ্গামণি কহিলেন, আমার বয়ে গেছে কাঁদতে। যা, আমার সুমুখ থেকে যা বলচি, শত্তুর বালাই কোথাকার!

গয়া চেঁচাইয়া কহিল, তুই আগে খেতে দে না, তবে ত যাব। কখন্ সাত সকালে ছুটি মুড়ি খেয়েচি বল্ ত? ক্ষিদে পায় না আমার?

গঙ্গামণি কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিবু পাঁচুকে লইয়া থানা হইতে ফিরিয়া আসিল এবং গয়ার প্রতি চোখ পড়িবামাত্রই বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিল, হারামজাদা পাজী, আবার আমার বাড়ি ঢুকেচে! বেরো, বেরো বলচি! পাঁচু, ধর্ ত শুয়োরকে।

বিদ্যুদ্বেগে গয়ারাম দরজা দিয়া দৌড় মারিল। চেঁচাইয়া বলিয়া গেল—পেঁচো-শালার একটা ঠ্যাং না ভেঙ্গে দিই ত আমার নামই গয়ারাম নয়।

চক্ষের পলকে এই কাণ্ড ঘটিয়া গেল। গঙ্গামণি একটা কথা কহিবারও অবকাশ পাইল না।

ক্রুদ্ধ শিবু স্ত্রীকে বলিল, তোর আস্কারা পেয়েই ও এমন হচ্চে। আর যদি কখন হারামজাদাকে বাড়ি ঢুকতে দিস্ ত তোর অতি বড় দিব্যি রইল।

পাঁচু বলিল, দিদি, তোমাদের কি, আমারই সর্ব্বনাশ। কখন্ রাত-ভিতে লুকিয়ে আমার ঠ্যাঙেই ও ঠ্যাঙা মারবে দেখচি।

শিবু কহিল, কাল সকালেই যদি না পুলিশ-পেয়াদা দিয়ে ওর হাতে দড়ি পরাই ত আমার—ইত্যাদি ইত্যাদি।

গঙ্গামণি কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল—একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। ভীতু পাঁচকড়ি সে-রাত্রে আর বাড়ি গেল না। এইখানে শুইয়া রহিল।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্রোশ-দুই দূরের পথ হইতে দারোগা উপযুক্ত দক্ষিণাদি গ্রহণ করিয়া পাল্কী চড়িয়া কনেস্টবল ও চৌকিদারাদি সমভিব্যাহারে সরজমিনে তদন্ত করিতে উপস্থিত হইলেন। অনধিকার-প্রবেশ, জিনিস-পত্র তছ্‌রূপ চ্যালা-কাঠের দ্বারা স্ত্রীলোকের অঙ্গে প্রহার—ইত্যাদি বড় বড় ধারার অভিযোগ—সমস্ত গ্রামে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

প্রধান আসামী গয়ারাম—তাহাকে কৌশলে ধরিয়া আনিয়া হাজির করিতেই সে কনেস্টবল চৌকিদার প্রভৃতি দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে কেউ দেখতে পারে না বলে আমাকে ফাটকে দিতে চায়।

দারোগা বুড়ামানুষ। তিনি আসামীর বয়স এবং কান্না দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কেউ ভালবাসে না গয়ারাম?

গয়া কহিল, আমাকে শুধু আমার জ্যাঠাইমা ভালবাসে, আর কেউ না।

দারোগা প্রশ্ন করিল, তবে জ্যাঠাইমাকে মেরেচ কেন?

গয়া বলিল, না, মারিনি। কবাটের আড়ালে গঙ্গামণি দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইদিকে চাহিয়া কহিল, তোকে আমি কখন্ মেরেচি জ্যাঠাইমা?

পাঁচু নিকটে বসিয়াছিল, সে একটু কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, দিদি, হুজুর জিজ্ঞেসা করচেন, সত্যি কথা বল। ও কাল দুপুরবেলা বাড়ি চড়াও হয়ে—কাঠের বাড়ি তোমাকে মারেনি? ধর্ম্মাবতারের কাছে যেন মিথ্যা কথা ব'লো না।

গঙ্গামণি অস্ফুটে যাহা কহিলেন, পাঁচু তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিল, হাঁ হুজুর, আমার দিদি বলচেন, ও মেরেচে।

গয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, হ্যাখ্ পেঁচো, তোর আমি না পা ভাঙি ত—রাগে কথাটা তার সম্পূর্ণ হইতে পাইল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, দেখলেন হুজুর! দেখলেন! হুজুরের সুমুখেই বলচে পা ভেঙে দেবে—আড়ালে ও খুন করতে পারে। ওকে বাঁধবার হুকুম হোক।

দারোগা শুধু একটু হাসিলেন। গয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, আমার মা নেই তাই। নইলে—এবারেও, কথাটা তাহার শেষ হইতে পারিল না। যে মাকে তাহার মনেও নাই, মনে করিবার কখনও প্রয়োজনও হয় নাই, আজ বিপদের দিনে অকস্মাৎ তাঁহাকেই ডাকিয়া সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় আসামী শম্ভুর বিরুদ্ধে কোন কথাই প্রমাণ হইল না। দারোগাবাবু আদালতে নালিশ করিবার হুকুম দিয়া রিপোর্ট লিখিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পাঁচু মামলা চালানোর, তাহার যথারীতি তদ্বিরাদির দায়িত্ব গ্রহণ করিল এবং তাহার ভগিনীর প্রতি গুরুতর অত্যাচারের জন্য গয়ার যে কঠিন শাস্তি হইবে, এই কথা চতুর্দ্দিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিন্তু গয়া সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। পাড়া-প্রতিবেশীরা শিবুর এই আচরণের নিন্দা করিতে লাগিল। শিবু তাহাদের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতে লাগিল, শিবুর স্ত্রী একেবারে চুপচাপ।

সেদিন গয়ার দূর-সম্পর্কের এক মাসী খবর শুনিয়া শিবুর বাড়ি বহিয়া তাহার স্ত্রীকে যা ইচ্ছা তাই বলিয়া গালি-গালাজ করিয়া গেল, কিন্তু গঙ্গামণি একেবারে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

শিবু পাশের বাড়ির লোকের কাছে এ-কথা শুনিয়া রাগ করিয়া স্ত্রীকে কহিল, তুই চুপ করে রইলি? একটা কথাও বললিনে?

শিবুর স্ত্রী কহিল, না।

শিবু বলিল, আমি বাড়ি থাকলে মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে ছেড়ে দিতুম।

তাহার স্ত্রী কহিল, তা হলে আজ থেকে বাড়িতেই বসে থেকো, আর কোথাও বেরিও না। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সেদিন দুপুরবেলা শিবু বাড়ি ছিল না। শম্ভু আসিয়া বাঁশঝাড় হইতে গোটা-কয়েক বাঁশ কাটিয়া লইয়া গেল। শব্দ শুনিয়া শিবুর স্ত্রী বাহিরে আসিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিল। কিন্তু বাধা দেওয়া দূরে থাকুক আজ সে কাছেও ঘেঁষিল না, নিঃশব্দে ঘরে ফিরিয়া গেল। দিন-দুই পরে সংবাদ শুনিয়া শিবু লাফাইতে লাগিল। স্ত্রীকে আসিয়া কহিল, তুই কি কানের মাথা খেয়েচিস? ঘরের পাশ থেকে সে বাঁশ কেটে নিয়ে গেল, আর তুই টের পেলি না?

তাহার স্ত্রী বলিল, কেন টের পাব না, আমি চোখেই ত সব দেখিচি।

শিবু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তবু আমাকে তুই জানালিনে?

গঙ্গামণি বলিল, জানাব আবার কি? বাঁশঝাড় কি তোমার একার; ঠাকরপোর তাতে ভাগ নেই?

শিবু বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া শুধু কহিল, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

সেদিন সন্ধ্যার পর পাঁচু সদর লইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। শিবু গরুর জন্য খড় কুচাইতেছিল, অন্ধকারে তাহার মুখের চোখের চাপা হাসি লক্ষ্য করিল না—সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'লো?

পাঁচু গাম্ভীর্য্যের সহিত একটু হাস্য করিয়া কহিল,পাঁচু থাকলে যা হয় তাই। ওয়ারেণ্ট বের করে তবে আসচি। এখন কোথায় আছে জানতে পারলেই হয়।

শিবুর একপ্রকার ভয়ানক জিদ চড়িয়া গিয়াছিল। সে কহিল, যত খরচ হোক ছোঁড়াকে ধরাই চাই। তাকে জেলে পুরে তবে আমার অন্য কাজ। তার পরে উভয়ের নানা পরামর্শ চলিতে লাগিল। কিন্তু রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল, ভিতর হইতে আহারের আহ্বান আসে না দেখিয়া শিবু আশ্চর্য্য হইয়া রান্নাঘরে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার।

শোবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, স্ত্রী মেঝের উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া আছে। ক্রুদ্ধ এবং আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবার হয়ে গেছে ত আমাদের ডাকিস্‌নি কেন?

গঙ্গামণি ধীরে-সুস্থে পাশ ফিরিয়া বলিল, কে রাঁধলে যে খাবার হয়ে গেছে?

শিবু তর্জ্জন করিয়া প্রশ্ন করিল, রাঁধিস্‌নি এখনো?

গঙ্গামণি কহিল, না। আমার শরীর ভাল নেই, আজ আমি পারব না।

নিদারুণ ক্ষুধায় শিবুর নাড়ী জ্বলিতেছিল, সে আর সহিতে পারিল না। শায়িত স্ত্রীর পিঠের উপর একটা লাথি মারিয়া বলিল, আজকাল রোজ অসুখ, রোজ পারব না! পারবিনে ত বেরো আমার বাড়ি থেকে।

গঙ্গামণি কথাও কহিল না, উঠিয়াও বসিল না। যেমন শুইয়াছিল, তেমনি পড়িয়া রহিল। সে রাত্রে শালা-ভগিনীপতি কাহারও খাওয়া হইল না।

সকালবেলা দেখা গেল গঙ্গামণি বাটীতে নাই। এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ খোঁজা-খুঁজির পর পাঁচু কহিল, দিদি নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি চলে গেছে।

স্ত্রীর এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু শিবু মনে মনে বুঝিয়াছিল বলিয়া তাহার বিরক্তিও যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়াছিল, নালিশ-মোকদ্দমার প্রতি ঝোঁকও তেমনি খাটো হইয়া আসিতেছিল। সে শুধু বলিল, চুলোয় যাক, আমার খোঁজবার দরকার নেই।

বিকেলবেলা খবর পাওয়া গেল, গঙ্গামণি বাপের বাড়ি যায় নাই। পাঁচু ভরসা দিয়া কহিল, তা হলে নিশ্চয় পিসীমার বাড়ি চলে গেছে।

তাহাদের এক বড়লোক পিসী ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে একটা গ্রামে বাস করিতেন। পূজা-পর্ব্ব উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে গঙ্গামণিকে লইয়া যাইতেন। শিবু স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সে মুখে বলিল, বটে, যেখানে খুশি যাক গে! মরুক গে! কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনুতপ্ত এবং উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবুও রাগের উপর দিন পাঁচ-ছয় কাটিয়া গেল। এদিকে কাজ-কর্ম্ম লইয়া, গরু-বাছুর লইয়া সংসার তাহার একপ্রকার অচল হইয়া উঠিল। একটাদিনও আর কাটে না এমনি হইল।

সাতদিনের দিন সে আপনি গেল না বটে, কিন্তু নিজের পৌরুষ বিসর্জ্জন দিয়া পিসীর বাড়িতে গরুর গাড়ি পাঠাইয়া দিল।

পরদিন শূন্য গাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল সেখানে কেহ নাই। শিবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সারাদিন স্নানাহার নাই, মড়ার মত একটা তক্তাপোষের উপর পড়িয়াছিল, পাঁচু অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সামন্তমশাই, সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কোথায়? কে খবর দিলে? অসুখ-বিসুখ কিছু হয়নি ত? গাড়ি নিয়ে চল্ না এখুনি দু'জনে যাই।

পাঁচু বলিল, দিদির কথা নয়— গয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে।

শিবু আবার শুইয়া পড়িল, কোন কথা কহিল না।

তখন পাঁচু বহুপ্রকারে বুঝাইতে লাগিল যে, এ সুযোগ কোনও মতে হাতছাড়া করা উচিত নয়। দিদি ত একদিন আসবেই, কিন্তু তখন আর এ-ব্যাটাকে বাগে পাওয়া যাবে না।

শিবু উদাসকণ্ঠে বলিল, এখন থাক্ গে পাঁচু! আগে সে ফিরে আসুক, তার পরে—

পাঁচু বাধা দিয়া কহিল, তারপরে কি আর হবে সামন্তমশাই, বরঞ্চ, দিদি ফিরে আসতে না আসতে কাজটা শেষ করা চাই! সে এসে পড়লে হয়ত আর হবেই না।

শিবু রাজি হইল। কিন্তু আপনার খালিঘরের দিকে চাহিয়া পরের উপর প্রতিশোধ লইবার জোর আর সে কোনমতে নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এখন পাঁচুর জোর ধার করিয়াই তাহার কাজ চলিতেছিল।

পরদিন রাত্রি থাকিতেই তাহারা আদালতের পেয়াদা প্রভৃতি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথে পাঁচু জানাইল, বহু দুঃখে খবর পাওয়া গেছে, শম্ভু তাহাকে পাঁচলার সরকারী পুলের কাজে নাম ভাঁড়াইয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছে—সেইখানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে।

শিবু বরাবরই চুপ করিয়াই ছিল, তখনও চুপ করিয়া রহিল।

তাহারা গ্রামে যখন প্রবেশ করিল তখন বেলা দ্বিপ্রহর। গ্রামের একপ্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠ, লোকজন, লোহা-লক্কড়, কল-কারখানায় পরিপূর্ণ—সর্ব্বত্রই ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া জন-মজুরেরা বাস করিতেছে। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর একজন কহিল, যে ছেলেটি সাহেবের বাংলা লেখাপড়ার কাজ করচে, সে ত? তার ঘর ঐ যে, বলিয়া একখানা ক্ষুদ্র কুটীর দেখাইয়া দিল, তাহারা গুঁড়ি মারিয়া পা টিপিয়া অনেক কষ্টে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে গয়ারামের গলা শুনিতে পাওয়া গেল। পাঁচু পুলকে উল্লসিত হইয়া পেয়াদা এবং শিবুকে লইয়া বীরদর্পে অকস্মাৎ কুটীরের উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইবামাত্রই তাহার সমস্ত মুখ বিস্ময়ে, ক্ষোভে নিরাশায় কালো হইয়া গেল। তাহার দিদি ভাত বাড়িয়া দিয়া একটা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতেছে এবং গয়ারাম ভোজনে বসিয়াছে।

শিবুকে দেখিতে পাইয়া গঙ্গামণি মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, তোমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসো গে, আমি ততক্ষণ আর এক হাঁড়ি ভাত চড়িয়ে দিই।

বিলাসী

বিলাসী

পাকা দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া স্কুলে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে যাই। আমি একা নই—দশ-বারোজন। যাহাদেরই বাটী পল্লীগ্রামে, তাহাদেরই ছেলেদের শতকরা আশি জনকে এমনি করিয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। ইহাতে লাভের অঙ্কে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে শূন্য না পড়িলেও, যাহা পড়ে তাহাতে হিসাব করিবার পক্ষে এই কয়টা কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে ছেলেদের সকাল আটটার মধ্যে বাহির হইয়া যাতায়াতে চার-ক্রোশ পথ ভাঙিতে হয়—চার-ক্রোশ মানে আট মাইল নয়, ঢের বেশী—বর্ষার দিনে মাথার উপর মেঘের জল ও পায়ের নীচে এক-হাঁটু কাদা এবং গ্রীষ্মের দিনে জলের বদলে কড়া সূর্য্য এবং কাদার বদলে ধূলার সাগর সাঁতার দিয়া স্কুল-ঘর করিতে হয়, সেই দুর্ভাগ্য বালকদের মা-সরস্বতী খুশী হইয়া বর দিবেন কি, তাহাদের যন্ত্রণা দেখিয়া কোথায় যে তিনি মুখ লুকাইবেন, ভাবিয়া পান না।

তারপরে এই কৃতবিদ্য শিশুর দল বড় হইয়া একদিন গ্রামেই বসুন, আর ক্ষুধার জ্বালায় অন্যত্রই যান—তাঁদের চার ক্রোশ-হাঁটা বিদ্যার তেজ আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে। কেহ কেহ বলেন শুনিয়াছি, আচ্ছা, যাদের ক্ষুধার জ্বালা, তাদের কথা না হয় নাই ধরিলাম, কিন্তু যাঁদের সে জ্বালা নাই, তেমন সব ভদ্রলোকেই বা কি সুখে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করেন? তাঁরা বাস করিতে থাকিলে ত পল্লীর এত দুর্দ্দশা হয় না।

ম্যালেরিয়ার কথাটা না হয় নাই পাড়িলাম। সে থাক, কিন্তু ঐ চার-ক্রোশ হাঁটার জ্বালায় কত ভদ্রলোকেই যে ছেলে-পুলে লইয়া গ্রাম ছাড়িয়া সহরে পালান তাহার আর সংখ্যা নাই। তারপরে একদিন ছেলে-পুলের পড়াও শেষ হয় বটে, তখন কিন্তু সহরের সুখ-সুবিধা রুচি লইয়া আর তাঁদের গ্রামে ফিরিয়া আসা চলে না।

কিন্তু থাক এ-সকল বাজে কথা। ইস্কুলে যাই—দু'ক্রোশের মধ্যে এমন আরও ত দু-তিনখানা গ্রাম পার হইতে হয়। কার বাগানে আম পাকিতে শুরু করিয়াছে, কোন্ বনে বঁইচি ফল অপর্য্যাপ্ত ফলিয়াছে, কার গাছে কাঁটাল এই পাকিল বলিয়া,

* অনেক পল্লী-বালকের ডায়েরী হইতে নকল। তাহার আসল নামটা কাহারও জানিবার প্রয়োজন নাই, নিষেধও আছে। ডাকনামটা না হয় ধরুন ন্যাড়া।

কার বর্ত্তমান রম্ভার কাঁদি কাটিয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র, কার কানাচে ঝোঁপের মধ্যে আনারসের গায়ে রঙ ধরিয়াছে, কার পুকুর-পাড়ের খেজুর-মেতি কাটিয়া খাইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা অল্প, এই সব খবর লইতেই সময় যায়, কিন্তু আসল যা বিদ্যা—কামস্কট্‌কার রাজধানীর নাম কি, এবং সাইবেরিয়ার খনির মধ্যে রূপা মেলে, না সোনা মেলে—এ সকল দরকারি তথ্য অবগত হইবার ফুরসৎই মেলে না।

কাজেই একজামিনের সময় এডেন কি জিজ্ঞাসা করিলে বলি, পারসিয়ার বন্দর, আর হুমায়ুনের বাপের নাম জানিতে চাহিলে লিখিয়া দিয়া আসি তোগ্‌লক খাঁ—এবং আজ চল্লিশের কোঠা পার হইয়াও দেখি, ও-সকল বিষয়ে ধারণা প্রায় এক রকমই আছে—তার পরে প্রোমোশনের দিন মুখ ভার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কখনো বা দল বাঁধিয়া মতলব করি, মাস্টারকে ঠ্যাঙানো উচিত, কখনো বা ঠিক করি, অমন বিশ্রী স্কুল ছাড়িয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আমাদের গ্রামে একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে ইস্কুলের পথে দেখা হইত। তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের চেয়ে সে অনেক বড়। থার্ড ক্লাসে পড়িত। কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠিয়াছিল, এ খবর আমরা কেহই জানিতাম না—সম্ভবতঃ তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বিষয়—আমরা কিন্তু তাহার থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়া আসিয়াছি। তাহার ফোর্থ ক্লাসে পড়ার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই, সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিবার খবরও কখনো পাই নাই। মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না, ছিল শুধু গ্রামের একপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান, আর তার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড পোড়ো-বাড়ি, আর ছিল এক জ্ঞাতি খুড়া। খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর নানাবিধ দুর্নাম রটনা করা—সে গাঁজা খায়, সে গুলি খায়, এমনি আরও কত কি! তাঁর আর একটা কাজ ছিল বলিয়া বেড়ানো, ঐ বাগানের অর্দ্ধেকটা তাঁর নিজের অংশ; নালিশ করিয়া দখল করার অপেক্ষা মাত্র। অবশ্য দখল একদিন তিনি পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে জেলা-আদালতে নালিশ করিয়া নয়—উপরের আদালতের হুকুমে। কিন্তু সে-কথা পরে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয় নিজে রান্না করিয়া খাইত এবং আমের দিনে ঐ আম-বাগানটা জমা দিয়াই তাহার সারা বৎসরের খাওয়া-পরা চলিত এবং ভাল করিয়াই চলিত। যেদিন দেখা হইয়াছে, সেই দিনই দেখিয়াছি, ছেঁড়া-খোঁড়া মলিন বইগুলি বগলে করিয়া পথের ধার দিয়া নীরবে চলিয়াছে। তাহাকে কখনো কাহারও সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে দেখি নাই—বরঞ্চ উপযাচক হইয়া কথা কহিতাম আমরাই। তাহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, দোকানের খাবার কিনিয়া খাওয়াইতে গ্রামের মধ্যে

তাহার জোড়া ছিল না। আর শুধু ছেলেরাই নয়। কত ছেলের বাপ কতবার যে গোপনে ছেলেকে দিয়া তাহার কাছে স্কুলের মাহিনা হারাইয়া গেছে, বই চুরি গেছে, ইত্যাদি বলিয়া টাকা আদায় করিয়া লইত, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঋণ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ছেলে তাহার সহিত একটা কথা কহিয়াছে এ-কথাও কোন বাপ ভদ্র-সমাজে কবুল করিতে চাহিত না—গ্রামের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ের ছিল এমনি সুনাম।

অনেকদিন মৃত্যুঞ্জয়ের দেখা নাই। একদিন শোনা গেল, সে মর-মর। আর এক দিন শোনা গেল, মালপাড়ায় এক বুড়া মাল তাহার চিকিৎসা করিয়া এবং তাহার মেয়ে বিলাসী সেবা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে যমের মুখ হইতে এ-যাত্রা ফিরাইয়া আনিয়াছে।

অনেকদিন তাহার অনেক মিষ্টান্নের সদ্ব্যয় করিয়াছি—মনটা কেমন করিতে লাগিল, একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার পোড়ো-বাড়িতে প্রাচীরের বালাই নাই। স্বচ্ছন্দে ভিতরে ঢুকিয়া দেখি, ঘরের দরজা খোলা, বেশ উজ্জ্বল একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর ঠিক সুমুখেই তক্তাপোষের উপর পরিষ্কার ধপ্‌ধপে বিছানায় মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে, তাহার কঙ্কালসার দেহের প্রতি চাহিলেই বুঝা যায়, বাস্তবিকই যমরাজ চেষ্টার ত্রুটি কিছু করেন নাই, তবে যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সে কেবল ওই মেয়েটির জোরে। সে শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল, অকস্মাৎ মানুষ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সেই বুড়া সাপুড়ের মেয়ে বিলাসী। তাহার বয়স আঠারো কি আটাশ ঠাহর করিতে পারিলাম না। কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্র টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুল-দানীতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

মৃত্যুঞ্জয় আমাকে চিনিতে পারিয়া বলিল, কে, ন্যাড়া?

বলিলাম, হুঁ।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, ব'সো।

মেয়েটা ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মৃত্যুঞ্জয় দুই-চারিটা কথায় যাহা কহিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, প্রায় দেড় মাস্ হইতে চলিল সে শয্যাগত। মধ্যে দশ-পনেরো দিন সে অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিল, এই কয়েকদিন হইল সে লোক চিনিতে পারিতেছে এবং যদিচ এখনো সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারে না, কিন্তু আর ভয় নাই।

ভয় নাই থাকুক। কিন্তু ছেলেমানুষ হইলেও এটা বুঝিলাম, আজও যাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার ক্ষমতা হয় নাই, সেই রোগীকে এই বনের মধ্যে একাকী যে মেয়েটি বাঁচাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছিল, সে কতবড় গুরুভার! দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি তাহার কত সেবা, কত শুশ্রূষা, কত ধৈর্য্য, কত রাত-জাগা! সে কত বড় সাহসের কাজ! কিন্তু যে বস্তুটি এই অসাধ্য-সাধন করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় যদিচ সেদিন পাই নাই, কিন্তু আর একদিন পাইয়াছিলাম।

ফিরিবার সময় মেয়েটি আর একটি প্রদীপ লইয়া আমার আগে আগে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্য্যন্ত আসিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে একটি কথাও কহে নাই, এইবার আস্তে আস্তে বলিল, রাস্তা পর্য্যন্ত তোমায় রেখে আসব কি?

বড় বড় আমগাছে সমস্ত বাগানটা যেন একটা জমাট অন্ধকারের মত বোধ হইতেছিল, পথ দেখা ত দূরের কথা, নিজের হাতটা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বলিলাম, পৌঁছে দিতে হবে না, শুধু আলোটা দাও।

সে প্রদীপটা আমার হাতে দিতেই তাহার উৎকণ্ঠিত মুখের চেহারাটা আমার চোখে পড়িল। আস্তে আস্তে সে বলিল, একলা যেতে ভয় করবে না ত? একটু এগিয়ে দিয়ে আসব?

মেয়েমানুষ জিজ্ঞাসা করে, ভয় করবে না ত! সুতরাং মনে যাই থাক্, প্রত্যুত্তরে শুধু একটা কথা 'না' বলিয়াই অগ্রসর হইয়া গেলাম।

সে পুনরায় কহিল, ঘন-জঙ্গলের পথ, একটু দেখে দেখে পা ফেলে যেয়ো।

সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল, কিন্তু এতক্ষণে বুঝিলাম উদ্বেগটা তাহার কিসের জন্য এবং কেন সে আলো দেখাইয়া এই বনের পথটা পার করিয়া দিতে চাহিতেছিল। হয়ত সে নিষেধ শুনিত না, সঙ্গেই যাইত, কিন্তু পীড়িত মৃত্যুঞ্জয়কে একাকী ফেলিয়া যাইতে বোধ করি তাহার শেষ পর্য্যন্ত মন সরিল না।

কুড়ি-পঁচিশ বিঘার বাগান। সুতরাং পথটা কম নয়! এই দারুণ অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক পদক্ষেপই বোধ করি ভয়ে ভয়ে করিতে হইত, কিন্তু পরক্ষণেই মেয়েটির কথাতেই সমস্ত মন এমনি আচ্ছন্ন হইয়া রহিল যে, ভয় পাইবার আর সময় পাইলাম না। কেবল মনে হইতে লাগিল, একটা মৃতকল্প রোগী লইয়া থাকা কত কঠিন। মৃত্যুঞ্জয় ত যে কোন মুহূর্ত্তেই মরিতে পারিত, তখন সমস্ত রাত্রি এই বনের মধ্যে মেয়েটি একাকী কি করিত! কেমন করিয়া তাহার সে রাতটা কাটিত!

এই প্রসঙ্গের অনেকদিন পরের একটা কথা আমার মনে পড়ে। এক আত্মীয়ের মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্ধকার রাত্রি—বাটীতে ছেলে-পুলে চাকর-

থাকের নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তাঁর সন্ত-বিধবা স্ত্রী, আর আমি। তাঁর স্ত্রী ত শোকের আবেগে দাপা-দাপি করিয়া এমন কাণ্ড করিয়া তুলিলেন যে, ভয় হইল তাঁহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, তিনি স্বেচ্ছায় যখন সহমরণে যাইতে চাহিতেছেন, তখন সরকারের কি? তাঁর যে আর তিলার্দ্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, এ কি তাহারা বুঝিবে না? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই? তাহারা কি পাষাণ? আর এই রাত্রেই গ্রামের পাঁচজনে যদি নদীর তীরের কোন একটা জঙ্গলের মধ্যে তাঁর সহমরণের যোগাড় করিয়া দেয় ত পুলিশের লোক জানিবে কি করিয়া? এমন কত কি! কিন্তু আমার ত আর বসিয়া বসিয়া তাঁর কান্না শুনিলেই চলে না। পাড়ায় খবর দেওয়া চাই—অনেক জিনিস যোগাড় করা চাই। কিন্তু আমার বাহিরে যাইবার প্রস্তাব শুনিয়াই তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিলেন। চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হয়েচে, আর বাইরে গিয়ে কি হবে? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক কাজ, তুমি ব'সো।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হবে, বলিয়া পা বাড়াইবামাত্রই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপ্‌রে! আমি একলা থাকতে পারব না।

কাজেই আবার বসিয়া পড়িতে হইল। কারণ তখন বুঝিলাম, যে-স্বামী জ্যান্ত থাকিতে তিনি নির্ভয়ে পঁচিশ বৎসর একাকী ঘর করিয়াছিলেন, তাঁর মৃত্যুটা যদি বা সহে, তাঁর মৃতদেহটা এই অন্ধকার রাত্রে পাঁচ মিনিটের জন্যও সহিবে না।

বুক যদি কিছুতে ফাটে ত সে এই মৃত স্বামীর কাছে একলা থাকিলে।

কিন্তু দুঃখটা তাঁহার তুচ্ছ করিয়া দেখানও আমার উদ্দেশ্য নহে। কিংবা তাহা খাঁটি নয় এ-কথা বলাও আমার অভিপ্রায় নহে। কিংবা একজনের ব্যবহারেই তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গেল তাহাও নহে। কিন্তু এমন আরও অনেক ঘটনা জানি, যাহার নাম উল্লেখ না করিয়াও আমি এই কথা বলিতে চাই যে, শুধু কর্ত্তব্য-জ্ঞানের জোরে অথবা বহুকাল ধরিয়া একসঙ্গে ঘর-করার অধিকারেই এই ভয়টাকে কোন মেয়েমানুষই অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা আর একটা শক্তি, যাহা বহু স্বামী-স্ত্রী একশ বৎসর একত্রে ঘর-করার পরেও হয়ত তাহার কোন সন্ধান পায় না।

কিন্তু সহসা সেই শক্তির পরিচয় যখন কোন নর-নারীর কাছে পাওয়া যায়, তখন সমাজের আদালতে আসামী করিয়া তাহাদের দণ্ড দেওয়া আবশ্যক যদি হয় ত হোক,

কিন্তু মানুষের যে বস্তুটি সামাজিক নয়, সে নিজে যে ইহাদের দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া কোন মতে থাকিতে পারে না।

প্রায় মাস-দুই মৃত্যুঞ্জয়ের খবর লই নাই। যাহারা পল্লীগ্রাম দেখেন নাই, কিংবা ওই রেলগাড়ির জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিবেন, এ কেমন কথা! এ কি কখনও সম্ভব হইতে পারে যে, অত-বড় অসুখটা চোখে দেখিয়া আসিয়াও মাস-দুই আর তার কোন খবরই নাই! তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা আবশ্যক যে, এ শুধু সম্ভব নয়, এটা হইয়া থাকে। একজনের বিপদে পাড়াসুদ্ধ ঝাঁক বাঁধিয়া উপুড় হইয়া পড়ে, এই যে একটা জনশ্রুতি আছে, জানি না তাহা সত্যযুগের পল্লীগ্রামে ছিল কি না, কিন্তু একালে ত কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না। তবে তাহার মরার খবর যখন পাওয়া যায় নাই, তখন সে যে বাঁচিয়া আছে এ ঠিক।

এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন কানে গেল, মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাগানের অংশীদার খুড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন যে, গেল গেল, গ্রামটা এবার রসাতলে গেল! নালতের মিত্তির বলিয়া সমাজে আর তাঁর মুখ বাহির করিবার জো রহিল না—অকালকুষ্মাণ্ডটা একটা সাপুড়ের মেয়ে নিকা করিয়া ঘরে আনিয়াছে। আর শুধু নিকা নয়, তাও না হয় চুলায় যাক, তাহার হাতে ভাত পর্য্যন্ত খাইতেছে! গ্রামে যদি ইহার শাসন না থাকে ত বনে গিয়া বাস করিলেই ত হয়। কোড়োলা, হরিপুরের সমাজ এ-কথা শুনিলে যে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন ছেলে-বুড়ো সকলের মুখেই ঐ এক কথা। অ্যাঁ—এ হইল কি? কলি কি সত্যই উল্টাইতে বসিল!

খুড়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এ যে ঘটিবে তিনি অনেক আগেই জানিতেন। তিনি শুধু তামাসা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরে। নইলে পর নয়, প্রতিবেশী নয়, আপনার ভাইপো! তিনি কি বাড়ি লইয়া যাইতে পারিতেন না? তাঁহার কি ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইবার ক্ষমতা ছিল না? তবে কেন যে করেন নাই, এখন দেখুক সবাই। কিন্তু আর ত চুপ করিয়া থাকা যায় না! এ যে মিত্তির-বংশের নাম ডুবিয়া যায়! গ্রামের যে মুখ পোড়ে।

তখন আমরা গ্রামের লোক মিলিয়া যে কাজটা করিলাম, তাহা মনে করিলে আমি আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। খুড়া চলিলেন নালতের মিত্তির-বংশের অভিভাবক হইয়া, আর আমরা দশ-বারোজন সঙ্গে চলিলাম, গ্রামের বদন দগ্ধ না হয় এইজন্য।

বিলাসী

মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়ো-বাড়িতে গিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সবেমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। মেয়েটি ভাঙা বারান্দায় একধারে রুটি গড়িতেছিল, অকস্মাৎ লাঠি-সোঁটা হাতে এতগুলি লোককে উঠানের উপর দেখিয়া ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল।

খুড়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় শুইয়া আছে। চট করিয়া শিকলটা টানিয়া দিয়া, সেই ভয়ে মৃতপ্রায় মেয়েটিকে সম্ভাষণ শুরু করিলেন। বলা বাহুল্য, জগতের কোন খুড়া কোনকালে বোধ করি ভাইপোর স্ত্রীকে ওরূপ সম্ভাষণ করে নাই। সে এমনি যে, মেয়েটি হীন সাপুড়ের মেয়ে হইয়াও তাহা সহিতে পারিল না, চোখ তুলিয়া বলিল, বাবা আমারে বাবুর সাথে নিকে দিয়েচে জানো!

খুড়া বলিলেন, তবে রে! ইত্যাদি ইত্যাদি—। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দশ-বারোজন বীর-দর্পে হুঙ্কার দিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িল। কেহ ধরিল চুলের মুঠি, কেহ ধরিল কান, কেহ ধরিল হাত-দুটো—এবং যাহাদের সে সুযোগ ঘটিল না, তাহারাও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল না।

কারণ, সংগ্রাম-স্থলে আমরা কাপুরুষের ন্যায় চুপ করিয়া থাকিতে পারি, আমাদের বিরুদ্ধে অতবড় দুর্নাম রটনা করিতে বোধ করি নারায়ণের কর্তৃপক্ষেরও চক্ষুলজ্জা হইবে। এইখানে একটা অবান্তর কথা বলিয়া রাখি। শুনিয়াছি, নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশে পুরুষদের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্ব্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

মেয়েটি প্রথমেই সেই যা একবার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল, তারপরে একেবারে চুপ করিয়া গেল। কিন্তু আমরা যখন তাহাকে গ্রামের বাহিরে রাখিয়া আসিবার জন্য হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিলাম, তখন সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, বাবুরা আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও, আমি রুটিগুলো ঘরে দিয়ে আসি। বাইরে শিয়াল-কুকুরে খেয়ে যাবে—রোগা-মানুষ সমস্ত রাত খেতে পাবে না।

মৃত্যুঞ্জয় রুদ্ধ ঘরের মধ্যে পাগলের মত মাথা কুটিতে লাগিল, দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিল এবং শ্রাব্য-অশ্রাব্য বহুবিধ ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। কিন্তু আমরা তাহাতে তিলার্দ্ধ বিচলিত হইলাম না। স্বদেশের মঙ্গলের জন্য সমস্ত অকাতরে সহ্য করিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলাম।

চলিলাম বলিতেছি, কেননা আমিও বরাবর সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোথায় আমার মধ্যে একটুখানি দুর্ব্বলতা ছিল, আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি নাই। বরঞ্চ কেমন যেন কান্না পাইতে লাগিল; সে যে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে এবং তাহাকে

গ্রামের বাহির করাই উচিত বটে, কিন্তু এটাই যে আমরা ভাল কাজ করিতেছি, সেও কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার কথা যাক।

আপনারা মনে করিবেন না, পল্লীগ্রামে উদারতার একান্ত অভাব। মোটেই না। বরঞ্চ বড়লোক হইলে আমরা এমন সব ঔদার্য্য প্রকাশ করি যে, শুনিলে আপনারা অবাক্ হইয়া যাইবেন।

এই মৃত্যুঞ্জয়টাই যদি না তাহার হাতে ভাত খাইয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিত, তাহা হইলে ত আমাদের এত রাগ হইত না। আর কায়েতের ছেলের সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ের নিকা—এ ত একটা হাসিয়া উড়াইবার কথা! কিন্তু কাল করিল যে ঐ ভাত খাইয়া! হোক না সে আড়াই মাসের রুগী, হোক না সে শয্যাশায়ী! কিন্তু তাই বলিয়া ভাত! লুচি নয়, সন্দেশ নয়, পাঁঠার মাংস নয়! ভাত খাওয়া যে অন্ন-পাপ! সে ত আর সত্য সত্যই মাপ করা যায় না। তা নইলে, পল্লীগ্রামের লোক সকীর্ণ-চিত্ত নয়। চার-ক্রোশ-হাঁটা-বিদ্যা যে-সব ছেলের পেটে,তারাই ত একদিন বড় হইয়া সমাজের মাথা হয়! দেবী বীণাপাণির বরে সঙ্কীর্ণতা তাহাদের মধ্যে আসিবে কি করিয়া!

এই ত ইহারাই কিছুদিন পরে, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগ্যে বছর-দুই কাশীবাস করিয়া যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন নিন্দুকেরা কানাকানি করিতে লাগিল যে, অর্দ্ধেক সম্পত্তি ঐ বিধবার এবং পাছে তাহা বেহাত হয়, এই ভয়েই ছোটবাবু অনেক চেষ্টা অনেক পরিশ্রমের পর বৌঠানকে যেখান হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেটা কাশীই বটে! যাই হোক, ছোটবাবু তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যে, গ্রামের বারোয়ারী পূজা বাবদ দুইশত টাকা দান করিয়া, পাঁচখানা গ্রামের ব্রাহ্মণের সদক্ষিণা উত্তম ফলাহারের পর, প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে যখন একটা করিয়া কাঁসার গেলাস দিয়া বিদায় করিলেন, তখন ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। এমন কি পথে আসিতে অনেকেই দেশের এবং দশের কল্যাণের নিমিত্ত কামনা করিতে লাগিলেন, এমন সব যারা বড়লোক, তাদের বাড়িতে বাড়িতে, মাসে মাসে এমন সব সদানুষ্ঠানের আয়োজন হয় না কেন?

কিন্তু যাক। মহত্ত্বের কাহিনী আমাদের অনেক আছে। যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লীবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লীতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মত অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্ম্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরা হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরাজকে কসিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলেই দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

বিলাসী

বৎসর খানেক গত হইয়াছে। মশার কামড় আর সহ্য করিতে না পারিয়া সবেমাত্র সন্ন্যাসীগিরিতে ইস্তফা দিয়া ঘরে ফিরিয়াছি! একদিন দুপুরবেলা ক্রোশ-দুই দূরের মাল পাড়ার ভিতর দিয়া চলিয়াছি, হঠাৎ দেখি একটা কুটিরের দ্বারে বসিয়া মৃত্যুঞ্জয়। তার মাথায় গেরুয়া-রঙের পাগড়ী, বড় বড় দাড়ি-চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁথির মালা—কে বলিবে এ আমাদের সেই মৃত্যুঞ্জয়! কায়স্থের ছেলে একটা বছরের মধ্যেই জাত দিয়া একেবারে পুরাদস্তুর সাপুড়ে হইয়া গেছে। মানুষ কত শীঘ্র যে তাহার চৌদ্দ-পুরুষের জাতটা বিসর্জ্জন দিয়া আর একটা জাত হইয়া উঠিতে পারে, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। ব্রাহ্মণের ছেলে মেথরাণী বিবাহ করিয়া মেথর হইয়া গেছে এবং তাহাদের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে, এ বোধ করি আপনারা সবাই শুনিয়াছেন। আমি সদ্‌ব্রাহ্মণদের ছেলেকে এণ্ট্রান্স পাশ করার পরেও ডোমের মেয়ে বিবাহ করিয়া ডোম হইতে দেখিয়াছি। এখন সে ধুচুনি কুলো বুনিয়া বিক্রয় করে, শূয়ার চরায়। ভাল ভাল কায়স্থ-সন্তানকে কসাইয়ের মেয়ে বিবাহ করিয়া কসাই হইয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আজ সে স্বহস্তে গরু কাটিয়া বিক্রয় করে—তাহাকে দেখিয়া কাহার সাধ্য বলে, কোনকালে সে কসাই ভিন্ন আর কিছু ছিল! কিন্তু সকলেরই ওই একই হেতু। আমার তাই ত মনে হয়, এমন করিয়া এত সহজে পুরুষকে যাহারা টানিয়া নামাইতে পারে, তাহারা কি এমনিই অবলীলাক্রমে তাহাদের ঠেলিয়া উপরে তুলিতে পারে না? যে পল্লীগ্রামের পুরুষদের সুখ্যাতিতে আজ পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছি, গৌরবটা কি একা শুধু তাহাদেরই? শুধু নিজেদের জোরেই এত দ্রুত নীচের দিকে নামিয়া চলিয়াছে। অন্দরের দিক হইতে কি এতটুকু উৎসাহ, এতটুকু সাহায্য আসে না?

কিন্তু থাক। ঝোঁকের মাথায় হয়ত বা অনধিকার চর্চ্চা করিয়া বসিব। কিন্তু আমার মুস্কিল হইয়াছে এই যে, আমি কোনমতেই ভুলিতে পারি না, দেশের নব্বুইজন নর-নারীই ঐ পল্লীগ্রামেরই মানুষ এবং সেইজন্য কিছু একটা আমাদের করা চাই-ই। যাক। বলিতেছিলাম যে, দেখিয়া কে বলিবে এ সেই মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমাকে সে খাতির করিয়া বসাইল। বিলাসী পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সেও ভারী খুশী হইয়া বারবার বলিতে লাগিল, তুমি না আগ্‌লালে সে রাত্তিরে আমাকে তারা মেরেই ফেলত। আমার জন্যে কত মারই না জানি তুমি খেয়েছিলে।

কথায় কথায় শুনিলাম, পরদিনই তাহারা এখানে উঠিয়া আসিয়া ক্রমশঃ ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে এবং সুখে আছে। সুখে যে আছে, এ-কথা আমাকে বলার প্রয়োজন ছিল না, শুধু তাহাদের মুখের পানে চাহিয়াই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম।

তাই শুনিলাম, আজ কোথায় নাকি তাহাদের সাপ-ধরার বায়না আছে এবং তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে, আমিও অমনি সঙ্গে যাইবার জন্য লাফাইয়া উঠিলাম। ছেলে-বেলা হইতেই দুটা জিনিসের উপর আমার প্রবল সখ ছিল। এক ছিল গোখরো কেউটে সাপ ধরিয়া পোষা, আর ছিল মন্ত্র-সিদ্ধ হওয়া।

সিদ্ধ হওয়ার উপায় তখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়কে ওস্তাদ লাভ করিবার আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। সে তাহার নামজাদা শশুরের শিষ্য, সুতরাং মস্ত লোক। আমার ভাগ্য যে অকস্মাৎ এমন সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা কে ভাবিতে পারিত!

কিন্তু শক্ত কাজ এবং ভয়ের কারণ আছে বলিয়া প্রথমে তাহারা উভয়েই আপত্তি করিল, কিন্তু আমি এমনি নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিলাম যে, মাসখানেকের মধ্যে আমাকে সাগরেদ করিতে মৃত্যুঞ্জয় পথ পাইল না। সাপ-ধরার মন্ত্র এবং হিসাব শিখাইয়া দিল এবং কব্জিতে ওষুধ-সমেত মাদুলি বাঁধিয়া দিয়া দস্তুরমত সাপুড়ে বানাইয়া তুলিল।

মন্ত্রটা কি জানেন? তার শেষটা আমার মনে আছে—

ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—
মনসা দেবী আমার মা—
ওলট-পালট পাতাল ফোঁড়—
ঢোঁড়ার বিষ তুই নে, তোর বিষ ঢোঁড়ারে দে—
—দুধরাজ, মণিরাজ!
কার আজ্ঞে—বিষহরির আজ্ঞে!

ইহার মানে যে কি, তাহা আমি জানি না। কারণ, যিনি এই মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি ছিলেন—নিশ্চয়ই কেহ না কেহ ছিলেন—তাঁর সাক্ষাৎ কখনো পাই নাই।

অবশেষে একদিন এই মন্ত্রের সত্য-মিথ্যার চরম মীমাংসা হইয়া গেল বটে, কিন্তু যতদিন না হইল, ততদিন সাপ-ধরার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রসিদ্ধ হইয়া গেলাম। সবাই বলাবলি করিতে লাগিল, হ্যাঁ, ন্যাড়া একজন গুণী লোক বটে। সন্ন্যাসী অবস্থায় কামাখ্যায় গিয়া সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; এতটুকু বয়সের মধ্যে এতবড় ওস্তাদ হইয়া অহঙ্কারে আমার আর মাটিতে পা পড়ে না, এমনি জো হইল।

বিশ্বাস করিল না শুধু দুইজন। আমার গুরু যে, সে ত ভাল মন্দ কোন কথাই বলিত না। কিন্তু বিলাসী মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিত, ঠাকুর, এ-সব ভয়ঙ্কর জানোয়ার, একটু সাবধানে নাড়া-চাড়া করো। বস্তুতঃ বিষদাঁত ভাঙা, সাপের

মুখ হইতে বিষ বাহির করা প্রভৃতি কাজগুলা এমনি অবহেলায় সহিত করিতে শুরু করিয়াছিলাম যে, সে-সব মনে পড়িলে আজও আমার গা কাঁপে।

আসল কথা হইতেছে এই যে, সাপ ধরা কঠিন নয়, এবং ধরা সাপ দুই-চারি দিন হাঁড়িতে পুরিয়া রাখার পরে তাহার বিষদাঁত ভাঙাই হোক আর নাই হোক, কিছুতেই কামড়াইতে চাহে না। চক্র তুলিয়া কামড়াইবার ভান করে, ভয় দেখায়, কিন্তু কামড়ায় না।

মাঝে মাঝে আমাদের গুরু-শিষ্যের সহিত বিলাসী তর্ক করিত। সাপুড়েদের সবচেয়ে লাভের ব্যবসা হইতেছে শিকড় বিক্রী করা, যা দেখাইবামাত্র সাপ পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু তার পূর্ব্বে সামান্য একটু কাজ করিতে হইত। যে সাপটা শিকড় দেখিয়া পলাইবে, তাহার মুখে একটা লোহার শিক পুড়াইয়া বার-কয়েক ছ্যাঁকা দিতে হয়। তার পরে তাহাকে শিকড়ই দেখান হোক আর একটা কাঠিই দেখান হোক, সে যে কোথায় পলাইবে ভাবিয়া পায় না। এই কাজটার বিরুদ্ধে বিলাসী ভয়ানক আপত্তি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে বলিত, দেখ, এমন করিয়া মানুষ ঠকাইয়ো না।

মৃত্যুঞ্জয় কহিত, সবাই করে—এতে দোষ কি ?

বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। আমাদের ত খাবার ভাবনা নেই, আমরা কেন মিছিমিছি লোক ঠকাতে যাই।

আর একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি। সাপ-ধরার বায়না আসিলেই বিলাসী নানা প্রকার বাধা দেবার চেষ্টা করিত—আজ শনিবার, আজ মঙ্গলবার, এমনি কত কি। মৃত্যুঞ্জয় উপস্থিত না থাকিলে সে তো একেবারে ভাগাইয়া দিত, কিন্তু উপস্থিত থাকিলে মৃত্যুঞ্জয় নগদ টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না। আর আমার ত একরকম নেশার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নানা প্রকারে তাহাকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে মজা ছাড়া ভয় যে কোথায় ছিল, এ আমাদের মনেই স্থান পাইত না। কিন্তু এই পাপের দণ্ড আমাকে একদিন ভাল করিয়াই দিতে হইল।

সেদিন ক্রোশ-দেড়েক দূরে এক গোয়ালার বাড়িতে সাপ ধরিতে গিয়াছি। বিলাসী বরাবরই সঙ্গে যাইত, আজও সঙ্গে ছিল। মেটে ঘরের মেজে খানিকটা খুঁড়িতেই একটা গর্ত্তের চিহ্ন পাওয়া গেল। আমরা কেহই লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে—সে হেঁট হইয়া কয়েক টুকরা কাগজ তুলিয়া লইয়া আমাকে বলিল, ঠাকুর, একটু সাবধানে খুঁড়ো। সাপ একটা নয়, এক জোড়া ত আছে বটেই, হয়ত বা বেশীও থাকতে পারে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, এরা যে বলে একটাই এসে ঢুকেচে। একটাই দেখতে পাওয়া গেছে।

বিলাসী কাগজ দেখাইয়া কহিল, দেখচ না বাসা করেছিল।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কাগজ ত ইঁদুরেও আনতে পারে?

বিলাসী কহিল, দুই-ই হতে পারে। কিন্তু দুটো আছেই আমি বলচি।

বাস্তবিক বিলাসীর কথাই ফলিল এবং মর্ম্মান্তিকভাবেই সেদিন ফলিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই একটা প্রকাণ্ড খরিশ গোখরো ধরিয়া ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় আমার হাতে দিল। কিন্তু সেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরিয়া ফিরিতে না ফিরিতেই মৃত্যুঞ্জয় উঃ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

প্রথমটা যেন সবাই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম! কারণ সাপ ধরিতে গেলে সে পলাইবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া বরঞ্চ গর্ত্ত হইতে এক হাত মুখ বাহির করিয়া দংশন করে, এমন অভাবনীয় ব্যাপার জীবনে এই একটিবার মাত্র দেখিয়াছি। পরক্ষণেই বিলাসী চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া আঁচল দিয়া তাহার হাতটা বাঁধিয়া ফেলিল এবং যত রকমের শিকড়-বাকড় সে সঙ্গে আনিয়াছিল সমস্তই তাহাকে চিবাইতে দিল। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের মাদুলি ত ছিলই, তাহার উপরেও আমার মাদুলিটাও খুলিয়া তাহার হাতে বাঁধিয়া দিলাম। আশা, বিষ ইহার ঊর্দ্ধে উঠিবে না। এবং আমার সেই "বিষ-হরির আজ্ঞে" মন্ত্রটা সতেজে বার বার আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকে ভিড় জমিয়া গেল এবং এ-অঞ্চলের মধ্যে যেখানে যত গুণী ব্যক্তি আছেন সকলকে খবর দিবার জন্য দিকে দিকে লোক ছুটিল। বিলাসীর বাপকেও সংবাদ দিবার জন্য লোক গেল।

আমার মন্ত্র পড়ার আর বিরাম নাই, কিন্তু ঠিক সুবিধা হইতেছে বলিয়া মনে হইল না। তথাপি আবৃত্তি সমভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু মিনিট পনের-কুড়ি পরেই যখন মৃত্যুঞ্জয় একবার বমি করিয়া দিল, তখন বিলাসী মাটির উপরে একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। আমি বুঝিলাম, বিষহরির দোহাই বুঝি আর খাটে না।

নিকটবর্ত্তী আরও দুই-চারিজন ওস্তাদ আসিয়া পড়িলেন এবং আমরা কখনো বা একসঙ্গে, কখনো বা আলাদা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দোহাই পাড়িতে লাগিলাম। কিন্তু বিষ দোহাই মানিল না, রোগীর অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। যখন দেখা গেল, ভাল কথায় হইবে না, তখন তিন-চারজন রোজা মিলিয়া বিষকে এমনি অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করিতে লাগিল যে, বিষের কান থাকিলে সে, মৃত্যুঞ্জয় ত মৃত্যুঞ্জয়, সেদিন দেশ ছাড়িয়া পলাইত। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। আরও আধঘণ্টা

ধস্তা-ধ্বস্তির পরে, রোগী তাহার বাপ-মায়ের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম, তাহার শ্বশুরের দেওয়া মন্ত্রৌষধি, সমস্ত মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করিল। বিলাসী তাহার স্বামীর মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়াছিল, সে যেন একেবারে পাথর হইয়া গেল।

যাক, তাহার দুঃখের কাহিনীটা আর বাড়াইব না। কেবল এইটুকু বলিয়া শেষ করিব যে, সে সাতদিনের বেশি বাঁচিয়া থাকাটা সহিতে পারিল না। আমাকে শুধু একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুর, আমার মাথার দিব্যি রইল, এসব তুমি আর কখনো ক'রো না।

আমার মাদুলি-কবজ ত মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে কবরে গিয়াছিল, ছিল শুধু বিষহরির আজ্ঞা। কিন্তু সে আজ্ঞা যে ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা নয়, এবং সাপের বিষ যে বাঙালীর বিষ নয়, তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম।

একদিন গিয়া শুনিলাম, ঘরে ত আর বিষের অভাব ছিল না, বিলাসী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে এবং শাস্ত্রমতে সে নিশ্চয়ই নরকে গিয়াছে। কিন্তু যেখানেই যাক, আমার নিজের যখন যাইবার সময় আসিবে, তখন ওইরূপ কোন একটা নরকে যাইবার প্রস্তাবে পিছাইয়া দাঁড়াইব না, এইমাত্র বলিতে পারি।

খুড়োমশাই ষোল-আনা বাগান দখল করিয়া অত্যন্ত বিজ্ঞের মত চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ওর যদি না অপঘাতে মৃত্যু হবে, ত হবে কার? পুরুষমানুষ অমন একটা ছেড়ে দশটা করুক না, তাতে ত তেমন আসে-যায় না—না হয় একটু নিন্দাই হ'তো। কিন্তু, হাতে ভাত খেয়ে মরতে গেলি কেন? নিজে ম'লো, আমার পর্য্যন্ত মাথা হেঁট করে গেল। না পেলে একফোঁটা আগুন, না পেলে একটা পিণ্ডি, না হ'লো একটা ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।

গ্রামের লোক একবাক্যে বলিতে লাগিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! অন্ন-পাপ! বাপ্‌রে! এর কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে!

বিলাসীর আত্মহত্যার ব্যাপারটাও অনেকের কাছে পরিহাসের বিষয় হইল। আমি প্রায়ই ভাবি, এ অপরাধ হয়ত উহারা উভয়েই করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ত পল্লীগ্রামেরই ছেলে, পাড়াগাঁয়ের তেলে-জলেই ত মানুষ! তবু এত বড় দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না?

আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে পরস্পরের হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে-দেশের নর-নারী আশা করিবার

সৌভাগ্য, আকাঙ্খা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত, যাহাদের জয়ের গর্ব্ব, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ, কিছুরই বালাই নাই, যাহাদের প্রাচীন এবং বহুদর্শী বিজ্ঞ সমাজ সর্ব্বপ্রকারের হাঙ্গামা হইতে অত্যন্ত সাবধানে দেশের লোককে তফাৎ করিয়া, আজীবন কেবল ভালটি হইয়া থাকিবারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাই বিবাহ-ব্যাপারটা যাহাদের শুধু নিছক contract, তা সে যতই কেন না বৈদিক মন্ত্র দিয়া document পাকা করা হোক, সে-দেশের লোকের সাধ্যই নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ন-পাপের কারণ বোঝে। বিলাসীকে যাঁহারা পরিহাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধু গৃহস্থ এবং সাধ্বী গৃহিণী—অক্ষয় সতীলোক তাঁহারা সবাই পাইবেন, তাও আমি জানি। কিন্তু সেই সাপুড়ের মেয়েটি যখন একটি পীড়িত শয্যাগত লোককে তিল তিল করিয়া জয় করিতেছিল, তাহার তখনকার সে গৌরবের কণামাত্রও হয়ত আজিও ইহাদের কেহ চোখে দেখেন নাই। মৃত্যুঞ্জয় হয়ত নিতান্তই একটা তুচ্ছ মানুষ ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় জয় করিয়া দখল করার আনন্দটাও তুচ্ছ নয়, সে সম্পদও অকিঞ্চিৎকর নহে।

এই বস্তুটাই এ-দেশের লোকের পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। আমি ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধে'রও দোষ দিব না এবং শাস্ত্রীয় তথা সামাজিক বিধি-ব্যবস্থারও নিন্দা করিব না। করিলেও, মুখের উপর কড়া জবাব দিয়া যাঁহারা বলিবেন, এই হিন্দু-সমাজ তাহার নির্ভুল বিধি-ব্যবস্থার জোরেই অত শতাব্দীর অতগুলো বিপ্লবের মধ্যে বাঁচিয়া আছে, আমি তাঁহাদেরও অতিশয় ভক্তি করি, প্রত্যুত্তরে আমি কখনই বলিব না, টিঁকিয়া থাকা চরম সার্থকতা নয়—এবং অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তেলাপোকা টিঁকিয়া আছে। আমি শুধু এই বলিব যে, বড়লোকের নন্দগোপালটির মত দিবারাত্র চোখে-চোখে এবং কোলে-কোলে রাখিলে যে সে বেশটি থাকিবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু একেবারে তেলাপোকাটির মত বাঁচাইয়া রাখার চেয়ে এক-আধবার কোল হইতে নামাইয়া আরও পাঁচজন মানুষের মত দু-এক পা হাঁটিতে দিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার মত পাপ হয় না।

———

বাল্যকালের গল্প

ছেলেধরা

সেবার দেশময় রটে গেল যে, তিনটি শিশু বলি না দিলে রূপনারায়ণের উপর রেলের পুল কিছুতেই বাঁধা যাচ্ছে না। দুটি ছেলেকে জ্যান্ত থামের নীচে পোঁতা হয়ে গেচে, বাকী শুধু একটি। একটি সংগ্রহ হলেই পুল তৈরী হয়ে যায়। শোনা গেল, রেল-কোম্পানীর নিযুক্ত ছেলেধরারা সহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্চে। তারা কখন এবং কোথায় এসে হাজির হবে, কেউ বলতে পারে না। তাদের কারোর পোষাক ভিখিরীর, কারও বা সাধু-সন্ন্যাসীর, কেউ বা বেড়ায় লাঠি-হাতে ডাকাতের মত—এ জনশ্রুতি পুরানো, সুতরাং কাছাকাছি পল্লীবাসীর ভয়ের ও সন্দেহের সীমা রহিল না যে, এবার হয়ত তাদের পালা, তাদের ছেলেপুলেই হয়ত পুলের তলায় পোঁতা যাবে।

কারও মনে শান্তি নেই, সব বাড়িতেই কেমন একটা ছম্‌ছম্‌ ভাব। আবার তার উপরে আছে খবরের কাগজের খবর। কলকাতায় যারা চাকরি করে তারা এসে জানায়, সেদিন বউবাজারে একটা ছেলেধরা ধরা পড়েচে, কাল কড়েয়ায় আর একটা লোককে হাতে-নাতে ধরা গেছে, সে ছেলে ধরে ঝুলিতে পুরছিল। এমনি কত খবর! কলকাতায় অলিতে-গলিতে সন্দেহক্রমে কত নিরীহের প্রতি কত অত্যাচারের খবর লোকের মুখে মুখে আমাদের দেশে এসে পৌঁছুল। এমনি যখন অবস্থা তখন আমাদের দেশেও হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেইটে বলি।

পথের অদূরে একটা বাগানের মধ্যে বাস করেন বৃদ্ধ মুখুয্যে-দম্পতি। ছেলে-পুলে নেই, কিন্তু সংসারে ও সাংসারিক সকল ব্যাপারে আশক্তি আঠারো আনা। ভাইপোকে আলাদা করে দিয়েছেন, কিন্তু আর কিছুই দেননি। দেবেন এ-কল্পনাও তাঁদের নেই। সে এসে মাঝে মাঝে দাবী করে ঘটি-বাটি-তৈজসপত্র; খুড়ি চেঁচিয়ে হাট বাঁধিয়ে দিয়ে লোকজন জড়ো করেন, বলেন হীরু আমাদের মারতে এসেছিল। হীরু বলে, সেই ভাল—মেরেই একদিন সমস্ত আদায় করব।

এমনি করে দিন যায়।

সেদিন সকালে ঝগড়ার চূড়ান্ত হয়ে গেল। হীরু উঠানে দাঁড়িয়ে বললে, শেষ বেলা বলচি খুড়ো, আমার ন্যায্য পাওনা দেবে কি না বল?

খুড়ো বললেন, তোর কিছু নেই।

নেই ?

না।

আদায় করে আমি ছাড়ব।

খুড়ি রান্নাঘরে কাজে ছিলেন, বেরিয়ে এসে বললেন, তা হলে যা তোর বাবাকে ডেকে আন্ গে।

হীরু বললে, আমার বাবা স্বর্গে গেছেন, তিনি আসতে পারবেন না,—আমি গিয়ে তোমাদের বাবাদের ডেকে আনব। তাদের কেউ হয়ত বেঁচে আছে—তারা এসে চুল-চিরে আমার বখ্‌রা ভাগ করে দেবে।

তারপর মিনিট-দুয়েক ধরে উভয় পক্ষে যে-ভাষা চলল তা লেখা চলে না।

যাবার আগে হীরু বলে গেল, আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব। এই তোমাদের বলে গেলুম। সাবধান!

রান্নাঘর থেকে খুড়ি বললেন, তোর ভারি ক্ষমতা! যা পারিস কর গে।

হীরু এসে হাজির হ'লো রাইপুরে। ঘর-কয়েক গরীব মুসলমানের পল্লী। মহরমের দিনে বড় বড় লাঠি ঘুরিয়ে তারা তাজিয়া বার করে। লাঠি তেলে পাকানো, গাঁটে গাঁটে পেতল বাঁধানো। এই থেকে অনেকের ধারণা তাদের মত লাঠি-খেলোয়াড় এ অঞ্চলে মেলে না। তারা পারে না এমন কাজ নেই। শুধু পুলিশের ভয়ে শান্ত হয়ে থাকে।

হীরু বললে, বড় মিঞা, এই নাও দুটি টাকা আগাম। তোমার আর তোমার ভায়ের। কাজ উদ্ধার করে দাও, আরো বক্‌শিস্ পাবে।

টাকা দুটি হাতে নিয়ে লতিফ মিঞা হেসে বললে, কি কাজ বাবু?

হীরু বললে, এদেশে কে না জানে তোমাদের দু-ভায়ের কথা! লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারী হাসিল করে নিয়েচ। তোমরা মনে করলে পার না কি।

বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ্ চুপ্ বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না! বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল করে দিয়েচি, এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারেনি বলেই ত সে-যাত্রা বেঁচে গেছি।

হীরু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, কেউ চিনতে পারেনি?

লতিফ বললে, পারবে কি করে! মাথায় ইয়া পাগ বাঁধা, গালে গাল-পাট্টা, কপালে কপাল-জোড়া সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে ছ-হাতি লাঠি,—লোকে ভাবলে হিঁদুর যমপুরী থেকে যমদূত এসে হাজির হ'লো। চিনবে কি—কোথায় পালাল তার ঠিকানা রইল না।

হীরু তার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, বড় মিঞা, এই কাজটি আর একবার তোমাকে করতে হবে, দাদা। আমার খুড়ো তবু যা হোক দুটো ভাগের ভাগ দিতে চায়, কিন্তু খুড়ি বেটী এমনি শয়তান যে একটা চুমকি ঘটিতে পর্য্যন্ত হাত দিতে দেয় না। ওই পাগড়ী, গাল-পাট্টা, আর সিঁদুর মেখে লাঠি হাতে একবার গিয়ে উঠানে দাঁড়াবে, তোমাদের ডাকাতের হুমকি একবার ঝাড়বে, তার পর দেখে নেবো কিসে কি হয়। আমার যা-কিছু পাওনা ফেঁড়ে বের করে আনব। ঠিক সন্ধ্যার আগে—ব্যাস্।

লতিফ মিঞা রাজি হ'লো। লতিফ মামুদ দু-ভাই সাজ-পোশাক পরে আজই গিয়ে খুড়োর বাড়িতে হানা দেবে ঠিক হয়ে গেল। পিছনে থাকবে হীরু।

একাদশী। সারাদিনের পর দাওয়ায় ঠাঁই করে দিয়েচেন জগদম্বা। মুখুয্যেমশাই বসেচেন জলযোগে। সামান্য ফল-মূল ও দুধ। বেতো ধাত—একাদশীতে অন্নাহার সহ্য হয় না। পাথরের বাটিতে ডাবের জলটুকু মুখে তুলেচেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল দু-ভাই লতিফ আর মামুদ। ইয়া পাগড়ী, ইয়া গাল-পাট্টা, হাতে ছ-হাতি লাঠি, কপাল-জোড়া সিঁদুর মাখানো। মুখুয্যের হাত থেকে পাথরের বাটি দুম্ করে পড়ে গেল,—জগদম্বা চীৎকার করে উঠলেন—ওগো পাড়ার লোক, কে কোথায় আছো, এসো গো, ছেলে-ধরা ঢুকেচে।

সুমুখের ছোট মাঠটায় ঘর কেটে ছোট ছোট ছেলের দল রোজ ফিঞে খেলে, আজও খেলছিল,—তারাও চেঁচাতে চেঁচাতে যে যেখানে পারলে ছুট দিলে—ওগো ছেলে-ধরা এসেচে, অনেক ছেলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

হীরু সঙ্গে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে। দোরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল—সে চাপা গলায় বললে—আর দেখ কি মিঞা, পালাও। পাড়ার লোক ধরে ফেললে আর রক্ষে নেই। বলেই নিজে মারলে ছুট।

লতিফ মিঞা সহরের আর কিছু না শুনে থাক্, ছেলে-ধরার জনশ্রুতি তাদের কানে এসেও পৌঁছেচে। চক্ষের পলকে বুঝলে এ অজানা জায়গায় এরূপ বেশে এই সিঁদুর মাখা মুখে ধরা পড়ে গেলে দেহের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না। সুতরাং তারাও মারল ছুট। কিন্তু ছুটলে হবে কি? পথ অচেনা, আলো এসেচে কমে—চতুর্দ্দিক থেকে কেবল বহুকণ্ঠের সমবেত চীৎকার—ধরে ফ্যাল্, ধরে ফ্যাল্! মেরে ফ্যাল্ ব্যাটাদের! ছোট ভাই মামুদ কোথায় পালাল ঠিকানা নেই, কিন্তু বড় ভাই লতিফকে সবাই ঘিরে ফেললে—সে প্রাণের দায়ে কাঁটা বন ভেঙ্গে লাফিয়ে পড়ল একটা ডোবায়। তার পর সবাই পাড়ে দাঁড়িয়ে ছুঁড়তে লাগল ঢিল। যেই মাথা

তোলে অমনি মাথায় পড়ে ঢিল। আবার সে মারে ডুব। আবার ওঠে, আবার মাথায় পড়ে ঢিল।

লতিফ মিঞা জল খেয়ে আর ইট খেয়ে আধ-মরা হয়ে পড়ল। সে যতই হাত জোড় করে বলতে চায় সে ছেলে-ধরা নয়, ছেলে ধরতে আসেনি,—ততই লোকের রাগ আর সন্দেহ বেড়ে যায়। তারা বলে নইলে ওর গাল-পাট্টা কেন? ওর পাগড়ী কিসের জন্য? ওর মুখময় এত সিঁদুর এলো কোথা থেকে? পাগড়ী তার খুলে গেছে, গাল-পাট্টা একধারে ঝুলচে—কপালের সিঁদুর জলে ধুয়ে মুখময় লেগেচে। এ-সব কথা সে পাড়ের লোকদের বলেই বা কখন, শোনেই বা কে!

ততক্ষণে কতকগুলি উৎসাহী লোক জলে নেমে লতিফকে টেনে হিঁচড়ে তুলেচে —সে কাঁদতে কাঁদতে কেবলই জানাচ্চে, সে লতিফ মিঞা, তার ভাই মামুদ মিঞা—তারা ছেলে-ধরা নয়।

এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে—হাঙ্গামা শুনে নেমে এলুম পুকুর-ধারে। আমাকে দেখে উত্তেজিত জনতা আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সবাই সমস্বরে বলতে লাগল, তারা একটা ছেলে-ধরা ধরেচে। লোকটার অবস্থা দেখে চোখে জল এলো, তার মুখ দিয়ে কথা বেরোবার শক্তি নেই—গাল-পাট্টায়, পাগড়ীতে সিঁদুরে-রক্তে মাখামাখি—শুধু হাত-জোড় করচে আর কাঁদচে।

জিজ্ঞাসা করলুম, ও কার ছেলে চুরি করেচে? কে নালিশ করেচে? তারা বললে, তা কে জানে?

ছেলে কৈ?

তাই বা কে জানে?

তবে এমন করে মারচো কেন?

কে একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধ হয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেচে। রাত্তিরে তুলে নিয়ে যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে।

বললুম; মরা ছেলে কখনো বলি দেওয়া যায়?

তারা বলল, মরা হবে কেন, জ্যান্ত ছেলে।

পাঁকে পুঁতে রাখলে ছেলে জ্যান্ত থাকে কখনো?

যুক্তিটা তখন অনেকের কাছেই সমীচীন বোধ হ'লো। এতক্ষণ উত্তেজনার মুখে সে-কথা কেউ ভাববারই সময় পায়নি।

বললুম, ছাড় ওকে। লোকটাকে জিজ্ঞেসা করলুম—মিঞা, ব্যাপারটা সত্যি কি বল ত?

এখন অভয় পেয়ে লোকটা কাঁদতে কাঁদতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলে। মুখুয্যে-দম্পতির উপর কারও সহানুভূতি ছিল না। শুনে অনেকের করুণাও হলো।

বললুম, লতিফ বাড়ি যাও, আর কখনও এ-সব কাজে এসে না।

সে নাক মললে, কান মললে—খোদার কিরে নিয়ে বললে, বাবুমশায়, আর এ-সব কাজে কখনো না। কিন্তু আমার ভাই গেল কোথায়?

বললুম, ভায়ের ভাবনা বাড়ি গিয়ে ভেবো লতিফ, এখন নিজের প্রাণটা যে বাঁচল এই ঢের।

লতিফ খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনমতে বাড়ি চলে গেল।

অনেক রাত্রে আর একটা প্রচণ্ড কোলাহল উঠল ঘোষালদের পাড়ায়। তাদের ঝি গোয়ালে ঢুকছিল গরুকে জাব দিতে। খড়ের ঝুড়ি টানতে গিয়ে দেখে টানা যায় না—হঠাৎ তার মধ্যে থেকে একটা ভীষণ-মূর্তি লোক বেরিয়ে ঝির পা দুটো জড়িয়ে ধরলে।

ঝি যতই চেঁচায়, বেরোও গো কে কোথা আছ,—ভূত আমাকে খেয়ে ফেললে। ভূত ততই তার মুখ চেপে ধরে বলে, মা গো, আমাকে বাঁচাও—আমি ভূত-পেরেত নই, আমি মানুষ।

চীৎকারে বাড়ির কর্তা আলো নিয়ে লোকজন নিয়ে এসে উপস্থিত—আগের ঘটনা গাঁয়ের সবাই শুনেচে। সুতরাং ছোট ভায়ের ভাগ্যে বড় ভাইয়ের দুর্গতি আর ঘটল না, সবাই সহজে বিশ্বাস করলে এই সেই মামুদ মিঞা। ভূত নয়।

ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে—শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে, ছোট মিঞা, সমস্ত জীবন মনে থাকবে বলে এটা রেখে দিলুম। মুখের ঐ সব রঙ-টঙ ধুয়ে ফেলে এখন আস্তে আস্তে ঘরে যাও।

কৃতজ্ঞ মামুদ একশ সেলাম জানিয়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল। ঘটনাটি ছেলে-ভুলানো গল্প নয়, সত্যই আমাদের ওখানে ঘটেছিল।

———

লালু

ছেলেবেলায় আমার এক বন্ধু ছিল তার নাম লালু। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে—অর্থাৎ, সে এতকাল পূর্ব্বে যে, তোমরা ঠিক-মত ধারণা করতে পারবে না—আমরা একটি ছোট বাঙলা ইস্কুলের এক ক্লাসে পড়তাম। আমাদের বয়স তখন দশ-এগারো। মানুষকে ভয় দেখাবার, জব্দ করবার কত কৌশলই যে তার মাথায় ছিল তার ঠিকানা নেই। ওর মাকে রবারের সাপ দেখিয়ে একবার এমন বিপদে ফেলেছিল যে, তিনি পা মচ্‌কে প্রায় সাত-আটদিন খুঁড়িয়ে চলেছিলেন। তিনি রাগ করে বললেন—ওর একজন মাস্টার ঠিক করে দিতে। সন্ধ্যেবেলায় এসে পড়াতে বসবেন, ও আর উপদ্রব করবার সময় পাবে না।

শুনে লালুর বাবা বললেন, না। তাঁর নিজের কখনো মাস্টার ছিল না, নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখ-পড়া করে এখন তিনি একজন বড় উকীল। ইচ্ছে ছিল ছেলেও যেন তেমনি করেই বিদ্যা লাভ করে। কিন্তু সর্ত্ত হলো এই যে, যে-বার লালু, ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম না হতে পারবে তখন থেকে থাকবে ওর বাড়িতে পড়ানোর টিউটার। সে যাত্রা লালু পরিত্রাণ পেলে, কিন্তু মনে মনে রইল ও মার 'পরে চটে। কারণ, উনি তার ঘাড়ে মাস্টার চাপানোর চেষ্টায় ছিলেন। সে জানত বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা সমান।

লালুর বাপ ধনী গৃহস্থ। বছর কয়েক হলো পুরানো বাড়ি ভেঙ্গে তেতালা বাড়ি করেচেন; সেই অবধি লালুর মায়ের আশা গুরুদেবকে এ-বাড়িতে এনে তাঁর পায়ের ধুলো নেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ, ফরিদপুর থেকে এতদূরে আসতে রাজি হন না, কিন্তু এইবার সেই সুযোগ ঘটেচে। স্মৃতিরত্ন সূর্য্যগ্রহণ-উপলক্ষে কাশী এসেচেন, সেখান থেকে লিখে পাঠিয়েছেন—ফেরবার পথে নন্দরাণীকে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। লালুর মার আনন্দ ধরে না—উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত—এতদিনে মনস্কামনা সিদ্ধ হবে, গুরুদেবের পায়ের ধুলো পড়বে। বাড়িটা পবিত্র হয়ে যাবে।

নীচের বড় ঘরটা থেকে আসবাবপত্র সরানো হলো, নতুন ফিতের খাট, নতুন শয্যা তৈরী হয়ে এলো,—গুরুদেব শোবেন। এই ঘরেরই এক কোণে তাঁর পূজো আহ্নিকের জায়গা হলো, কারণ তেতালার ঠাকুর-ঘরে উঠতে-নামতে তাঁর কষ্ট হবে।

দিন-কয়েক পরে গুরুদেব এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কি দুর্যোগ! আকাশ ছেয়ে কালো মেঘের ঘটা, যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি—তার আর বিরাম নেই।

এদিকে মিষ্টান্নাদি তৈরী করতে, ফল-মূল সাজাতে লালুর মা নিশ্বাস নেবার সময় পান না। তারই মধ্যে স্বহস্তে ঝেড়ে-ঝুড়ে মশারি গুঁজে দিয়ে বিছানা করে গেলেন। নানা কথাবার্ত্তায় রাত হয়ে গেল, পথশ্রমে ক্লান্ত গুরুদেব আহারাদি সেরে শয্যা গ্রহণ করলেন। চাকর-বাকর ছুটি পেলে। সুকোমল শয্যার পারিপাট্যে প্রসন্ন গুরুদেব মনে মনে নন্দরাণীকে আশীর্ব্বাদ করলেন।

কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ছাদ চুঁইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়চে। —উঃ, কি ঠাণ্ডা জল! শশব্যস্তে বিছানার বাহিরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন, নতুন বাড়ি করলে নন্দরাণী, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যেই ফেটেচে দেখচি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারী-সুদ্ধ সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশী নয়, চোখ দুটি সবে বুজেচেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠাণ্ডা জল টপ্ টপ্ টপ্ টপ্ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়ল। স্মৃতিরত্ন আবার উঠলেন, আবার খাট টেনে অন্যধারে নিয়ে গেলেন, বললেন, ইঃ—ছাতটা দেখচি এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্য্যন্ত ফেটে গেছে। আবার শুলেন, আবার পেটের উপর জল ঝরে পড়ল। আবার উঠে পেটের জল মুছে খাটটা টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু শোবামাত্রই তেমনি জলের ফোঁটা। আবার টেনে নিয়ে আর একধারে গেলেন, কিন্তু সেখানেও তেমনি। এবার দেখলেন বিছানাটাও ভিজেচে, শোবার জো নেই। স্মৃতিরত্ন বিপদে পড়লেন। বুড়ো-মানুষ; অজানা জায়গায় দোর খুলে বাইরে যেতেও ভয় করে, আবার থাকাও বিপজ্জনক। কি জানি ফাটা ছাত ভেঙে হঠাৎ মাথায় যদি পড়ে! ভয়ে ভয়ে দোর খুলে বারান্দায় এলেন, সেখানে লণ্ঠন একটা জ্বলচে বটে, কিন্তু কেউ কোথাও নেই,—ঘোর অন্ধকার।

যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়ো হাওয়া! দাঁড়াবার জো কি। কোথায় চাকর-বাকর, কোন ঘরে শোয় তারা—কিছুই জানেন না তিনি। চেঁচিয়ে ডাকলেন, কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। একধারে একটা বেঞ্চি ছিল, লালুর বাবার গরীব মক্কেল যারা তারাই এসে বসে। গুরুদেব অগত্যা তাতেই বসলেন। আত্মমর্য্যাদার যথেষ্ট লাঘব হ'লো অন্তরে অন্তরে অনুভব করলেন, কিন্তু উপায় কি। উত্তুরে বাতাসে বৃষ্টির ছাটের আমেজ রয়েছে—শীতে গা শির্ শির্ করে—কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, পা দুটি যথাসম্ভব উপরে তুলে, যথাসম্ভব আরাম পাবার আয়োজন করে নিলেন।

নানাবিধ শ্রান্তি ও দুর্বিপাকে দেহ অবশ, মন তিক্ত, ঘুমে চোখের পাতা ভারাতুর, অনভ্যস্ত গুরু-ভোজন ও রাত্রি-জাগরণে দু-একটা অম্ল উদ্গারের আভাস দিলে—উদ্বেগের অবধি রইল না! হঠাৎ এমনি সময় অভাবনীয় নতুন উপদ্রব। পশ্চিমের বড় বড় মশা দুই কানের পাশে এক গান জুড়ে দিলে। চোখের পাতা প্রথমে সাড়া দিতে চায় না, কিন্তু মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কি জানি এরা সংখ্যায় কত। মাত্র মিনিট-দুই অনিশ্চিত নিশ্চিত হ'লো; গুরুদেব বুঝলেন সংখ্যায় এরা অগণিত। সে বাহিনীকে উপেক্ষা করে বিশ্বে এমন বীরপুরুষ কেউ নেই। যেমন তার জ্বলুনি তেমন তার চুলকুনি। স্মৃতিরত্ন দ্রুত স্থান ত্যাগ করলেন, কিন্তু তারা সঙ্গ নিলে। ঘরের মধ্যে জলের জন্য যেমন ঘরের বাইরে মশার জন্য তেমন। হাত-পায়ের নিরন্তর আক্ষেপে, গামছার সঘন সঞ্চালনে কিছুতেই তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা যায় না। স্মৃতিরত্ন এ-পাশ থেকে ও-পাশে ছুটে বেড়াতে লাগলেন, শীতের মধ্যেও তাঁর গায়ে ঘাম দিলে। ইচ্ছে হ'লো ডাক ছেড়ে চেঁচান, কিন্তু নিতান্ত বালকোচিত হবে ভেবে বিরত রইলেন। কল্পনায় দেখলেন নন্দরাণী সুকোমল শয্যায় মশারির মধ্যে আরামে নিদ্রিত, বাড়ির যে যেখানে আছে পরম নিশ্চিন্তে সুপ্ত—শুধু তাঁর ছুটোছুটিরই বিরাম নেই। কোথাকার ঘড়িতে চারটা বাজল, বললেন, কামড়া ব্যাটারা, যত পারিস্ কামড়া,—আমি আর পারিনে; বলেই বারান্দার একটা কোণে পিঠের দিকটা যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন। বললেন, সকাল পর্য্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে ত এ দুর্ভাগা দেশে আর না। যে গাড়ি প্রথমে পাব সেই গাড়িতে দেশে পালাব। কেন যে এখানে আসতে মন চাইত না তার হেতু বোঝা গেল। দেখতে দেখতে সর্ব্বসন্তাপহর নিদ্রায় তাঁর সারারাত্রির সকল দুঃখ মুছে দিলে,—স্মৃতিরত্ন অচেতনপ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

এদিকে নন্দরাণী ভোর না হ'তেই উঠেচেন,—গুরুদেবের পরিচর্য্যায় লাগতে হবে। রাত্রে গুরুদেব জলযোগ মাত্র করেচেন—যদিচ তা গুরুতর—তবু মনের মধ্যে ক্ষোভ ছিল, খাওয়া তেমন ভাল হয় নাই। আজ দিনের বেলা নানা উপাচারে তা ভরিয়ে তুলতে হবে।

নীচে নেমে এলেন, দেখেন দোর খোলা। গুরুদেব তাঁর আগে উঠেচেন ভেবে একটু লজ্জা বোধ হ'লো। ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখেন তিনি নেই, কিন্তু এ কি ব্যাপার! দক্ষিণ দিকের খাট উত্তর দিকে, তাঁর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা জানালা ছেড়ে মাঝখানে নেমেচে, কোশাকুশি, আসন প্রভৃতি পূজা-আহ্নিকের জিনিস-পত্রগুলো সব এলোমেলো স্থানভ্রষ্ট,—কারণ কিছুই বুঝলেন না। বাইরে এসে চাকরদের ডাকলেন,

তারা কেউ তখনও ওঠে নি। তবে একলা গুরুদেব গেলেন কোথায়? হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল—ওটা কি? এক কোণে আলো-অন্ধকারে মানুষের মত কি একটা বসে না! সাহসে ভর করে একটু কাছে গিয়ে ঝুঁকে দেখেন তাঁর গুরুদেব। অব্যক্ত আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠাকুরমশাই! ঠাকুরমশাই!

ঘুম ভেঙ্গে স্মৃতিরত্ন চোখ মেলে চাইলেন, তার পরে ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসলেন। নন্দরাণী ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় কেঁদে ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর-মশাই, আপনি এখানে কেন?

স্মৃতিরত্ন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারারাত দুঃখের আর পার ছিল না যে মা।

কেন বাবা?

নূতন বাড়ি করেচ বটে মা, কিন্তু ছাত কোথাও আর আস্ত নেই। সারারাতের বৃষ্টি-বাদল বাইরে ত পড়েনি, পড়েচে আমার গায়ের উপর। খাট টেনে যেখানে নিয়ে যাই সেইখানেই পড়ে জল। পাছে ছাত ভেঙ্গে মাথায় পড়ে, পালিয়ে এলাম বাইরে, কিন্তু তাতেও কি রক্ষা আছে মা, পঙ্গপালের মত ডাঁশ-মশা ঝাঁকে ঝাঁকে সমস্ত রাত্রি যেন ছুবলে খেয়েচে—এধার থেকে ছুটে ওধার যাই, আবার ওধার থেকে ছুটে এধারে আসি। গায়ের অর্দ্ধেক রক্ত বোধ করি আর নেই মা।

বহু প্রয়াস, বহু সাধ্য-সাধনায় ঘরে আনা বৃদ্ধ গুরুদেবের অবস্থা দেখে নন্দরাণীর দু'চোখ অশ্রু-সজল হয়ে উঠল, বললেন, কিন্তু বাবা, বাড়িটা যে তেতলা, আপনার ঘরের উপর আরও যে দুটো ঘর আছে, বৃষ্টির জল তিন তিনটে ছাদ ফুঁড়ে নামবে কি করে? কিন্তু বলতে বলতেই তাঁর সহসা মনে হলো এ হয়ত ঐ শয়তান লালুর কোন রকম শয়তানি বুদ্ধি। ছুটে গিয়ে বিছানা হাতড়ে দেখেন মাঝখানের চাদর অনেকখানি ভিজে এবং মশারি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরচে। তাড়াতাড়ি নামিয়ে নিয়ে দেখতে পেলেন ন্যাকড়ায় বাঁধা এক চাঙড়া বরফ, সবটা গলেনি, তখনও এক টুকরো বাকী আছে। পাগলের মত ছুটে বাইরে গিয়ে চাকরদের যাকে সুমুখে পেলেন চেঁচিয়ে হুকুম দিলেন,—হারামজাদা লেলো কোথায়? কাজ-কর্ম চুলোয় যাক গে, বজ্জাতটাকে যেখানে পাবি মারতে মারতে ধরে আন্।

লালুর বাবা সেইমাত্র নীচে নামছিলেন, স্ত্রীর কাণ্ড দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন, —কি কাণ্ড করচ? হলো কি?

নন্দরাণী কেঁদে ফেলে বললেন, হয় তোমার ঐ লেলোকে বাড়ি থেকে তাড়াও, না হয় আজই আমি গঙ্গায় ডুবে এ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করব।

কি করলে সে?

বিনা দোষে গুরুদেবের দশা কি করেচে চোখে দেখোসে। তখন সবাই গেলেন ঘরে। নন্দরাণী সব বললেন, সব দেখালেন। স্বামীকে বললেন, এ দস্যি ছেলেকে নিয়ে ঘর করব কি করে তুমি বল ?

গুরুদেব ব্যাপারটা সমস্ত বুঝলেন। নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় বৃদ্ধ হাঃ হাঃ করে হেসে ফেললেন।

লালুর বাবা আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চাকররা এসে বললে, লালুবাবু কোঠি মে নহি হ্যায়। আর একজন এসে জানাল সে মাসীমার বাড়িতে বসে খাবার খাচ্ছে। মাসীমা তাকে আসতে দিলেন না।

মাসীমা মানে নন্দর ছোট বোন। তার স্বামীও উকীল, সে অন্য পাড়ায় থাকে।

এর পরে লালু দিন-পনেরো আর এ বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিলে না।

কলকাতার নতুন-দা

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায় শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, "—তে থিয়েটার হবে যাবি ?"

থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম।

ইন্দ্র কহিল, "তবে কাপড় পরে শীগগির আমাদের বাড়ি আয়।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, "তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব।"

আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ, গঙ্গার উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতেই পারা যাইবে না।

ইন্দ্র কহিল, "ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে, দেরি হবে না, আমার নতুন-দা কোলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।"

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়া আছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রের নতুন-দা ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কোলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চকচকে পাম্প-সু, আগা-গোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত যাচ্ছেতাই বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

"তোর নাম কি রে?"

ভয়ে ভয়ে বলিলাম,—"শ্রীকান্ত।"

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, "আবার শ্রী—কান্ত! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ্। ইন্দ্র, হুকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে, তামাক সাজুক!"

ওরে বাবা, মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজচি।"

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ তিনি ইন্দ্রর মাসতুতো ভাই, কোলকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল. এ. পাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে তিনি প্রসন্ন মুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, "তুই থাকিস্ কোথায় রে কান্তে? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়! ফুটচে—পেতে দে দেখি, বসি।"

"আমি দিচ্চি, নতুন-দা। আমার শীত করচে না এই নাও"—বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়—আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, "নতুন-দা, এ যে ভারী মুস্কিল হলো—হাওয়া পড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।"

নতুন-দা জবাব দিলেন, "এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক।"

কলিকাতাবাসী নতুন-দাদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, "দাঁড়! কারুর সাধ্যি নেই, নতুন-দা, এ স্রোত ঠেলে উজান বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।"

প্রস্তাব শুনিয়া নতুন-দা একমুহূর্ত্তেই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, "তবে আনলি কেন হতভাগা? যেমন করে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে। তারা বিশেষ করে ধরেচে।"

ইন্দ্র কহিল, "তাদের বাজাবার লোক আছে নতুন-দা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।"

"না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়াম! চল্, যেমন করে পারিস্ নিয়ে চল্।" বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ইহার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সে-কথার আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, "ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না?"

কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকিয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁত-মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। বলিলেন, "তবে যাও না, টানো গে না হে! জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন?"

তার পরে, একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাহাড়ের উপর দিয়া, কখনো বা নিচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জল ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করতে পারবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেল, "না খুলে—"

"হাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি করে ফেলি আর কি?—নে—যা করচিস্ কর্।"

বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ; সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম। পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে এক ফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভারকোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে-চড়িলে

কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন। আরও বিপদ—গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রাম বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল; এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছাইতে রাত্রি দুটো বাজিয়া যাইবে শুনিয়া বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারটা, তখন কোলকাতার বাবু প্রায় কাবু হইয়া বলিলেন, "হাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টা-মোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?"

ইন্দ্র কহিল, "সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুন-দা, সব জিনিস পাওয়া যায়।"

"তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাস্‌নে? ইন্দ্র, বল না তোর ঐ ওটাকে একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক।"

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে পাড়টা ঢালু এবং বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সঙ্কীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দু'জনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু বলিলেন, "হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার।"

অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দু'জনে তাঁহার ক্ষুধা শান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম, এত রাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ, তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, "চল না নতুন-দা, একলা তোমার ভয় করবে,—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে, এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।"

নতুন-দা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, "ভয়! আমরা দর্জ্জিপাড়ার ছেলে—যমকে ভয় করিনে তা জানিস্! কিন্তু তা বলে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়।" অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিতেও আমি কিছুতেই একাকী লোকটির সংসর্গে থাকিতে রাজি হইলাম না। ইন্দ্রের সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জ্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন,—"ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা—"

আমরা অনেকদূর পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি-সুরে সঙ্গীতচর্চ্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম।

ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, "এরা কোলকাতার লোক কি-না, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করিতে পারে না—বুঝলি শ্রীকান্ত!"

আমি বলিলাম,—"হুঁ।"

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দিতে দিতে চলিল। অতি অচিরেই বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটী হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক, এতদিন পরে এখন তিনি কোথাকার ডেপুটী কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন, না হইলে বাঙালী ডেপুটীর মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনিতে পাই কি করিয়া? তখন তাঁহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন আর কোনকালে নয়। অথচ, ঘণ্টা-কয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না, তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে,—না হইলে, বহু পূর্ব্বেই সংসারটা রীতিমত একটি পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলের পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রের জানা ছিল। সে গিয়া মুদির দোকানে উপস্থিত হইল, কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানদার শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন! এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী, সে-কথা যাহার জানা নাই তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী, নিষ্কর্ম্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত, কন্যাদায়গ্রস্থ বাঙালী গৃহস্থও নয়, সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চার-পাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধু মাত্র চেঁচামেচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জ্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্ত্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া আধঘণ্টা

পরে রিক্ত-হস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যত-দূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জ্জিপাড়া'র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দুইজনে প্রাণপণে চিৎকার করিলাম—"নতুন-দা!" কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারে'র জালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথাই বলিয়া বসিল,—"বাঘে নিলে না ত রে!" ভয়ে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল কিছুদূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু'র এক-পাটি। ইন্দ্র সেই ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল—"শ্রীকান্ত রে আমার মাসীমাও এসেচেন যে! আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না।"

তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদির দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিলাম, তখন এইদিকের কুকুরগুলার যে সমবেত আর্ত্ত-চীৎকার আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। এখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে, নেকড়েগুলো তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া যেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলো এখনো চেঁচাইয়া মরিতেছে।

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি যাব।"

আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম, "পাগল হয়েচ ভাই!"

ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ হাতে লইয়া কহিল, "তুই থাক্ শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস্—আমি চললুম।"

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ দুটো জ্বলিতে লাগিল, তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না—সে যাইবেই। ভয়ের সহিত চির-অপরিচিত,

তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া কি বলিয়া বাধা দিব! যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা হোক হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "তুই ক্ষেপেচিস্ শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?"

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া একমুহূর্ত্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোন মতে গোপন করিয়া বলিলাম, "তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?"

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুন-দাকে আনতে চাইনি। কিন্তু, একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।"

কিন্তু আমারও যাওয়া চাই। কারণ, পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম এবং আর বাক্‌বিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম।

ইন্দ্র কহিল, "বালির উপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার সে চেষ্টা করিসনে। জলে গিয়ে পড়বি।"

সুমুখে একটা বালির উপরে ঢিপি ছিল। সেইটাই অতিক্রম করিয়া দেখা গেল, অনেকদূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ৫।৭টা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া, বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই। সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালো-পানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল—"নতুন-দা!"

নতুন-দা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্ত স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—"এই যে আমি।"

দু'জনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম, কুকুরগুলা সরিয়া দাঁড়াইল এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠ-নিমজ্জিত মূর্চ্ছিতপ্রায় তাহার দর্জ্জিপাড়ার মাসতুতো ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প-সু, গায়ে ওভার-কোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি;—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া "ঠুন্‌ঠুন্ পেয়ালা" ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব সেই সঙ্গীতচর্চ্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলা দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই অভূতপূর্ব্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল।

এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং এই দুর্দ্দান্ত শীতের রাত্রে তুষার-শীতল জলে

আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্দ্ধ-ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও সে-রাত্রে আমাদিগকে কম মেহন্নত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, বাবু ডাঙ্গায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, "আমার এক পাটি পাম্প ?"

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই তিনি সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তারপরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃপুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে-রাত্রে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ফিরিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্ব্বোধের মত সে-সব তাহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধূলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এ-সব কখনো চোখে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রাম বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাকে ইতিপূর্ব্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতে তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই-সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দু'টার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্ব্বে মূর্চ্ছিত হইতেছিলেন, সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে, পা মুছিতেও ঘৃণা হয় তাহা পুনঃপুনঃ শুনাইতে শুনাইতে ইন্দ্রর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে-যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্র-কবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকা-চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া এই দুর্জ্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুট মাত্র অবলম্বন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ি ফিরিয়া গেলাম।

———

বিভিন্ন রচনাবলী

স্মৃতিকথা

মনে হয়, পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে, মুক্তিসংগ্রামে বিদেশীয়ের অপেক্ষা দেশের সঙ্গেই মানুষকে বেশী লড়াই করতে হয়। এই লড়াইয়ের প্রয়োজন যেদিন শেষ হয়, শৃঙ্খল আপনি খসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজন শেষ হইল না, দেশবন্ধু দেহত্যাগ করিলেন। ঘরে-বাহিরে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করার গুরুভার তাঁহার আহত, একান্ত পরিশ্রান্ত দেহ আর বহিতে পারিল না।

আজ চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে, ঠিক এতবড় কান্নারই প্রয়োজন ছিল।

তাঁহার আয়ুষ্কাল যে দ্রুত শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমরাও জানিতাম, তিনি নিজেও জানিতেন।

সেদিন পাটনায় যাইবার পূর্ব্বে আমায় ডাকাইয়া পাঠাইলেন। শয্যাগত; আমি কাছে গিয়া বসিতে বলিলেন, এবার final শরৎবাবু।

বলিলাম, আপনি যে স্বরাজ চোখে দেখিয়া যাইবেন বলিয়াছিলেন?

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তার আর সময় হইল না।

তিনি যখন জেলে, তখন জন-কয়েক লোক প্রাচীরের গায়ে নমস্কার করিতেছিল। জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের দেশবন্ধু এই জেলের মধ্যে, তাঁহাকে চোখে দেখিবার জো নাই, আমরা তাই জেলের পাঁচিলে তাঁকে প্রণাম করিতেছি। এ-কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, এরা আপনাকে ছাড়িয়া দিবে কেন?

দুই চোখ তাঁহার ছল ছল করিয়া আসিল, কয়েক মুহূর্ত্ত তিনি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া অন্য কথা পাড়িলেন! মিনিট ২০ পরে ডাক্তার দাশগুপ্ত ঘরের কোণ হইতে আমার মোটা লাঠিটা আনিয়া আমার হাতে দিলে, তিনি হাসিয়া বলিলেন, ইঙ্গিতটা বুঝেচেন শরৎবাবু? এরা আমাদের একটুখানি গল্প করতেও দিতে চায় না।

এ গল্পের আর আমাদের অবসর মিলিল না।

লোক বলিতেছে, এতবড় দাতা, এতবড় ত্যাগী দেখি নাই। দান হাত পাতিয়া লওয়া যায়, ত্যাগ চোখে দেখা যায়, ইহা সহজে কাহারও দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু হৃদয়ের নিগূঢ় বৈরাগ্য? বাস্তবিক, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের মধ্যেও এতবড় বৈরাগী আর আমি দেখি নাই। ঐশ্বর্য্যে যাহার প্রয়োজন ছিল না, ধন-সম্পদের মূল্য যে কোন-

মতেই উপলব্ধি করিতে পারিল না, সে টাকাকাড়ি দুই হাতে ছড়াইয়া ফেলিবে না ত ফেলিবে কে? একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, লোকে ভাবে, আমি ব্যক্তিবিশেষের প্রভাবে পড়িয়া ঝোঁকের মাথায় প্র্যাকটিস ছাড়িয়াছি। তাহারা জানে না যে, এ আমার বহুদিনের একান্ত বাসনা, ত্যাগের ছল করিয়াই ত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল, সামান্য কিছু টাকা হাতে রাখিব, কিন্তু এ যখন ভগবানের ইচ্ছা নহে, তখন এই আমার ভাল।

কিন্তু এই বিরাট ত্যাগের নিভৃত অন্তরালে আর একজন আছেন—তিনি বাসন্তী দেবী। একদিন উর্ম্মিলা দেবী আমাকে বলিয়াছিলেন, দাদার এতবড় কাজের মধ্যে আর একজনের হাত নিঃশব্দে কাজ করে, সে আমাদের বৌ। নইলে দাদা কতখানি কি করতে পারতেন, আমার ভারী সন্দেহ হয়। বাস্তবিক, নন-কো-অপারেশনের প্রথম হইতে ত অনেককেই দেখিলাম, কিন্তু সমস্ত-কিছুর আগোচরে এমন আড়ম্বরহীন শান্ত দৃঢ়তা, এমন ধৈর্য্য, এমন সদাপ্রসন্ন স্নিগ্ধ মাধুর্য্য আর আমার চোখে পড়ে নাই। একান্ত পীড়িত স্বামীকে সেদিন শেষবারের মত কাউন্সিল-ঘরে তিনিই পাঠাইয়াছিলেন। ডাক্তারদের ডাকিয়া বলিলেন, গাড়ি হউক, স্ট্রেচার হউক, যা হউক একটা তোমরা বন্দোবস্ত করিয়া দাও। উনি যখন মন-স্থির করিয়াছেন, তখন পৃথিবীতে কোন শক্তি নাই ওঁকে আটকায়। হাঁটিয়া যাইবার চেষ্টা করিবেন, তার ফলে তোমরা রাস্তার মাঝখানেই ওঁকে হারাইবে।

অথচ নিজে সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, পথের দিকে চাহিয়া সারাদিন চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। ইংরেজীতে যাহাকে বলে, scene create করা, এই ছিল তাঁহার সবচেয়ে বড় ভয়। সর্ব্বলোকের চক্ষু তাঁহাতে আকৃষ্ট হওয়ার কল্পনামাত্রেই তিনি সঙ্কুচিত হইয়া উঠেন। আজ এইটিই হইতেছে ভারতের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। গৃহে গৃহে যতদিন না এমনই সাধ্বী, এমনই লক্ষ্মী জন্মগ্রহণ করিবে, ততদিন দেশের মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

আজ চিত্তরঞ্জনের দীপ্তিতে বাঙ্গলার আকাশ ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দীপের যে অংশটা শিখা হইয়া লোকের চোখে পড়ে, তাহার জ্বলার ব্যাপারে কেবল সেইটুকুই তাহার সমস্ত ইতিহাস নহে। তাই মনে হয়, সন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জনকে রিক্ত করিয়া লইতেও ভগবান যেমন দ্বিধা করেন নাই, যখন দিয়াছিলেন তখন কৃপণতাও তেমনিই করেন নাই!

অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং উপলক্ষে কোথাও দূর পাল্লায় যাইবার প্রয়োজন হইলেই, আমার কেমন দুর্ভাগ্য, ঠিক পূর্ব্বক্ষণেই আমার কিছু না কিছু

একটা মস্ত অসুখ করিত। সেবার দিল্লী যাইবার আগের দিন দেশবন্ধু আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, কাল আপনার সঙ্গে ঊর্ম্মিলা যাবেন।

আমি বলিলাম, যে আজ্ঞা, তাই হবে।

দেশবন্ধু কহিলেন, হবে ত বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পরে গাড়ি, কাল বিকাল নাগাদ আপনার অসুখ করবে বলে মনে হচ্ছে না ত?

আমি বললাম, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, শত্রুপক্ষীয়রা আপনার কাছে আমার দুর্নাম রটনা করেচে।

তিনি কহিলেন, তা করেচে বটে, কিন্তু আপনি বিছানায় শোন, এরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণও ত কই নেই!

আমার সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল। সে বেচারা বি. এ. পর্য্যন্ত পড়িয়াও চাকুরি পায় নাই। বড়বাবুর কাছে আবেদন করায় তিনি রাগিয়া বলিয়াছিলেন যাকে চাকরি দিয়েচি, তার কোয়ালিফিকেসন্ বেশী, সে বি. এ. ফেল।

প্রত্যুত্তরে ছেলেটি সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, আজ্ঞে, একজামিন দিলে কি আমি তার মত ফেল করতেও পারতাম না?

আমিও দেশবন্ধুকে বলিলাম, আমার যোগ্যতা অল্প, তারা আমাকে নিন্দা করে জানি; কিন্তু আমার শুয়ে থাকবার যোগ্যতাও নেই, এ অপবাদ আমি কিছুতেই নিঃশব্দে মেনে নিতে পারব না।

দেশবন্ধু সহাস্যে কহিলেন, না, আপনি রাগ করবেন না, আপনার সে যোগ্যতা তারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে।

গয়া কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আভ্যন্তরিক মতভেদ ও মনোমালিন্যে তখন চারিদিক আমাদের মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এই বাঙ্গলাদেশে ইংরেজী বাংলা যতগুলি সংবাদপত্র আছে, প্রায় সকলেই কণ্ঠ মিলাইয়া সমস্বরে তাঁহার স্তবগান শুরু করিয়া দিল, তখন একাকী তাঁহাকে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন করিয়া যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি, জগতের ইতিহাসে বোধ করি তাহার আর তুলনা নাই। একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সংসারে কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই কি আপনাকে দমাইতে পারে না? দেশবন্ধু একটুখানি হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা হলে কি আর রক্ষা ছিল? পরাধীনতার যে আগুন এই বুকের মাঝে অহর্নিশি জ্বলচে, সে ত এক মুহূর্ত্তে আমাকে ভস্মসাৎ করে দিত।

লোক নাই, অর্থ নাই, হাতে একখানা কাগজ নাই, অতি ছোট যাহারা তাহারাও গালিগালাজ না করিয়া কথা কহে না, দেশবন্ধুর সে কি অবস্থা! অর্থাভাবে

আমরা অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিতাম, শুধু অস্থির হইতেন না তিনি নিজে। একটা দিনের কথা মনে পড়ে। রাত্রি তখন নয়টাই হইবে কি দশটা হইবে, বাহিরে জল পড়িতেছে, আর আমি, সুভাষ ও তিনি শিয়ালদহের কাছে এক বড়লোকের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি কিছু টাকার আশায়। আমি অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলাম, গরজ কি একা আপনারই? দেশের লোক সাহায্য করিতে যদি এতটাই বিমুখ হয়ে উঠে ত তবে থাক্।

মন্তব্য শুনিয়া বোধ হয় দেশবন্ধু মনে মনে ক্ষুন্ন হইলেন। বলিলেন, এ ঠিক নয় শরৎবাবু। দোষ আমাদেরই, আমরাই কাজ করিতে জানিনে, আমরাই তাঁদের কাছে আমাদের কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারিনে। বাঙ্গালী ভাবুকের জাত, বাঙ্গালী কৃপণ নয়। একদিন যখন সে বুঝবে, তার যথাসর্ব্বস্ব এনে আমাদের হাতে ঢেলে দেবে। এই-সকল কথা বলিতে গেলেই উত্তেজনায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিত। এই বাঙ্গলাদেশ ও এই বাঙ্গলাদেশের মানুষকে তিনি কি ভালই বাসিতেন, কি বিশ্বাসই করিতেন। কিছুতেই যেন আর তাহাদের ত্রুটি খুঁজিয়া পাইতেন না।

এ-কথার আর উত্তর কি, আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আজ মনে হয়, বাস্তবিক এতখানি ভাল না বাসিলে এই অপরিসীম শক্তিই বা তিনি পাইতেন কোথায়? লোক কাঁদিতেছে,—মহতের জন্য দেশের লোক ইতিপূর্ব্বে আরও অনেক-বার কাঁদিয়াছে, সে আমি চিনি। কিন্তু এ সে নয়! একান্ত প্রিয় একান্ত আপনার জনের জন্য মানুষের বুকের মধ্যে যেমন জ্বালা করিতে থাকে, এ সেই। আর আমরা যাহারা তাহার আশে-পাশে ছিলাম, আমাদের ভয়ানক দুঃখ জানাইবার ভাষাও নাই, পরের কাছে জানাইতে ভালও লাগে না। আমাদের অনেকেরই মন হইতে দেশের কাজ করার ধারণাটা যেন ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আমরা করিতাম দেশবন্ধুর কাজ। আজ তিনি নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া এই কথাই মনে হইতেছে, কি হইবে আর কাজ করিয়া? তাঁহার সব আদেশই কি আমাদের মনঃপুত হইত? হায় রে, রাগ করিবার অভিমান করিবার জায়গাও আমাদের ঘুচিয়া গেছে। যেখানে এবং যাহাকে বিশ্বাস করিতেন, সে বিশ্বাসের আর সীমা ছিল না। যেন একেবারে অন্ধ! ইহার জন্য আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সহস্র প্রমাণ প্রয়োগেও এ বিশ্বাস টলাইবার জো ছিল না।

সেদিন বরিশালের পথে স্টিমারে, ঘরের মধ্যে আলো নিভানো, আমি মনে করিয়াছিলাম, পাশের বিছানায় দেশবন্ধু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, অনেক রাত্রিতে হঠাৎ ডাকিয়া বলিলেন, শরৎবাবু, ঘুমাইয়াছেন?

বলিলাম, না।

তবে চলুন, ডেকে গিয়ে বসি গে।

বলিলাম, ভয়ানক পোকার উৎপাত।

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্‌ করার চেয়ে সে ঢের সুসহ। চলুন।

দুইজন ডেকে আসিয়া বসিলাম। চারিদিক নিবিড় অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তারা দেখা যায়, নদীর অসংখ্য বাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্টিমার চলিয়াছে, তাহার দূরপ্রসারী সার্চ্চলাইটের আলো কখনও বা তীরে বাঁধা ক্ষুদ্র নৌকার ছাতে, কখনও বা তরুশিরে, কখনও বা জেলেদের কুটীরের চূড়ায় গিয়া পড়িতেছে। দেশবন্ধু বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, শরৎবাবু নদীমাতৃক কথাটার সত্যকার অর্থ যে কি, এ-দেশে যারা না জন্মায়, তারা জানেই না। এ আমাদের চাই-ই চাই।

এ-কথার তাৎপর্য্য বুঝিলাম, কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার পরে তিনি একা কত কথাই না বলিয়া গেলেন। আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। উত্তরের প্রয়োজন ছিল না; কারণ সে-সকল প্রশ্ন নহে, একটা ভাব। তাঁহার কবি-চিত্ত কি হেতু জানি না, উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি চরকা বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করচেন, সে বিশ্বাস করিনে।

কেন করেন না?

বোধ হয় অনেকদিন অনেক চরকা কেটেচি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই ভারতবর্ষে ত্রিশ কোটি লোকের পাঁচ কোটি লোকও যদি সুতো কাটে ত ষাট কোটি টাকার সুতো হতে পারে।

বলিলাম, পারে। দশ লক্ষ লোক মিলে একটা বাড়ি তৈরীতে হাত লাগালে দেড় সেকেণ্ডে হতে পারে। হয়, আপনি বিশ্বাস করেন?

দেশবন্ধু বলিলেন, এ দুটো এক বস্তু নয় কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেচি,—সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু তবুও আমি বিশ্বাস করি। আমার ভারী ইচ্ছে হয় যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোনরকম হাতের কাজেই আমার কোন পটুতা নেই।

বলিলাম, ভগবান আপনাকে রক্ষা করেচেন।

দেশবন্ধু হাসিলেন, বলিলেন, আপনি হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

দেশবন্ধু বলিলেন, আপনার মুসলমান-প্রীতি অতি প্রসিদ্ধ।

ভাবিলাম, মানুষের কোন সাধু ইচ্ছাই গোপন থাকিবার জো নাই, খ্যাতি এতবড় কানে আসিয়াও পৌঁছিয়াছে! কিন্তু নিজের প্রশংসা শুনিলে চিরদিনই আমার লজ্জা করে, তাই সবিনয়ে বদন নত করিলাম।

দেশবন্ধু কহিলেন, কিন্তু এছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারেন? এরই মধ্যে তারা সংখ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বেড়ে গেছে, আর দশ বছর পরে কি হবে বলুন ত?

বলিলাম, এটা যদিও ঠিক মুসলমান-প্রীতির নিদর্শন নয়, অর্থাৎ বছর-দশেক পরের কথা কল্পনা করে আপনার মুখ যেমন সাদা হয়েচে, তাতে আমার নিজের সঙ্গে আপনার খুব বেশী তফাৎ মনে হচ্চে না। তা সে যাই হোক, কেবলমাত্র সংখ্যাই আমার কাছে মস্ত জিনিস নয়। তা হলে চার কোটি ইংরেজ দেড়শ কোটি লোকের মাথায় পা দিয়ে বেড়াতে পারত না। নমঃশূদ্র, মালো, নট, রাজবংশী, পোদ, এদের টেনে নিন, দেশের মধ্যে, দশের মধ্যে এদের একটা মর্য্যাদার স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়ে এদের মানুষ করে তুলুন, মেয়েদের প্রতি যে অন্যায়, নিষ্ঠুর, সামাজিক অবিচার চলে আসচে, তার প্রতিবিধান করুন, ও-দিকের সংখ্যার জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির লাঞ্ছনার কথায় তাঁহার বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইতে থাকিত। কে নাকি একবার তাঁহাকে বলিয়াছিল, দেশবন্ধু শব্দের আর একটা অর্থের নাম চণ্ডাল। এই কথায় তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজে উচ্চকুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, উচ্চজাতির দেওয়া বিনা-দোষের এই অপমানের গ্লানি নিপীড়িতদের সহিত সমভাগে ভোগ করিবার জন্য প্রাণ তাঁর আকুল হইয়া উঠিত। ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আপনারা দয়া করে আমাকে এই 'পলিটিক্সে'র বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে দিন, আমি ওই ওদের মধ্যে গিয়ে থাকিগে। আমি ঢের কাজ করতে পারব। এই বলিয়া তিনি ইহাদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া হিন্দু-সমাজ কত অত্যাচার করিতেছে, তাহাই এক একটা করিয়া বলিতে লাগিলেন। কহিলেন, বেচারাদের ধোপা-নাপিত নেই, ঘরামীরা ঘর ছেয়ে দেয় না। অথচ এরাই মুসলমান খ্রীষ্টান হয়ে গেলে আবার তারাই এসে এদের কাজ করে। অর্থাৎ হিন্দুরাই প্রকারান্তরে বলচে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান খ্রীষ্টানই বড়। এ-রকম senseless সমাজ মরবে না ত মরবে কে? এই বলিয়া বহুক্ষণ স্থির থাকিয়া সহসা প্রশ্ন করিলেন, আপনি আমাদের অহিংস-অসহযোগ বিশ্বাস করেন ত?

বললাম, না। অহিংস সহিংস কোন অসহযোগেই আমার বিশ্বাস নেই।

দেশবন্ধু সহাস্যে কহিলেন, অর্থাৎ আমাদের মধ্যে দেখচি, কোথাও লেশমাত্র মতভেদ নেই।

আমি প্রত্যুত্তরে কহিলাম, একদিন কিন্তু যথার্থই লেশমাত্র মতভেদ থাকবে না, আমি এই আশাতেই আছি। ইতিমধ্যে যতটুকু শক্তি, আপনার কাজ করে দিই। আর শুধু মত নিয়েই বা হবে কি, বসন্ত মজুমদার, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় এঁরা ত দেশের বড় কর্ম্মী, কিন্তু ইংরাজের প্রতি বসন্তর বিঘূর্ণিত রক্তচক্ষুর অহিংস দৃষ্টিপাত এবং শ্রীশের প্রেমসিক্ত বিদ্বেষবিহীন মেঘগর্জ্জন,—এই দুটি বস্তু দেখলে এবং শুনলে আপনারও সন্দেহ থাকবে না যে, মহাত্মাজীর পরে অহিংস অসহযোগ যদি কোথাও স্থিতি লাভ করে থাকে, ত এই দুটি বন্ধুর চিত্তে। অথচ, এত বেশী কাজই বা কয়জনে করেচে? অসহযোগ আন্দোলনের সার্থকতা ত গণসাধারণ, অর্থাৎ mass-এর জন্য? কিন্তু এই mass পদার্থটির প্রতি আমার অতিরিক্ত শ্রদ্ধা নেই। একদিনের উত্তেজনায় এরা হঠাৎ কিছু একটা করে ফেলতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিনের সহিষ্ণুতা এদের নেই। সে-বার দলে দলে এরা জেলে গিয়েছিল, কিন্তু দলে দলে ক্ষমা চেয়ে ফিরেও এসেছিল। যারা আসেনি তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা। তাই আমার সমস্ত আবেদন-নিবেদন এদের কাছে। ত্যাগের দ্বারা কেউ কোনদিন যদি দেশ স্বাধান করতে পারে, ত শুধু এরাই পারবে।

এইখানে দেশবন্ধুর বোধ করি একটা গোপন ব্যথা ছিল, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু জেলের কথায় তাঁহার আর একটা প্রকাণ্ড ক্ষোভের কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, এ দুরাশা আমার কোনদিন নেই যে, দেশ একেবারে একলাফে পুরো স্বাধীন হয়ে যাবে। কিন্তু আমি চাই স্বরাজের একটা সত্যকার ভিত্তি স্থাপন করতে। আমি তখন জেলের মধ্যে, বাইরে বড়লাট প্রভৃতি এঁরা, ওদিকে সাবরমতি আশ্রমে মহাত্মাজী,—তাঁর কিছুতেই মত হ'লো না, অতবড় সুযোগ আমাদের নষ্ট হয়ে গেল। আমি বাইরে থাকলে কোনমতেই এতবড ভুল করতে দিতাম না। অদৃষ্ট! তাঁর লীলা।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছিল, বলিলাম, শুতে যাবেন না? চলুন।

চলুন, বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এই রেভোলিউশনারীদের সম্বন্ধে আপনার যথার্থ মতামত কি?

সম্মুখের আকাশ ফর্সা হইয়া আসিতেছিল, তিনি রেলিং ধরিয়া কিছুক্ষণ উপরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, এদের অনেককে আমি অত্যন্ত

ভালবাসি, কিন্তু এদের কাজ দেশের পক্ষে একেবারে ভয়ানক মারাত্মক। এই অ্যাক্‌টিভিটিতে সমস্ত দেশ অন্ততঃ পঁচিশ বছর পেছিয়ে যাবে। তা ছাড়া এর মস্ত দোষ এই যে, স্বরাজ পাবার পরেও এ জিনিস যাবে না, তখন আরও স্পর্দ্ধিত হয়ে উঠবে, সামান্য মতভেদে একেবারে 'সিভিল ওয়ার' বেধে যাবে। খুনোখুনি রক্তারক্তি আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, শরৎবাবু।

কিন্তু এই কথাগুলি তিনি যখনই যতবার বলিয়াছেন, ইংরেজী খবরের কাগজ-ওয়ালারা বিশ্বাস করে নাই, উপহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, রাত্রিশেষের আলো-অন্ধকার আকাশের নীচে, নদীবক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সত্য ছাড়া আর কোন বাক্যই বাহির হয় নাই।

বহুদিন পরে আর একদিন রাত্রিতে তাঁহার মুখ হইতে এমনই অকপট সত্য-উক্তি বাহির হইতে আমি শুনিয়াছি। তখন রাত্রি বোধ হয় আটটা বাজিয়া গিয়াছে, আচার্য্য রায়মহাশয়কে বাড়িতে পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, দেশবন্ধু সিঁড়ির উপর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলাম, একটা কথা বলব, রাগ করবেন না?

তিনি বলিলেন, না।

আমি বলিলাম, বাঙ্গলাদেশে আপনারা এই যে কয়জন সত্যকার বড়লোক আছেন, তা পরস্পরের সন্দর্শনমাত্রই আপনারা পুলকে যে-রকম রোমাঞ্চিত-কলেবর হয়ে ওঠেন—

দেশবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, বেড়ালের মত?

বলিলাম, পাপ-মুখে ও আর আমি ব্যক্ত করব কি করে। কিন্তু কিছু একটা না হলে—

দেশবন্ধুর মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, কত যে ক্ষতি হয়, সে আমার চেয়ে বেশী আর কে জানে? কেউ যদি এর পথ করে দিতে পারে, ত আমি সকলের নীচে, সকলের তাঁবে কাজ করতে রাজি আছি। কিন্তু ফাঁকি চলবে না, শরৎবাবু।

সেদিন তাঁহার মুখের উপর অকৃত্রিম উদ্বেগের যে লেখা পড়িয়াছিলাম, সে আর ভুলিবার নহে। বাহির হইতে যাহারা তাঁহাকে যশের কাঙাল বলিয়া প্রচার করে, তাহারা না জানিয়া কতবড় অপরাধই না করে! আর ফাঁকি? বাস্তবিক, যে লোক তাঁহার সর্ব্বস্ব দিয়াছে, বিনিময়ে সে ফাঁকি সহিবে কি করিয়া?

আর একটা কথা বলিবার আছে। কথাটা অপ্রীতিকর। সতর্কতা ও অতি-বিজ্ঞতার দিক দিয়া একবার ভাবিয়াছিলাম, বলিয়া কাজ নাই, কিন্তু পরে মনে

হইয়াছে, তাঁহার স্মৃতির মর্য্যাদা ও সত্যের জন্য বলাই ভাল। একবার ফরিদপুরে 'কন্‌ফারেন্সে' আমি যাই নাই, তখনকার সব খুঁটিনাটি আমি জানি না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া অনেকে আমার কাছে এমন সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে,—যাহা প্রিয় নহে, সাধুও নহে। অধিকাংশই ক্ষোভের ব্যাপার এবং দেশবন্ধু সম্বন্ধে তাহা একেবারেই অসত্য।

দেশের মধ্যে রেভোলিউশনারী ও গুপ্ত-সমিতির অস্তিত্বের জন্য কিছুকাল হইতে তিনি নানা দিক দিয়া নিজেকে বিপন্ন জ্ঞান করিতেছিলেন। তাঁহার মুস্কিল হইয়াছিল এই যে, স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা বলি স্বরূপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের একান্তভাবে না ভালবাসাও তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল, তাঁহাদের প্রশ্রয় দেওয়াও তাঁহার পক্ষে তেমনই অসম্ভব ছিল। তাঁহাদের চেষ্টাকে দেশের পক্ষে নিরতিশয় অকল্যাণের হেতু জ্ঞান করিয়া তিনি অত্যন্ত ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সমিতিকে উদ্দেশ করিয়া আমাকে একদিন বাংলায় একটা appeal লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। আমি লিখিয়া আনিলাম, "যদি তোমরা কোথাও কেহ থাকো, যদি তোমাদের মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতেও না পারো, ত অন্ততঃ ৫।৭ বৎসরের জন্যও তোমাদের কার্য্যপদ্ধতি স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রকাশ্যে সুস্থচিত্তে কাজ করিতে দাও। ইত্যাদি ইত্যাদি।" কিন্তু আমার 'যদি' কথাটায় তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'যদি'তে কাজ নেই। সাতাশ বৎসর ধরে 'assuming but not admitting' করে এসেচি, কিন্তু আর ফাঁকি নয়। আমি জানি তারা আছে, 'যদি' বাদ দিন।

আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম, আপনার স্বীকারোক্তির ফল দেশের উপর অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।

দেশবন্ধু জোর করিয়া বলিলেন, না। সত্য কথা বলার ফল কখনও মন্দ হয় না।

বলা বাহুল্য,আমি রাজি হইতে পারি নাই এবং আবেদনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাকে বলিয়াছিলেন, এ-সকল যারা করে তারা জেনে-শুনেই করে, কিন্তু যারা করে না কিছুই, গভর্ণমেণ্টের হাতে তারাই বেশী করে দুঃখ পায়। সুভাষ, অনিলবরণ, সত্যেন প্রভৃতির জন্য তাঁহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। সুভাষকে করপোরেশনে কাজ দিবার পরে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, I have sacrificed my best man for this corporation. এবং সেই সুভাষকেই যখন পুলিশ ধরিয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাঁহাকে সর্ব্বদিক দিয়া অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দিবার জন্যই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার হাত-পা কাটিয়া তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া আনিতেছে।

তাঁহার ফরিদপুর অভিভাষণের পরে মডারেটদলের লোক উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিল, আর ত কোনও প্রভেদ নাই, আইস, এখন কোলাকুলি করিয়া মিলিয়া যাই। ইংরাজী খবরওয়ালার দল তাঁহার 'জেস্চারের' অর্থ এবং অনর্থ করিয়া গালি দিল কি সুখ্যাতি করিল, ঠিক বুঝাই গেল না। তাঁহার নিজের দলের বহু লোক মুখ ভারী করিয়াই রহিল, কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমার একটা কথা বলিবার আছে।

অসাধারণ কর্ম্মীদের এই একটা বড় দোষ যে, তাঁহারা নিজেদের ভিন্ন অপরের কর্ম্মশক্তির প্রতি আস্থা রাখিতে পারেন না। এবার পীড়ায় যখন শয্যাগত, পরলোকের ডাক বোধ হয় যখন তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, শরৎবাবু compromise করতে যে শিখলে না, বোধ হয় এ-জীবনে সে কিছুই শিখলে না। Tory Government is the cruellest Government in the world. এরা না পারে পৃথিবীতে এমন অনাচার নেই। আবার মিটমাট করে নেবার পক্ষেও, বোধ করি এমন বন্ধু আর নেই। কিন্তু ভয় হয় আমি তখন আর থাকব না। জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

একবার একটা সভার পরে গাড়ির মধ্যে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অনেকে আমাকে আবার প্রাক্‌টিস্ করে দেশের জন্যে টাকা রোজগার করে দিতে পরামর্শ দেন। আপনি কি বলেন ?

আমি বলিলাম, না। টাকার কাজের শেষ আছে, কিন্তু এই আদর্শের আর অন্ত নেই। আপনার ত্যাগ চিরদিন আমাদের জাতীয় সম্পত্তি হয়েই থাক। এ আমাদের অসংখ্য টাকার চেয়েও ঢের বড।

দেশবন্ধু জবাব দিলেন না। হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এই হাসিটা এবং স্তব্ধতার মূল্য যেন আমরা বুঝিতে পারি,—ইহার চেয়ে বড় কামনা আর নাই।*

---

* ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আষাঢ়, দেশবন্ধু স্মৃতি-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত।

আমার কথা

হাওড়া জেলা কংগ্রেস-কমিটির আমি ছিলাম সভাপতি। আমি ও আমার সহকারী বা সহকর্ম্মী যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই পদত্যাগ করেছেন। এই কথাটা জানাবার জন্যেই আজকের এই সভার আয়োজন। নইলে সাড়ম্বরে বক্তৃতা শোনাবার জন্যে আপনাদের আহ্বান করে আনিনি। ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার এই ক্ষুদ্র শাখার যে কর্ম্মভার আমার প্রতি ন্যস্ত ছিল তা থেকে বিদায় নেবার কালে আপনাদের কাছেই মুক্তকণ্ঠে তার হেতু প্রকাশ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। একটা কথা উঠেছিল, চুপি চুপি সরে গেলেই ত হ'তো; এই লজ্জাকর ঘটনা এমন ঘটা করে জানাবার কি প্রয়োজন ছিল? আমার মনে হয় প্রয়োজন ছিল, মনে হয় নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে গেলে চক্ষুলজ্জাটা বাঁচত, কিন্তু তাতে সত্যকার লজ্জা চতুর্গুণ হয়ে উঠত। এর পরে, এ জেলায় কংগ্রেস কমিটি থাকবে কি থাকবে না, আমি জানি না। থাকতে পারে, না থাকাও বিচিত্র নয়; কিন্তু সে যাই হোক, ভেতরে যার ক্ষত, বাইরে তাকে অক্ষত দেখানোর পাপ আমি করতে চাইনে। এ একটা policy হতে পারে, কিন্তু ভাল policy বলে কোনমতেই ভাবতে পারিনে।

আমি কর্ম্মী নই, এ গুরুভারের যোগ্য আমি ছিলাম না। অক্ষমতার ক্ষোভ আমার মনের মধ্যে আছেই; কিন্তু যে ভার একদিন গ্রহণ করেছিলাম, আজ তাকে অকারণে বা নিছক স্বার্থের দায়ে ত্যাগ করে যাচ্ছি, যাবার সময় এ কলঙ্কও আমার প্রাপ্য নয়। আমার এই কথাটাই আজ আপনাদের একটু ধৈর্য্য ধরে শুনতে হবে।

আমার মনের মধ্যে হয়ত রূঢ় কথা কোথাও একটু থেকে যেতে পারে, হয়ত আমার অভিযোগের মধ্যে অপ্রিয় সুরও আপনাদের কানে বাজবে, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় যা সত্য বলে জেনেছি বা বুঝেছি, আপনাদের গোচর না করে আজ আমার ছুটি হতেই পারে না। কারণ, সত্য গোপন করা, আত্মবঞ্চনারই সমান। এক আশঙ্কা, প্রতিপক্ষের উপহাস ও বিদ্রূপ। কিন্তু নিজের কর্ম্মফলে তাই যদি অর্জ্জন করে থাকি, আমি ছাড়া সে আর কে নেবে? আর তা যদি না হয়ে থাকে, বিদ্রূপের হেতু যদি সত্যই না ঘটে থাকে ত ভয় কিসের? যথার্থ সম্মানের বস্তুকে যে মূঢ় অযথা ব্যঙ্গ করে; সমস্ত লজ্জা ত তারই। অতএব, এ সকল মিথ্যা দুশ্চিন্তা

আমার নেই। আমার একমাত্র চিন্তা অকপটে আপনাদের কাছে সমস্ত ব্যক্ত করা। কারণ, প্রতিকারের ইচ্ছা ও শক্তি আপনাদেরই হাতে। এই শেষ মুহূর্ত্তেও যদি একে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চান, সে শুধু আপনারাই পারেন।

পাঞ্জাব অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেড়েক পূর্ব্বে একদিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশজোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয়-জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিকে প্রচার করে বলেছিলাম, স্বরাজ চাই-ই চাই। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোনদিন প্রতিবিধান হতে পারবে না। কথাটা যে মূলতঃ সত্য, এ বোধ করি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতায় মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতবর্ষীয়দের হাতে থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে কেউ তাদের বঞ্চিত করে রাখে, সে-ই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও ত একটা কথা আছে, যাকে স্বীকার না করে পথ নেই;—সে হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য।

Right এবং Duty এই দুটো অনুপূরক শব্দ ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াতে পারে না, এ তো অবিসম্বাদী সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্বনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্মস্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্ত্তব্যের দায় নিয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাব এড়বড় অন্যায় অসঙ্গত দাবী,—এতবড় পাগলামী আর ত কিছু হতেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় হয়ে জন্মেছি বলেই ভারতের স্বাধীনতার অধিকার উচ্চকণ্ঠে দাবী করাও কোনমতেই সত্য হতে পারে না। এবং এ প্রার্থনা ইংরাজ কেন, স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বোধ করি মঞ্জুর করতে পারবেন না। এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই চিরনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার দিন আজ আমাদের এসেছে। এই ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার শুধু আমার কেন, পৃথিবীতে কেউ কখন পায়নি, পায় না, এবং আমার বিশ্বাস, কোনদিন কখনো কেউ পেতেও পারেন না। কর্ত্তব্যহীন অধিকারও অনধিকারের সমান। কাজ করব না, মূল্য দেব না, অথচ পাব, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারাই যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি, তা হলে নিশ্চয়ই বলছি আমি, কেবলমাত্র সমস্বরে ও প্রবলকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না।

একটুখানি অবিনয়ের অপবাদ নিয়ে বলতে হচ্ছে, বুড়ো হলেও চিরদিনের অভ্যাসে এ চোখের দৃষ্টি আমার আজও একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়নি। যা যা দেখছি, (অন্ততঃ এই হাওড়া জেলায় যা দেখেছি) তা নিছক এই ভিক্ষার চাওয়া, দাম না দিয়ে চাওয়া, ফাঁকি দিয়ে চাওয়া। মানুষের কাজ-কর্ম্ম, লোক-লৌকিকতা, আহার-বিহার, আমোদ-আহ্লাদ, সর্ব্বপ্রকারের সুখ-সুবিধের কোথাও যেন কোন ত্রুটি না ঘটে, পান থেকে একবিন্দু চূণ পর্য্যন্ত না খসতে পায়,—তার পরে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত-সমুদ্র উত্তীর্ণ করে দিয়ে আসা পর্য্যন্ত বল, যা হয় তা হোক, কোন আপত্তি নেই। আপত্তি তাদের না থাকতে পারে, কিন্তু ইংরাজের আছে। শতকরা পঁচানব্বই জন লোকের এই হাস্যাস্পদ চাওয়াটাকে সে যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, ভারতবাসী স্বরাজ চায় না,—সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা বলে ? যে ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী রাজত্ব বিস্তার করেছে দেশের জন্য প্রাণ দিতে যে এক নিমেষ দ্বিধা করে না, যে স্বাধীনতার স্বরূপ জানে, এবং পরাধীনতার লোহার শিকল মজবুত করে তৈরী করবার কৌশল যার চেয়ে বেশী কেউ জানে না,—তাকে কি কেবল ফাঁকি দিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে, গলায় এবং কলমে গালিগালাজ করে, তার ত্রুটি ও বিচ্যুতির অজস্র প্রমাণ ছাপার অক্ষরে সংগ্রহ করে, তাকে লজ্জা দিয়েই এতবড় বস্তু পাওয়া যাবে ? এ প্রশ্ন ত সকল তর্কের অতীত করে প্রমাণিত হয়ে গেছে, এই লজ্জাকর বাক্যের সাধনায় কেবল লজ্জাই বেড়ে উঠবে, সিদ্ধিলাভ কদাচ ঘটবে না।

আত্মবঞ্চনা অনেক করা গেছে, আর তাতে উদ্যম নেই। জড়ের মত নিশ্চল হয়ে জন্মগত অধিকারের দাবী জানাতেও আর যেমন আমার স্বর ফোটে না, পরের মুখেও তত্ত্বকথা শোনবার ধৈর্য্য আর আমার নেই। আমি নিশ্চয় জানি, স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার যদি কারও থাকে, ত সে মনুষ্যত্বের, মানুষের নয়। অন্ধকারের মাঝে আলোকের জন্মগত অধিকার আছে দীপ-শিখার, দীপের নয় ; নিবানো প্রদীপের এই দাবী তুলে হাঙ্গামা করতে যাওয়া শুধু অনর্থক নয়, অপরাধ,—সকল দাবী-দাওয়া উত্থাপনের আগে এ-কথা ভুলে গেলে, কেবল ইংরাজ নয়, পৃথিবীশুদ্ধ লোক আমোদ অনুভব করবে।

মহাত্মাজী আজ কারাগারে। তাঁর কারাবাসের প্রথমদিনে মারামারি কাটাকাটি বেধে গেল না, সমস্ত ভারতবর্ষ শুদ্ধ হয়ে রইল। দেশের লোকে সগর্ব্বে বললে, এ শুধু মহাত্মাজীর শিক্ষার ফল। Anglo-Indian কাগজওয়ালারা হেসে জবাব দিলে, এ শুধু নিছক indifference। আমার কিন্তু এ বিবাদে কোন পক্ষকেই প্রতিবাদ

করতে মন সরে না। মনে হয়, যদি হয়েও থাকে ত দেশের লোকের এতে গর্ব্বের বস্তু কি আছে? Organised Violence করবার আমাদের শক্তি নেই, প্রবৃত্তি নেই, সুযোগ নেই। আর হঠাৎ Violence? সে ত কেবল একটা আকস্মিকতার ফল। এই যে আমরা এতগুলি ভদ্র ব্যক্তি একত্র হয়েছি, উপদ্রব করা আমাদের কারও ব্যবসা নয়, ইচ্ছাও নয়, অথচ এ কথাও ত কেউ জোরে বলতে পারিনে, আমাদের বাড়ি ফেরবার পথটুকুর মাঝেই হঠাৎ কিছু একটা বাধিয়ে না দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে একটা মস্ত ফ্যাসাদ বেধে যাওয়াও ত অসম্ভব নয়। বাধেনি সে ভালই, এবং আমিও একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে চাইনে, কিন্তু এ নিয়ে দাপাদাপি করে বেড়ানোরও হেতু নাই। একেই মস্ত কৃতিত্ব বলে সান্ত্বনা লাভ করতে যাওয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা। আর indifference? এ-কথায় যদি কেউ এই ইঙ্গিত করে থাকে যে, মহাত্মার কারারোধে দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজেনি, ত তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়েই বেজেছে; কিন্তু তাকে নিঃশব্দে সহ্য করাই আমাদের স্বভাব, প্রতিকারের কল্পনা আমাদের মনেই আসে না।

প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ত্ত মন যেমন উপায়হীন বেদনায় কাঁদতে থাকে, অথচ, যা অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে হাত নেই, এই বলে মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া পরা, আমোদ আহ্লাদ, হাসি-তামাসা, কাজ-কর্ম্ম যথারীতি পূর্ব্বের মতই চলতে থাকে, মহাত্মার সম্বন্ধেও দেশের লোকের মনোভাব প্রায় তেমনি। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজ্ সাহেবের উপর। কেউ বললে, তার প্রশংসা-বাক্য কেবল ভণ্ডামী, কেউ বললে, তার দু'বছর জেল দেওয়া উচিত ছিল, কেউ বললে বড় জোর তিন বছর, কেউ বললে, না চার বছর, কিন্তু ছ'বছর জেল যখন হ'লো তখন আর উপায় কি? এখন গভর্নমেণ্ট যদি দয়া করে কিছু আগে ছাড়েন তবেই হয়। কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি। তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল, হোক না জেল ছ' বছর, হোক না জেল দশ বছর,—তাঁকে মুক্ত করাও ত দেশের লোকেরই হাতে। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশী কেউ তাকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা সে গভর্নমেণ্ট যতই কেন না শক্তিশালী হউন। কিন্তু সে আশা তাঁর একলারই ছিল, দেশের লোকের সে ভরসা করবার সাহস হ'লো না। তাদের অর্থোপার্জ্জন থেকে শুরু করে আহার-নিদ্রা অব্যাহত চলতে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও একটুকু বিঘ্ন হ'লো না, শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্ম্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচতে লাগলেন। প্রতিবিধান করবে কি, এতবড় হীনতায় লজ্জা বোধ করবার শক্তি পর্য্যন্ত যেন এদের চলে গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধি বিড়ম্বনায়

ছুতো তুলেছে non-violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধীজীর movementই কি practical? তাই ত আমরা···। কিন্তু কে এদের বুঝিয়ে দেবে কোন movementই কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে co-operation, non-co-operation, violence, non-violence সবই সমান, সবই সমান ফলপ্রসূ।

Non-co-operation বস্তুটা ভিক্ষে চাওয়া নয়, ও একটা কাজ, সুতরাং এ-কথা কিছুতেই সত্য নয় যে, non-co-operation পন্থা এ-দেশে অচল,—মুক্তির পথ সেদিকে যায়নি—অন্ততঃ, এখনো একদল লোক আছে, তা সংখ্যায় যত অল্পই হোক, যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে একে আজও বিশ্বাস করে। এরা কারা জানেন? একদিন যারা মহাত্মাজীর ব্যাকুল আহ্বানে স্বদেশী-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেছিল, উকীল তার ওকালতী ছেড়ে, শিক্ষক তার শিক্ষকতা ছেড়ে, বিদ্যার্থী তার বিদ্যালয় ছেড়ে, চারিদিকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, যাঁদের অধিকাংশই আজ কারাগারে,—এরা তাঁদেরই অবশিষ্টাংশ। দেশের কল্যাণে, আপনার কল্যাণে, আমার কল্যাণে সমস্ত নর-নারীর কল্যাণে যারা ব্যক্তিগত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছিল, সেই দেশের লোক আজ তাদের কি দাঁড় করিয়েছে জানেন? আজ তারা সম্মানহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, লাঞ্ছিত, পীড়িত, ভিক্ষুকের দল। তাদের জীর্ণ মলিন বাস, তারা গৃহহীন, তারা মুষ্টিভিক্ষায় জীবন যাপন করে, যৎসামান্য তেল-নুনের পয়সার জন্য স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইতে বাধ্য হয়। অথচ স্বেচ্ছায় সে সমস্ত ত্যাগ করে এসেছে। যতটুকুতে তার প্রয়োজন, সেটুকু সমস্ত দেশের কাছে কতই না অকিঞ্চিৎকর! এইটুকু সে সসম্মানে সংগ্রহ করতে পারে না। অথচ এরাই আজও অন্তরে স্বরাজের আসন এবং দেশের বাহিরে সমস্ত ভারতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পতাকা বহন করে বেড়াচ্ছে। আশার প্রদীপ—তা সে যতই ক্ষীণ হোক, আজও এদেরই হাতে। এদের নির্য্যাতনের কাহিনী সংবাদ-পত্রের পাতায় পাতায়, কিন্তু সে কতটুকু—যে অব্যক্ত লাঞ্ছনা ও অপমান এদের দেশের লোকের কাছে সহ্য করতে হয়! মহাত্মাজীর আন্দোলন থাক্ বা যাক্, এদের অশ্রদ্ধেয় করে আনবার, দীন হীন ব্যর্থ করে তোলবার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেশের লোককে একদিন করতেই হবে, যদি ন্যায় ও ধর্ম্ম ও সত্যকার বিধি-বিধান কোথাও কোনখানে থাকে। হাওড়া জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি অন্ততঃ এ জেলার লোক স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য। কেউ কিছু করব না, কোন ক্ষতি, কোন অসুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না—আমার

বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাত্রার এক তিল বাহিরে যেতে পারব না,—আমরা টাকার উপর টাকা, বাড়ির উপর বাড়ি, গাড়ির উপর গাড়ি, আমার দোতালার উপর তেতলা এবং তার উপর চৌতালা অবারিত এবং অব্যাহত উঠতে থাক—কেবল এই গোটাকতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়ে না দেয়ে, খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে পারে ত দিক, তখন না হয় তাকে ধীরে-সুস্থে চোখ বুজে পরম আরামে রসগোল্লার মত চিবানো যাবে। কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও কখনো হয় না। আসল কথা, এরা বিশ্বাস করতেই পারে না স্বরাজ নাকি আবার কখন হতে পারে। তার জন্য আবার নাকি চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হবে তাতে, কি হবে চরকায়, কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চ্চায়? নিবানো দীপ-শিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে মুছে গেছে, একমাত্র হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে আর কিছুতে!

একটা নমুনা দিই :—

সেদিন নারী-কর্ম্মমন্দির থেকে জন-দুই মহিলা ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে নিয়ে দুর্যোগের মধ্যেই আমতা অঞ্চলে বেরিয়ে পড়েছিলাম, ভাবলাম ঋষিতুল্য ও সর্ব্বদেশপূজ্য ব্যক্তিটাকে সঙ্গে নেওয়ায় এ-যাত্রা আমার সুযাত্রা হবে। হয়েও ছিল। বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার ও তাঁর নিজের প্রবল জয়ধ্বনির কোন অভাব ঘটেনি এবং ওই রোগা মানুষটিকে স্থানীয় রায় বাহাদুরের ভাঙ্গা তাঞ্জামের মধ্যে সবলে প্রবেশ করানোরও আন্তরিক ও একান্ত উদ্যম হয়েছিল। কিন্তু তার পরের ইতিহাস সংক্ষেপে এইরূপ—আমাদের যাতায়াতের ব্যয় হ'লো টাকা পঞ্চাশ। ঝড়ে, জলে আমাদের তত্ত্বাবধান করে বেড়াতে পুলিশেরও খরচা হয়ে গেল বোধ হয় এমনি একটা কিছু। বর্দ্ধিষ্ণু স্থান, উকীল, মোক্তার ও বহু ধনশালী ব্যক্তির বাস, অতএব স্থানীয় তাঁত ও চরকার উন্নতিকল্পে চাঁদা প্রতিশ্রুত হ'লো তিন টাকা পাঁচ আনা। তারপর আচার্য্যদেব বহু পরিশ্রমে আবিষ্কার করলেন জন-দুই উকীল বিলাতী কাপড় কেনেন না, এবং একজন তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করলেন, ভবিষ্যতে তিনি আর কিনবেন না। ফেরবার পথে প্রফুল্লচন্দ্র প্রফুল্ল হয়ে আমার কানে কানে বললেন, হ্যাঁ, জেলাটা উন্নতিশীল বটে! আর একটু লেগে থাকুন, civil disobedience বোধ হয় আপনারাই declare করতে পারবেন।

আর জনসাধারণ? সে তো সর্ব্বদা ভদ্রলোকেরই অনুগমন করে।

এ চিত্র দুঃখের চিত্র, বেদনার ইতিহাস, অন্ধকারের ছবি; কিন্তু এই কি শেষ কথা? এই অবস্থাই কি এ জেলার লোক নীরবে শিরোধার্য্য করে নেবে? কারও কোন কথা, কোন ত্যাগ, কোন কর্ত্তব্যই কি দেখা দেবে না? যারা দেশের সেবা-

রতে জীবন উৎসর্গ করেছে, যারা কোন প্রতিকূল অবস্থাকেই স্বীকার করতে চায় না, যারা Governmentএর কাছেও পরাভব স্বীকার করেনি, তারা কি শেষে দেশের লোকের কাছেই হার মেনে ফিরে যাবে? আপনারা কি কোন সংবাদই নেবেন না?

এই প্রসঙ্গে আমার বাঙ্গলা দেশের Provincial Congress Committeeর কথা উল্লেখ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আর লজ্জা বাড়িয়ে তুলতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

আমার এক আশা, সংসারে সমস্ত শক্তিই তরঙ্গ-গতিতে অগ্রসর হয়। তাই তার উত্থান-পতন আছে, চলার বেগে যে আজ নীচে পড়েছে, কাল সেই আবার উপরে উঠবে, নইলে চলা তার সম্পূর্ণ হবে না। পাহাড় গতিহীন, নিশ্চল, তাই তার শিখর-দেশ একস্থানে উঁচু হয়েই থাকে, তাকে নামতে হয় না। কিন্তু বায়ু-তাড়িত সমুদ্রের সে ব্যবস্থা নয়—তার উঠা-পড়া আছে; সে তার লজ্জার হেতু নয়, সেই তার গতির চিহ্ন, তার শক্তির ধারা। তখন সে কেবল উঁচু হয়ে থাকতে চায় যখন জমে বরফ হয়ে উঠে। তেমনি আমাদের এও যদি একটা movement, পরাধীন দেশের একটা অভিনব গতিবেগ, তা হলে উঠা-নামার আইন একেও মেনে নিতে হবে, নইলে চলতেই পারবে না।

কিন্তু সঙ্গে যারা চলবে তাদের রসদ যোগানো চাই। রসদ্ না পেয়েও এতদিন কোনমতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখন আমরা ক্ষুধিত, ক্লান্ত, পীড়িত,—আমাদের বিদায় দিয়ে নূতন যাত্রী আপনারা মনোনীত করে নিন।*

---

* ১৯১৯ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই, হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সভাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া প্রদত্ত লিখিত ভাষণ।

শিক্ষার বিরোধ

এতদিন এদেশে শিক্ষার ধারা একটা নির্ব্বিঘ্ন নিরুপদ্রব পথে চলে আসছিল। সেটা ভাল কি মন্দ এ-বিষয়ে কারও কোন উদ্বেগ ছিল না। আমার বাবা যা পড়ে গেছেন, তা আমিও পড়ব। এর থেকে তিনি যখন দু'পয়সা করে গেছেন, সাহেব-সুবোর দরবারে চেয়ারে বসতে পেয়েছেন, হ্যাণ্ডশেক্ করতে পেয়েছেন, তখন আমিই বা কেন না পারব? মোটামুটি এই ছিল দেশের চিন্তার পদ্ধতি। হঠাৎ একটা ভীষণ ঝড় এল। কিছুদিন ধরে সমস্ত শিক্ষা-বিধানটাই বনিয়াদ-সমেত এমনি টল্‌মল্ করতে লাগল যে, একদল বললেন পড়ে যাবে। অন্যদল সভয়ে মাথা নেড়ে বললেন, না, ভয় নেই—পড়বে না। পড়লও না! এই নিয়ে প্রতিপক্ষকে তাঁরা কটু কথায় জর্জ্জরিত করে দিলেন। তারা হেতু ছিল। মানুষের শক্তি যত কমে আসে মুখের বিষ তত উগ্র হয়ে ওঠে। বাইরে গাল তাঁরা ঢের দিলেন, কিন্তু অন্তরে ভরসা বিশেষ পেলেন না। ভয় তাঁদের মনের মধ্যেই রয়ে গেল, দৈবাৎ বাতাসে যদি আবার কোনদিন জোর ধরে ত এই গোড়া-হেলা নড়বড়ে অতিকায়টা হুমড়ি খেয়ে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবে না।

এমনি যখন অবস্থা তখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফিরে এলেন, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলন সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি কয়েকটি বক্তৃতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমার গুরুতুল্য পূজনীয়। সুতরাং মতভেদ থাকলেও প্রকাশ করা কঠিন। কেবল ভয় হয় পাছে অজ্ঞাতসারে তাঁর সম্মানে কোথাও লেশমাত্র আঘাত করে বসি। কিন্তু এ তো কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনা নয়,—যা তাঁরও বহুপূজ্য,—সেই দেশের সঙ্গে এ বিজড়িত। তাঁর কথা নিয়ে কয়েকটা Anglo-Indian কাগজ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে তাদের প্যাঁচালো উপদেশের আর বিরাম নেই। আর কিছু না হোক দেশের হিতাকাঙ্ক্ষায় এদের যখন বুক ফাটতে থাকে তখনি ভয় হয়, ভেতরে কোথাও একটা বড় রকমের গলদ আছে। বিশেষ করে বাঙ্গালী-পরিচালিত Anglo-Indian একখানা কাগজ। এর মুখের ত আর কামাই নেই। নিজের বুদ্ধি দিয়ে কবির কথাগুলো বিকৃত বিধ্বস্ত করে অবিশ্রাম বলছে—আমরা বলে বলে গলা ভেঙ্গে ফেলেছি,—ফল হয়নি,—এখন রবিবাবু এসে রক্ষে করে দিলেন। যথা—

"And if there were any among educated Bengalees, who were wavering and vacillating, knowing not what to do,—to exclude the West or to stick to the East—Rabindranath's recent Calcutta lectures have gone a great way towards making up their minds. They have given up their sitting-on-the-fence posture. They have jumped off on Western side."

অর্থাৎ আমরা দেশের শিক্ষিত সমাজ বেড়ার ডগায় বসেছিলাম, পশ্চিম-প্রত্যাগত কবির ইঙ্গিতে 'জয় রাম' বলে পশ্চিম দিকেই লাফিয়ে পড়লাম! বাঁচা গেল! শিক্ষিত সমাজের এতদিনে একটা কিনারা হ'লো! কিন্তু শিক্ষিতের দল যা নিয়ে এতবড় রই-রই করেন, যাঁদের অশিক্ষিত অজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন না,—তাঁদের যুক্তি-তর্কে এর কি মূল্য দাঁড়ায় একবার সেটাও ওজন করা ভাল। কিন্তু মোটের উপর পূর্ব্ব ও পশ্চিমের শিক্ষার মিলনে আসল কথা কবি কি বলেছেন?

প্রথম কথা বলেছেন এই যে, আজকের দিনে পশ্চিম জয়ী হয়েছে, সুতরাং সেই জয়ের কৌশলটা তাদের কাছে আমাদের শেখা চাই। বেশ। দ্বিতীয় কথা; লড়াইয়ের পরে পশ্চিম শোকাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই'? অতএব তাদের সেটা বলে দেওয়া আবশ্যক। এও ভাল কথা। আমি যতদূর জানি অসহযোগপন্থীর কেউ এ-বিষয়ে কোন আপত্তি করে না। তৃতীয় দফায় কবি উপনিষদের ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্' অতএব 'মা গৃধঃ'। চমৎকার কথা,—কারও কোনও দ্বন্দ্ব নেই। এ যে একটা তত্ত্ব নয়, সমস্ত দুনিয়ার এও কেউ লোকসমাজে অস্বীকার করে না, অথচ মানুষের এমন পোড়া স্বভাব যে, সে সরল ও সহজ সত্য কিছুতেই সোজা করে বলে মিটিয়ে নেবে না। আপন আপন স্বার্থ ও প্রয়োজনমত তার মধ্যে অসংখ্য sub clause, অগণিত qualification-এর আমদানি করে তাকে এমনি ভারাক্রান্ত করে তুলবে যে, তত্ত্বকথা আপনি হেঁয়ালী হয়ে দাঁড়াবে। তখন অসঙ্কোচে তাকে সত্য বলে চিনে নেওয়াই কঠিন। শুধু এইজন্যই উপস্থিত fact-গুলোই সংসারে সত্যের মুখোস পরে, মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার ধারার মধ্য অনধিকার প্রবেশ করে, অপরিমেয় অনর্থের সূচনা করে দেয়।

কবি প্রথমেই বলেছেন,—

"এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে

গেল···অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয়ই সে কোন একটা সত্যের জোরে।”

আজকের দিনে এ-কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, পৃথিবীর বড় বড় ক্ষীর-ভাণ্ডেই সে মুখ জুবড়ে আছে,—তার পেট ভরে দুই কস বেয়ে দুধের ধারা নেমেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী দাঁড়িয়ে আছি।

এ-একটা fact; আজকের দিনে একে কিছুতেই 'না' বলবার পথ নেই,—আমরা উপবাসী রয়েছি সত্যই, কিন্তু তাই বলেই কি এই কথা মানতেই হবে যে, এ অধিকার পেয়েছে তারা নিশ্চয়ই একটা সত্যের জোরে? এবং সেই সত্য তাদের কাছ থেকে আমাদের শিখতেই হবে? লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে, এ একটা fact, কিন্তু একেই যদি মানুষে চরম সত্য মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকত ত আজকের দিনে নীচে, জলের উপর এবং উর্দ্ধে আকাশের মধ্যে লোহার জাহাজ ছুটে বেড়াতে পারত না। উপস্থিত কালে যা fact তাই কেবল শেষ কথা নয়। মাসের ১লা তারিখে যে লোকটা তার বিদ্যের জোরে আমার সারা মাসের মাইনে গাঁট কেটে নিয়ে ছেলে-পুলে সমেত আমাকে অনাহারে রাখলে, কিংবা মাথায় একটা বাড়ি মেরে সমস্ত কেড়ে নিয়ে রাস্তার ওপরে চটের দোকানে বসে ভোজ লাগালে—এ ঘটনা সত্য হলেও কোন সত্য অধিকারে বলতে পারব না, কিংবা এ দুটো মহাবিদ্যে শেখবার জন্যে তাদের শরণাপন্ন হতে হবে এও স্বীকার করতে পারব না। তা ছাড়া গাঁটকাটা কিছুতেই বলে দেবে না পয়সা কোথায় রাখলে কেটে নেওয়া যায় না, অথবা ঠেঙালেও শিখিয়ে দেবে না কি করে তার মাথায় উল্টে লাঠি মেরে আত্মরক্ষা করা যায়। এ যদি বা শিখতেই হয়, ত সে অন্য কোথাও—অন্ততঃ তাদের কাছে নয়। কবি জোর দিয়ে বলেছেন, এ কথা মানতেই হবে পশ্চিম জয়ী হয়েছে এবং সে শুধু তাদের সত্যবিদ্যার অধিকারে! হয়ত মানতেই হবে তাই। কারণ সম্প্রতি সেই রকমই দেখাচ্ছে। কিন্তু কেবলমাত্র জয় করেছে বলে এই জয় করার বিদ্যাটাও সত্য বিদ্যা, অতএব শেখা চাই-ই, এ-কথা কোনমতেই মেনে নেওয়া যায় না। গ্রীস একদিন পৃথিবীর রত্নভাণ্ডার লুটে নিয়ে গিয়েছিল, রোমও তাই করেছিল। আফগানেরাও বড় কম করেনি,—কিন্তু সেটা সত্যের জোরেও নয়, সত্য হয়েও থাকেনি। দুর্য্যোধন একদিন শকুনির বিদ্যার জোরে জয়ী হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে দীর্ঘকাল ধরে বনে-জঙ্গলে উপবাস করতে বাধ্য করেছিল, সেদিন দুর্য্যোধনের পাত্র ছাপিয়ে গিয়েছিল, তার ভোগের অন্নে কোথাও একটি তিলও কম পড়েনি, কিন্তু তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে যুধিষ্ঠিরকে ফিরে এসে সারাজীবন কেবল পাশাখেলা শিখেই কাটাতে হ'তো। সুতরাং সংসারে জয় করা

যাঁ পরের কেড়ে নেওয়ার বিদ্যাটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই মানুষের বড় সার্থকতা নয়। তা ছাড়া, জয় কি কেবল নির্ভর করে বিজেতার উপরেই? আফগান যখন হিন্দুস্থান জয় করেছিল, সে কি তার নিজের গুণে? হিন্দুস্থান দেশ হারিয়েছিল তার নিজের দোষে। সেই ত্রুটি সংশোধন করার বিদ্যে তার নিজের মধ্যেই ছিল, বিজেতা আফগানের কাছে শেখবার কিছুই ছিল না। আবার এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে দুষ্প্রাপ্য নয় যখন বিজেতাই পরাজিতের কাছে কি বিদ্যা, কি ধর্ম্ম, কি সভ্যতা, কি ভদ্রতা সমস্তই শিক্ষা করে আর একদিন মানুষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে বলেছে, সত্যকার বিদ্যা যদি কিছু তার থাকে তা শিখতে হবে না? কে বলেছে, তার দ্বার পশ্চিম-মুখো থাকায় তাকে অহিন্দু বলে বয়কট করতে হবে? কি পদার্থ-বিদ্যা, কি রসায়ন-শাস্ত্র, কি ধনবিজ্ঞান—এ-সকল পশ্চিমী বিদ্যে শেখবার আবশ্যক নেই বলে কে বিবাদ করেছে? বিবাদ যদি কিছু থাকে সে তার বিদ্যের উপরে নয়—সে তার শেখানোর ভান করার ওপর, শিক্ষার বদলে কুশিক্ষার আয়তনের উপর। এতকাল এই তামাসায় যোগ দিয়ে পাগলের মত সবাই নেচে বেড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ জন-কয়েক লোকের চৈতন্য হওয়ায় তারা পেছিয়ে দাঁড়িয়ে এই ফাঁকিটাকে কেবল আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে—এই ত দেখি আসলে মতভেদের কারণ।

এই বস্তুটাকেই একটু বিশদ করে দেখবার চেষ্টা করা যাক। পশ্চিমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন-শাস্ত্র যতখানি বেড়ে উঠেছে গত যুদ্ধের সময়, এতখানি এতটুকু সময়ের মধ্যে বোধ করি আর কখনো হয়নি। মানুষ মারবার নব নব কৌশল এরা যত আবিষ্কার করেছে, ততই আনন্দে দম্ভে এদের বুক ভরে উঠেছে। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে আগুন দিয়ে, বিষ দিয়ে পুড়িয়ে গ্রামকে গ্রাম, সহরকে সহর ধ্বংস করবার কত ফন্দিই না এরা বার করেছে এবং আরও কত বার করত এই যুদ্ধটা আরও কিছুদিন অগ্রসর হলে। সৌভাগ্য এবং সভ্যতার বোধ করি এদের এই একটিমাত্র মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। এ যে দেখতে না পায় সে অন্ধ এবং এই বিদ্যাটা অপরকে এরা শেখাতে পারে, কিংবা শেখবার সুযোগ দিতে পারে, অতিবড় কবি-কল্পনাতেও এ আমি ভাবতে পারি না। কথা উঠতে পারে, মানবের কল্যাণকর এমন কি কিছুই এর থেকে আবিষ্কৃত হয়নি? হয়েছে বৈ কি। কিন্তু সে নিতান্তই by-product এর মত বলা যেতে পারে। হোক by-product, কিন্তু সে যখন মানবের হিতার্থে, তখন সেই বিদ্যাগুলো আয়ত্ত করেও ত আমরা মানুষ হতে পারি? হয়ত পারি। কিন্তু ঠিক ও উপায়ে নয়। পশ্চিমের সভ্যতার অহঙ্কার অভ্রভেদী।

আমাদের এবং আমাদের মত আরও অনেক দুর্ভাগা জাতির কাঁধে যখনই ওরা চেপে থাকে, তখনই ঘরে-বাইরে এই কৈফিয়ৎ দেয় যে, এগুলো দেখতে-শুনতে মানুষের মত হলেও ঠিক মানুষ নয়। অন্ততঃ সাবালক মানুষ নয়, ছেলেমানুষ। বেলজিয়াম যখন রবারের জন্য নিগ্রোদেরই দেশে গিয়ে নিগ্রোদেরই হাত কেটে দিত, তখনও সেই অজুহাতই তারা দিয়েছিল যে, এরা আমাদের হুকুম মানতে চায় না। এরা অসভ্য। অতএব আমরা গায়ে পড়ে এদের সভ্য করবার, মানুষ করবার ভার যখন নিয়েছি, তখন মানুষ এদের করতেই হবে। অতএব শিক্ষার জন্য এদের কঠোর শাস্তি দেওয়া একান্তই আবশ্যক। তথাস্তু বলা ছাড়া ওর যে আর কি জবাব আছে আমি জানি না। আমাদের, অর্থাৎ ভারতবাসীর সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলেও ইংরাজ ঠিক এই জবাবটাই দিয়ে আসছে যে, এরা অর্দ্ধ-সভ্য—ছেলেমানুষ। এদের দেশে প্রচুর অন্ন, কিন্তু পাছে অবোধ শিশুর মত বেশী খেয়ে পীড়িত হয়ে পড়ে, তাই এদের মুখের গ্রাস নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—সে এদেরই ভালোর জন্যে। আবার টাকাকড়িগুলো পাছে অপব্যয় করে নষ্ট করে ফেলে, তাই সে-সমস্ত দয়া করে আমরাই খরচ করে দিচ্ছি; সেও এদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত। এমনি সব ভাল করার কত কি অফুরন্ত কাহিনী ডেকে হেঁকে প্রচার করছেন—কত কষ্ট করে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এদের মানুষ করতে এসেছি;—কারণ মানুষ করার sacred duty যে আমাদেরই ওপরে। কিন্তু আঃ—গেলাম! By law established হয়ে এই ইণ্ডিয়ানগুলোকে মানুষ করতে করতে হয়রান হয়ে মোলাম!

ভগবান জানেন কবে এরা আবার by law disestablished হবে! কবে আমরা মানুষ হয়ে এদের দুশ্চিন্তা-মুক্ত করতে পারব! দেড়শ বছর ধরে তালিম দেওয়া চলছে, কিন্তু মানুষ আর হলাম না। কবে যে হতে পারব সেও ওরাই জানে, আর জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু ঐ দেড়শ বছরেও যদি ওই মোহ আমাদের ঘুচে না থাকে, যে এদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সত্যিই একদিন মানুষ হয়ে উঠব, সত্যি সত্যিই আমাদের মানুষ করে, নিজেদের মৃত্যুবাণ স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলে দিতে এরা ব্যাকুল, তা হলে আমি বলি আমাদের কোনকালে মানুষ না হওয়াই উচিত। ভগবান যেন কোনদিন এই দুর্ভাগাদের পরে প্রসন্ন না হন।

বস্তুতঃ, এ-কথা বোঝা কি এতই কঠিন যে, বিজ্ঞানের যে শিক্ষায় মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে, তার আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে দাঁড়ায়, সে উপলব্ধি করে সেও মানুষ, অতএব স্বদেশের দায়িত্ব শুধু তারই, আর কারও নয়,—পরাজিতের জন্য এমনি শিক্ষার ব্যবস্থা বিজেতা কি কখনও করতে পারে? তার বিদ্যালয়, তার শিক্ষার বিধি সে কি

নিজের সর্ব্বনাশের জন্যেই তৈরী করিয়ে দেবে? সে কেবলমাত্র এইটুকুই দিতে পারে যাতে তার নিজের কাজগুলি সুশৃঙ্খলায় চলে। তার আদালতে বিচারের বহুমূল্য অভিনয় করতে উকীল, মোক্তার, মুন্সেফ, হুকুম-মত জেলে দিতে ডেপুটি, সব্‌ডেপুটি, ধরে আনতে থানার ছোট-বড় পিয়াদা, ইস্কুলে ভুবালের পিতৃভক্তির গল্প পড়াতে দুর্ভিক্ষপীড়িত মাস্টার, কলেজে ভারতের হীনতা বর্ব্বরতার লেক্‌চার দিতে নখদন্তহীন প্রফেসার, অফিসে খাতা লিখতে জীর্ণ-শীর্ণ কেরানী,—তার শিক্ষা-বিধান এর বেশী দিতে পারে এও যে আশা করতে পারে, সে যে পারে না কি আমি তাই শুধু ভাবি। অথচ কবি বলেছেন, বাঁচবার বিদ্যা কিংবা মানুষ হবার বিদ্যা আছে কেবল শুক্রাচার্য্যের হাতে, আজ তার বাড়ি পশ্চিমে। সুতরাং মানুষ হতে যদি চাই তার আশ্রমে আজ আমাদের দৌড়াতেই হবে, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" অমৃত-লোকের লোক হয়েও কচকে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল। হয়েছিল সত্য, কিন্তু বিদ্যা ত কচ সহজে আদায় করতে পারেনি, গুরুদেবের ভোজ্য পদার্থ পর্যন্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু দিনকাল এখন বদলে গেছে,—আমাদের দুরদৃষ্টে যদি গুরুদেবের ভোজনপর্ব্ব পর্য্যন্ত হয়েই নাটক সমাপ্ত হয়ে যায়, তামাসার বাকী আর কিছু থাকবে না।

কিন্তু আমাদেরই বা এত দুঃখ, এত বেদনা কেন? কবি বলেছেন, সেটা একেবারে নিছক আমাদের নিজেরই অপরাধ। আমি কিন্তু এই উক্তিটাকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারিনে। আমার মনে হয় প্রত্যেক মানব-জীবনের দুঃখের অধ্যায়েই তার অপরাধ ছাড়াও একটা জিনিস আছে যা তার অদৃষ্ট, যে বস্তু তার দৃষ্টির বাহিরে, এবং যার ওপর তার কোন হাত নেই। তেমনি একটা সমগ্র জাতিরও দুঃখের মূলে তার দোষ ছাড়াও এমন বস্তু আছে যা তার সাধ্যের অতীত, যা তার দুর্ভাগ্য। আমাদের দেশের ইতিহাস যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বোধ হয় সম্পূর্ণ অসত্য বলে এ-কথা উড়িয়ে দেবেন না। দুঃখ ও হীনতার মূলে আমাদের অদৃষ্ট বস্তুও অনেকটা দায়ী, যার ওপর আমাদের কর্তৃত্ব ছিল না। কিন্তু কবি এ-কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করে উপমাচ্ছলে একটা গল্প বলেছেন। গল্পটা এই—

"মনে কর এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কি করে। অন্য ছেলেটি ভালমানুষ, সে ভক্তি-ভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তাঁর দুই হাত মোটরের

হাল যে কোনদিকে কেমন করে ঘোরাচ্চে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে উর্দ্ধস্বরে বাঁশী বাজিয়ে দৌড় মারল। গাড়ি চালাবার সখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁসই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়, তিনি স্বয়ং যে রথের রথী, ছেলেও সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালমানুষ ছেলেটি দেখলে ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ড ভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়া গাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে 'মরণং ধ্রুবম্', তখনও সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল, আর বললে, আমার আর কিছুতে দরকার নেই।"

এই গল্পের সার্থকতা যে কি আমি বুঝতে পারিনি। ছেলে দুটি কে তা অনুমান করা শক্ত নয়; কিন্তু এক ছেলের প্রতি আর এক ছেলের অকারণ দৌরাত্ম্য দেখে যে বাপ প্রসন্ন হন তিনি যে কিরূপ বাপ তা বোঝা যায় না। তবে এ-কথা বেশ বোঝা যায়, এমন বাপের পায়ের দিকে যে ছেলে তাকিয়ে থাকে,—তা তিনি যত বড় রথেরই রথী হোন, তাঁর 'মরণং ধ্রুবম্'।

অতঃপর কবি এই দুটি ছেলের জীবন-বৃত্তান্তও দিয়েছেন। মোটর হাঁকানো ছেলেটি ত ম্যাজিক থেকে বিজ্ঞানের ক্লাসে প্রমোশন পেলে, কিন্তু যে ছেলেটি 'মরণং ধ্রুবম্' সে তার ম্যাজিক ও তন্ত্র-মন্ত্র নিয়েই পড়ে রইল। এই তন্ত্র-মন্ত্রের 'পরে কঠোর কটাক্ষ কবি পূর্ব্বেও করেছেন। তাঁর 'অচলায়তনে' এ নিয়ে হাসি-তামাসা অনেক হয়ে গেছে, যাঁরা ওয়াকিফহাল তাঁরা এর মীমাংসা করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় এখানে এ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বিশ্ববস্তুর পেছনে যে কোন একটা অজ্ঞেয় শক্তি আছে, মানব ইতিহাসে এ একটা প্রাচীন তথ্য। এবং আজ বিংশ শতাব্দীতেও কূল-কিনারা তার তেমনি অজ্ঞাত। এই অজ্ঞেয় শক্তিকে প্রসন্ন করে কাজ আদায়ের চেষ্টা মানুষ চিরদিন করে আসছে,—আজও তার উপায় বার হয়নি; অথচ আজও তার অবসান নেই। এই উপায় আবিষ্কারের পথে কি করে যে প্রার্থনা একদিন ম্যাজিকে অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্রে এবং ম্যাজিক আর একদিন প্রার্থনায় চেহারা বদলে দাঁড়ায়, এ তর্ক তুলে পুঁথি বাড়াতে আমার সাধ নেই। ঈশ্বরের ধারণার অভিব্যক্তির ইতিহাসের এই অংশটা বিজ্ঞানের পরিণতির প্রশ্নে আমার অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।

সে যাই হোক, মোটর-হাঁকানো ছেলেটির উন্নতির হেতুবাদ এবং সেই পায়ের দিকে তাকানো ভাল ছেলেটির দুঃখের বিবরণ কবি এইখানে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যথা,—

"পূর্ব্বদেশে আমরা যে সময় রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকচি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়াচ্চি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখার ভার দিচ্চি শীতলা দেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ উচ্চাটন মন্ত্র আওড়াতে বলেছি, ঠিক সেই সময় পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ারকে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শুনেচি নাকি মন্ত্র-গুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য? ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, নিশ্চয় মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই। ইউরোপের কোণে-কানাচে যাদুমন্ত্রের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ব্বাবাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে এবং আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।"

কবির এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তা হলে বলার আর কিছুই নেই। আমাদের সব মরাই উচিত, এমন কি, সেঁকো বিষ খেতেও কারো আপত্তি করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু এই কি সত্য? ভল্‌টেয়ার বেশীদিনের লোক নন, তাঁর মত পণ্ডিত ও জ্ঞানী তখন সে-দেশে বড় সুলভ ছিল না, অতএব এ-কথা তাঁর মুখে কিছুই অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু তখনকার দিনে অজ্ঞান ও বর্ব্বরতায় কি এ দেশটা এতখানিই নীচের ধাপে নেবে গিয়েছিল যে, ঠিক এমনি কথা বলবার লোক এখানে কেউ ছিল না যে বলে, "বাপু, ভূতের ওঝা না ডাকিয়ে বৈদ্যের বাড়ি যাও। মারতে চাও ত অন্য পথ অবলম্বন কর, কেবল ঘরে বসে নিরালায় মরণ-মন্ত্র জপ করলেই কার্য্য সিদ্ধ হবে না?" ইউরোপের জয়গান করতে আমি নিষেধ করিনে, কিংবা যে হাতী পাঁকে পড়ে গেছে, তাকে নিয়ে আস্ফালন করবারও আমার রুচি নেই, কিন্তু তাই বলে ভূতের ওঝা ও মারণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের ইঙ্গিতও নির্ব্বিবাদে হজম করতে পারিনে। 'গোরা' বলে বাঙলা-সাহিত্যে একখানি অতি সুপ্রসিদ্ধ বই আছে; কবি যদি একবার সেখানি পড়ে দেখেন তো দেখতে পাবেন তার একান্ত স্বদেশভক্ত গ্রন্থকার গোরার মুখ দিয়ে বলেছেন,—"নিন্দা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ, এবং স্বদেশের মিথ্যা নিন্দার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।"

কবি বলেছেন, যাদুমন্ত্রের পরিণতিই হচ্ছে বিজ্ঞানে। কোনও একটা বস্তু কত দিক থেকে যে পরিণত হয়ে ওঠে সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু এই কি ঠিক যে ইউরোপ তার

যাদুবিদ্যার নালা এক লাফে ডিঙিয়ে গেল, আর আমরা দেশ-শুদ্ধ লোক মিলে ঘাড়-মোড় ভেঙে সেই পাঁকেই চিরকাল পুঁতে রইলাম। বাইরের দিকে বিশ্ববস্তু যে একটা প্রকাণ্ড কল, এর অখণ্ড অব্যাহত নিয়মের শৃঙ্খল যে যাদুবিদ্যায় ভাঙে না, সংসারে যা-কিছু ঘটে তারই একটা হেতু আছে, এবং সেই হেতু কঠোর আইন-কানুনে বাঁধা, অর্থাৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথার্থ জনক-জননী বিশ্ব-জগতে কার্য্যকারণের সত্য ও নিত্য সম্বন্ধের ধারণা কি এই দুর্ভাগ্য পূর্ব্বদেশে কারও ছিল না? এবং এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা কি পশ্চিম হতে আমদানি না করতে পারলে আমাদের ভাগ্যে মরণ-উচ্চাটন মন্ত্র-তন্ত্রের বেশী আর কিছুই মিলতে পারে না? পশ্চিমের বিদ্যার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু সে যদি আমাদের নিজেদের প্রতি কেবল অনাস্থাই এনে দিয়ে থাকে, আমাদের জ্ঞান, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ-সংস্থান, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি সকলের প্রতি যদি শুধু অশ্রদ্ধাই জন্মিয়ে দিয়ে থাকে, ত মনে হয়, লুব্ধচিত্তে পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের পানে আমাদের না তাকানোই ভাল। বস্তুতঃ, এই ত নাস্তিকতা। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, যে-শিক্ষায় মানুষ সত্যকারের মানুষ হয়ে উঠতে পারে—অন্ততঃ, তাদের মানুষের ধারণা যা,—তা তারা আমাদের দেয়নি, দেবে না এবং আমার বিশ্বাস দিতে পারেও না। এই সুদীর্ঘকাল পশ্চিমের সংসর্গেও যে আমরা কি হয়ে আছি, মাত্র সেইটুকুই কি এ-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? পেয়েছি কেবল এই শিক্ষা—যাতে নিজেদের সর্ব্ববিষয়ে অবজ্ঞা এবং তাদের যা-কিছু সমস্তের 'পরেই আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেছে। আর তাদের ভিতরের দ্বার এমন অবরুদ্ধ বলেই অবনতিও আজ আমাদের এত গভীর। সেটা তো জানবার পথ নেই, তাই শুধু তাদের বাইরের সাজ-সজ্জা দেখে একদিকে নিজেদের প্রতি যেমন ঘৃণা, অন্য দিকে তাদের প্রতিও ভক্তির আবেগ একেবারে শতধারে উৎসারিত হয়ে উঠেছে। তাই, একদিন আমাদের দেশের একদল লোক নির্ব্বিচারে ঠিক করেছিলেন, ঠিক ওদের মত হতে না পারলে আর আমাদের মুক্তি নেই। ওদের জাতিভেদ নেই—অতএব সেটা ঘোচানো চাই, ওদের স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—অতএব সেটা না হলেই নয়, তাদের খাওয়া-দাওয়ার বাচ-বিচার নেই—সুতরাং ওটা না তুললেই আর রক্ষা নেই, তাদের মন্দির নেই—অতএব আমাদের গির্জ্জার ব্যবস্থা চাই, তারা ভাড়া করে ধর্ম্ম প্রচারক রাখে, সুতরাং আমাদেরও ওটা অত্যাবশ্যক—এমনি কত কি! কেবল গায়ের চামড়াটা বদলাবার ফন্দি তাঁরা খুঁজে পাননি, নইলে আজ তাদের চেনাও যেত না। অথচ, আমি এর দোষ-গুণের বিচার করছিনে, আমি সরল-চিত্তে বলছি, কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করবার আমার লেশমাত্র অভিরুচি নেই, আমি কেবল

এই mentality-টাই আপনাদের গোচর করবার প্রয়াস করচি। এই যে বিদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও স্বদেশের প্রতি নিদারুণ বিরাগ, এ শুধু সম্ভবপর হয়েছিল তাদের অন্তরের পথটা চিরদিন বন্ধ ছিল বলে। তাই এদের সংসর্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের চোখে ওদের বাইরের মোহটা এমনি পেয়ে বসেছিল যে, এ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে তাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব ঘটেনি যে, বাইরে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, কেবল সেইটুকুর হুবহু নকল করলেই, তাঁরাও অমনি মানুষ হয়ে ওদের অন্তরে পংক্তিভোজনে সরাসরি বসে যেতে পারবেন। সংসারে যা-কিছু অজ্ঞাত, গোপন, যার ভিতরে প্রবেশের পথ নেই, তার প্রতি বাইরের লোকের লোভের অবধি থাকে না। তাই এ কথা তাঁদের স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিতে কোথাও কিছুমাত্র বাধেনি যে, মানুষ হবার সত্যকার সজীব মন্ত্রটি কেবল ওদের এই নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটিতেই চাপা দেওয়া আছে, কোনমতে ওর সন্ধান না পেলে আমাদেব মনুষ্যজন্ম সার্থক করবার দ্বিতীয় পন্থা নেই। এই ভ্রান্তিটা চোখ মেলে দেখবার আজ দিন এসেছে।

শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিরোধ-বিসম্বাদ চলেছে,—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ্য, অত বড় বড় বাড়ি কি হবে। কি হবে টানা পাখার? কাজ কি আবার টেবিল চেয়ারে,—দূর করে দাও মোটা মাইনে বিলিতী প্রফেসার—তার খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হয়ে গেল,—এমনি আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্ব্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোন্‌খানে। এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? একি কেবল গোটা-কতক সাজ-গোজ বদলালেই হবে? টেবিল চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেকট্রিক ফ্যানের পরিবর্ত্তে তালপাখা এনে, কিংবা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দেশী অধ্যাপক আমদানি করে কিংবা বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়ামের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেক্‌চারের আইন করলেই দুঃখ দূর হবে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে,—তাতে কল্যাণ নেই, গৌরব নেই, দেশকে সে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে, কোনদিন মনুষ্যত্ব দেবে না।

আমার এ-সব কথার কথা নয়,—উদ্দীপনাপূর্ণ স্বদেশী লেক্‌চার নয়—সত্য সত্যই যা আমি সত্য বলে বুঝেছি তাই কেবল আপনাদের কাছে বলছি। মানুষের এক প্রকার শিক্ষা আছে, যা কেবল নিছক ব্যক্তিগত সুখ ও সুবিধার খাতিরে মানুষে অর্জ্জন করতে চায়। যে mentality থেকে আমাদের এদেশে কেউ কেউ ইংরিজী ভাষাটা সাহেবের গলায় বলাটাকেই চরম উন্নতি জ্ঞান করে, এবং এই mentality-রই এক ধাপ নীচের লোকগুলো জাহাজে এবং রেলগাড়িতে সাহেবী পোষাক ছাড়া কিছুতেই বেড়াতে চায় না। এবং এই জিনিসটা এত ইতর, এত ক্ষুদ্র যে, এ কেন হয়, এর কি উদ্দেশ্য এ বিষয় আলোচনা করতেও ঘৃণা বোধ হয়। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই ছদ্মবেশের হীনতা, এই আপনার কাছ থেকে আপনাকে লুকোবার পাপ, এবং গভীর লাঞ্ছনা আপনারা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারেন। এবং প্রসঙ্গক্রমে এ-কথা কেন যে উত্থাপিত করলাম তাও বুঝতে আপনাদের বাকী থাকবে না।

এইখানে জাপানের কথা স্মরণ করে কেউ কেউ বলতে পারেন, এই যদি সত্য তবে জাপান আজ এমন হ'লো কিসের জোরে? তার চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার ইতিহাসটা একবার ভেবে দেখ! আমি ভেবে দেখেছি। পশ্চিমের শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্বের জোরেই যদি সে আজ বড় হয়ে থাকে, তবে বড়ত্বটাও বেশ মেপে দেখেছি আমরা শুক্রাচার্য্যেরই মাপকাঠি দিয়ে। কিন্তু মানবত্ব-বিকাশের সেই কি শেষ মানদণ্ড? জাতীয় জীবনে এই দু'শো পাঁচশো বছরের ঘটনাই কি তার চরম ইতিহাস?

আমি জাপানের ইতিহাস জানিনে। তার কি ছিল এবং কি হয়েছে। এ-বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ, কিন্তু এই তার পার্থিব উন্নতির মূলে, পশ্চিমের সভ্যতার পদতলে যদি তার আত্মসমর্পণের সূচনাই করে থাকে ত তারস্বরে আনন্দধ্বনি করবার বোধ হয় বেশী কারণ নেই। এবং এমন দুর্দ্দিন যদি কখনো ভারতের ভাগ্যে ঘটে—সে তার বিগত জীবনের সমস্ত tradition বিস্মৃত হয়ে ঠিক অতখানি উন্নত হয়েই ওঠে, এক কালো চামড়া ছাড়া পশ্চিমের সঙ্গে তার কোন প্রভেদই না থাকে ত ভারতের ভাগ্য-বিধাতা উপরে বসে সেদিন হাসবেন কি নিজে চুল ছিঁড়বেন বলা কঠিন।

কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়েই হয় না—হবার জো-ই নেই। তাদের যে বিদ্যাটার প্রতি আমাদের এত লোভ, তা তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়েই অর্জ্জন করি—এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী যদি না সে দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, এর মূল যদি না জাতির অতীতের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে

থাকে। এই ফুল-সমেত বৃক্ষশাখা, তা সে বর্ণে ও গন্ধে যত দামীই হোক, একদিন শুখোবেই শুখোবে, কোন কৌশলেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

এই সত্যটা আজ আমাদের একান্তই বোঝবার দিন এসেচে যে, ঠকিয়ে-মজিয়েই হোক বা কেড়ে-বিকড়েই হোক্, নানা দেশ থেকে টেনে এনে জমা করাটাই দেশের সম্পদ নয়। যথার্থ সম্পদ দেশের প্রয়োজনের মধ্যে থেকেই গড়ে ওঠে। তার অতিরিক্ত যা সে শুধুই ভার, নিছক আবর্জ্জনা। পরের দেখে আমরাও যেন ওই ঐশ্বর্যের প্রতি লুব্ধ হয়ে না উঠি। আমাদের জ্ঞান, আমাদের অতীত আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছিল, আজ অপরের শিক্ষার মোহে যদি নিজের শিক্ষাকে হেয় মনে করে থাকি ত সে পরম দুর্ভাগ্য। ঐ যে ট্রাম, ঐ যে মোটর পথের উপর দিয়ে বায়ুবেগে ছুটেছে, ঐ যে ঘরে ঘরে electric পাখা ঘুরচে, ঐ যে সহরের আলোর মালার আদি-অন্ত নেই, ঐ যে শত-সহস্র বিদেশী সভ্যতার তোড়-জোড় বিদেশ থেকে বয়ে এনে জমা করেছি, ওর কোনটাই কি আমাদের যথার্থ সম্পদ? বিগত যুদ্ধের দিনের মত আবার যদি কোনদিন ওর আমদানীর মূল শুকিয়ে যায় ত ভোজবাজির মত ওদের অস্তিত্ব এ-দেশ থেকে উঠে যেতে বিলম্ব হবে না। ও-সকল আমরা সৃষ্টি করিনি, করতেও জানিনে। পরের কাছ থেকে বয়ে আনা। আজ ও-সকল আমাদের না হলেও নয়, অথচ, ওর কোনটাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে গড়ে ওঠেনি। এই যে দেখা-দেখি প্রয়োজন, এ যদি আমরা গড়তেও না পারি, ছাড়তেও না পারি, তা হলে দুষ্ট-ক্ষুধার মত ও কেবল আমাদের একদিকে প্রলুব্ধ এবং অন্যদিকে পীড়িতই করতে থাকবে। কিন্তু পশ্চিম ওদের সৃষ্টি করেছে নিজের গরজ থেকে। তাদের সভ্যতায় ও-সকল চাই-ই চাই। ঐ যে বড় বড় মানোয়ারী জাহাজ, ওই যে গোলা-গুলি-কামান-বন্দুক গ্যাসের নল, ওই যে উড়ো এবং ডুবো জাহাজ ও সমস্তই ওদের সভ্যতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তাই কোনটাই ওদের বোঝা নয়, তাই ওদের পরিণতি, ওদের নিত্য নব আবির্ভাব দেশের প্রতিভার ভিতর থেকেই বিকশিত হয়ে উঠেচে। দূর থেকে আমরা লোভ করতেও পারি. নিতান্ত নিরীহ গোছের বাবুয়ানীর সরঞ্জাম কিনেও আনতে পারি, কিন্তু বাণিজ্য-জাহাজই বল, আর মোটর-গাড়িই বল, যতক্ষণ না সে নিজেদের প্রয়োজনে, নিজের দেশে, নিজের জিনিসের মধ্যে দিয়ে জন্মলাভ করে, ততক্ষণ যেমন করে এবং যত টাকা দিয়েই না তাদের সংগ্রহ করে আনি, সে আমাদের সত্যকারের ঐশ্বর্য্য নয়। তাই ম্যানচেস্টারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, গ্লাসগো লিনেন, এবং মসলিন, স্কটল্যাণ্ডের পশমী শীতবস্ত্র,—তা সে আমাদের যত শীতই নিবারণ করুক এবং দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুক, কোনটাই আমাদের যথার্থ সম্পদ নয়—নিছক আবর্জ্জনা।

কিন্তু আমি একটু সরে গেছি। আমি বলছিলাম যে মানুষ কেবল সত্যকারের প্রয়োজনেই সৃষ্টি করতে পারে এবং সৃষ্টি করা ছাড়া সে কখনো সত্যকারের সম্পদও পায় না। কিন্তু পরের কাছে শিখে মানুষ বড় জোর সেইটুকুই তৈরী করতে পারে, কিন্তু তার বেশী সে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করাটা শক্তি—সেটা দেখা যায় না—এমনকি পশ্চিমের দ্বারস্থ হয়েও না। এই শক্তির আধার নিজের প্রতি বিশ্বাস,—আত্মনির্ভরতা। কিন্তু যে শিক্ষা আমাদের আত্মস্থ হতে দেয় না, অতীতের গৌরব-কাহিনী মুছে দিয়ে আত্মসম্মানে অবিশ্রাম আঘাত করে, কানের কাছে কেবলি শোনাতে থাকে, আমাদের পিতা-পিতামহেরা কেবল ভূতের ওঝা আর মন্ত্র-তন্ত্র, দৈবজ্ঞ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁদের কার্য্যকারণের সম্বন্ধ-জ্ঞান বা বিশ্বজগতের অব্যাহত নিয়মের ধারণাও ছিল না—তাই আমাদের এ দুর্দ্দশা, তা হলে সে শিক্ষায় যত মজাই থাক্, তার সঙ্গে অবাধ কোলাকুলি একটু দেখে-শুনে করাই ভাল।

পশ্চিমের সভ্যতার আদর্শে মানুষ মারবার শত-কোটী মন্ত্র-তন্ত্র, পরের দেশে তার মুখের গ্রাস অপহরণ করার ততোধিক কলকারখানা, এ সমস্তই তার প্রয়োজনে তার নিজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছে,—কিন্তু ঠিক ঐ-সকল আমাদের দেশের সভ্যতার আদর্শে প্রয়োজন কি-না আমি জানি না। কিন্তু কবি বলেছেন, এই সকল মহৎ কার্য্য করেছে তারা নিশ্চয় কোন একটি সত্যের জোরে। অতএব এটা আমাদের শেখা চাই, কারণ বিদ্যাটা তাদের সত্য। এবং পরক্ষণেই বলেছেন, কিন্তু শুধু ত বিদ্যা নয়, বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানীও আছে, সুতরাং শয়তানীর যোগেই ওদের মরণ।

হতেও পারে। কিন্তু যে লোক শুধু মারণ-উচ্চাটন বিদ্যে শিখে মন্ত্র জপতে শুরু করেছে, তার কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা শয়তানী নির্ণয় করা কঠিন। কবি আমাদের মুখে একটা কথা গুঁজে দিয়ে বলেছেন—

"ঐ কথাটাই ত আমরা বার বার বলচি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের (অর্থাৎ পশ্চিমের) এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে এক এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এতবড় হাঁ করেচে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কারবার চলতে পারে না, কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে, এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা বিষের মত পরিহার করা চাই।"

এমন কথা যদি কেউ বলেও থাকে ত খুব বেশী অন্যায় করেছে আমার মনে হয় না। Physics, Chemistry হিন্দু কি ম্লেচ্ছ এ-কথা কেউ বলে না। বিদ্যার জাত নেই এ-কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে Culture জিনিসটারও জাত নেই এ-কথা

কিছুতেই সত্য নয়। এবং ওদের শিক্ষা যদি কেউ বিষের মত পরিহারের ব্যবস্থাই দিয়ে থাকে, ত সে কেবল এইজন্যেই. বিদ্যার জন্যে নয়। আর এই যদি ঠিক হয় যে, তারা কেবল অবিদ্যাকেই মানে এবং আমরা মানি বিদ্যাকে তা হলে এ দুটোর সমন্বয়ের উপায় বইয়ের মধ্যে, প্রবন্ধের মধ্যে, শ্লোক তুলে তুলে হতেও পারে, কিন্তু একটাকে আর একটার গিলে না খেয়ে বাস্তব জগতে যে কিভাবে সমন্বয় হতে পারে আমি জানিনে। যাদের গেলবার মত বড় হাঁ আছে তারা গিলবেই—মনু বা উপনিষদের দোহাই মানবে না। অন্ততঃ এতকাল যে মানেনি সে ঠিক।

পশ্চিমে এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের পরেও যে আজ সেই ল্যাজটার ওপরে মোড়কে মোড়কে সন্ধি-পত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলছে, এবং এত মারের পরেও যে তার নাড়ী বেশ তাজা আছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার আছে কি? এই মহাযুদ্ধ যারা যথার্থ বাধিয়েছিল তাদের দু'পক্ষই চমৎকার সুস্থ দেহে ও বহাল-তবিয়তে বেঁচে আছে। যারা মরবার তারা মরেছে; এবং ফের যদি আবশ্যক হয়, তাদেরই আবার মরবার জন্যে জড়ো করা হবে।

সুতরাং এদের মধ্যে আজ যদি কেউ শোকাকুল-চিত্তে কবিকে প্রশ্ন করে থাকে, 'ভারতের বাণী কই'? তা হলে সন্দেহ হয় তারা কিঞ্চিৎ রসিকতা করছে; এবং এইজন্যেই তাদের নিমন্ত্রণ করে ঘরে ডেকে এনে নিভৃতে 'মা গৃধঃ' মন্ত্র দিয়ে বশ করা যাবে,—এ ভরসা কবির থাকলেও আমার নেই। কারণ, বাঘের কানে 'বিষ্ণু মন্ত্র' ফুঁকলে বৈষ্ণব হয় কি না আমি ভেবে পাইনে।

আরও একটা কথা। পশ্চিমের সভ্যতার একটা মস্ত মূলমন্ত্র হচ্ছে standard of living বড় করা। আমাদের দেশের মূল নীতির সঙ্গে এর পার্থক্য আলোচনা করবার স্থান আমার নেই, কিন্তু ওদের সমাজ-নীতির যেমন interpretationই দেওয়া যাক, তার আসল কথা হচ্ছে, ধনী হওয়ার। ওদের সামাজিক ব্যবস্থা, ওদের সভ্যতা, ওদের ধনবিজ্ঞান,—এর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয়ও আছে এ সত্য সে অস্বীকার করবে না। এ ধনী হওয়ার অর্থ ত কেবল সংগ্রহ করাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীকেও তেমনি ধনহীন করে তোলাও এর অন্য উদ্দেশ্য। নইলে, শুধু নিজে ধনী হওয়ার কোন মানেই থাকে না। সুতরাং কোন একটা সমস্ত মহাদেশ যদি কেবল ধনী হতেই চায় ত অন্যান্য দেশগুলোকে সে ঠিক সেই পরিমাণে দরিদ্র না করেই পারে না। তবু এই একটা কথা নিত্য নিয়ত মনে রাখলে দুরূহ সমস্যার আপনি মীমাংসা হয়ে যায়। এই তার মেদ-মজ্জাগত সংস্কার, এই তার সমস্ত সভ্যতার ভিত্তি, এর 'পরেই তার বিরাট সৌধ অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এরই জন্যে তার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সাধনা নিয়োজিত।

আজ আমার কথায়, আমাদের ঋষিবাক্যে সে কি তার সমস্ত civilisationএর কেন্দ্র নড়িয়ে দেবে? আমাদের সংসর্গে তার বহুযুগ কেটে গেল, কিন্তু আমাদের সভ্যতার আঁচটুকু পর্য্যন্ত সে কখনো তার গায়ে লাগতে দেয়নি। আপনাকে এমনি সতর্ক, এমনি স্বতন্ত্র, এমনি শুচি করে রেখেছে যে, কোনদিন এর ছায়াটুকু মাড়ায়নি। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে এ-দেশের রাজার মাথায় কোহিনুর থেকে পাতালের তলে কয়লা পর্য্যন্ত, যেখানে যা-কিছু আছে কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এটা বোঝা যায়, কারণ, এই তার সত্য, এই তার সভ্যতার মূল শিকড়। এই দিয়েই সে তার সমাজ-দেহের সমস্ত সভ্যতার রস শোষণ করে, কিন্তু আজ খামোকা যদি সে ভারতের আধিভৌতিক সত্যবস্তুর বদলে ভারতের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-পদার্থের inquiry করে থাকে ত আনন্দ করব কি হুঁশিয়ার হব—চিন্তার কথা।

ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে,—এই মূলে। আমাদের ঋষিবাক্য যত ভালই হোক তারা নেবে না, কারণ তাতে তাদের প্রয়োজন নেই। সে তাদের সভ্যতার বিরোধী। আর তাদের শিক্ষা তারা আমাদের দেবে না -কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু সত্য। আর দিলেও তার যেটুকু ভিক্ষা সেটুকু না নেওয়াই ভাল। বাকীটুকু যদি আমাদের সভ্যতার অনুকূল না হয়, সে শুধু ব্যর্থ নয়, আবর্জ্জনা। তাদের মত পরকে মারতে যদি না চাই, পরের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়াটাই যদি সভ্যতার শেষ না মনে করি ত মারণ মন্ত্র যত সত্যই হোক তার প্রতি নির্লোভ হওয়াই ভাল।

আর একটা কথা বলেই আমি এবার এ প্রবন্ধ শেষ করব। সময়ের অভাবে অনেক বিষয়ই বলা হ'লো না,—কিন্তু এই অবান্তর কথাটা না বলেও থাকতে পারলাম না যে, বিদ্যা এবং বিদ্যালয় এক বস্তু নয়; শিক্ষা ও শিক্ষার প্রণালী এ দুটো আলাদা জিনিস। সুতরাং কোন একটা ত্যাগ করাই অপরটা বর্জ্জন করা নয়। এমনও হতে পারে, বিদ্যালয় ছাড়াই বিদ্যালাভের বড় পথ। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা উল্টো মনে হলেও সত্য হওয়া অসম্ভব নয়। তেলে জলে মেশে না, এ দু'টো পদার্থও একেবারে উল্টো, তবু তেলের সেজ জ্বালাতে যে মানুষ জল ঢালে সে কেবল তেলটাকেই নিঃশেষে পুড়িয়ে নিতে। যারা এ তত্ত্ব জানে না, তাদের একটু ধৈর্য্য থাকা ভাল।*

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে 'গৌড়ীয় সর্ব্ববিদ্যা আয়তনে' পঠিত-ভাষণ।

স্বরাজ-সাধনায় নারী

শাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখের কথা আছে। পৃথিবীতে যাবতীয় দুঃখকেই হয়ত ঐ তিনটির পর্য্যায়েই ফেলা যায়, কিন্তু আমার আলোচনা আজ সে নয়। বর্ত্তমান কালে যে তিন প্রকার ভয়ানক দুঃখের মাঝখান দিয়ে জন্মভূমি আমাদের গড়িয়ে চলেছে, সেও তিন প্রকার সত্য, কিন্তু সে হচ্ছে রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক। রাজনীতি আমরা সবাই বুঝিনে, কিন্তু এ-কথা বোধ করি অনায়াসেই বুঝতে পারি এই তিনটিই একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একটা কথা উঠেছে, একা রাজনীতির মধ্যেই আমাদের সকল কষ্টের, সকল দুঃখের অবসান! হয়ত এ-কথা সত্য, হয়ত নয়, হয়ত সত্যেমিথ্যায় জড়ানো, কিন্তু এ-কথাও কিছুতেই সত্য নয় যে, মানুষের কোন দিক দিয়েই দুঃখ দূর করার সত্যকার প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে আছেন তাঁরা সর্ব্বদা সর্ব্বকালে আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরা সকলেই যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে নাও পাই, যে দাগগুলো কেবল স্থূল দৃষ্টিতেই দেখতে পাওয়া যায়—আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক স্পষ্ট দুঃখগুলো—কেবল এইগুলিই যদি প্রতিকারের চেষ্টা করি, বোধ হয় মহাপ্রাণ রাজনৈতিক নেতাদের স্কন্ধ থেকে একটা মস্ত গুরুভারই সরিয়ে দিতে পারি।

তোমার দীর্ঘ অবকাশের প্রাক্কালে, তোমাদের এবং আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় এই শেষের দিকের অসহ্য বেদনায় গোটা-কয়েক কথা তোমাদের মনে করে দেবার জন্যে আমাকে আহ্বান করেছেন এবং আমিও সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। এই সুযোগ এবং সম্মানের জন্য তোমাদের এবং গুরুস্থানীয়দের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিই।

এই সভায় আমার ডাক পড়েছে দু'টো কারণে। একে ত মৈত্র মশাই আমার বয়সের সম্মান করেছেন, দ্বিতীয়তঃ একটা জনরব আছে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে আমি অনেকদিন ধরে অনেক ঘুরেছি। ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ বহু লোকের সঙ্গে মিশে মিশে, অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে রেখেছি। জনরব কে রটিয়েছে খুঁজে পাওয়া শক্ত, কিন্তু কথাটা ঠিক সত্য না হলেও একেবারে মিথ্যাও বলা চলে না। দেশের নব্বই জন যেখানে বাস করে আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতূহল দমন করতে না

পেরে অনেকদিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়েছি এবং তাদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি। তাদের সেই-সব অসহ্য, অব্যক্ত দুঃখ ও দৈন্য ঘোচাবার ভার নিতে আজ আমার দেশের সমস্ত নর-নারীকে আহ্বান করতে সাধ যায়, কিন্তু কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে, যখনই মনে হয়, মাতৃভূমির এই মহাযজ্ঞে নারীকে আহ্বান করার আমার কতটুকু অধিকার আছে। যাকে দিইনি, তার কাছে প্রয়োজনে দাবী করি কোন মুখে? কিছুকাল পূর্ব্বে 'নারীর মূল্য' বলে আমি একটা প্রবন্ধ লিখি। সেই সময়ে মনে হয়, আচ্ছা, আমার দেশের অবস্থা ত আমি জানি, কিন্তু আরও ত ঢের দেশ আছে, তারা নারীর দাম সেখানে কি দিয়েছে? পুঁথি-পত্র ঘেঁটে যে সত্য বেরিয়ে এল, তা দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। পুরুষের মনের ভাব, তার অন্যায় এবং অবিচার সর্ব্বত্রই সমান। নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে কম-বেশী প্রায় সমস্ত দেশের পুরুষ তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেচে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই আজ দেশ জুড়ে আরম্ভ হয়ে গেছে। স্বার্থ এবং লোভে, পৃথিবীজোড়া যুদ্ধে পুরুষ যখন মারামারি কাটাকাটি বাঁধিয়ে দিলে তখনই তাদের প্রথম চৈতন্য হ'লো, এই রক্তারক্তিই শেষ নয়, এর উপরে আরও কিছু আছে। পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেমনি অবধি নেই। এই দারুণ দুর্দ্দিনে নারীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে তার বাধল না। আমি ভাবি, এই বঞ্চিতার দান না পেলে এ সংসার-ব্যাপী নরযজ্ঞের প্রায়শ্চিত্তের পরিণাম আজ কি হ'তো? অথচ, এ-কথা ভুলে যেতেও আজ মানুষের বাধেনি।

আজ আমাদের ইংরাজ Government-এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনি। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, কিন্তু কবলমাত্র তাদেরই ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরমনিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি কে নেবে? এই প্রসঙ্গে আমার কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-খুড়া-জ্যেঠাদের ক্রোধান্ধ মুখগুলি মনে পড়ে। এবং সেইসকল মুখ থেকে যে বাণী নির্গত হয় তাও মনোরম নয়। তাঁরা আমাকে এই বলে অনুযোগ করেন, আমি আমার বইয়ের মধ্যে কন্যা-পণের বিরুদ্ধে মহা হৈ চৈ করে তাঁদের কন্যাদায়ের সুবিধে করে দিইনি কেন?

আমি বলি, মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাঁরা চোখ কপালে তুলে বলেন, সে কি মশায়, কন্যাদায় যে।

আমি বলি, কন্যা যখন দায় তখন তার প্রতিকার আপনিই করুন, আমার মাথা গরম করার সময়ও নেই, বরের বাপকে নিরর্থক গালমন্দ করারও প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, বাঘের মুখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে তাকে বোষ্টম হতে

অনুরোধ করায় ফল হয় বলেও যেমন আমার ভরসা হয় না, যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে, তাকেও দাতাকর্ণ হতে বলায় লাভ হবে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরেও না, তাকে দাঁত খিঁচিয়েও না। আসল প্রতিকার মেয়ের বাপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়-গ্রস্তই আমার কথা বোঝে না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে বলেন,—সে কি করে হবে মশাই, সমাজ রয়েছে যে! সমস্ত মেয়ের বাপ এ কথা বলেন ত আমিও বলতে পারি, কিন্তু একা ত পারিনে। কথাটা তাঁর বিচক্ষণের মত শুনতে হয় বটে, আসল গলদও এইখানে। কারণ পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনও দল বেঁধে হয় না। একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ একদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, তার বলে নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বহিতে পারে, অপরে পারে না। আর কেবল নেওয়াই নয়, মেয়েমানুষকে মানুষ করার ভারও তারই উপরে, এখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।

এ-সব কথা আমি শুধু বলতে হয় বলেই বলছিনে; সভায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করছিনে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই এ-কথা বলছি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন, কিন্তু আমার অন্তর্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছে না। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে যেন প্রতি মুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্ছেন এ হবার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এতবড় বস্তু লাভ করা যাবে না। মেয়েমানুষকে আমরা কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হতে দিইনি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখচে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে।

এইখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিসটা তুচ্ছও নয়, এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে যে ছোট করে রাখতে চেয়েছে তাও সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলিনে, কিন্তু একেই তার নারী-জীবনের চরম ও পরম শ্রেয়ঃ জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হবার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী, একে ফাঁকি দিয়ে, যে কেউ যে কোন

একটা কিছুকে বড় করে খাড়া করতে গেছে, সে তাকে ঠকিয়েছে, নিজেও ঠকেছে। তাকেও মানুষ হতে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেমনি অজ্ঞাতসারে ছোট করে ফেলেছে! এ-কথা তার মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য। Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং দশের তিনি অনেক মঙ্গল করে গেছেন, কিন্তু তাদের মানুষ হতে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বলতে হয়েছে, "All my life I have been but a slave-driver!" এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় গ্লানি করে যে গেছেন, সে কেবল জগদীশ্বরই জেনেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর পাঠক ছিলাম; দেশে প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে,—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক, কি আর্থিক, কি নৈতিক, সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণ তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছে, নারীর মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা যে পরিমাণে মুক্ত করে দিয়েছে,—নিজেদের অধীনতা-শৃঙ্খলও তাদের তেমনি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ, তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেছে? কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক এই আশঙ্কাই আমার বুকের উপর যাঁতার মত বসে আছে। মনে হয়, এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকী রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এশিয়ার এমন দেশও ত আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা একতিল দেয়নি, অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি—অপহরণ করবেই এমন কথা আমিও বলিনি। তবুও আমি এ-কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈববলের অভাবে যদি কখনও এ বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবলমাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহা ভার সূচ্যগ্রও নড়াতে পারবেন না। শুধু আপাতদৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্মদেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে-দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে পুরুষ এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেইদিন থেকে

একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য বিলাসী এবং হীন হতে শুরু করেছিল, অন্যদিকে তেমনি নারীর মধ্যে স্বেচ্ছাচারীতা আরম্ভ হয়েছিল। আর সেইদিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক সহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েছি, আমি দেখতে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে, কিন্তু একটা বড় জিনিস আজও তারা হারায়নি। কেবলমাত্র নারীর সতীত্বটাকে একটা ফেটিস করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টাকাকীর্ণ করে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার-ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বুই জন লিখতে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্ব্বাসিত হয়ে যায়নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে অচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন, যেদিন তাদের ঘুম ভাঙবে, এই সমবেত নর-নারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠবে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারীই হোক, খসে পড়তে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না, তাতে বাধা দেয় এমন শক্তিমান কেউ নেই।

আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেচে। আমার বিশ্বাস, এখন দেশে এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট-গৌরব, বিলুপ্ত-সম্মান পুনরুজ্জাবিত না দেখতে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই ত মেলে না, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায়ের পথেই যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত মতভেদ। এবং এখানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চির-জীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও। তা সে যেখানে এবং যারই হোক। এ আমার বই-পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার দীর্ঘজীবনের বার বার ঠকে শেখা সত্য। আমি কেবল এইটুকু দিয়েই অত্যন্ত জটিস সমস্যার আজও মীমাংসা করি, আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মানুষ হয় এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক। হাড়ি ডোমকে যদি মানুষ বলতে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি, তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেখানেই গিয়ে পৌছাক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা, তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, বলতেনেই, ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝ না—এস, আমি তোমার

হিতের জন্য তোমার মুখে পরদা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকেও ডেকে বলিনে, বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশী চলাফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ভিক্ষোলেই তোমার পা ভেঙে দেব।

আমি বলি, যার যা দাবী সে ষোল-আনা নিক্। আর ভুল করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয়, ত সে ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে! দুটো পরামর্শ দিতে পারি—কিন্তু মেরে-ধরে হাত-পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হবে, এতবড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায়ও নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, বাস্তবিক, আমার মত কুঁড়ে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাটা যদি জগতে একটু কম করে করত ত তারাও আরামে থাকত, এদেরও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু-আধটু হবারও জায়গা পেত। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে, এই কথাটা আমার তোমরা ভুলো না।

আজ তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কথা বলবার ছিল। সকল দিক দিয়ে কি করে সমস্ত বাঙ্গলা জীর্ণ হয়ে আসচে, -দেশের যারা মেরুমজ্জা সেই ভদ্র গৃহস্থ প-রিবার কি করে কোথায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আসচে, সে আনন্দ নেই, সে প্রাণ নেই, সে ধর্ম্ম নেই, সে খাওয়া-পরা নেই; সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রামগুলো প্রায় জনশূন্য,—বিরাট প্রাসাদতুল্য আবাসে শিয়াল-কুকুর বাস করে; পীড়িত নিরুপায় মৃতকল্প লোকগুলো যারা আজও সেখানে পড়ে আছে, খাদ্যাভাবে জলাভাবে কি তাদের অবস্থা—এই সব সহস্র দুঃখের কাহিনী তোমাদের তরুণ প্রাণের সামনে হাজির করবার আমার সাধ ছিল, কিন্তু এবার আমার সময় হ'লো না। তোমরা ফিরে এস, তোমাদের অধ্যাপক যদি আমাকে ভুলে না যান ত আর একদিন তোমাদের শোনাব।*

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে পৌষ মাসে 'শিবপুর ইন্‌স্টিটিউটে' পঠিত অভিভাষণ।

দেশবন্ধুকে অভিনন্দন

শ্রদ্ধাস্পদ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় শ্রীকরকমলেষু—

হে বন্ধু, তোমার স্বদেশবাসী আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। মুক্তিপথযাত্রী যত নর-নারী যে যেখানে যত লাঞ্ছনা, যত দুঃখ, যত নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছে, হে প্রিয়, তোমার মধ্যে আজ আমরা তাহাদের সমস্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া সগৌরবে, সবিনয়ে নমস্কার করি। সুজলা, সুফলা, শ্যামলা মা আমাদের আজ অবমানিতা, শৃঙ্খলিতা। মাতার শৃঙ্খলভার যত সন্তান তাঁহার স্বেচ্ছায় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে, তুমি তাহাদের অগ্রজ; হে বরেণ্য, তোমার সেই সকল খ্যাত ও অখ্যাত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের উদ্দেশে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত সমস্ত দেশের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

একদিন দেশের লোক তোমাকে ক্ষুধিত পীড়িতের আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছিল, সেদিন সে ভুল করে নাই। কিন্তু, যে-কথা তুমি নিজে চিরদিন গোপন করিয়াছ,—দাতা ও গ্রহীতার সেই নিভৃত করুণ সম্বন্ধ—আজও সে তেমনই গোপনে শুধু তোমাদের জন্যই থাক্। কিন্তু আর একদিন এই বাঙ্গলাদেশ তোমাকে ভাবুক বলিয়া, কবি বলিয়া বরণ করিয়াছিল, সেদিনও সে ভুল করে নাই। সেদিন এই বাঙ্গলার নিগূঢ় মর্ম্মস্থানটি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিতে, তাহার একান্ত সঞ্চিত অন্তর-বাণীটি নিরন্তর কান পাতিয়া শুনিতে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া লইতে তোমার একাগ্র সাধনার অবধি ছিল না। তখন হয়তো তোমার সকল কথা বঙ্গের ঘরে ঘরে গিয়া পৌঁছায় নাই, হয়ত কাহারও রুদ্ধ দ্বারে ঘা খাইয়া সে ফিরিয়াছে, কিন্তু পথ যেখানে তাহার মুক্ত ছিল, সেখানে সে কিছুতেই ব্যর্থ হইতে পায় নাই।

তাহার পরে একদিন মাতার কঠিনতম আদেশ তোমার প্রতি পৌঁছিল। যেদিন দেশের কাছে স্বাধীনতার সত্যকার মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে সর্ব্বস্ব পণে তোমাকে পথে বাহির হইতে হইল, সেদিন তুমি দ্বিধা কর নাই।

বীর তুমি, দাতা তুমি, কবি তুমি,—তোমার ভয় নাই, তোমার মোহ নাই,—তুমি নির্লোভ, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন। রাজা তোমাকে বাঁধিতে পারে না, স্বার্থ তোমাকে ভুলাইতে পারে না, সংসার তোমার কাছে হার মানিয়াছে। বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা তাই তোমার কাছেই দেশের শ্রেষ্ঠ বলি গ্রহণ করিলেন, তোমাকেই সর্ব্বলোক-চক্ষুর সাক্ষাতে দেশের স্বাধীনতার মূল্য সপ্রমাণ করিয়া দিতে হইল। যে-কথা তুমি বার বার

বলিয়াছ—স্বাধীনতার জন্য বুকের জ্বালা কি, তাহা তোমাকেই সকল সংশয়ের অতীত করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইল। বুঝাইয়া দিতে হইল,—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

এই ত তোমার ব্যথা! এই ত তোমার দান!

ছলনা তুমি জান না, মিথ্যা তুমি বল না, নিজের তরে কোথাও কিছু লুকাইতে তুমি পার না—তাই, বাংলা তোমাকে যখন 'বন্ধু' বলিয়া আলিঙ্গন করিল, তখন সে ভুল করিল না, তাহার নিঃসঙ্কোচ নির্ভরতায় কোথাও লেশমাত্র দাগ লাগিল না।

আপনার বলিয়া, স্বার্থ বলিয়া কিছু তোমার নাই, সমস্ত স্বদেশ তাই ত আজ তোমার করতলে। তাই ত, তোমার ত্যাগ আজ শুধু তোমার নয়, আমাদের। শুধু বাঙ্গালীকে নয়, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ বিহারী, পাঞ্জাবী, মারহাট্টী, গুজরাটী যে যেখানে আছে, সকলকে নিষ্পাপ করিয়াছে।

তোমার দান আমাদের জাতীয় সম্পত্তি,—এ ঐশ্বর্য্য বিশ্বের ভাণ্ডারে আজ সমস্ত মানবজাতির জন্য অক্ষয় হইয়া রহিল। এমনি করিয়াই মানবজীবনের দেনা-পাওনার পরিশোধ হয়, এমনি করিয়াই যুগে যুগে মানবাত্মা পশুশক্তি অতিক্রম করিয়া চলে।

একদিন নশ্বর দেহ তোমার পঞ্চভূতে মিলাইবে। কিন্তু যতদিন সংসারে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের, সবলের বিরুদ্ধে দুর্ব্বলের, অধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তির বিরোধ শান্ত হইয়া না আসিবে, ততদিন অবমানিত, উপদ্রুত মানবজাতি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার এই সুকঠোর প্রতিবাদ মাথায় করিয়া বহিবে এবং কোনমতে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাটা যে অনুক্ষণ শুধু বাঁচাকেই ধিক্কার দেওয়া, এ সত্য কোনদিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

জীবনতত্ত্বের এই অমোঘ বাণী স্বদেশে, বিদেশে, দিকে দিকে উদ্ভাসিত করিবার গুরুভার বিধাতা স্বহস্তে যাঁহাকে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার কারাবসানের তুচ্ছতাকে উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া আমরা উল্লাস করিতে আসি নাই। হে চিত্তরঞ্জন, তুমি আমাদের ভাই, তুমি আমাদের সুহৃদ, তুমি আমাদের প্রিয়,—অনেকদিন পরে তোমাকে কাছে পাইয়াছি। তোমার সকল গর্ব্বের বড় গর্ব্ব—বাঙ্গালী তুমি; তাই ত সমস্ত বাঙ্গলার হৃদয় তোমার কাছে আজ বহিয়া আনিয়াছে,—আর আনিয়াছি, বঙ্গজননীর একান্ত মনের আশীর্ব্বাদ,—তুমি চিরজীবী হও। তুমি জয়যুক্ত হও।*

তোমার গুণমুগ্ধ স্বদেশবাসিগণ।

---

* ১৩২৮ বঙ্গাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কারামুক্তি হইলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রদত্ত অভিনন্দন।

মহাত্মাজী

মহাত্মাজী আজ রাজার বন্দী। ভারতবাসীর পক্ষে এ সংবাদ যে কি, সে কেবল ভারতবাসীই জানে। তবুও সমস্ত দেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দেশব্যাপী কঠোর হরতাল হইল না, শোকোন্মত্ত নর-নারী পথে পথে বাহির হইয়া পড়িল না, লক্ষ কোটি সভা-সমিতিতে হৃদয়ের গভীর ব্যথা নিবেদন করিতে কেহ আসিল না - যেন কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই,—যেমন কাল ছিল, আজও সমস্তই ঠিক তেমনি আছে. কোনখানে একটি তিল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হয় নাই—এমনিভাবে আসমুদ্র-হিমাচল নীরব হইয়া আছে। কিন্তু এমন কেন ঘটিল ? এতবড় অসম্ভব কাণ্ড কি করিয়া সম্ভবপর হইল ? নীচাশয়, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলো যাহার যাহা মুখে আসিতেছে বলিতেছে, কিন্তু প্রতিদিনের মত সে মিথ্যা খণ্ডন করিতে কেহ উদ্যত হইল না। আজ কথা-কাটাকাটি করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত কাহারও নাই। মনে হয়, যেন তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম বেদনা আজ সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অতীত।

যাইবার পূর্ব্বাহ্ণে মহাত্মাজী অনুরোধ করিয়া গেছেন, তাঁহার জন্য কোথাও কোন হরতাল, কোনরূপ প্রতিবাদ-সভা, কোন প্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমাত্র আক্ষেপ উত্থিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন আদেশ। কিন্তু তথাপি সমস্ত দেশ তাঁহার সে আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে। এই কণ্ঠরোধ, এই নিঃশব্দ সংযম, আপনাকে দমন করিয়া রাখার এই কঠোর পরীক্ষা যে কত বড় দুঃসাধ্য, এ-কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তবুও এ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যাইতে তাঁহার বাধে নাই। আর একদিন—যেদিন তিনি বিপন্ন দরিদ্র উপদ্রুত ও বঞ্চিত প্রজার পরম দুঃখ রাজার গোচর করিতে যুবরাজের অভ্যর্থনা নিষেধ করিয়াছিলেন, এই অর্থহীন, নিরানন্দ উৎসবের অভিনয় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত হইতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে-দিনও তাঁহার বাধে নাই। রাজরোষাগ্নি যে কোথায় এবং কত দূরে উৎক্ষিপ্ত হইবে, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু কোন আশঙ্কা, কোন প্রলোভনই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা কত বজ্রপাত কত দুঃখই না বহিয়া গেল, কিন্তু একবার যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যুবরাজের উৎসব-সম্বন্ধে শেষ দিন পর্য্যন্ত সে আদেশ তাঁহার প্রত্যাহার করেন নাই। তার পর অকস্মাৎ একদিন চৌরিচৌরার ভীষণ দুর্ঘটনা

ঘটিল। নিরুপদ্রব সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস টলিল,—তখন এ কথা সমস্ত জগতের কাছে অকপট ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহার লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হইল না। নিজের ভুল ও ত্রুটি বারংবার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আসন্ন ও সুতীব্র সংঘর্ষের সর্ব্বপ্রকার সম্ভাবনা স্বহস্তে রোধ করিয়া দিলেন। বিন্দুমাত্রও কোথাও তাঁহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত অসহযোগ পন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকাল-বিলম্বে দিল্লীর নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস-কার্য্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, I have lost all fear of men—জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা এ-দেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়া গেছেন, তাহার দণ্ডভোগও তাঁহাদের ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি ভয়হীনতার পরীক্ষা তাহাদিগকে কেবল এই দিক দিয়াই দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে বড় পরীক্ষা ছিল,—অনুরক্ত ও ভক্তের অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও বিদ্রূপের দণ্ড—একথা লোকে একপ্রকার ভুলিয়াইছিল—যাবার পূর্ব্বে দেশের কাছে এই পরীক্ষাটাই তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল, অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া যাইতে হইল যে সম্ভ্রম, মর্য্যাদা, যশ, এমন কি, জন্মভূমির উপরও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ইহা পারা যায় না। কিন্তু এত বড় শান্ত শক্তি ও সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠার মর্য্যাদা ধর্ম্মহীন উদ্ধত রাজশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিল। মহাত্মাকে সেদিন রাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু কিছুকাল হইতে এই সম্ভাবনা জনশ্রুতিতে ভাসিতেছিল, অতএব ইহা আকস্মিকও নয়, আশ্চর্য্যও নয়। কারাদণ্ড অনিবার্য্য। ইহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। ভাবনা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিজের জন্য নয়, এ চিন্তা সমষ্টিগতভাবে সমস্ত দেশের জন্য। যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কোন-কিছু নাই, আর্ত্তের জন্য, পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে, যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল। দেশের মঙ্গলেই রাজশ্রীর মঙ্গল, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ, শাসনতন্ত্রের এই মূল তত্ত্বটি আজ এ-দেশে সত্য কি না, এখানে দেশের হিতার্থে-ই রাজ্য পরিচালনা, প্রজার ভাল হইলেই রাজার ভাল হয় কিনা, ইহা চোখ মেলিয়া আজ

দেখিতে হইবে। আত্ম-বঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া নয়, হিংসা ও আক্রোশের নিষ্ফল অগ্নিকাণ্ড করিয়া নয়,—কারারুদ্ধ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইয়া এবং তাঁহারি মত লোভ, মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া। অর্থহীন কারাবরণ করিয়া নয়,—কারাবরণের অধিকার অর্জ্জন করিয়া।

হয়ত ভালই হইয়াছে। শাসনযন্ত্রের নাগপাশে আজ তিনি আবদ্ধ। তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত বিশ্রামের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু দেশের ভার যখন আজ দেশের মাথায় পড়িল,—একটা কথা তিনি বারবার বলিয়া গিয়াছেন, দানের মত স্বাধীনতা কোনদিন কাহারও হাত হইতে গ্রহণ করা যায় না, গেলেও তাহা থাকে না, ইহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জ্জন করিতে হয় তাঁহার অবর্ত্তমানে আপনাকে সার্থক করিবার এই পরম সুযোগটাই হয়ত আজ সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে জুটিয়াছে। যাহারা রহিল, তাহারা নিতান্তই মানুষ। কিন্তু মনে হয়, অসামান্যতার পরম গৌরব আজ কেবল তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

আরও এ টা পরম সত্য তিনি অত্যন্ত পরিস্ফুট করিয়া গেছেন। কোন দেশ যখন স্বাধীন সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন দেশাত্মবোধের সমস্যাও খুব জটিল হয় না, স্বদেশ-প্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিয়তিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয় না। সেদেশের নেতৃস্থানীয়গণকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলেও হয়ত চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত, রুগ্ন ও মরণাপন্ন হইয়া উঠে, তখন ঐ ঢিলাঢালা কর্ত্তব্যের আর অবকাশ থাকে না। তখন এই দুর্দ্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন, সকল দেশের সমস্ত চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে পরার্থপরতার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয়—কাজে, চালাকির মার-প্যাঁচে নয়—সরল সোজা পথে, স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়—সকল চিন্তা, সকল উদ্বেগ, সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিয়া। ইহার অন্যথা বিশ্বাস করা চলে না। এই পরম সত্যটিকে আর আমাদের বিস্মৃত হইলে কোনমতে চলিবে না। এই পরীক্ষা দিতে গিয়াই আজ শত-সহস্র ভারতবাসী রাজকারাগারে। এবং এইজন্যই ইহাকে 'স্বরাজ আশ্রম' নাম দিয়াও তাঁহারা আনন্দে রাজদণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন।

প্রজার কল্যাণের সহিত রাজশক্তির আজ কঠিন বিরোধ বাধিয়াছে। এই বিগ্রহ, এই বোঝাপড়া কবে শেষ হইবে সে শুধু জগদীশ্বরই জানেন, কিন্তু রাজায় প্রজায় এই সংঘর্ষ প্রজ্জ্বলিত করিবার যিনি সর্ব্বপ্রধান পুরোহিত, আজ যদিও তিনি অবরুদ্ধ, কিন্তু, এই বিরোধের মূল তথ্যটা আবার একবার নূতন করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

সংশয় ও অবিশ্বাসই সকল সদ্ভাব, সকল বন্ধন, সকল কল্যাণ পলে পলে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। শাসনতন্ত্র কহিলেন, "এই" প্রজাপুঞ্জ জবাব দিতেছে,—"না, এই নয়, তোমার মিথ্যা কথা।" রাজশক্তি কহিতেছেন, "তোমাকে এই দিব, এতদিনে দিব।" প্রজাশক্তি চোখ তুলিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, "তুমি আমাকে কোনদিন কিছু দিবে না,—নিছক বঞ্চনা করিতেছ।"

"কে বলিল?"

"কে বলিল। আমার সমস্ত অস্থি-মজ্জা, আমার সমস্ত প্রাণশক্তি, আমার আত্মা, আমার ধর্ম্ম, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পেটের সমস্ত নাড়িভূঁড়িগুলা পর্য্যন্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া কেবল এই কথা ক্রমাগত বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শোনে কে? চিরদিন তুমি শুনিবার ভান করিয়াছ, কিন্তু শোন নাই। আজও সেই পুরনো অভিনয় আর একবার নুতন করিয়া করিতেছ মাত্র। তোমাকে শুনাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জগতের কাছে আমার লজ্জা ও হীনতার অবধি নাই; কিন্তু আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তোমার কাছে নালিশ করিব না, শুধু আর একবার আমার বেদনার কাহিনীটা দেশের কাছে একে একে ব্যক্ত করিব।"

ভূতপূর্ব্ব ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেব সেবার যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন এই বাংলাদেশেরই একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙ্গালী তাহাকে একখানা বড় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহার মস্ত একটা জবাবও পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আগাগোড়া ভাল ভাল ফাঁকা কথার বোঝায় ভরা চিঠিখানির ফাঁকিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই, এবং বোধ করি মনেও থাকে না। কিন্তু এ পক্ষের মোট বক্তব্যটা আমার বেশ স্মরণ আছে। ইনি বার বার করিয়া, এবং বিশদ করিয়া ওই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তর্কটাই চার পাতা চিঠি ভরিয়া সাহেবকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। যেন এতবড় নূতন তত্ত্বকথা এই ভারতভূমি ছাড়া বিদেশী সাহেবের আর কোথাও শুনিবার সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ আমার বিশ্বাস, সাহেবের বয়স অল্প হইলেও এ-তত্ত্ব তিনি সেই প্রথমও শুনেন নাই এবং সেই প্রথমও জানিয়া যান নাই। কিন্তু জানা এক এবং তাহাকে মানা আর। তাই সাহেবকে কেবল এমন সকল কথা এবং ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, যাহা দিয়া চিঠির পাতা ভরে, কিন্তু অর্থ হয় না।

কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিকই সত্য! জগতে কোথাও কি ইহার ব্যতিক্রম নাই? গভর্নমেণ্ট আমাদের অর্থ দিয়া বিশ্বাস করেন না, পল্টন দিয়া বিশ্বাস করেন না, পুলিশ দিয়া বিশ্বাস করেন না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু শুধু কেবল এই

জন্যই কি আমরাও বিশ্বাস করিব না এবং এই যুক্তিবলেই দেশের সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যের সহিত অসহযোগ করিয়া বসিয়া থাকিব? গভর্ণমেণ্ট ইহার কি কি কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন জানি না, খুব সম্ভব কিছুই দেন না, দিলেই হয়ত ওই মণ্টেগু সাহেবের মতই দেন—যাহার মধ্যে বিস্তর ভাল কথা থাকে, কিন্তু মানে থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের অফিসিয়াল বুলি ছাড়িয়া যদি স্পষ্ট করিয়া বলেন, "তোমাদের এই সকল দিয়া বিশ্বাস করি না খুব সত্য কথা, কিন্তু সে শুধু তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত।"

আমরা রাগ করিয়া জবাব দিই, "ও আবার কি কথা? বিশ্বাস কি কখনও এক-তরফা হয়? তোমরা বিশ্বাস না করলে আমরাই বা করিব কি করিয়া?"

অপর পক্ষ হইতে যদি পাল্টা প্রশ্ন আসিত, ও বস্তুটা দেশ কাল-পাত্র-ভেদে একতরফা হওয়া অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র গলার জোরেই জয়ী হওয়া যাইত না। এবং প্রতিপক্ষ-সাধারণ একটা উদাহরণের মত যদি কহিতেন, পীড়িত রুগ্ন ব্যক্তি যখন অস্ত্রচিকিৎসায় চোখ বুঁজিয়া ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন বিশ্বাস বস্তুটা একতরফাই থাকে। পীড়িতের বিশ্বাসের অনুরূপ জামিন ডাক্তারের কাছে কেহ দাবী করে না এবং করিলেও মেলে না! চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, তাঁহার সাধু ও সদিচ্ছাই একমাত্র জামিন এবং সে তাঁহার নিছক নিজেরই হাতে। পরকে তাহা দেওয়া যায় না। রোগীকে বিশ্বাস করিতে হয় আপনারই কল্যাণে, আপনারই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য।

এ পক্ষ হইতেও প্রত্যুত্তর হইতে পারে, ওটা উদাহরণেই চলে, বাস্তবে চলে না। কারণ, অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করিবার জামিন আছে, কিন্তু তাহা ঢের বড়, এবং তাহা গ্রহণ করেন চিকিৎসকের হৃদয়ে বসিয়া ভগবান নিজে। তাঁর আদায়ের দিন যখন আসে, তখন না চলে ফাঁকি, না চলে তর্ক। তাই বোধ হয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারামারি, কাটাকাটি, অস্ত্র-শস্ত্র, বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন-নিবেদন, অভিযোগ-অনুযোগ এই আত্মার কাছে। রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে, কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে, তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং সহানুভূতিই যখন জীবের সকল সুখ-দুঃখ, সকল জ্ঞান, সকল কর্ম্মের আধার, তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আজ স্বার্থ ও অনাচারে ইহা যত মলিন, যত আচ্ছন্নই না হইয়া থাক্, একদিন ইহাকে নির্ম্মল ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এই অটল বিশ্বাস হইতে তিনি এক মুহূর্ত্তও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু লোভ ও মোহ দিয়া স্বার্থকে, ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না, তাহা

মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে, আপনাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে বলি দিতেই এই ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকে তিনি বীরের ধর্ম্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতা-কলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহাই একমাত্র সমাধান। গুলি-গোলা, বন্দুক-বারুদ, কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাঁহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে, এই পরম সত্যকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসা-ব্রতকে মাত্র ক্ষণিকের উপায় বলিয়া নয়, চিরজীবনের একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এইজন্যই তিনি ভারতীয় আন্দোলনকে রাজনীতিক না বলিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় দিনের পর দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছিলেন। বিপক্ষ উপহাস করিয়াছে, স্বপক্ষ অবিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু কোনটাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। ইংরাজ-রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন, কিন্তু মানুষ-ইংরাজদের আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে।

কিন্তু এই অচঞ্চল নিষ্কম্প শিখাটির মহিমা বুঝিয়া উঠা অনেকের দ্বারাই দুঃসাধ্য। তাই সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু যখন মহাত্মাজীর কথা—"I would decline to gain India's. Freedom at the cost of non-violence, meaning that India will never gain her Freedom without non-violence" তুলিয়া ধরিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, "মহাজীর লক্ষ্য—সত্যাগ্রহ, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজলাভ এই লক্ষ্যের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু ভুল লক্ষ্য নহে", তখন তিনিও এই শিখার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অপরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া মানবের পূর্ণ স্বাধীনতা যে কত বড় সত্য বস্তু এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আগ্রহও যে কত বড় স্বরাজসাধনা, তাহা তিনিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রভৃতি নাই, সত্য সম্পূর্ণ এবং সত্যই সত্যের শেষ। এবং এই চাওয়ার মধ্যেই মানব জাতির সর্ব্বপ্রকার এবং সর্ব্বোত্তম লক্ষ্যের পরিণতি রহিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন, যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়। তাহার ক্ষুব্ধ চিত্তের কৃপণের দেয় অর্থ নয়, তাহার দাতার প্রসন্ন হৃদয়ের সার্থকতার দান। অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া-নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ-কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কোথাও ত একটি তিলও কম পড়ে নাই? তাই

তিনি আজ ও-সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন, পণ করিয়াছিলেন—মানবাত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।

সর্ব্বান্তঃকরণে স্বাধীনতা বা স্বরাজকামী তিনি যখন ইংরাজ-রাজত্বের সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বিস্তর কটু-কথা শুনিতে হইয়াছিল। বহু কটূক্তির মধ্যে একটা তর্ক এই ছিল যে, ইংরাজ-রাজত্বের সহিত আমাদের চিরদিনের অবিচ্ছিন্ন বন্ধন কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। নিরুপদ্রব শান্তির জন্যই বা এত ব্যাকুল হওয়া কেন? পরাধীনতা যখন পাপ এবং পরের স্বাধীনতা অপহরণকারীও যখন এতবড় পাপী, তখন যেমন করিয়া হউক, ইহা হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম্ম। ইংরাজ নিরুপদ্রব-পথে রাজ্য স্থাপন করে নাই, এবং রক্তপাতেও সংকোচ বোধ করে নাই, তখন আমাদেরই শুধু নিরুপদ্রবপন্থী থাকিতে হইবে, এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করি কিসের জন্য? কিন্তু মহাত্মাজী কর্ণপাত করেন নাই, তিনি জানিতেন এ উক্তি সত্য নয়, ইহার মধ্যে একটা মস্ত বড় ভুল প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বস্তুতঃ, এ-কথা কিছুতেই সত্য নয়, জগতে যাহা কিছু অন্যায়ের পথে, অধর্ম্মের পথে একদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে, আজ তাহাকে ধ্বংস করাই ন্যায়, যেমন করিয়া হোক তাহাকে বিদূরিত করাই আজ ধর্ম্ম। যে ইংরাজ রাজকে একদিন প্রতিহত রাইক ছিল দেশের সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম, সেদিন তাহাকে ঠেকাইতে পারি নাই বলিয়া আজ যে-কোন পথে তাহাকে বিনাশ করাই দেশের একমাত্র শ্রেয়, এ-কথা কোনমতেই জোর করিয়া বলা চলে না। অবাঞ্ছিত জারজ সন্তান অধর্ম্মের পথেই জন্মলাভ করে, অতএব ইহাকে বধ করিয়াই স্বাধীনতার প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, তাহা সত্য নয়।*

* ১৩২৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'নারায়ণ' পত্রে প্রকাশিত।

মহাত্মার পদত্যাগ

সংবাদ আসিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। খবরটা আকস্মিক নয়। কিছুদিন যাবৎ এমন একটা সম্ভাবনা বাতাসে ভাসিতেছিল, মহাত্মা রাজনীতির প্রবাহ হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া স্বীয় বিশাল ব্যক্তিত্ব, বিরাট কর্ম্মশক্তি ও একাগ্রচিত্ত ভারতের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করিবেন। তাহাই হইয়াছে। দেখা গেল, জাতীয় মহাসমিতির সভামণ্ডপে বহু কর্ম্মী, বহু ভক্ত, বহু বন্ধুজনের আবেদন-নিবেদন অনুনয়-বিনয় তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। পারার কথাও নয়। বহুবার বহু বিষয়েই প্রমাণিত হইয়াছে, অশ্রুধারার প্রবলতা দিয়া কোনদিন মহাত্মাজীকে বিচলিত করা যায় না। কারণ, তাঁর নিজের যুক্তি ও বুদ্ধির বড় সংসারে আর কিছু আছে, বোধ হয় তিনি ভাবিতেই পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এই কথাই বলি না, এ বুদ্ধি সামান্য বা সাধারণ। এ বুদ্ধি অসামান্য, অসাধারণ। অনুরাগীগণের ঢাকিয়া রাখার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ বুদ্ধি তাঁহার কাছে অবশেষে এ সত্য উদঘাটিত করিয়াছে যে, কংগ্রেসে তাঁহার প্রয়োজনীয়তা অন্ততঃ বর্ত্তমানের জন্য শেষ হইয়াছে, অথচ বিস্ময় এই যে, তাঁহার দুঃসহ প্রভুত্বে যাঁহারা নিজেদের উৎপীড়িত লাঞ্ছিত জ্ঞান করিয়াছেন, মহাত্মার চিন্তা ও কার্য্যপদ্ধতির অনুধাবন করিতে পদে পদে যাঁহারা দ্বিধাগ্রস্থ হইয়াছেন, নেপথ্যে অনুযোগ-অভিযোগের যাঁহাদের অবধি ছিল না, তাঁহারাও সে কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। বরঞ্চ, নানারূপে তাঁহার প্রসাদ-লাভের জন্য যত্ন করিয়া সেই নেতৃত্বেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। বোধ করি শঙ্কা তাঁহাদের এই যে, এত বড় ভারতে নেতৃত্ব করিবার লোক আর তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন না। কিন্তু খুঁজিয়া না পাওয়া গেলেও এ-কথা বলিব যে, যেখানে স্বাধীন চিন্তা স্বাধীন উক্তি স্বাধীন অভিমত বারংবার প্রতিরুদ্ধ হইয়া জাতীয় মহাসমিতিকে পঙ্গুপ্রায় করিয়া আনিয়াছে, সেখানে মহাত্মার অথবা কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌম আধিপত্য কল্যাণকর নয়।

আজ মহাত্মার মত, পথ ও যুক্তির আলোচনা করিব না। চরকায় দেশের অধোগতি প্রতিহত করিতে পারে কি না, অদ্রোহ অসহযোগে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আনিতে পারে কি না, আইন-অমান্য আন্দোলনের শেষ পরিণাম কি, এ সকল

প্রশ্ন আজ থাক্, কিন্তু মহাত্মার এ দাবী সত্য বলিয়াই স্বীকার করি যে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

একদিন কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন অভিযোগ-অনুযোগের সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিত। বঙ্গ-বিচ্ছেদের দিনেও জাতীয় মহাসমিতি বঙ্গকে তাহার অঙ্গ বলিয়াই ভাবিতে জানিত না, বাংলার প্রশ্ন ছিল শুধু বাংলারই, বোম্বাই-আহমদাবাদ বাঙ্গালীকে এক টাকার কাপড় চার টাকায় বিক্রী করিত, কংগ্রেস নিরুপায় বিস্মিত-চক্ষে শুধু চাহিয়া থাকিত,—কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন অক্ষম জাতীয় মহাসমিতিকে নিজের অদম্য অকপট বিশ্বাসের জোরে সমগ্রতা আনিয়া দিলেন মহাত্মা, দিলেন শক্তি, সঞ্চারিত করিলেন প্রাণ, তাঁহার এই দানই সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করিব। উত্তরকালে হয়ত তাঁহার মত ও পথ উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহার প্রবর্ত্তিত আদর্শের হয়ত চিহ্নও থাকিবে না, তথাপি তিনি যাহা দিয়া গেলেন, সমস্ত পরিবর্ত্তনের মাঝেও তাহা অমর হইয়া রহিবে। শৃঙ্খলমুক্ত ভারত ঋণ তাঁহার কোনও দিন বিস্মৃত হইবে না। আজ কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানেরতিনি বাহিরে আসিয়াছেন মাত্র, কিন্তু ইহাকে ত্যাগ করেন নাই, করিবার উপায় নাই। যে শিশুকে তিনি মানুষ করিয়াছেন, সে আজ বড় হইয়াছে। তাই তাহাকে নিজের কঠিন শাসন পাশ হইতে মহাত্মা স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলেন। ইহাতে শোক করিবার কোন কারণ ঘটে নাই,—এই মুক্তিতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে এই আমার আশা।*

---

* ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 'কিশলয়' পত্রে প্রকাশিত।

সত্যাশ্রয়ী

ছাত্র, যুবক ও সমবেত বন্ধুগণ,—বাঙলাভাষায় শব্দের অভাব ছিল না; অথচ এই আশ্রমের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা তাঁরা বেছে বেছে এর নাম দিয়েছিল 'অভয় আশ্রম'। বাইরের লোকসমাজে প্রতিষ্ঠানটিকে অভিহিত করার নানা নামই ত ছিল, তবু তাঁরা বললেন—অভয় আশ্রম। বাইরের পরিচয়টা গৌণ, মনে হয় যেন সঙ্কল্প স্থাপনা করে বিশেষভাবে তাঁরা নিজেদেরই বলতে চেয়েছিলেন—স্বদেশের কাজে যেন আমরা নির্ভয় হতে পারি, এ-জীবনের যাত্রাপথে যেন আমাদের ভয় না থাকে। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, দৈন্য ও হীনতার মূলে মনুষ্যত্বের চরম শত্রু ভয়কে উপলব্ধি করে বিধাতার কাছে তাঁরা অভয় বর প্রার্থনা করে নিয়েছিলেন। নামকরণের ইতিহাসে এই তথ্যটির মূল্য আছে, এবং আজ আমার মনের মধ্যে কোন সংশয় নেই যে, সে আবেদন তাঁদের বিধাতার দরবারে মঞ্জুর হয়েছে। কর্ম্মসূত্রে এঁদের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। দূর থেকে সামান্য যা-কিছু বিবরণ শুনতে পেতাম, তার থেকে মনের মধ্যে আমার এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল—একবার নিজের চোখে গিয়ে সমস্ত দেখে আসব। তাই, আমার পরম প্রীতিভাজন প্রফুল্লচন্দ্র যখন আমাকে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে এখানে আহ্বান করলেন, তাঁর সে আমন্ত্রণ আমি নিরতিশয় আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলাম। শুধু একটি মাত্র সর্ত্ত করিয়ে নিলাম যে, অভয় আশ্রমের পক্ষ থেকে আমাকে অভয় দেওয়া হোক যে, মঞ্চে তুলে দিয়ে আমাকে অসাধ্য-সাধনে নিযুক্ত করা হবে না। বক্তৃতা দেবার বিভীষিকা থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। জীবনে যদি কিছুকে ভয় করি, ত একেই করি। তবে এটুকুও বলেছিলাম—যদি সময় পাই ত দু-এক ছত্র লিখে নিয়ে যাব। সে লেখা প্রয়োজনের দিক দিয়েও যৎসামান্য, উপদেশের দিক দিয়েও অকিঞ্চিৎকর। ইচ্ছা ছিল, কথার বোঝা আর না বাড়িয়ে উৎসবের মেলামেশায় আপনাদের কাছ থেকে আনন্দের সঞ্চয় নিয়ে ঘরে ফিরব। আমি সে সঙ্কল্প ভুলিনি এবং এই দু-দিনে সঞ্চয়ের দিক থেকেও ঠকিনি। কিন্তু এ আমার নিজের দিক। বাইরেও একটা দিক আছে, সে যখন এসে পড়ে, তার দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। তেমনি এলো প্রফুল্লচন্দ্রের ছাপানো কার্য্য-তালিকা। রওনা হতে হবে, সময় নেই,—কিন্তু পড়ে দেখলাম, অভয় আশ্রম পশ্চিম-বিক্রমপুর-নিবাসী ছাত্র ও যুবকদের মিলনক্ষেত্রের আয়োজন করছে। ছেলেরা

এখানে সমবেত হবেন। তাঁরা আমাকে অব্যাহতি দেবেন না; বলবেন,—কিশোর বয়স থেকে ছাপা-বইয়ের ভিতর দিয়ে আপনার অনেক কথা শুনেছি, আজও যখন কাছে পেয়েছি, তখন যা হোক কিছু না শুনে ছাড়ব না। তারই ফলে এই কয়েক ছত্র আমার লেখা। মনে হবে, তা বেশ ত, কিন্তু এতবড় ভূমিকার কি আবশ্যক ছিল? তার উত্তরে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভিতরের বস্তু যখন কম থাকে, তখন মুখবন্ধের আড়ম্বর দিয়েই শ্রোতার মুখবন্ধের প্রয়োজন হয়।

নিজের চিন্তাশীলতায় নূতন কথা বলবার আমার শক্তি-সামর্থ্য কিছুই নাই, স্বদেশ-বৎসল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে বহু সভা-সমিতিতে যে-সকল কথা আপনারা বহুবার শুনেছেন, আমি সেই সবই শুধু লিপিবদ্ধ করে এনেছি। ভেবেছি অভিনবত্ব নাই থাক, মৌলিকত্ব যত বড় হোক, তার চেয়েও বড় সত্য কথা। পুরানো বলে সে তুচ্ছ নয়, তাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়াও বড় কাজ। তেমনি মাত্র গুটি দুই-তিন কথাই আজ আমি আপনাদের কাছে উল্লেখ করব।

কিছুদিন থেকে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করে আসছি। ভাবি, এতবড় সত্যটা এতকাল গোপনে ছিল কি করে? সেদিনও সবাই জানত, সবাই মানত—পলিটিক্স জিনিসটা কেবল বুড়োদেরই ইজারা মহল। আবেদন-নিবেদন, মান-অভিমান থেকে শুরু করে চোখ-রাঙানো পর্য্যন্ত বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে যা-কিছু মোকাবিলার দায়িত্ব, সব তাদের। ছেলেদের এখানে প্রবেশ নিষেধ। শুধু অনধিকার চর্চ্চা নয়, গর্হিত অপরাধ। তারা ইস্কুল-কলেজে যাবে, শান্ত-শিষ্ট ভাল ছেলে হয়ে পাশ করে বাপ-মায়ের মুখোজ্জ্বল করবে—এই ছিল সর্ব্ববাদিসম্মত ছাত্র-জীবনের নীতি। এর যে কোন ব্যত্যয় ঘটতে পারে, এর বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন মাত্র উঠতে পারে, এ ছিল যেন লোকের স্বপ্নাতীত। হঠাৎ কোথাকার কোন্ উল্টো ঝোড়ো হাওয়ায় এর কেন্দ্রটাকে ঠেলে নিয়ে একেবারে যেন পরিধির বাইরে ফেলে দিলে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন অকস্মাৎ ঘনান্ধকারের বুক চিরে বস্তু প্রকাশ করে, নৈরাশ্য ও বেদনার অগ্নিশিখা তেমনি করেই আজ সত্য উদ্ঘাটিত করেছে। যা চোখের অন্তরালে ছিল, তা দৃষ্টির সুমুখে এসে পড়ছে। সমস্ত ভারতবর্ষময় কোথাও আজ সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, এতদিন লোকে যা ভেবে এসেছে তা ভুল, সত্য তাতে ছিল না বলেই বিধাতা বারংবার ব্যর্থতার কালিমা দেশের সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছেন। এ গুরুভার বৃদ্ধদের জন্যে নয়, এ ভার যৌবনের। তাই ত আজ ইস্কুল-কলেজে, নগর-পল্লীতে, ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে যৌবনের ডাক পড়েছে। ডাক বৃদ্ধরা দেয়নি, দিয়েছেন বিধাতাপুরুষ নিজে। তাঁর আহ্বান কানের মধ্যে দিয়ে এদের বুকে পৌঁছেছে যে, জননীর হাতে

পায়ে বাঁধা এই কঠিন শৃঙ্খল ভাঙবার শক্তি অতি প্রাজ্ঞ প্রবীণের হিসাবী বুদ্ধির মধ্যে নেই, এ শক্তি আছে শুধু যৌবনের প্রাণ-চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে। এই নিঃসংশয় আত্ম-বিশ্বাসে আজ তাকে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। এতদিন বিদেশীয় বণিক-রাজশক্তির কোন চিন্তাই ছিল না, বৃদ্ধের রাজনীতিচর্চ্চাকে খেলাচ্ছলেই গ্রহণ করে এসেছিল, কিন্তু এখন তার আর খেলার অবকাশ নেই। দিকে দিকে এ চিহ্ন কি আপনাদের চোখে পড়েনি? যদি না পড়ে থাকে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে বলি। রাজশক্তি আজ ব্যাকুল এবং অচির-ভবিষ্যতে এই অন্ধ-ব্যাকুলতায় দেশ ছেয়ে যাবে—এ সত্যও আজ আপনাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে বলি। আরও বলি, সেদিন যেন এই সত্যোপলব্ধির অবমাননা না ঘটে!

এখানে একটা কথা বলে রাখি। কারণ, সন্দেহ হতে পারে, সর্ব্বদেশেই ত রাজনীতির পরিচালনার ভার বৃদ্ধদের স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু এখানে তার অন্যথা হবে কেন? অন্যথা এখানেও হবে না, একদিন তাঁদের 'পরেই রাজ্যশাসনের দায়িত্ব পড়বে। কিন্তু সেদিন আজ নয়। এখনও সে এসে পৌঁছয়নি। কারণ, দেশ শাসন করা ও স্বাধীন করা এক বস্তু নয়। এ-কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, রাজনীতি-পরিচালনা একটা পেশা। যেমন ডাক্তারি, ওকালতি, প্রফেসারি,—এমনি। অন্যান্য সমুদয় বিদ্যার মত একেও শিক্ষা করতে হয়, আয়ত্ত করতে সময় লাগে। তর্কের মার-প্যাঁচ, কথা-কাটাকাটির লড়াই, আইনের ফাঁক খুঁজে কড়া করে দুকথা শুনিয়ে দেওয়া,—আবার যথাসময়ে আত্মসংবরণ ও বিনীত ভাষণ,—এ-সকল কঠিন ব্যাপার, এবং বয়স ছাড়া এতে পারদর্শিতা জন্মে না। এরই নাম পলিটিক্স। স্বাধীন দেশে এর থেকে জীবিকা-নির্ব্বাহ চলে। কিন্তু পরাধীন দেশে সে ব্যবস্থা নয়। সেখানে দেশের মুক্তি অর্জ্জন-পথে পদে পদে আপনাকে বঞ্চিত করে চলতে হয়। এ তার পেশা নয়, এ তার ধর্ম্ম। তাই এই পরম ত্যাগের ব্রত শুধু যৌবনই গ্রহণ করতে পারে। এ তার স্বাধিকার চর্চ্চা, অনধিকার-চর্চ্চা নয় বলেই রাজশক্তি একে ভয়ের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছে। এ-ই স্বাভাবিক, এবং এর গতি-পথে বাধার অবধি থাকবে না, এ-ও তেমনি স্বাভাবিক। কিন্তু এই সত্যটাকে ক্ষোভের সঙ্গে নয়, আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে আজ আপনাদের আমি আহ্বান করি।

শব্দের ঘটায় ও বাক্যের ছটায় উত্তেজনার সৃষ্টি করতে আমি অপারগ। শান্ত-সমাহিত চিত্তে সত্যোপলব্ধি করতেই আমি অনুরোধ করি। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, আমাদের এই ছিল, এই ছিল, এই ছিল এবং এই আছে, এই আছে, এই

আছে, সুতরাং ঘুম ভেঙে চোখ রগড়ে উঠে বসলেই সব পাব, এ যাদুবিদ্যার আশ্বাস দিতে আমার কোনকালেই প্রবৃত্তি হয় না। জগৎ মানুক আর না-মানুক, আমরা মস্ত বড় জাতি, এ কথা বহু আস্ফালনে দিকে দিকে ঘোষণা করে বেড়াতেও যেমন আমি গৌরব বোধ করিনে, তেমনি, বিদেশী রাজশক্তিকে ধিক্কার দিয়ে ডেকে বলতে লজ্জা বোধ করি যে, হে ইংরাজ, তোমরা কিছুই নয়, কারণ অতীতকালে আমরা যখন এই সমস্ত বড় বড় কাজ করেছি, তোমরা তখন শুধু গাছের ডালে ডালে বেড়াতে। এবং বিদ্রূপ করে কেউ যদি আমাকে বলে—তোমরা যদি সত্যই এত বড়, তবে হাজার বছর ধরে একবার পাঠান, একবার মোগল, একবার ইংরাজের পায়ের তলে তোমাদের মাথা মুড়োয় কেন, তবে এ উপহাসের প্রত্যুত্তরেও আমি ইতিহাসের পুঁথি ঘেঁটে অন্যান্য জাতির দুর্দ্দশার নজির দেখাতেও ঘৃণা বোধ করি। বস্তুতঃ এ তর্কে লাভ নেই। বিগত দিনে তোমার আমার কি ছিল, এ নিয়ে গ্লানি বাড়িয়ে কি হবে,—আমি বলি, ইংরাজ, আজ তুমি বড়; শৌর্য্যে, বীর্য্যে, স্বদেশ-প্রেমে তোমার জোড়া নেই; কিন্তু আমারও বড় হবার সমস্ত মালমশলা মজুত। আজ দেশের যৌবন-চিত্ত পথের খোঁজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাকে ঠেকাবার শক্তি কারও নেই, তোমারও না। তুমি যত বড়ই হও, সে তোমারই মত বড় হয়ে তার জন্মের অধিকার আদায় করে নেবেই নেবে।

কিন্তু কোন্ সংজ্ঞায় যৌবনকে নির্দ্দেশ করা যায়? অতীত যার কাছে অতীতের বেশী নয়, সে যত বৃহৎ হোক, মুগ্ধ চিত্ত-তলে তাকেই লালন করে কালক্ষেপের অবসর যার নেই, যার বৃহত্তম আশা ও বিশ্বাস 'অনাগতের অন্তরালে কল্পনায় উদ্ভাসিত—সেই ত যৌবন। এখানেই বৃদ্ধের পরাজয়। শক্তি তার নিঃশেষিতপ্রায়, ভবিষ্যত আশাহীন শুষ্ক, সম্মুখ অবরুদ্ধ, শেষ-জীবনের বাকী দিন-ক'টা তাই প্রাণপণে অতীতকে আঁকড়ে থাকাই তার সান্ত্বনা। এ অবলম্বন সে কোনমতেই ছাড়তে পারে না; কেবলই ভয় হয়, এর থেকে বিচ্যুত হলে তার দাঁড়াবার স্থান আর কোথাও থাকবে না। স্থিতিশীল শান্তিই তার একান্ত আশ্রয়, বহুদিন আবদ্ধ খাঁচার পাখীর মত, মুক্তিই তার বন্ধন, মুক্তিই তার সুনিয়ন্ত্রিত অভ্যাস-সিদ্ধ প্রাণধারণ-প্রণালীর যথার্থ অন্তরায়। এইখানেই যৌবনের সঙ্গে তার প্রচণ্ড বিভেদ। দেশের, সমাজের, জাতির মুক্তি-বিধানের দায়িত্ব যতদিন এই বৃদ্ধের হাতেই থাকবে, বন্ধনের গ্রন্থিতে পাকের পর পাক পড়তেই থাকবে, খুলবে না। কিন্তু যৌবন-ধর্ম্ম এর বিপরীত। তাই যেদিন থেকে শুনতে পেলাম, স্কুল-কলেজের ছাত্র আর রাজনীতিকে—যে রাজনীতি কেবলমাত্র পলিটিক্স নয়, যে রাজনীতি স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে ব্রতের মত,

ধর্মের মত, তাকেই গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছে, এ কুসংস্কারের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে যে, এ বস্তু তার ছাত্রজীবনের পরিপন্থী—সেইদিনই আমার প্রতীতি জন্মেছে, এবার সত্য সত্যই আমাদের দুর্গতি মোচন হবে। ছাত্র এবং দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের কাছে আমার অন্তরের নিবেদন, এ সম্বন্ধ থেকে যেন তাঁরা কারও কথায় কোন প্রলোভনেই বিচ্যুত না হন।

এ সম্বন্ধে বহু মনীষী ব্যক্তিই বহু উপদেশ দিয়েছেন। তোমরা এই কর, এই কর, এই কর,—এই তোমাদের করণীয়, এই আচরণই প্রশস্ত, স্বার্থত্যাগ চাই, বুকের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি জ্বালিয়ে তোলা প্রয়োজন, জাতিভেদ অস্বীকার, ছুঁৎমার্গ পরিহার, খদ্দর পরিধান—এমনি অনেক আবশ্যকীয় ও মূল্যবান আদেশ এবং উপদেশ। এই হলো প্রোগ্রাম। আবার অন্যপ্রকার উপদেশ, ভিন্ন প্রোগ্রামও আছে। আপনাদেরই মত দেশের বহু ছাত্র ও যুবক আমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আমরা কি করব আপনি বলে দিন। উত্তরে আমি বলি,—প্রোগ্রাম ত আমি দিতে পারিনে, আমি শুধু তোমাদের বলতে পারি, তোমরা দৃঢ়পণে 'সত্যাশ্রয়ী' হও। তাঁরা প্রশ্ন করেন, এ ক্ষেত্রে সত্য কি? বিভিন্ন মতামত ও প্রোগ্রাম যে আমাদের উদভ্রান্ত করে দেয়। জবাবে আমি বলি, সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা relation দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ কাল পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্ত্তন বুদ্ধিপূর্ব্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা। যেমন বহুপূর্ব্বকালে রাজাই ছিলেন ভগবানের প্রতিনিধি। দেশের লোকে একথা মেনে নিয়েছিল। একে অসত্য বলতে আমি চাইনে। সেই প্রাচীন যুগে হয়ত এই ছিল সত্য, কিন্তু আজ জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনের ফলে এ কথা যদি ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়, তবুও কোন এক সাবেক দিনের যুক্তি ও উক্তি-মাত্রকেই অবলম্বন করে একেই সত্য বলে যদি কেউ তর্ক করে, তাকে আর যাই কেন না বলি, 'সত্যাশ্রয়ী' বলব না। কিন্তু শুধুমাত্র মানাই এর সবটুকু নয়,—বস্তুতঃ আর একদিক দিয়ে কোন সার্থকতাই এর নেই—যদি না চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে, জীবনযাত্রার পদে পদে এ সত্য বিকশিত হয়ে ওঠে। ভুল জানা, ভ্রান্ত ধারণা, বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু ভিতরের জানা ও বাইরের আচরণে যদি সামঞ্জস্য না থাকে,—অর্থাৎ যদি জানি একরকম, বলি আর একরকম এবং করি আর একরকম,—তবে জীবনের এত বড় ব্যর্থতা, এত বড় ভীরুতা আর নেই। যৌবন-ধর্ম্মকে এতখানি ছোট করতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। ছুঁৎমার্গ, জাতিভেদ, খদ্দর পরিধান, জাতীয় শিক্ষা, দেশের কাজ—এ সব সত্য কি

অসত্য, ভাল কি মন্দ, এ আলোচনা আমি করব না, এর সত্যাসত্য বুঝিয়ে দেবার আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আপনারা অনেক পাবেন, কিন্তু আমি কেবল এই নিবেদনই করব, আপনাদের বুঝার সঙ্গে যেন কার্য্যের ঐক্য থাকে। বুঝি, ছোঁয়া-ছুঁয়ি আচার-বিচারের অর্থ নেই, তবু মেনে চলি; বুঝি জাতিভেদ মহা অকল্যাণকর, তবু নিজের আচরণে তাকে প্রকাশ করিনে, বুঝি ও বলি, বিধবা-বিবাহ উচিত তবু নিজের জীবনে তাকে প্রত্যাহার করি, জানি খদ্দর পরা উচিত, তবু বিলাতী কাপড় পরি, একেই বলি আমি অসত্যাচরণ। দেশের দুর্দ্দশা ও দুর্গতির মূলে এই মহাপাপ যে আমাদের কতখানি নীচে টেনে এনেছে, এ হয়ত আমরা কল্পনাও করিনে। এমনিধারা সকল দিকে। দৃষ্টান্ত দিয়ে সময় অতিবাহিত করবার প্রয়োজন নেই,—প্রার্থনা করি, দীনতা ও কাপুরুষতার এই গভীর পঙ্ক থেকে দেশের যৌবন যেন মুক্তিলাভ করতে পারে! ভুল বুঝে ভুল কাজ করায় অজ্ঞতার অপরাধ হয়, সেও ঢের ভাল, কিন্তু ঠিক বুঝে বেঠিক কাজ করায় শুধু সত্যভ্রষ্টতার নয়, অসত্য নিষ্ঠার প্রত্যবায় হয়। তার প্রায়শ্চিত্তের যখন দিন আসে, তখন সমস্ত দেশের শক্তিতে কুলোয় না। এ-কথা মনে রাখতে হবে, সত্যনিষ্ঠাই শক্তি, সত্যনিষ্ঠাই সমস্ত মঙ্গলেরআধার এবং ইংরাজীতে যাকে বলে tenacity of purpose, সেও এই সত্যনিষ্ঠারই বিকাশ। তাই বারংবার স্বদেশের যৌবনের কাছে এই আবেদনই করি, সত্যনিষ্ঠাই যেন তাদের ব্রত হয়। কেন না, নিশ্চয় জানি এই ব্রত-ধারণই তাদের সম্মুখের সমস্ত বাধা অপসারণ করে যথার্থ কল্যাণের পথ উদ্ঘাটিত করে দেবে। প্রোগ্রাম ও পথের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না!

আজকের কার্য্য-তালিকায় একটি বিষয় আছে, সে হচ্ছে লাঠি, তলোয়ার ও ছোরাখেলা। এতদিন physical culture-এর দিকে ছাত্র-সমাজ একেবারে বিমুখ হয়ে পড়েছিল। মনে হয়, এইটে ধীরে ধীরে আবার যেন ফিরে আসছে। এই প্রত্যাগমনকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি। তারা দেখেছে, দুর্ব্বল শক্তি-হীনেরই শুধু লাথির ঘায়ে প্লীহা ফাটে। শক্তিমান পাঠান-কাবলীওয়ালার ফাটে না। ফাটে বাঙ্গালীর। বোধহয় বারংবার এই ধিক্কারেই শারীরিক শক্তি অর্জ্জনের স্পৃহা ফিরে এলো। Physical culture-এ শক্তি বাড়ে, আত্মরক্ষার কৌশল আয়ত্ত হয়, সাহস বৃদ্ধি পায়—কিন্তু তবুও এ-কথা ভুললে চলবে না যে, এ সমস্তই দেহের ব্যাপার। অতএব এই-ই সবটুকু নয়। সাহস বাড়া এবং নির্ভীকতা অর্জ্জন কোনমতেই এক বস্তু নয়। একটা দৈহিক, অন্যটা মানসিক। দেহের শক্তি ও কৌশল বৃদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অকৌশলীকে পরাভূত করা যায়, কিন্তু নির্ভয়ের সাধনায় শক্তি-

মানকে পরাস্ত করা যায়,—সংসারে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, সে হয় অপরাজেয়। তাই প্রারম্ভে যে-কথা একবার বলেছি, তাই পুনরুক্তি করে আবার বলি যে, এই অভয় আশ্রম সেই সাধনাতেই নিযুক্ত। এঁদের কৃচ্ছ্রসাধনা তারই একটা সোপান, একটা উপায়। এ তাঁদের পথ,—শেষ লক্ষ্য নয়। অভাব, দুঃখ, ক্লেশ, প্রতিবেশীর লাঞ্ছনা, বন্ধুজনের গঞ্জনা, প্রবলের উৎপীড়ন, কোন-কিছুই যেন এঁদের মুক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে—এই এঁদের একান্ত পণ। এই ত নির্ভয়ের সাধনা এবং তাই সত্যনিষ্ঠাই এঁদের গন্তব্য-পথকে নিরন্তর আলোকিত করে চলেছে। খদ্দর প্রচার, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল খোলা, আর্ত্তের সেবা, এ-সব ভাল কি মন্দ, নির্ভীকতা ও দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে এ-সমস্ত কাজের কি না,—এ-সব প্রশ্ন বৃথা। এঁদের সত্যনিষ্ঠা কাল যদি এঁদের চক্ষে অন্য পথ নির্দ্দেশ করে, এই সমস্ত আয়োজন নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলতে অভয় আশ্রমীদের একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হবে না—এই আমার বিশ্বাস। এবং কামনা করি, এ বিশ্বাস যেন আমার সত্য হয়।

আমার বয়েস অনেক হ'লো, তবু এখানে এসে অনেক কিছুই শিখলাম। এই অভয় আশ্রমে অতিথি হতে পারার সৌভাগ্য আমার শেষদিন পর্য্যন্ত মনে থাকবে।

পরিশেষে, এই ছাত্র ও যুব-সঙ্ঘকে আশীর্ব্বাদ করি, যেন এঁদের মতই সত্যনিষ্ঠা তাদেরও জীবনের ধ্রুবতারা হয়।

* ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারী মালিকান্দা 'অভয় আশ্রমে' পশ্চিম-বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র-সম্মিলনীর অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ।

যুব-সঙ্ঘ

কল্যাণীয় 'বেণু'র কিশোর-কিশোরী পাঠকগণ,—উত্তরবঙ্গের রংপুর শহর থেকে তোমাদের এখানি লিখছি। তোমরা জান বোধ হয় বাঙলাদেশে যুব-সমিতি নাম দিয়ে এক সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে। হয়ত, আজও তোমরা এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত নয়, কিন্তু একদিন এই সমিতি তোমাদের হাতে এসেই পড়বে। তোমরাই এর উত্তরাধিকারী। তাই, এ-সম্বন্ধে দুটো কথা তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই। সমিতির বার্ষিক সম্মিলনী কাল শেষ হয়ে গেছে। আমি বুড়োমানুষ, তবুও ছেলে-মেয়েরা আমাকেই এই সম্মিলনীর নেতৃত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ করে এনেছে। তারা আমার বয়সের খেয়াল করেনি। কারণ বোধ করি এই যে, কেমন করে যেন তারা বুঝতে পেরেছে, আমি তাদের চিনি। তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে ছুটে এসেছিলাম শুধু এই কথাটাই জানাতে যে, তাদের হাতেই দেশের সমস্ত ভাল-মন্দ নির্ভর করে, এই সত্যটা যেন তারা সকল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। অথচ, এই পরম সত্যটাকে বোঝবার পথে তাদের কতই না বাধা। কত আবরণই না তৈরী হয়েছে তাদের দৃষ্টি থেকে একে ঢেকে রাখবার জন্যে। আর তোমরা, যাদের বয়স আরও কম, তাদের বাধার ত আর অন্ত নেই। বাধা যারা দেয়, তারা বলে, সকল সত্য সকলের জানবার অধিকার নেই। এই যুক্তিটা এমনি জটিল যে, না বলে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও যায় না, হাঁ বলে সম্পূর্ণ মেনে নেওয়াও যায় না আর এইখানেই তাদের জোর। কিন্তু এমন করে এ বস্তুর মীমাংসা হয় না। হয়ও নি। সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসেছে;—অধিকারভেদের তর্ক উঠেছে, শেষে বয়স ছেড়ে মানুষের ছোট-বড়, উঁচু-নীচু অবস্থার দোহাই দিয়ে মানুষকে মানুষ জ্ঞানের দাবী থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছে।

তোমরাও এমনি তোমাদের জন্মভূমি সম্বন্ধেঅনেক তথ্য অনেক জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছ। সত্য সংবাদ পেলে পাছে তোমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়, পাছে তোমাদের ইস্কুল-কলেজের পড়ায়, পাছে তোমাদের একজামিনে পাশের পরম বস্তুতে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় মিথ্যে দিয়েও তোমাদের দৃষ্টি রোধ করা হয়, এ খবর হয়ত তোমরা জানতেও পারো না।

যুব-সমিতির সম্মিলনে এই কথাটাই আমি সকলের চেয়ে বেশী করে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম, তোমাদের পরাধীন দেশটিকে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়েই তোমাদের সঙ্ঘ গঠন। ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার—স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে। এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবার অধিকার আছে।

বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না, তোমাদের মত কিশোরবয়স্কদেরও না।

একজামিনে পাশ করা দরকার,—এ তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলায় এই সত্যচিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক করে রাখলে যে ভাঙ্গার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও ত আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই বয়সের শেখাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।

নিজেও ত দেখি, ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে একদিন যা শিখেছিলাম, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তা তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিক্ষার আর ক্ষয় নাই।

তোমরা নিজের বেলাতেও ঠিক তাই মনে ক'রো। ভেবো না যে, আজ অবহেলায় যেদিকে দৃষ্টি দিলে না, আর একদিন বড় হয়ে তোমরা ইচ্ছামতই দেখতে পাবে। হয়ত পাবে না, হয়ত সহস্র চেষ্টা সত্বেও সে দুর্ল্লভ বস্তু চিরদিনই চোখের অন্তরালে রয়ে যাবে। যে শিক্ষা পরম শ্রেয়, তাকে এই কিশোর বয়সেই শিরার রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে গ্রহণ করতে হয়, তবেই যথার্থ করে পাওয়া যায় কালকের এই যুব-সমিতির যুবকেরা কংগ্রেসের ধরণ-ধারণ ছেলেবেলাতেই গ্রহণ করেছিল বলে সে রীতি-নীতি আর ত্যাগ করতে পারেনি। এটা ভয়ের কথা।

রংপুর, ১৭ই চৈত্র। *

---

* ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ সংখ্যা (৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) 'বেণু' মাসিক-পত্রে প্রকাশিত।

নূতন প্রোগ্রাম

শরৎবাবুর রংপুর অভিভাষণের উত্তরে চরকা লইয়া কথা-কাটাকাটি হইয়া গেল বিস্তর, আজও তার শেষ হয় নাই। প্রথমে চরকা-ভক্তের দল প্রচার করিয়া দিলেন, তিনি মহাত্মাজীর টিকিতে চরকা বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এতবড় একটা অমর্য্যাদাকর উক্তি অভিভাষণে ছিল না, কিন্তু তা বলিলে কি হয়,—ছিলই। না হইলে আর ভক্তের বেদনা প্রকাশের সুযোগ মিলিবে কি করিয়া? কিন্তু শরৎবাবু নিজে যখন নীরব, তখন আমার মতন একজন সাধারণ ব্যক্তির ওকালতি করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। নিজের মাথায় টিকি নাই, কেহ যে ধরিয়া রাগ করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সেও পারিবে না, সুতরাং এদিকে নিরাপদ। কিন্তু অভিভাষণে কেবল টিকিই ত ছিল না, চরকাও ছিল যে, অতএব বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা হইতে দ্রুতবেগে গেলেন মানভূমে, এবং প্রতিবাদ করিলেন যুব-সমিতির সম্মিলনে। ঠিকই হইয়াছে, ওটা যুব-সমিতিরই ব্যাপার। তরুণ বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধা সাহিত্যিকের তামাক খাওয়ার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, সকলে একজনকে ধন্য ধন্য এবং অপরকে ছি ছি করিতে লাগিল, তথাপি ভরসা হয় না যে, তিনি তিন কাল পার করিয়া দিয়া অবশেষে এই শেষ কালটাতেই তামাক ছাড়িবেন। অতঃপর শুরু হইয়া গেল প্রতিবাদের প্রতিবাদ, আবার তারও প্রতিবাদ। দুই একটা কাগজ খুলিলে এখনও একটা-না-একটা চোখে পড়ে।

কিন্তু আমরা ভাবি, শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙলাদেশের লোকে চরকা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ যদি থাকে, সে এ-দেশের লোকের। খামোকা তাঁহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি? এ-বিষয়ে আমার নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি ত এই বছর-আষ্টেক চরকা লইয়া লোকের সঙ্গে কি ধ্বস্তাধ্বস্তিটাই না হইল! কিন্তু প্রথম হইতেই মানুষে সেই যে ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, স্বরাজের লোভ, মহাত্মাজীর দোহাই, বন্দে-মাতরমের দিব্যি, কোন-কিছু দিয়াই সে বাঁকা ঘাড় আর সোজা করা গেল না, যে বা লইল, চরকার দাম দিল না, বক্তৃতার জোরে যাহাকে দলে আনা গেল, সে বিপদ ঘটাইল আরও বেশী। নব উৎসাহে কাজে মন দিয়া দিন দশ-পনেরো পরেই জট-পাকানো এক-মুঠো সুতা আনিয়া হাজির করিল। আষ্টে-পৃষ্টে তাহাতে নাম-

থাম-সমেত লেবেল আঁটা, অর্থাৎ গোলমালে খোয়া না যায়। কহিল, দিন ত মশাই একখানা প্রমাণ শাড়ি বুনে।

কর্ম্মীরা কহিত—এতে কি কখনো শাড়ি হয়?

হয় না? আচ্ছা, শাড়িতে কাজ নেই, ধুতিই বুনে দিন, কিন্তু দেখবেন, বহর ছোট করে ফেলবেন না যেন।

কর্ম্মীরা—এতে ধুতিও হবে না।

হবে না কি রকম? আচ্ছা ঝাড়া দশ হাত না হোক ন'হাত সাড়ে ন'হাত ত হবে? বেশ তাতেই চলবে। আচ্ছা চললুম। -এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত।

কর্ম্মীরা প্রাণের দায়ে তখন চীৎকার করিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, এ ঢাকাই মসলিন নয়,—খদ্দর। এক-মুঠো সুতার কাজ নয় মশাই, অন্ততঃ এক-ধামা সুতার দরকার।

কিন্তু এ ত গেল বাহিরের লোকের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মীদের উৎসাহ-উদ্যম অথবা খদ্দর-নিষ্ঠার লেশমাত্র অভাব ছিল, তাহা বলিতে পারিব না। প্রথম যুগের মোটা খদ্দরের ভারের উপরেই প্রধানতঃ patriotism নির্ভর করিত।

সুভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। তিনি পরিয়া আসিতেন দিশি—সামিয়ানা তৈরীর কাপড় মাঝখানে সেলাই করিয়া। সমবেত প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনে সভা মুখরিত হইয়া উঠিত, এবং সেই পরিধেয় বস্ত্রের কর্কশতা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও ওজনের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া কিরণশঙ্কর-প্রমুখ ভক্তবৃন্দের দুই চক্ষু ভাবাবেশে অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

কিন্তু সামিয়ানার কাপড়ে কুলাইল না, আসিল নয়ন-রুখের যুগ। সেদিন আসল ও নকল কর্ম্মী এক আঁচড়ে চিনা গেল। যথা, অনিলবরণ—দীর্ঘ শুভ্রদেহের লয়নটুকু মাত্র ঢাকিয়া যখন কাঠের জুতা পায়ে খটাখট শব্দে সভায় প্রবেশ করিতেন, তখন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে উপস্থিত সকলেই চোখ মুদিয়া অধোবদনে থাকিত। এবং তিনি সুখাসীন না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ চোখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিত না। সে কি দিন! "My only answer is Charka" অধোমুখে বসিয়া সকলেই এই মহাকাব্য মনে মনে জপ করিয়া ভাবিত, ইংরাজের আর রক্ষা নাই, ল্যাঙ্কাশায়ারে লালবাতি জ্বলিয়া ব্যাটারা মরিল বলিয়া। আজ অনিলবরণ বোধ করি যোগাশ্রমে ধ্যানে বসিয়া ইহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।

সেদিন করেন রুখ মানেই ছিল মিল-রুখ। তা সে যেখানেরই তৈরী হউক না কেন। সেদিন অপবিত্র মিল-রুখ পরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি কোনও স্বদেশভক্ত

দিগম্বর মূর্তিতেও কংগ্রেসে প্রবেশ করিত, ৩১শে ডিসেম্বরের মুখ চাহিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না কথাটি বলে।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—The programme of the Charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it.

সেদিন কেন যে কবি এতবড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই,—প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। কিন্তু ইহারও আর উপায় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তাহার আর সীমা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলার খদ্দরের একজন বড় আড়তদারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্রম তৈরী হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগ-দুগ্ধ পান করা পর্য্যন্ত, তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন—তেমনি টিকি, কাপড় পরা, তেমনি চাদর গায়ে দেওয়া, তেমনি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেমনি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর বাক্যালাপ—সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও না-কি পূজার উপাচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোল-কলায় হৃদয় ভরে নাই; উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার না-কি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাস্তবিক, এ অনুরাগ অতুলনীয়, মনে হয় যেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল ঘোষকে ইনি হার মানাইয়াছেন।

কিন্তু এ হইল উচ্চাঙ্গের সাধন-পদ্ধতি, সকলের অধিকার জন্মে না। এ পর্য্যায়ে যাঁহারা উঠিতে পারেন নাই, একটু নীচের ধাপে আছেন, তাঁহাদেরও চরকা-যুক্তি যথেষ্টই হৃদয়গ্রাহী। একটা কথা বারংবার বলা হয়, চরকা কাটিলে আত্মনির্ভরতা জন্মে, কিন্তু এ জিনিসটা যে কি, কেন জন্মায়, এবং চরকা ঘুরাইয়া বাহুবল বৃদ্ধি কিংবা আর কোন গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বারংবার বলা সত্ত্বেও ঠিক বুঝা যায় না। তবে এ-কথা স্বীকার করি, আত্মনির্ভরতার ধারণা সকলেরই এক নয়। যেমন আমাদের পরাণ একবার আত্মনির্ভরতার বক্তৃতা দিয়া বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে উপসংহারে concrete উদাহরণ দিয়া বলিয়াছেন,—"মনে কর তুমি গাছে চড়িয়া পড়িয়া গেলে। কিন্তু পড়িতে পড়িতে তুমি হঠাৎ যদি একটি ডাল ধরিয়া ফেলিতে পার, তবেই জানিবে, তোমার আত্মনির্ভরতা (Self-help) শিক্ষা হইয়াছে,—তুমি স্বাবলম্বী হইয়াছ।"

অবশ্য এরূপ হইলে বিবাদের হেতু নাই। কিন্তু এ ত গেল সূক্ষ্ম দিক। ইহার স্থূল দিকের আলোচনাটাই বেশী দরকারী। বিশেষজ্ঞ বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তির

মজির দিয়া প্রায়ই বলা হয়, অবসরকালে দু-চার ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ চরকা কাটিলে মাসিক আট আনা দশ আনা বারো আনা আয় বাড়ে। গরীব দেশে এই ঢের। অবশ্য গরীব শব্দটা অনাপেক্ষিক বস্তু নয়, একটা তুলনাত্মক শব্দ। Economics-এ marginal necessity-র উল্লেখ আছে, সে যে-দেশের শাস্ত্র, সেই দেশের উপলব্ধির ব্যাপার। আমাদের এ-দেশের গরীব কথাটার মানে আমরা সবাই বুঝি, এ লইয়া তর্ক করিও না, কিন্তু এই দৈনিক এক পয়সা দেড় পয়সা আয় বৃদ্ধিতে চাষারা খাইয়া পরিয়া পুরুষ্টু হইয়া কি করিয়া যে ইংরাজ তাড়াইয়া স্বরাজ আনিবে, ইহাই বুঝা কঠিন।

অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুনুরি, এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসরমত দু'মুঠা ঘাস ছিঁড়িলেও ত মাসিক দশ-বারো আনা অর্থাৎ দিনে এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়। তিনি আরও বলেন, ইহাতে অন্য উপকারও আছে। এ. আই. সি. সি.-র একটা মিটিং ডাকিয়া franchise করিয়া দিলে লিডারদের তখন ঘাস ছিঁড়িতে পাড়াগাঁয়ে আসিতে হইবে। কারণ, শহরে ঘাস মেলে না। অতএব এরূপ মেলামেশায় পল্লী-সংগঠনের কাজটাও দ্রুত আগাইয়া যাইবে। অন্ততঃ সহরের মধ্যে মোটর হাঁকাইয়া লোক চাপা দিয়া মারার দুষ্কর্মটা কিছু কম হওয়ারই সম্ভাবনা।

আমি বলি, অনিলবরণের প্রস্তাবটিকে due consideration দেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন, তিনি হয়ত শুনিয়া বলিবেন, ইহাও utterly childish, কিন্তু আমরা বলিব, কবিদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নাই,—সুতরাং তাঁহার কথা শোনা চলিবে না। বিশেষতঃ বার মাসের মধ্যে তের মাস থাকেন তিনি বিলাতে, দেশের আবহাওয়া তিনি জানেন কতটুকু? চরকা-বিশ্বাসী অহিংসকেরা হিংস্র অধিবাসীদের ধিক্কার দিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, তোমরা চরকা-কাটার মত সোজা কাজটাই ধৈর্য্য ধরিয়া করিতে পার না, আর তোমরা করবে দেশোদ্ধার? ছি ছি, তোমাদের গলায় দড়ি।

শুনিয়া ইহারা ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। হয়ত কেহ কেহ ভাবে, হবেও বা। চরকা কাটিতেই যখন পারিলাম না, তখন আমাদের দ্বারা আর কি হইবে? কিন্তু আমি বলি হতাশ হইবার কারণ নাই। অনিলবরণের কর্ম্ম-পদ্ধতি অন্ততঃ বছর-খানেক trial দিয়া দেখা উচিত। কারণ, আরও সহজ। চরকা কিনিতে হইবে না, শিখিতে হইবে না, তুলার চাষ করিতে হইবে না, বাজারের শরণাপন্ন হইতে হইবে না;—কোনও মুস্কিল নাই। আর পদ্মার চর হইলে ত কথাই নাই, ছিঁড়িতেও হইবে না, ধরা মাত্রেই খুশ্‌ করিয়া উপড়াইয়া আসিবে। স্বরাজ মুঠার মধ্যে।

কিন্তু অনিলবরণ বলিয়াছেন, আস্থাহীন হইলে চলিবে না। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথায় যত ছেলেমানুষী দেখাক, যুক্তি যত উল্টা কথাই বলুক, তথাপি বিশ্বাস করিতে হইবে।

এক বৎসরে Dominion Status অবশ্যম্ভাবী! হইবেই হইবে। যদি না হয়? সে লোকের অপরাধ, প্রোগ্রামের নয়। এবং তখন অনায়াসে বলা চলিবে, এত সহজ কর্ম্ম-পদ্ধতি যে-দেশের লোক নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়া সফল করিতে পারিল না, তাহাদের দিয়া কোনও কালেই কিছুই হইবে না। আসল জিনিষ বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। একটার যখন সুবিধা হইল না, তখন আর একটা লওয়া কর্ত্তব্য. এমনি করিয়া চেষ্টা করিতে করিতেই একদিন খাঁটি প্রোগ্রামটি ধরা পড়িবে। পড়িবেই পড়িবে। জয় হোক অনিলবরণের! কত সস্তায় স্বরাজের রাস্তা বাৎলে দিলেন!

নিখিল-ভারত কাটুনি-সঙ্ঘ খবর দিতেছেন, বিশ লাখ টাকার চরকা কিনিয়া বাইশ লাখ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছে। উৎসব লাগিয়া গেল, সবাই কহিল—আর চিন্তা নাই, বিদেশী কাপড় দূর হইল বলিয়া। কলিকাতার বড় কংগ্রেস আসন্ন-প্রায়; সুভাষচন্দ্র বলিলেন, খবরদার! কলের তৈরী দিশী একগাছি সুতাও যেন অধিবেশনে না ঢোকে। এ ঢুকিলে আর উনি ঢুকিবেন না।

নলিনীরঞ্জন বিষয়ী মানুষ, কত ধানে কত চাল হয় খবর রাখা তাঁর পেশা, কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন, সে কি কথা! বিদেশী কাপড় বয়কট করার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ! তোমার এই বাইশ লাখ দিয়া সত্তর-আশি ক্রোড়ের ধাক্কা সামলাইবে কেন?

সেইন-গোপ্তা সাহেব বীরদর্পে বলিলেন, আমরা ঐ খদ্দর এক-শ টুকরা করিয়া লেংটি পরিব।

নলিনীরঞ্জন কহিলেন, সে জানি, কিন্তু এক-শ টুকরা কেন, উহার একগাছি করিয়া সুতা ভাগ করিয়া দিলেও যে ভাগে কুলাইবে না।

সুভাষ বলিলেন, বস্ত্র বয়কট পরে হইবে, আপাততঃ মহাত্মাজীর বয়কট সহিবে না।

কিরণশঙ্কর কহিলেন, ঠিক, ঠিক।

মহাত্মা আসিলেন, লোকমুখে খবর লইয়া দেশে ফিরিয়া certificate পাঠাইয়া দিলেন, 'ফিলিস সরকাস' মন্দ জমে নাই।

নেতারা টু শব্দটি করিলেন না, পাছে রাগ করিয়া তিনি স্বরাজের চাবি-কাঠিটি

আটকাইয়া রাখেন। বাঙলাদেশের যেখানে যত আশ্রম ছিল, তাহার তপস্বীরা বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল,—কেমন! কর একৃজিবিশন!

আমরা বাইরের লোকেরা ভাবি, Complete Independence বটে! তাই Dominion Statusএ এদের মন উঠে না। আরও একটা কথা ভাবি, এ ভালই হইয়াছে যে, দেশবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। 'ফিলিস সরকাসে'র বিবরণ Young Indiaর পাতায় তাঁহাকে চোখে দেখিতে হয় নাই।

শুনিয়াছি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে এবার নেহেরু-রিপোর্ট পাশ হইয়াছে। বহুবিধ ছলচাতুরীপূর্ব্বক সেই আরজি অবশেষে বিলাতী পার্লামেণ্টে পেশ করা হইয়াছে। আশা ত ছিলই না, তবে সে-দেশের পার্লামেণ্ট না কি এবার মেয়েদের হুকুম-মত তৈরী, সুতরাং এখন তাহারাই একপ্রকার ভারতের ভাগ্যবিধাতা। প্রবাদ, মেয়েরা দয়াময়ী, এবার তারা যদি এ-দেশের দুর্ভাগা পুরুষদের কিছু দয়া করে। আমেন।*

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অভিনন্দনের উত্তর

আমার অনেকদিন থেকে প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে আসবার কল্পনা ছিল; কিন্তু শরীর অসুস্থ থাকায় ও নানা কাজের ভিড়ে কখনও আসতে পারিনি। তখন তবু কাছে ছিলাম, এখন ত অনেক দূরে চলে গেছি। এঁদের কাছ থেকে প্রতিবারই আহ্বান পেয়েছি—কোনবারই আসতে পারিনি। এইবার এসেছি। আজ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ যে অভিনন্দন দিলেন, বিনয় করে যদি বলি—এর কোনও দাবী আমার নেই, সেটা সত্য কথা হবে না। সাহিত্য-সেবা করে বঙ্গবাসীকে কিছু দান করেছি, তার জন্য দাবী একটা আছে। শক্তির চেয়ে বড় পুরস্কারই পেলাম। সেইটা দু'হাত পেতে নিলাম; আমার এই ক্ষেত্রে কিছু বলা দরকার—কিন্তু বলবার শক্তি ভগবান আমাকে একেবারে দেননি! সকলে বোধ হয় আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না। এ-সম্বন্ধে আপনারা কিছু আশাও করবেন না।

---

* 'নূতন প্রোগ্রাম' নিবন্ধটি শরৎচন্দ্রের 'শ্রীপরশুরাম' ছদ্মনামে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'বেণু' মাসিকপত্রে প্রকাশিত।

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের অভিনন্দনের উত্তর

আমার একমাত্র বলবার বিষয় এই যে, অল্প সময়ের মধ্যে এখানে এসে যা দেখলাম তা আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। এঁদের মূলকথা এই—মানুষকে মানুষ করে তোলা। ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষের লোকেরা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছে। এঁদের উদ্দেশ্য—ভারতকে সেই হীনতা থেকে রক্ষা করা। ধর্ম্মের দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে, শিল্পের দিক দিয়ে যে-ভারতবর্ষ একদিন বড় ছিল, তাকে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মতিবাবু এই আশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যাঁরা আশ্রমের কাজে নিযুক্ত আছেন—বিশেষ করে মতিবাবু—তাঁরা আমার চেয়ে বেশী জানেন, কি করে এই উদ্দেশ্য সফল করা যেতে পারে। তিনি যৌবন থেকে এই কর্ম্মে ব্রতী। বহুদিন নানা কর্ম্মের মধ্যে থেকে, অনেক ভেবে ভেবে যে যে উপায় তিনি নিজের বুদ্ধিমত আবিষ্কার করেছেন, সেইটা কাজে লাগিয়ে তাঁর স্বপ্ন সফল হউক। আমার প্রার্থনা—আমি বেঁচে থাকতেই যেন তা দেখে যেতে পাই।

আর একটি কথা। দেখেছি—আশ্রমের প্রতি এখানকার লোকের সহানুভূতি আছে। তাঁরা ভালও বাসেন। আমি এই প্রার্থনা করি—সকলে মিলে যেন এই প্রতিষ্ঠানকে সার্থক ও জয়যুক্ত করতে পারেন।

৭টা বাজে, আমার যাবার সময় হ'লো। সাহিত্য-সভা হলে কিছু হয়ত বলতে পারতাম। মতিবাবুকে আশীর্বাদ করছি। আজ পরমানন্দ নিয়ে বাড়ি চললাম। আমি বলতে কিছু পারি না; মামুলী কিছু একটা বলবার কথা—তাই কিছু বললাম। বলবার শক্তি ভগবান আমাকে দেননি। একটা কথা বলে গেলাম - এখানে বা আর কোথাও যদি একটা সভা হয়, তা হলে এবার কিছু লিখে নিয়ে আসব। তাই পড়ে আপনাদের শোনাব। আজ এই পর্য্যন্ত।*

* ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে ৮ম বর্ষ প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ অক্ষয়-তৃতীয়া উৎসবে অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত ভাষণ। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবর্ত্তক' মাসিক-পত্রে প্রকাশিত।

দিন-কয়েকের ভ্রমণ-কাহিনী

নলিনী,—তোমার যাবার পরে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, দিন-কয়েক বাহিরে যাওয়ার অজুহাতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখার বিপদ আছে। প্রথম, এই জাতীয় লেখা আমার আসে না; অনধিকার-চর্চ্চা অপরাধে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জলধর ভায়া হয়ত রাগ করিবেন। লোকেও অপবাদ দিয়া বলিবে, এ শুধু তাঁহার নৈহাটী ও বরানগর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নিছক নকল। দ্বিতীয় বিপদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। কারণ, আমি যদি বলি: দিল্লীতে এবার রেলওয়ে স্টেশন দেখিয়া আসিলাম, তিনি হয়ত কাগজে প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র উপন্যাস লিখিয়াছেন। দিল্লীতে স্টেশন বলিয়া কোন-কিছুই নাই, ওখানে রেলগাড়িই যায় না। অতএব, মুস্কিল বুঝিতেই পারিতেছ। তবে, গোটাকয়েক নিজের মনের কথা বলা যাইতে পারে। চৌধুরী-মশায় উপন্যাস বলিলেও দুঃখ নাই, শ্রীমান্ রায়বাহাদুর ভায়া ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নয় বলিলেও আপশোষ হইবে না।

আমার যাওয়ার ইতিহাস এই প্রকার।

প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে বন্ধুরা একদিন বলিলেন, দেশোদ্ধার করিতে অনেকে দিল্লী কংগ্রেসে যাইতেছেন, তুমিও চল। অস্বীকার করিয়া ফল নাই জানিয়া রাজি হইলাম। ভরসা ছিল, অন্যান্য বারের মত এ-বারেও ঠিক যাইবার দিন পেটের অসুখ করিবে। কিন্তু এ-বার তাঁহারা এরূপ দৃষ্টি রাখিলেন যে, তাহার সুযোগই ঘটিল না; রওনা হইতে হইল। সন্ধ্যা নাগাদ আমার প্রবাসের বাহন ভোলার স্কন্ধে আত্মসমর্পণ করিয়া মেল ট্রেনে চাপিয়া বসিলাম। ট্রেনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। আফিমের ঘোরে সারা-রাত্রি ধরিয়া আমি তামাক খাইলাম, এবং আমার একমাত্র অপরিচিত সহযাত্রী আমাশার বেগে আলো জ্বালাইয়া সারারাত্রি ধরিয়া পায়খানা গেলেন। ভোর নাগাদ আমিও শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, তাঁহারও হাত-পা শক্ত অবশ হইয়া আসিল। সুতরাং আলো নিবাইয়া উভয়েই কিয়ৎকাল নিদ্রা দিলাম। সকালে কোন একটা স্টেশনে নামিবার সময় জলের সোরাইটা আমার তিনি দিলেন ভাঙ্গিয়া, এবং উহার টাইম-টেবল্‌টা আমি রাখিলাম বালিশের নীচে চাপিয়া। অতঃপর বাকী পথটা একাকী নিরুপদ্রবে কাটিল, অবিশ্রাম তামাক খাইয়া গাড়ির ফুলকাটা সাদা ছাতটা পর্য্যন্ত কালো করিয়া দিলাম।

দিন-কয়েকের ভ্রমণ-কাহিনী

এবার দিল্লী কংগ্রেসের পালা। এ-সম্বন্ধে এত লোকে এত কলরব এত আস্ফালন করিয়াছে, এত গালি দিয়াছে, এত জ্বালা ও উদ্দাম আবর্ত্তনের জন্মদান করিয়াছে যে, সেখানে অন্তর বস্তুটি আমার প্রবেশ করিবার বাস্তবিকই পথ খুঁজিয়া পায় নাই। কেবল সাধারণের পরিত্যক্ত, অতি সঙ্কীর্ণ নিরালা একটুখানি পথ সন্ধান করিয়া পাইয়াছিলাম, এবং সেইজন্যই শুধু আমার মনে হয়, মনের মধ্যেটা আমার নিছক ব্যর্থতার গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙ্গলার দেশবন্ধু দাশকে অতিশয় কাছে করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। যতই দেখিয়াছি, ততই অকপটে মনে হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের এত দেশ এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এতবড় মানুষ বোধ করি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ-করা জীবন আর কই? অনেকদিন পূর্ব্বে তাঁহারই একজন ভক্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং বাঙ্গলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রায় তুল্য কথা। কথাটা যে কত বড় সত্য এই সভার একান্তে বসিয়া আমার বহুবার তাহা মনে পড়িয়াছে। অথচ, এই বাঙ্গালাদেশেরই কাগজে কাগজে যে তাঁহাকে ছোট বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, পরের চক্ষে হীন করিয়া প্রতিপন্ন করিবার অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলিয়াছে, এতবড় ক্ষোভের বিষয় কি আর আছে? তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গলাদেশটাই যে অপরের চক্ষে ক্ষুদ্র হইয়া আসিবে, এমন সহজ কথাটাও যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহাদের লেখার ভিতর দিয়া দেশের কোন্ শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইবে? একের সঙ্গে অপরের মত ষোল-আনা মিলিতে না পারে, হয়ত মিলেও না, কিন্তু মতামতের চাইতেও এই মানুষটি যে কত বড়, এ-কথা লোকে এত সহজে ভুলিয়া যায় কি করিয়া? তাঁহার প্রতি চাহিয়া বিভিন্ন জনভার এই বিপুল হট্টগোলের মাঝখানে বসিয়াও এ-কথা আমার বার বার মনে হইয়াছে যে, এই সাধারণ মানুষটি তাঁহার জীবদ্দশায় কতখানি দেশোদ্ধার করিয়া যাইবেন, তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু যে অসাধারণ চরিত্রখানি তিনি দেশবাসীর অনাগত বংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাহা তার চেয়েও সহস্র গুণে বড়। কাগজের গালিগালাজ এই পরাধীন দেশকে কোনদিনই স্বাধীনতা দিবে না, যে দিবে সে শুধু এই সকল চরিত্রের ইতিহাস।

এই জাতীয় কংগ্রেসের আর একটা ব্যাপার আমার বেশ মনে আছে, সে হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি। এই ইউনিটির এক অধ্যায় ইতিপূর্ব্বেই সাহারানপুরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। সভাপতি মৌলানা আজাদ সাহেব নাকি উর্দ্দুতে দু-চার কথা

বলিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মাজীর অশেষ প্রীতিভাজন মৌলানা মহম্মদ আলী এ-সম্বন্ধে নীরব হইয়া রহিলেন। তা থাকুন, কিন্তু তথাপি শুনিতে পাইলাম, হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি একদিন জাতীয় মহাসভার মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল। সবাই বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বলিতে লাগিল যাক, বাঁচা গেল। চিন্তা আর নাই, নেতারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার শেষ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, এ-বার শুধু কাজ আর কাজ,—শুধু দেশোদ্ধার। প্রতিনিধিরা ছুটি পাইয়া সহাস্যমুখে দলে দলে টাঙ্গা, একা, এবং মোটর ভাড়া করিয়া প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভসকল দেখিতে ছুটিলেন। সে ত আর এক-আধটা নয়, অনেক। সঙ্গে গাইড, হাতে কাগজ-পেন্সিল—কোন্ কোন্ মসজিদ কয়টা হিন্দু মন্দির ভাঙিয়া তৈয়ার হইয়াছে, কোন্ ভগ্নস্তূপের কতখানি হিন্দু ও কতখানি মোসলেম, কোন বিগ্রহের কে কবে নাক এবং কান কাটিয়াছে, ইত্যাদি বহু তথ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রান্ত দেহে দিনের শেষে গাছতলায় বসিয়া পড়িয়া অনেকেরই দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে শুনিলাম—উঃ! হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি!

মানুষের অত্যন্ত সাধের বস্তুই অনেক সময়ে অনাদরে পড়িয়া থাকে। কেন যে থাকে জানি না, কিন্তু নিজের জীবনে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি, যাহাকে সবচেয়ে বেশী দেখিতে চাই, তাহার সঙ্গেই দেখা করা ঘটিয়া উঠে না, যাহাকে সংবাদ দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সে-ই আমার চিঠির জবাব পায় না। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামটিও ঠিক এমনি। সুদীর্ঘ জীবনে মনে মনে ইহার দর্শনলাভ কত যে কামনা করিয়াছি তাহার অবধি নাই, অথচ আমার পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াতের পথের কখনো দক্ষিণে কখনো বামে ইনিই চিরদিন রহিয়া গেছেন, দেখা আর হয় নাই। এবার ফিরিবার পথে সে ত্রুটি আর কিছুতে হইতে দিব না এই ছিল আমার পণ। দিল্লী পরিত্যাগের আয়োজন করিতেছি, শ্রীমান্ মণ্টু অথবা দিলীপকুমার রায় ব্যস্ত ব্যাকুলভাবে আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলা ভাঙ্গা এবং চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সচেতন। বাসায় তিনি কান খাড়া করিয়া রহিলেন। অনুমান ও কিছু কিছু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা বুঝা গেল, এই কয়দিনেই দিল্লীর লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছে, তাই আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না পাইয়া অপেক্ষাকৃত এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া তিনি আশ্রয় লইয়াছেন। আমার বৃন্দাবন-যাত্রার প্রস্তাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিলেন। বৃন্দাবনের জন্য নয়, দিল্লী ছাড়িয়া হয়ত তখন ল্যাপল্যাণ্ডে যাইতেও মণ্টু রাজি হইতেন। আর একজন সঙ্গী জুটিলেন শ্রীমান সুরেশ,—কাশীর 'অলকা' মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা। স্থির হইল বৃন্দাবনে

আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়া উঠিব, এবং সুরেশচন্দ্র একদিন পূর্ব্বে গিয়া তথায় আমাদের বাসের বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া রাখিবেন।

দিল্লী হইতে শ্রীবৃন্দাবন বেশী দূর নয়। শুভক্ষণ দেখিয়াই যাত্রা করিয়াছিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে আকাশ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি নামিল। মথুরা স্টেশনে নামিতে জিনিসপত্র সমস্ত ভিজিয়া গেল এবং বৃন্দাবনের ছোট গাড়িতে গিয়া যখন উঠিলাম তখন টিকিট কেনা হইল না। আধ ঘণ্টা পরে সাধের বৃন্দাবনে নামিয়া গাড়ি পাওয়া গেল না, কুলিরা অত্যধিক দাবী করিল, টিকিট-মাস্টার জরিমানা আদায় করিলেন, একগুণ মোট-ঘাট ভিজিয়া চতুর্গুণ ভারি হইয়া উঠিল এবং পায়ের জুতা হাতে করিয়া সিক্ত-বস্ত্রে ক্লান্ত-দেহে যখন সেবাশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গেল তখন সন্ধ্যা হয় হয়; এবং ওয়াকিবহাল এক ব্যক্তিকে আশ্রমের সন্ধান জিজ্ঞাসা করায় সে নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিল যে, সে একটা জঙ্গলের মধ্যে ব্যাপার, তথায় যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট রাস্তা নাই এবং দূরত্বও যেমন করিয়া হউক ক্রোশ-দুয়ের কম নয়। মণ্টু কাঁদ কাঁদ হইয়া উঠিল এবং আমার বাহন ভোলা প্রায় হাল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু উপায় কি? জলের মধ্যে এই পথের ধারেও ত দাঁড়াইয়া থাকা যায় না; কোথাও ত যাওয়া চাই, অতএব চলিতেই হইল। বৃষ্টি থামার নাম নাই, প্রভূত রজ ছিটকাইয়া মাথায় উঠিয়াছে, শ্রীকণ্টকে পদতল ক্ষত-বিক্ষত, রাত্রি সমাগতপ্রায়, এমনি অবস্থায় দেখা গেল, শ্রীমান সুরেশচন্দ্র একটা চালার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। সে একদিন আগে আসিয়াছে, সে সব জানে, তাহার এই প্রকার আকস্মিক অভ্যাগমে আমাদের মধ্যে যেন একটা আনন্দ-কলরব উঠিয়া গেল। অপরাহ্ণশেষের স্বল্পালোকে দূর হইতে তাহার চেহারা ভাল দেখা যায় নাই, কিন্তু কাছে আসিলে দেখা গেল, মুখ তাহার ভোলার চেয়ে, এমন কি, মণ্টুর চেয়েও অধিকতর মলিন। সুরেশ ছেলেটির বয়স কম, কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে জ্ঞান লাভ করিয়াছে যে, সংসার দুঃখময়, এখানে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবার অধিক অবকাশ নাই। সে গম্ভীর ও সংক্ষেপে সংবাদ দিল যে, বৃন্দাবন কলেরায় প্রায় উজাড় হইয়াছে এবং যে দু-চারজন অবশিষ্ট আছে তাহারা ডেঙ্গুতে শয্যাগত। কাল সে সেবাশ্রমেই ছিল, সেখানে বামুন নাই, চাকর পলাইয়াছে, ব্রহ্মচারীরা সব জ্বরে মর মর। গোটা-সাতেক কুকুর আছে, একটার ল্যাজে ঘা, একটা মস্ত রামছাগল আছে তার নাম রামভকৎ, সে রাজ্যশুদ্ধ লোককে গুঁতাইয়া বেড়ায়। সেবাশ্রমের স্বামিজী বেদানন্দ শুধু ভাল আছেন, আজ তিনি রাঁধিয়াছেন এবং সুরেশ নিজে বাসন মাজিয়াছে। গরম চায়ের আশা ত সুদূরপরাহত, রাত্রে দুটো ভাত পাওয়াই শক্ত। পাশে চাহিয়া দেখিলাম

ভোলা ঊর্দ্ধমুখে বোধকরি তাহার দেশের জগবন্ধু স্মরণ করিতেছে এবং শ্রীমান্ মণ্টুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে; ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া আমরা আবার গন্তব্যস্থানের অভিমুখেই প্রস্থান করিলাম, কিন্তু সমস্ত পথটায় কাহারও মুখে আর কথা রহিল না।

যথাকালে সেবাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অধ্যক্ষ স্বামিজী বেদানন্দ আমাদের সানন্দে ও সমাদরে গ্রহণ করিলেন। গরম চা পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কারণ, চাকর না থাকিলেও একজন নূতন দাসী আসিয়াছে। বামুন ঠাকুর কি-একটা অছিলায় দিন-দুই পলাতক ছিল, সেও ভাগ্যক্রমে আজ বিকালে আসিয়া হাজির হইয়াছে। সাতটা কুকুরের কথা ঠিক। একটার ল্যাজেও ঘা আছে বটে। রামভকৎ গুঁতায় সত্য, কিন্তু সে কেবল মেয়েদের—পুরুষদের সহিত তাহার খুব ভাব। সুতরাং আমাদের আশঙ্কা নাই। আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী পুরানো ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন, কাল তিনি পথ্য পাইবেন। একজন বৈষ্ণবী নব-পরিক্রমা হইতে ফিরিবার পথে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল, দিন-দুই হইল তাহার শ্রীবৃন্দাবন লাভ হইয়াছে, এ খবর যথার্থ। সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এ-শহরেও ডেঙ্গু দেখা দিয়াছে, এ-সংবাদও মিথ্যা নয়! অতএব শ্রীমান সুরেশকে দোষ দেওয়া যায় না।

শহরের একান্তে যমুনাতটে পনর-কুড়ি বিঘার একখণ্ড ভূমির উপর এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। বছর দশ-বার পূর্ব্বে এই বাংলাদেশেরই একজন ত্যাগী ও কর্ম্মী যুবক কেবলমাত্র নিজের অদম্য শুভেচ্ছাকেই সম্বল করিয়া, এই সেবাশ্রম স্থাপিত করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আজ এই প্রতিষ্ঠান-টির সহিত আপনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রত্যেক ইঁট ও কাঠের সহিত তাঁহার বিগত দিনের কর্ম্ম ও চেষ্টা নিত্য বিজড়িত হইয়া আছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া এই রাত্রেই আবার সকলে মন্দিরাদি দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। স্বামিজী আমাদের পথ দেখাইয়া চলিলেন। বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু আকাশ তখনও পরিষ্কার হয় নাই। অধিকাংশ মন্দিরের ভিতরের কাজ শেষ হইয়া তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। লণ্ঠন লইয়া রাস্তা চলিতে হয়—শ্রীকাদায় ও মাঠের ধোয়া শুকনো গোক্ষুরফলের তিনকোণা শ্রীকাঁটায় পথ পরিপূর্ণ, স্বামিজী বারবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা শ্রান্ত, আজ থাক,—কিন্তু থাকি কি করিয়া? শ্রীমান সুরেশের বৃন্দাবন-কাহিনী যে রায় বাহাদুর জলধর সেনের হিমালয়-কাহিনীর মত একেবারে অতখানি সত্য নয়,—এই আনন্দাতিশয্য ঘরের মধ্যে আজ আবদ্ধ করিয়া রাখি কি দিয়া? পারিলাম না। আলো হাতে সত্য সত্যই বাহির হইয়া পড়িলাম।

অথচ, না গেলেই হয়ত ভাল করিতাম। পথ চলার দুঃখের কথা বলিতেছি না, সে তো ছিলই। কিন্তু সেই আবার পুরাতন ইতিহাস। শুনিতে পাইলাম, এখানে ছোট-বড় প্রায় হাজার-পাঁচেক মন্দির আছে। কিন্তু অধিকাংশই আধুনিক, ইংরাজ আমলের। ইংরাজের আর যাহাই দোষ থাক্, যে মন্দিরের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই তাহারও চূড়া ভাঙ্গে না, যে বিগ্রহের সে পূজা করে না তাহারও নাক কান কাটিয়া দেয় না। অতএব যে-কোন দেবায়তনের মাথার দিকে চাহিলে বুঝা যায়, ইহার বয়স কত। স্বামিজী দেখাইয়া দিলেন, ওটি ওমুক জীউর মন্দির সম্রাট আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিয়াছেন ওটি ওমুক জীউর মন্দির ওমুক বাদশাহ ভূমিসাৎ করিয়াছেন, ওটি ওমুক দেবায়তন ভাঙ্গিয়া মসজেদ্ তৈরী হইয়াছে, ওখানে আর কেন যাইবে, আসল বিগ্রহ নাই,—নূতন গড়াইয়া রাখা হইয়াছে,—ইত্যাদি পুণ্যময় কাহিনীতে চিত্ত একেবারে মধুময় করিয়া আমরা অনেক রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। পথে সুরেশচন্দ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক্, সে অনেককালের কথা।

স্বামিজী কহিলেন, কালের জন্য আসিয়া যায় না সুরেশ, মন্দির ভাঙিয়া মসজেদ্ ও বিগ্রহ দিয়া সিঁড়ি তৈরীর সুযোগ আর নাই,—এই যা তোমাদের ভরসা। তোমরা কংগ্রেসের দল ইংরাজ রাজার এই গুণটা অন্ততঃ স্বীকার ক'রো।

এই বৃন্দাবনে এক মাড়বারী ধনী কানা খোঁড়া কালা অন্ধ খঞ্জ সমস্ত বৈষ্ণবীদেরই বৈকুণ্ঠে চড়িবার এক অদ্ভুত লিফ্‌ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন শুনা গেল। সুরেশচন্দ্র ত এই মাড়বারীর ধর্ম্মপ্রাণতায়, বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় ও ফন্দির অপরূপত্বে এক প্রকার মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দেখা হওয়া পর্য্যন্ত ত এই কথাই সে আমাদের একশ'বার করিয়া বলিতে লাগিল, এবং পরদিন সকাল হইতে না হইতে আমাদের সে সর্ব্বকর্ম্ম ফেলিয়া সেইদিকে টানিয়া লইয়া গেল। একটা ঘেরা জায়গায় নানা বয়সের শ' দুই-তিন বৈষ্ণবী সারি দিয়া বসিয়াছে, প্রত্যেকের হাতে এক এক জোড়া খঞ্জনী। তাহারা সেই বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে সুর করিয়া অবিশ্রাম আবৃত্তি করিতেছে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম। তাহাদের মাঝখান দিয়া পথ। দুই-তিনজন মাড়বারী কর্ম্মচারী অনুক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়াছে—কেহ ফাঁকি না দেয়। এই ভাবে প্রত্যহ বেলা এগারোটা পর্য্যন্ত তাহারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম পালন করিলে আধ সের করিয়া আটা পায়, এবং সন্ধ্যাকালে এইমত রুটিনে পরকালের কাজ করিলে এক আনা করিয়া পয়সা পায়। প্রভাতকাল। জন-দুই বুড়া বৈষ্ণবীর তখন পর্য্যন্ত ঘুম ছাড়ে নাই, তাহারা ঢুলিতেছিল, একজন আধা-বয়সী বৈষ্ণবী তাহার পাশের

বৈষ্ণবীর সহিত চাপা-গলায় তুমুল কলহ করিতেছিল। আমরা হঠাৎ প্রবেশ করিতেই বৃদ্ধা দুইটি চমকাইয়া উঠিয়া নামগান শুরু করিল এবং যাহারা বিবাদ করিতে ব্যস্ত ছিল, তাহাদের অসমাপ্ত কোন্দল এই প্রকার আকস্মিক বাধায় বুকের মধ্যে যেন পাক খাইয়া ফিরিতে লাগিল। বিরক্তি ও ক্রোধে মুখ তাহাদের কালো হইয়া উঠিল। সেই ক্রুদ্ধ মুখের নামকীর্ত্তন ভাগ্যে গিয়া গৌর-নিতাইয়ের কানে পৌঁছায় না। জনকয়েক কম-বয়েসী চালাক বৈষ্ণবী দেখিলাম, তালে তালে শুধু হাঁ করে এবং ঠোঁট নাড়ে। চেঁচাইয়া শক্তি ক্ষয় করে না। কিন্তু সকলের মুখ-চোখেই ঠিক পাউণ্ডে আটকানো গরু-বাছুরের ন্যায় অবসন্ন করুণ চাহনি। দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। মাড়বারীরা কিন্তু অত্যন্ত উৎফুল্ল। তাহারা নিজেদের সদনুষ্ঠানের কথা সগর্ব্বে বারংবার বলিতে লাগিল। আর একটা ইঙ্গিতও প্রকারান্তরে করিতে ছাড়িল না যে, কোন একটা উপায়ে ইহাদের আবদ্ধ না রাখিতে পারিলে অসৎপথে যাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

সম্ভাবনা ত আছেই। তথাপি, ফিরিবার পথে আমাদের কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার প্রয়োজন ছিল না,—এই ফন্দি অসাধু! ধর্ম্ম বস্তুটাকে এমন করিয়া উপহাস করা অন্যায়! ছলে, বলে, কৌশলে মানুষকে ধার্ম্মিক করিতেই হইবে,—ইহা কিসের জন্য? এই যে মাড়বারী ধনী কতকগুলি নিরুৎসুক উদাসীন বুভুক্ষু প্রাণীকে আহারের লোভে প্রলুব্ধ করিয়া ভগবানের নাম-কীর্ত্তনে বাধ্য করিয়াছে, ইহার মূল্য কতটুকু! অথচ, এইরূপ জবরদস্তির দ্বারাই ধর্ম্মচর্চ্চায় নিরত করা সকল ধর্ম্মেরই একটা প্রচলিত পদ্ধতি। কোনটা বা ব্যক্ত, কোনটা বা গুপ্ত, এই যা বিভেদ! এবং মাড়বারী প্রসন্নচিত্তে ইহারই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে মাত্র। এই ব্যক্তিকেই আর একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তোমরা এত খরচ কর, কিন্তু সেবাশ্রমে সাহায্য কর না কেন? সে স্বচ্ছন্দে জবাব দিল, সেবাশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা ঔষধ দেয়, যে-সে জাতের মড়া ফেলে, রোগীর সেবা করে,—এই-সব কি সাধুর কাজ? সাধু শুদ্ধাচারী হইবে, ভজন-সাধন করিবে, তবেই ত সে সাধু।

মনে মনে বলিলাম, তাই বটে! তা না হইলে আর আমাদের এই দশা!*

---

* 'বিজলী' পত্রিকার ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৫এ আশ্বিন ও ২৩শে কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

পত্র-সঙ্কলন

পত্র-সঙ্কলন

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোস্ট,
জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু-একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র-সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি, এতে তা পারিনি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারংবার অনুভব করেছি—এ ঠিক হচ্ছে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কিভাবে যে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরীর চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ-জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এ-দেশের লোক-যাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কি-না এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব-ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সেই জানাই হ'লো আমার বিপদ। লেখার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেচে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই, বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু

সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যর সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোল না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লী-সমাজ, এর বিক্রীও যত খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিঁকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যায় জড়ানো। মিথ্যে বরঞ্চ টিঁকে, কিন্তু সত্যর বোনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা হঠাৎ যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময়ে আমি শুধু ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর মুণ্ডু, ওর ধড়, তার পা এক কোরে চমৎকার জিনিস দাঁড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র-সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মত লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁক থেকে যায়, এবং উত্তরকালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এইজন্যেই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন শুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে, সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারো কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয়, এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই—এমনি। মাঝে মাঝে হয়ত, অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে,—তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি, কিন্তু তবুও মন খুশী হয় না, অথচ এরা বলে এই ত সাহিত্য।

ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলছেন আমি বুঝতে পারিনি। শুধু এইটুকুই বুঝেছি, এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায়নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকা জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্ত্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং

বিচারবুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দ্দেশই পাবার জো নেই। সুতরাং ছবির perspective এবং সাহিত্যের perspective কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তা ছাড়া সাহিত্যের বর্ত্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে, সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা concrete উদাহরণ নিই। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন্ পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তার কত রকমের নাম, কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল, তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল, এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী perspective বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন ?

আমি পূর্ব্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু'একটা লেখার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা, না বোকা দর্শকেরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিংবা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তি উল্লেখ করে লিখেছেন, "তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।" আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারী ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তার দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণটা ভারি এলোমেলো—কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে

পারিনে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জ্জনা করবেন। ইতি
—২৬এ ফাল্গুন, ১৩৩৪

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[উপরোক্ত পত্রটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে লিখিত। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'দেনা-পাওনা'র নাট্যরূপ 'ষোড়শী' প্রকাশিত হইলে এবং শরৎচন্দ্র এই বইখানি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত জানিতে চাহিলে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, ইহা তাহারই উত্তর। রবীন্দ্রনাথের পত্রটিও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।]

কল্যাণীয়েষু—তোমার ষোড়শী পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুইটি যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো, তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশী করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। যে ষোড়শীকে এঁকেচ সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিস, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ-পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্ত্তারূপে

তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চলিত সেন্টিমেণ্ট-মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার 'পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যের তুমি বড়ো সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তা হলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুশী থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি—৪ঠা, ফাল্গুন, ১৩৩৪

তোমার—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সামতাবেড়, ২৪-২-২৭

অমল,

……তোমার "অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য" আমি সেইদিনই আগাগোড়া পড়ে ফেলেছিলাম। তোমার বক্তব্য বিষয়ের মূল বস্তুটি আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। দু-একটা কথা হয়ত না বললেই হ'ত; তবে কেউ না বললেই বা বলা হয় কিরূপে? একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে। আর একটু ছোট হলে একটা সুবিধে এই হ'ত যে, কোন ব্যক্তির সম্বন্ধেই একবারের বেশী বার বলবার স্থান থাকত না। তীক্ষ্ণতা একটু কম হ'ত।

কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে এর মধ্যে টেনে না আনলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুশী হতাম। যদি বল, "আপনাকে আনলাম কি করে?" তার উত্তরে আমি বিষ্ণু-শর্ম্মার কৃষক ও শৃগালের গল্প উল্লেখ করতে পারি। শৃগাল বলেছিল—"ভাই, তুমি মুখে যেমন চুপ করেছিলে, তেমন আঙুলটিও যদি না আমার দিকে নির্দ্দেশ করে রাখতে! ভাগ্যি, শিকারীরা তোমার আঙুলের দিকে নজর করেনি।"

তাই না অমল? "গোর্কি, শেখব, শরৎচন্দ্র কি,—" তার পরে আর সমস্ত প্রবন্ধের ভেতর শরৎচন্দ্রের নাম-গন্ধ নেই। রবিবাবুর নানাবিধ উদাহরণ তোলবার পরে যদি অন্ততঃ আমার ওই রকম দু' একটা গল্প, যেমন 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি,—অর্থাৎ দুর্নীতি বা অশ্লীলতা দোষ যাতে নেই,—ইঙ্গিতেও তুমি তা উল্লেখ করতে ত এটা বোঝা যেত, তুমি ঠিক এঁদের মধ্যে আমাকে ঠাঁই দিতে চাওনি।

তোমার মুখ থেকে যদি না আমি নিজে আমার সাহিত্যের সম্বন্ধে তোমার মতামত বহুবার শুনে আসতাম, তবে অনেকের মতো আমারও মনে হ'তো, তুমি

ইঙ্গিতে এঁদের সকলের আগে আমাকেই দাঁড় করিয়েছ। অথচ, তুমি তা করোনি এবং করবার সঙ্কল্পও ছিল না তোমার।

যাই হোক, তোমার রচনা প্রভৃতি অতি চমৎকার হয়েছে। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।* তোমাদের—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১) সামতাবেড়, ২২শে ভাদ্র ১৩৩৩

মণ্টুরাম,—তোমার বই এবং ছোট্ট চিঠিখানি পেলাম। কাল দিনে রেতে বই-খানি পড়ে শেষ করলাম। চমৎকার লাগলো। তবে দু'-একটা ত্রুটিও আছে। ভারতের বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ের মধ্যে আমার নাম না দেখতে পেয়ে কিছু ক্ষুণ্ণ হোলাম। তবে নিশ্চয় জানি এ তোমার ইচ্ছাকৃত নয়, অনবধানতাবশতঃই হয়ে গেছে, এবং ভবিষ্যতে এ ভ্রম যে তুমি শুধরে দেবে, তাতেও আমার লেশমাত্র সংশয় নেই। ওটা দিয়ো, ভুলো না। রায় বাহাদুর মজুমদার মশায়ের রাঙা জবা মুটো মুটোর উল্লেখ কই? ওটাও চাই। কারণ, তিনিও ক্ষুণ্ণ হয়েছেন বলেই আমার বিশ্বাস। এ তো গেল বইয়ের ত্রুটির কথা, একটা মতভেদের বিষয়ও আছে। তুমি পূজনীয় রবিবাবুর একটা উক্তি তুলে দিয়েছ, "আমরা সর্ব্বসাধারণকে অশ্রদ্ধা করি বলেই তাদের চিঁড়ে-মুড়কির বরাদ্দ করি, বাইরের প্রাঙ্গণে আর সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাটা শুনতে ভালো এবং যিনি লেখেন তাঁরও মানসিক ঔদার্য্য এবং নিরপেক্ষতাও প্রকাশ পায় সত্য, কিন্তু আসলে এতবড় ভুল বাক্যও আর নেই। শিক্ষা সভ্যতা এবং কালচারের জন্য সন্দেশই চাই, চিঁড়ে-মুড়কি খাওয়াবার চেষ্টা করলে তারা পেট কামড়ানিতে সারা হয়। আর সর্ব্বসাধারণ মানেই ছোটলোক। তারা চিঁড়ে-মুড়কিতেই thrive করে। একটা concrete দৃষ্টান্ত নাও। সাধারণ মানে ছোটলোক, মা—ও ছোটলোক। এই মা—র পয়সা হওয়ায় ও তোমাদের মত দু'-চারজনের প্রশ্রয় পাওয়ায় আজকাল তারা 3rd class ছেড়ে 2nd class compatmentএ উঠতে আরম্ভ করেছে। (1st classএ সাহেবের ভয়ে ওঠে না, এই না কতক রক্ষে) আচ্ছা, কোন compartmentএ জন দুই-তিন মা—কে ঘণ্টা ৩।৪ ঢুকিয়ে রাখবার পরে আর সাধ্য নাই কারও যে সে ঘর ব্যবহার করে। হাতে-মাটির জন্যে এক ঝুড়ি মাটি থেকে শুরু করে ছোলাসেদ্ধ, পকোড়া, থুথু, গয়ার এবং হেগে-মুতে এমন কাণ্ড করে রেখে বেরিয়ে যাবে যে, সে দৃশ্য যে দেখেচে সে

* শ্রীঅমল হোমকে লিখিত।

আর ভুলবে না। আসল কথা, অন্দরে শোবার ঘরে বসে সন্দেশ ভোজন করার যোগ্যতা আগে অর্জ্জন করা চাই। নইলে অন্দরের দোর খোলা পেয়ে একবার তারা জিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে ঢুকে পড়লে আমরা আর বাঁচবো না। অতএব এরূপ অশ্রদ্ধেয় বাক্য আর কখনো বোলো না।

তোমার concertএ যেতে পারিনি শরীর একটু অসুস্থ ছিল বলে। আরও একটা হেতু এই যে, মেদিনীপুরে প্রতি বৎসরেই কোথাও-না-কোথাও বন্যা হবেই। হতে বাধ্য। Govt. তার কোন উপায় করে না, করবে না। এ হয়েছে দেশের উপরে একটা স্থায়ী tax, এমন কোরে বছর বছর বন্যাপীড়িতের সাহায্য করার সার্থকতা কি? Govt. কে তারা একটা কথা জোর করে বলবে না, এক কোদাল মাটি কেটে রেলের রাস্তা ভেঙে যে জল বার করে দেবে তা দেবে না, পাছে সাহেবরা ধরে জেল দেয়। তারা জানে কলকাতার ভদ্রলোকের মহাকর্ত্তব্য হচ্চে তাদের খাওয়া-পরা দেওয়া, যেহেতু তাদের ঘরে-দোরে জল উঠেছে। তা ছাড়া পদ্মার চরে যো -রা কেন দল বেঁধে বাস করে জানো? শুধু এইজন্যে যে বর্ষায় তাদের ঘর-দোর ভেসে গেলেই পশ্চিমবঙ্গের ভদ্রলোকদের টাকা দিতে হবে। শুধু out of malice এবং spite তারা গিয়ে এরকম ভয়ানক জায়গায় বাস করছে। এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি নিশ্চয় জানি এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার কোনপ্রকার মতভেদ হবার আশঙ্কা নেই। কারণ, তুমি বুদ্ধিমান, যা সত্যি কথা তা বুঝবেই।

তুমি বিলেত যাচ্চো খবরের কাগজে দেখলাম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার যাত্রা নির্ব্বিঘ্ন হোক, উদ্দেশ্য সফল হোক। আমার বয়স হয়েছে, ফিরে এসে যদি আর দেখা না হয় এই কথাটি মনে রেখো আমি চিরদিন তোমার শুভকামনা করে গেছি। আশা করি তোমার কুশল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পুঃ—আগামী ৩১শে ভাদ্র আমার বয়স পঞ্চাশ হবে। ১লা আশ্বিন যাবো কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

(২) সামতাবেড়, ১৩ ফাল্গুন, ৩৩

পরম কল্যাণবরেষু,—মণ্টু, তোমার চিঠি পেয়ে যে কত আনন্দ পেলাম তা তোমাকেও জানানো শক্ত। তুমি যে আমাকে শ্রদ্ধা কর, ভালোবাসো, এও যদি না বুঝবো ত বুঝবো সংসারে কি?

তোমার বিদায়-অভিনন্দনে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মুখে কি কি হয়েছিল সব শুনেছি। তুমি বিদেশে যাচ্ছো, কিন্তু একটু শীঘ্র করে ফিরে এসো। তুমি কাছাকাছি নেই মনে হলে কষ্ট হয়।

'মনের পরশে'র শেষ অংশ অর্থাৎ তৃতীয় অংশটি যে আমার কত ভালো লেগেছিল তা বলতে পারিনে। সত্যকার ব্যথা ও দুঃখের মধ্যে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীময় মানুষে যে মানুষের কত আপনার, এই কথাটি কত সহজেই না তোমার বইয়ের শেষটুকুতে ফুটে উঠেছে। তাই আমার কেবলই মনে হয়েছিল, তুমি বুঝি কার যথার্থ জীবনের দুঃখের কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করে গেছ। কিন্তু এই লিপিবদ্ধ করার প্রণালীটি তোমাকে আর একটুখানি যত্ন নিয়ে শিখতে হবে। তোমার বাবাকে আমি জানতাম না, তাঁর অন্তরঙ্গদের মুখে শুনি, তাঁর মানুষের বেদনা বোঝবার অনুভূতি খুব বড় রকমের ছিল। এইটি হয়ত তুমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ। তোমাকে এই বস্তুটিকে মনের মধ্যে দিবারাত্রি লালন করে পূর্ণ মানুষ করে তুলতে হবে। তবেই ত হবে।

বেশ, আমার চিঠির মধ্যে থেকে যা ইচ্ছে তুমি প্রকাশ করতে পারো। অনুমতি দিলাম।

তুমি আমার অতিশয় স্নেহের জিনিস। আজ বলে নয়, অনেক দিন থেকে। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমার বাড়িতে এসে হৈ হৈ করে লুচি খেয়ে যেতে, তখন থেকে।

তোমাকে আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি, এ জীবনে তুমি সফল হও, নীরোগ হও, দীর্ঘজীবী হও।...আশীর্ব্বাদক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(৩) সামতাবেড়, আষাঢ় ১৩৩৫

পরম কল্যাণীয়েষু—মণ্টু, কতদিন থেকে তোমার চিঠির জবাব দিতে পারিনি। না জানি কত রাগই তুমি কোরেছ। সেদিন তোমাদের থিয়েটার রোডের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু না ছিলে তুমি, না ছিলেন তোমার মাতুল তকু। সাহেবের বাড়ি, অপেক্ষা করা রীতি-বিরুদ্ধ কি না স্থির হোলো না। আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি পাকা লোক। দালালি কাজে সাহেবের বাড়িতে তাঁর যাতায়াত আছে। তিনি বললেন card রেখে যাওয়াই etiquette,—হাঁ করে বসে থাকলে এরা রাগ করে। কিন্তু card না থাকায় আমরা নিঃশব্দে ফিরে এলাম।

কালও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার 'দুধারা'র অনেক জায়গা আর একবার পড়ে গেলাম। বাস্তবিকই বইখানি ভালো। অবহেলা কোরে যেমন-তেমনভাবে পড়ে যাবার জিনিস নয়, মন দিয়ে পড়বার মতই বই। কিন্তু জানো ত আজকাল

প্রশংসা-পত্রের দাম নেই। কারণ, কথার দাম যাঁদের আছে তাঁরা নিজেরাই তার অমর্য্যাদা করেন। তাই সহজে আমি কথা কইনে। কিন্তু, আমার কথায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের সকলকেই বলি মণ্টুর এ বইখানি যেন তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আদ্যোপান্ত একবার পড়ে দেখেন। আমার নিজের তো পেশাই এই, তবুও এতে এমন ঢের কথা আছে যা আমিও ইতিপূর্ব্বে চিন্তা করে দেখিনি।

'ভারতবর্ষে' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫) তোমার 'চাকর'-গল্পটা পড়লাম। গল্পের দিক দিয়ে এ তেমন ভালো হয়নি, কিন্তু, একটা জিনিস দেখচি তোমার চমৎকার develope করে উঠেছে, সে তোমার dialogue। গল্প লেখবার কৌশল অথবা পদ্ধতি এবং এই dialogueএর ধারা,—তোমার লেখায় যেদিন এ দুটোর একটা মিল হয়ে উঠবে সেদিন তুমি সত্যিই বড় সাহিত্যিক হবে। একটা কথা ভুলো না মণ্টু, লেখার মধ্যে লিখে যাওয়াও যেমন শক্ত, লেখার মধ্যে না-লিখে থেমে থাকাও তেমনি শক্ত। কিন্তু এ বস্তুটা কাউকে শেখানো যায় না, আপনি শিখতে হয়। আমি নিশ্চয় জানি এ শিখে নিতে তোমার বাধবে না। আজ তোমাকে যারা বিদ্রূপ করে, তারাই একদিন প্রকাশ্যে না হোক মনে মনেও এ সত্য স্বীকার করবে। আমাদের যাবার দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে, আমরা হয়ত এ চোখে দেখে যেতে পাবো না, কিন্তু ততদিন পরেও আমাকে যদি তোমার মনে থাকে তো আমার এই কথাটা তোমার স্মরণ হবে।

আ—র (আশালতা সিংহ) প্রবন্ধগুলো পড়লাম। ছেলেমানুষের লেখা,—এর ভাল-মন্দ এখনো বিচার করবার সময় আসেনি। বয়সের সঙ্গে আড়ম্বরের অতিশয্যগুলো কেটে গেলে লেখা হয়ত এর ভালোই হবে। ছেলে বয়সের একটা মস্ত দোষ এই যে, অনেক-বই-পড়ার অভিমানটা এদের পেয়ে বসে। তাই নিজের লেখার মধ্যে নিজের কিছুই থাকে না, থাকে শুধু মুখস্থ-করা পরের কথা। থাকে কারণে-অকারণে যেখানে-সেখানে গুঁজে দেওয়ার বিদ্যের বাচালতা। মেয়েটিকে তুমি অতো দ্রুতবেগে লিখতে বারণ করো। লেখার দ্রুতগতি কেরানীর qualification —লেখকের নয়। এ-কথা ভোলা উচিত নয়। অল্প বয়সে গল্প লেখা ভালো, কবিতা লেখা আরো ভালো, কিন্তু সমালোচনা লিখতে যাওয়া অন্যায়। তা উপন্যাসের ওপরেই হোক, বা নারীর ওপরেই হোক।

'শরৎচন্দ্র ও গল্স্ওয়ার্দ্দি' প্রবন্ধ পড়লাম। গল্স্ওয়ার্দ্দি নামটাই শুধু শুনেছি, তাঁর কোন বই আমি পড়িনি। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কোথায় আমার মিল কোথায় গরমিল কিছুই জানিনে। প্রবন্ধের মধ্যে আমার সুখ্যাতি আছে, আর আছে গল্স্ওয়ার্দ্দির রাশি রাশি কোটেশন্। তার থেকে কোন অর্থই আমার আদায় হোলো

না। এইটুকুই বুঝলাম আ—তাঁর বই পড়েচেন এবং গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি ভদ্রলোক যেই হোন অনেক ভালো ভালো বচন দিয়ে গেছেন। এবং সে-সব পড়লে জ্ঞান জন্মায়।

মেয়েটি যে জীবনে সুখী নয় এ-কথা শুনে ক্লেশ বোধ হয়! কিন্তু এ সমাজে মেয়ে-জন্মের এমনি অভিশাপ যে, এর থেকে নিষ্কৃতিরও পথ নেই। মেয়েটির লেখা পড়ে মনে হয় ভারি বুদ্ধিমতী। কিন্তু জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই পড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না-পাওয়া পর্য্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত? কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাকতেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত। এই যেমন গল্প লেখা। আমি অনেক সময়ে দেখেচি কম বয়সে যা লেখা যায় তার অনেক অংশই আবার বয়স বাড়লে লেখা যায় না। তখন বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ও সঙ্কোচে বাধে। মানুষের মধ্যে শুধু লেখকই থাকে না, ক্রিটিক্‌ও থাকে। বয়সের সঙ্গে এই ক্রিটিক্‌টি বাড়তে থাকে। তাই বেশী বয়সে লেখক যখন লিখতে চায় ক্রিটিকটি প্রতি হাতে তার হাত চেপে ধরতে থাকে। সে লেখা জ্ঞান বিদ্যে-বুদ্ধির দিক দিয়ে যত বড়ই হয়ে উঠুক রসের দিক দিয়ে তার তেমনি ত্রুটি ঘটতে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস যৌবন উত্তীর্ণ করে দিয়ে যে-ব্যক্তি রস-সৃষ্টির আয়োজন করে সে ভুল করে।—মানুষের একটা বয়স আছেই যার পরে কাব্য বলো উপন্যাস বলো আর লেখা উচিত নয়। রিটায়ার করাই কর্ত্তব্য। বুড়ো বয়সটা হচ্ছে মানুষকে দুঃখ দেবার বয়স, মানুষকে আনন্দ দেবার অভিনয় করা তখন বৃথা।

সেদিন বার্ট্রাণ্ড রাসেলের An outline of philosophy বইখানি পড়লাম। এ বইখানি শক্ত, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি বিশেষ জ্ঞান না থাকলে সকল কথা ভালো বোঝা যায় না, বুঝতেও পারিনি। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় মানুষটির সরলতা দেখলে, এবং অনভিজ্ঞ মানুষকে সোজা করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে। আনাড়ি লোকদের ওপর এঁর অশেষ করুণা। আহা! এ বেচারারা দুটো কথা বুঝুক,—সত্যিকার এই ইচ্ছেটুকু যেন এঁর লেখার ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। ভাবি, যাঁরা বাস্তবিকই পণ্ডিত, জ্ঞানী, তাঁদের লেখার সঙ্গে ফোক্কড়দের লেখার কতই না প্রভেদ। এটা কতই না স্পষ্ট হয়ে ওঠে এঁর লেখার পাশাপাশি H. G. Wellsএর লেখা পড়লে। এর কেবলই চেষ্টা বড় বড় কথা শুধু চালাকি আর ফক্কড়ি করে মেরে দেবো। রাসেলের On Education বইটা কিনে এনেচি। ভাবচি কাল পড়ব। আসচে বছরে যদি বিলেতে যাই শুধু এই লোকটিকে একবার দেখে আসবার জন্যেই যাব।

সেদিন জনকয়েক ছেলে এসে তোমার মনের পরশের ভারী সুখ্যাতি করছিলো। তারা বলে এ বইটির সম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম তা বাস্তবিক সত্য। শুনে বড় খুশী হয়েছিলাম।......শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৪) সামতাবেড়, ১৩-৬-২৭

মণ্টু,—তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হতে গেলে? ব্যস, আর না। এই পত্র পাবা মাত্র চলে আসবে। আবার না হয় দিন-কতক পরে যেয়ো ক্ষতি নেই। আমি অভিজ্ঞ ব্যক্তি, আমার কথাটা শুনো। তোমার বয়সে আমি চার-চারবার সন্ন্যাসী হয়েছি। ও অঞ্চলে বোধ করি মাছি আর মশা কম, নইলে হিন্দুস্থানী......দের পিঠের চামড়া ছাড়া কার সাধ্য সে দংশন সহ্য করে। এ বাঙ্গালীর পেশা নয় বাপু, কথা শোন, চলে এসো। তুমি এলে এবার একসঙ্গে বর্ষার পরে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ একবার বেড়াতে যাবো। তুমি সঙ্গে না থাকলে খাতির পাওয়া যাবে না, খাওয়া-দাওয়ারও তেমন সুবিধে ঘটবে না। কবে আসচো পত্রপাঠ লিখে পাঠাবে। আমি ইষ্টিসানে যাব।

আর একটি কথা। বারীন (বারীন্দ্রকুমার ঘোষ) শুনেছি যে-কোন গাছের পাতা তোমার নাকের ডগায় রগড়ে দিয়ে যে-কোন ফুলের গন্ধ শুঁকিয়ে দিতে পারে। উপেন বাঁড়ুয্যে বলে এটা সে কর্ত্তার (শ্রীঅরবিন্দ) কাছ থেকে মেরে নিয়েচে। আসবার সময় এটা তুমি শিখে নেবে। হঠাৎ সে মানবে না, কিন্তু ছেড়ো না। দিন-কতক তার আন্দামানের বাঁশীর খুব তারিফ করতে থাকবে এবং বইখানা সর্ব্বদাই হাতে হাতে নিয়ে বেড়াবে। এবং এ-বই এতদিন যে পড়োনি এই বলে মাঝে মাঝে তার সুমুখে অনুতাপ প্রকাশ করবে। খুব সম্ভব এই হলেই 'বিভূতি'টা হস্তগত করে নিতে পারবে। উত্তর-ভারতে বেড়াবার সময়ে এটা বিশেষ কাজে লাগবে।

অনিলবরণ (অনিলবরণ রায়) শুনেছি নাকি মাটির গুঁড়োকে চিনি করে দিতে পারে। বেশীক্ষণ থাকে না বটে, কিন্তু ৫।৭ ঘণ্টা চিনির মত দেখতেও হয়, খেতেও লাগে। এটা নিশ্চিত শিখে আসবার চেষ্টা কোরো। হঠাৎ টাকাকড়ি ফুরিয়ে গেলে পথে ঘাটে বিদেশে,—বুঝেচ ত? এটা শেখাই চাই। অনিলবরণ লোকটি সরল ও ভালো মানুষ,—একান্তই যদি শেখাতে আপত্তি করে তো ভূত-পেত্নীর গল্প করবে। হলফ করে বলবে যে পেত্নী তুমি চোখে দেখেচো। তার পরে ভাবতে হবে না,—অনায়াসে কৌশলটা মেরে নিতে পারবে, আর এ দুটো যদি সত্যি শিখে নিতে পারো ত ওখানে কষ্ট করে থাকবারই বা দরকার কি?

অনেককাল তোমাকে দেখিনি। ভারী দেখবার ইচ্ছা হয়, গান শোনবার সাধ হয়। কবে আসবে জানিয়ো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পুঃ—'বিভূতি' দুটো আদায় করে আনা চাই। সময়ে অসময়ে ভারী কাজে লাগে। যাই হোক শীঘ্র চলে এসো। সন্ন্যাসী হওয়া ভারী খারাপ মণ্টু, আমার কথা বিশ্বাস কর। আজকালকার দিনে কিচ্ছু মজা নেই। কবে আসবে নিশ্চয় লিখো।

(৫) সামতাবেড়, ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩৭

পরম কল্যাণীয়েষু,—মণ্টু তোমার চিঠি পেলাম।······

তোমার নতুন কাগজ আমাকে পাঠিও। আমি ছাড়া পরিচিত যাঁরা, তাঁদেরও নেবার জন্যে বলে দেবো। তোমার লেখা বেরুবে, ওটা পড়বার আমার সত্যি আগ্রহ হয়। তুমি লিখেচো সাহিত্য ব্যাপারে আমার কাছে তুমি ঋণী, —অন্ততঃ এর সংযম সম্বন্ধে। ঋণের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু এই কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেচি যে, কেবল লেখাই শক্ত নয়, না-লেখার শক্তিও কম শক্ত নয়। অর্থাৎ ভেতরের উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ যেন নিরর্থক ভাসিয়ে নিয়ে না যায়। আমি নিজেই যেন পাঠকের সবখানি আচ্ছন্ন করে না রাখি। অ-লিখিত অংশটা তারাও যেন নিজেদের ভাব, রুচি এবং বুদ্ধি দিয়ে পূর্ণ করে তোলবার অবকাশ পায়। তোমার লেখা তাদের ইঙ্গিত করবে, আভাস দেবে, কিন্তু তাদের তল্পি বইবে না। জলধর-দা (রায় বাহাদুর জলধর সেন) তাঁর কি একটা বইয়ে মরা-ছেলের বাপ-মায়ের হয়ে পাতার পর পাতা এত কান্নাই কাঁদলেন যে, পাঠকেরা শুধু চেয়েই রইলো, কাঁদবার ফুরসৎ পেলে না। বস্তুতঃ লেখার অসংযম সাহিত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করে দেয়।··· বাঁড়ুয্যে চমৎকার লিখতেই পারেন, কিন্তু চমৎকার না-লিখতে পারেন না। আর এক ধরণের অসংযম দেখতে পাই অ—র লেখায়। ছেলেটি লেখে ভালো, বিলেতেও গেছে,—এ যাওয়াটা ও একটা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলতে পারে না। বিলেতের ব্যাপার নিয়ে ওর লেখার এমনি একটা অরুচিকর ভক্তিগদ্‌গদ্ 'আদেক্‌লেপনা' প্রকাশ পায় যে, পাঠকের মন উৎপীড়িত বোধ করে। আমার গিরীন মামাকে মনে পড়ে। একবার বৈষ্ণব মেলা উপলক্ষে আমরা শ্রীধাম খেতুরীতে গিয়াছিলাম। মামার বিশ্বাস ছিল খেতুরীর প্রসাদ খেলে অম্বল সারে। স্টীমার থেকে গঙ্গার তীরে নেমেই মামা অ্যাঃ—করে উঠলেন। দেখি ভয়ার্ত্ত মুখে এক পা উঁচু করে আছেন।

কি হ'লো?

বড্ড কাঁচা শ্রীগু মাড়িয়ে ফেলেচি।

তাঁর ভয় ছিল, ভক্তিহীনতা প্রকাশ পেলে হয়ত অম্বল সারবে না। তোমার 'দোলা'র ব্যাপারটাও বিলেতের। সেদিন কয়েকটা অধ্যায় পড়েছিলাম। তাতে এই অহেতুক ভক্তিবিহ্বলতা, অকারণ অসংযত বিবরণের ঘটাপটা নেই। মনে হয় এও বিলেতে গেছে, জানেও অনেক কিছু, কিন্তু জানানোর মাতামাতি নেই। এইটুকু সর্ব্বদাই মনে রেখো মণ্টু। আমি আশীর্ব্বাদ করছি একদিন তুমি বড় হবে। অ—র লেখার সম্বন্ধে আমার অভিমত কেউ যদি challenge করে বলে কই দেখাও দিকি? আমাকে প্রত্যুত্তরে হয়ত শুধু এই কথাই বলতে হবে যে, এ-সব জিনিস এমন কোরে দেখানো যায় না। ও রসজ্ঞ পাঠকের মন আপনি অনুভব করে। অ—দেবীর উপন্যাসে দেখতে পাবে বেদ-বেদান্ত, উপনিষৎ, পুরাণ, কালিদাস, ভবভূতি, সবাই ঢোকবার জন্যে যেন ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দেয়। ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটি ধরা পড়ে,—দ্যাখো তোমরা আমরা কি বিদুষী। কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি! এই আতিশয্য যেন কোনমতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। ওদের এমনি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এ না-এলেই-নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল। এ শেখানো যায় না—আপনি শিখতে হয়। আর শেখা যায় শুধু সংযমের অভ্যাসে। পাঠককে তাক লাগিয়ে দেবার সদিচ্ছার বাহুল্যে তার স্বকীয় কল্পনার খোরাককে কখনো কৃপণতা কোরব না, এই তত্ত্বটি লেখবার সময়ে একটি মিনিটের জন্যেও ভুললে চলবে না। অথচ, বড় ভাব, বড় তত্ত্ব, বড় idea, বড় প্রকাশ, এই নিয়েই চলা চাই লেখা,—জল পড়ে, পাতা নড়ে, লাল ফুল, কালো জল, আর জায়ে জায়ে ঝগড়া আর বৌয়ে-বৌয়ে মনোমালিন্য, কিংবা প্রভাত মুখুয্যের (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) বর্ণনার নিপুণতা,—ঘরের মধ্যে ক'টা আলমারি, ক'টা সোফা, প্রদীপে ক'টা সলতে দেওয়া এবং আলনায় ক'টা এবং কি পাড়ের কোঁচানো শাড়ি—এ সকলের দিনও গেছে, প্রয়োজনও শেষ হয়েছে। ও কেবল লেখার ছলে সাহিত্যকে ঠকানো।

তোমার লেখার মধ্যে আজকাল আমি অনেক আশা অনেক ভরসা পাই। অথচ, মনের মধ্যে বেদনা বোধ করি যে এ তুমি ছেড়ে দিলে। আশ্রমে বাস করে সে বস্তু কখনো হবে না। জীবনে যে ভালোবাসলে না, কলঙ্ক কিনলে না, দুঃখের ভার বইলে না, সত্যিকার অনুভূতির অভিজ্ঞতা আহরণ করলে না, তার পরের-মুখে ঝাল-খাওয়া কল্পনা সত্যিকার সাহিত্য কতদিন জোগাবে? নাকটেপা-প্রাণায়ামের যোগবলে আর যা-কিছুই হোক এ বস্তু হবে না। নিজের জীবনটাই

হোলো যার নীরস, বাঙলাদেশের বালবিধবার মতো পবিত্র, সে প্রথম যৌবনের আবেগে যত কিছুই করুক, দু'দিনে সব মরুভূমির মত শুষ্ক শ্রীহীন হয়ে উঠবে। ভয় হয়, ক্রমশঃ হয়ত তোমার লেখার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখা দেবে। সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সব-কিছু ফুলের মতো বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাংলাদেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে এই বুঝি গ্রন্থকারের নিজের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন-সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত। আমার কথা যাক। তোমার নিজের কথায় একদিন আমি ভেবেছিলাম, মণ্টু যে ব্যারিস্টার হয়ে আসেনি সে ভালোই হয়েছে। না-ই করলে ও রাশি রাশি টাকা রোজগার, নাই চড়ে বেড়ালো মটরগাড়ি, না-ই হোলো হাই সার্কেলের কেও-কেটা। ওর অভাব নেই, যা-আছে বেশ চলে যাবে,—শুধু সঙ্গীত ও সাহিত্যে দেশকে অনেক কিছু যেন মণ্টু দিয়ে যেতে পারে। সে নিরানন্দ দেশের আনন্দের ভোজ,—সেই আমাদের ঢের। আমি আরও একটা কথা ভাবতাম। মণ্টু এই যে দেশে দেশে ঘুড়ে বেড়ায়, ও অনেক জাত অনেক সমাজে অনেক লোকের সঙ্গে বাঙলাদেশের একটা স্নেহ ও শ্রদ্ধায় বাঁধন বেঁধে দিচ্ছে। একে সবাই চেনে, সবাই ভালোবাসে। মণ্টুর সঙ্গে গেলে কোথাও আদরের অভাব ঘটবে না। কিন্তু সে আশা সে আনন্দে ছাই পড়লো। যাহার দেহের মনের আনন্দের সামাজিকতার স্বাধীনতার সীমা ছিল না, সে আজ এমনি দাসখৎ লিখে দিলে যে এক-পা বাড়াতে গেলেও আজ চাই ওর permission – ছাড়পত্র। এই হোল ওর মুক্তির সাধনা। গেলো দেশ, রইলো ওর কাল্পনিক স্বার্থ -সেই হোলো ওর বড়ো। আমিও অনেক পড়েচি, অনেক দেখেচি, অনেক কিছু করেচি—এ-কথা আমিও তো ভুলতে পারিনে। তাই, যে যা বলে মেনে নিতে পারিনে, আমার বাধে। কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল। আমার ছেলেবেলার একটা কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। মামার সঙ্গে স্যার গুরুদাসের (গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) বাড়ি দুর্গাপূজোর নেমতন্ন খেতে গেছি। গিয়ে দেখি গুরুদাসের প্রচণ্ড ক্রোধে মাথার বড় বড় কেশর ফুলে উঠেচে। একজন ছাত্র নাকি বলেছিল গঙ্গাস্নানে পাপ ক্ষয় হয়, সে বিশ্বাস করে না। গুরুদাস ক্ষিপ্ত হয়ে চীৎকার করে বলচেন যে, স্নানের প্রয়োজন নেই, শুধু তীরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা বলে গঙ্গা দর্শন করলে শুধু তার নিজের নয়, সাতপুরুষ যে পাপমুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গ-বাস করে এতে সন্দেহের অবকাশ কোনখানে? কোন্ পাষণ্ড এ শাস্ত্রবাক্য অস্বীকার করিতে পারে। বলতে বলতে তিনি রাগে বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন। মনে

আছে সেই ছেলেবয়সেই মনে মনে বোললাম, এই গুরুদাস! সেকালের এম. এ.-তে Mathematics-এ First, বড় উকিল, বড় Jurist, বড় জজ, University-র ভাইস-চ্যান্‌সেলার। ধার্ম্মিক, সত্যবাদী—তিনি ভণ্ডামি করেননি, যা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন তাই বলেচেন,—তাই এই ভীষণ ক্রোধ। দেখি এ নিয়ে Sir Oliver Lodge-এর সঙ্গেও তর্ক চলে না, আমার প্রজা গৌর মাঝির সঙ্গেও না। এ অন্ধ বিশ্বাস। তাকেই নানা যুক্তি, নানা কথার মারপ্যাঁচ লাগিয়ে সত্যি বলে মেনে নেওয়া। বিদ্যে-সিদ্যে থাকলে কথায়-বার্ত্তায় রঙ-চঙ লাগাতে পারে, না থাকলে সোজা কথায় সহজ করে বলে। প্রভেদ ঐটুকু। ঐ Sir Gooroodas! তোমার কাছে এ-সব বলতেও ভয় হয়, কারণ সকলেই জানে যে, আশ্রমবাসীরা অত্যন্ত ক্রোধী হয়। তারা কথায় কথায় গাল-মন্দ করে তেড়ে মারতে আসে!······কোন আশ্রমের 'পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোন-একটা বিশেষ আশ্রমের পরেই আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। আমি জানি ও সবই সমান। সবই ভুয়ো।

আশ্রম যাক······আসল কথা তুমি নিজে। তোমাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করি এ মিথ্যে নয়। ভারী দেখতে ইচ্ছে হয়। গান শুনতে, গল্প করতে। ভারী বুড়ো হয়ে পড়েচি, আর ক'টা দিনই বা বাঁচবো, এদিকে আসবে না একবার? আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো।—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

(১) ভূপেন,

একখানি মাসিক পত্রের তুমি সম্পাদক, catchwordএর মোহ যেন তোমাকে না পেয়ে বসে। কারণ, এ-কথা তোমার কিছুতেই ভোলা উচিত নয় যে, বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েচে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt-এর form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্ত্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো? বিপ্লবের মাঝে আছে class war, বিপ্লবের মাঝে আছে civil war;—আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।

---

* (১) হইতে (৫) সংখ্যক পত্রগুলি শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখিত। মণ্টু দিলীপবাবুর ডাক নাম।

সামতাবেড়, ১০ই চৈত্র, ১৩৩৬

(২) ভূপেন,

নববর্ষের সূচনায় তোমাদের 'বেণু'কে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি। যে-জাতির সাহিত্য নেই, তাদের দারিদ্র্য যে কত বড়, এই পুরানো সত্যটা আমরা বর্ত্তমান কালে নানা উত্তেজনায় প্রায় ভুলে যাই। তার ফল হয় এই যে, হানতার অন্ধকার জাতীয় জীবনে নিরন্তর গাঢ়তর হয়েই উঠতে থাকে। সমাজের মধ্যে আবর্জ্জনা অনেক জমেছে, বেদনা ও দুঃখেরও সীমা নেই, এ-কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তোমরা যে-কয়টি ছেলের দল এই ছোট কাগজখানিকে কেন্দ্র কোরে একসঙ্গে মিলেছো—তোমরা যে নর-নারীর যৌন সমস্যাকেই সকল বেদনার পুরোভাগে স্থাপন করনি, এইটিই আমার সবচেয়ে আনন্দের সেতু। পরাধীনতার দুঃখই তোমাদের সকল ব্যথার বড় হয়ে তোমাদের এই পত্রিকায় বারে বারে ফুটে ওঠে। প্রার্থনা করি, এ কাগজে এ নীতির যেন ব্যতিক্রম না হয়।

সামতাবেড়

(৩) পরম কল্যাণবরেষু,

ভূপেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার চিঠি পেয়েছি। সাহিত্য নিয়েই তোমাদের সঙ্গে পরিচয়, এবং নিজের দেশকে সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসা এই জানি, কিন্তু কোন্ অপরাধে যে আবদ্ধ হয়ে আছো ভেবে পাইনে। প্রার্থনা করি, যেন অচিরে মুক্তি পেয়ে আবার কর্ম্মের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে ফিরে আসতে পারো।

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটা যে তোমার এতখানি ভালো লেগেছে, এতে ভারী আনন্দ পেলাম। এর ভেতর সামাজিক অনেক প্রশ্নের আলোচনা আছে, কিন্তু সমাধানের ভার তোমাদের হাতে। ভবিষ্যতের এই সুকঠিন দায়িত্বের সম্ভাবনাই হয়ত তোমাদের এতবড় আনন্দ দিয়েছে। অথচ, আমার ধারণা এ বই বহু লোককেই নিরাশ করবে, তারা কোন আনন্দই পাবে না। একে তো গল্পাংশ নিতান্ত কম, তাতে আবার ভেবে ভেবে পড়তে হয়, হু হু করে সময় কাটানো বা ঘুমের খোরাকের মত নিশ্চিন্ত আরামে অর্দ্ধেক চোখ বুজে উপভোগ করা চলে না। এ ভালো লাগবার কথা নয়। তবুও লিখেছিলাম এই ভেবে যে, কেউ কেউ তো বুঝবে, আমার তাতেই চলে যাবে। সকল প্রকার রস সকলের জন্য নয়। অধিকারী ভেদটা আমি মানি।

আরও একটা কথা মনে ছিলো, সে অতি-আধুনিক সাহিত্য। ভেবেছিলাম এইদিকে একটা ইসারা রেখে যাবো। বুড়ো হয়েছি, লেখার শক্তি অস্তগতপ্রায়

তবু, ভাবী-কালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত পাবে যে নোঙরা না করেও অতি-আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল, পেলব রসানুভূতিই নয়, intellect-এর বলকারক আহার্য্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রস-সাহিত্যের একটা বড় কাজ। এর পরে তোমরাও যখন লিখবে তোমাদেরও অনেক পড়তে হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শুধু চিত্ত-বিনোদনের হাল্কা ভাবটুকু বয়ে দিয়েই অব্যাহতি পাবে না।

জেলের মধ্যে আছো, হাতে সময় অপরিসীম, এ বৃথা যেন নষ্ট ক'রো না, এই তোমার প্রতি আদেশ। এই নির্জ্জন বাস পরবর্ত্তী কালে যেন তোমার কল্যাণের দ্বার মুক্ত করে দিতে পারে। বহুর সাহচর্য্যে বহু মানবকে যেন চিনতে পারো। মানুষের স্বরূপের জ্ঞানটাই সাহিত্যের আসল মালমসলা। এই সত্যটি কোনদিন ভুলো না।······ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ৩৮*

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু, সামতাবেড়

ভাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম। আমার একটা দুর্নাম আছে যে আমি জবাব দিইনে। নেহাৎ মিথ্যে বলতে পারিনে, কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তুমি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছো, তারও যদি সাড়া না দিই তো শুধু যে অসৌজন্যের অপরাধ হবে তাই নয়, কোনদিক থেকেই যে যতীনকে সমাদর করবার অংশ নিতে পারলাম না, সে দুঃখের অবধি থাকবে না। অনেকেই জানে না যে যতীনকে [কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী] আমি সত্যিই ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমন একটি স্নেহসরস বন্ধু-বৎসল ভদ্র মন আছে যে, তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।

যতীন জানেন, আমি তাঁর কবিতায় একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের দেখা পাই, বার বার করে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নির্ভুল ছন্দগুলি কানে কানে যেন কত কি বলতে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে—আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ভাবি আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বলতেই হয়

---

* (১), (২) ও (৩) এই পত্র কয়টি 'বেণু' পত্রের সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়কে লিখিত।

তো সত্যি কথাই বলি। যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুশী করতে পারতাম না সত্যি না হলে। যাক এ-কথা।

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট,—হবেই তো ছোট। কিন্তু তাই বলে তার দামটি ছোট নয়। এ তো ঢ্যাঁঢরা দিয়ে বহু লোক ডেকে এনে উচ্চ-কোলাহলে "জয়, যতীন বাগচীকি জয়!" বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট রসচক্রের প্রীতি-সম্মিলন। কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জন-কয়েক সত্যিকার সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-সেবী একসঙ্গে মিলে আর একজন সত্যিকার সাহিত্য-সেবককে সাদরে আহ্বান ক'রে এনে বলা—"কবি, আমরা তোমার সাহিত্য-সাধনায় আনন্দ লাভ করেছি, তোমার বাণীপূজা সার্থক হয়েছে,—তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ু হও, আমরা তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিই, আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর।" এই তো? আয়োজন সামান্য বলে তোমরা ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না।

কিন্তু তবুও সম্মিলনে একটু ত্রুটি ঘটলো, আমি যেতে পারলাম না। কারণ, আমি বোধ করি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।......

অনেকে উপস্থিত আছে, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। কালিদাস, তুমিও তো প্রায় সাবালক হতে চললে। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণে না থাকলেও কিছু কিছু হয়ত মনেও পড়বে। এদিনের মতো সেদিনে আমরা এমন করে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না। এক আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেছে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্য-সেবকদের মাঝখানে ভাবের আদান-প্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিনই চলে আসচে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল একি হতে চললো? নিন্দে করার একি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানি প্রচারের একি নির্দ্দয় অধ্যবসায়। কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি ততই মন লজ্জায় দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য্য নেই, বেদনা-বোধ নেই, হানাহানির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেচে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেচে, রুক্ষ কটু-কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে-বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে, বাঙলাদেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবে, অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হয়ে ওঠেনি।

যাই হোক, কামনা করি তোমাদের রসচক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়।

কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি লেখা হয়ে যায় আমার চিরদিনই এলো-মেলো।...ইতি—৫ই ভাদ্র, ১৩৩৮ *

—শরৎদা

২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়েষু,

কাগজ চালাবার সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়েছো, কিন্তু নিজে কখনও কাগজ চালাইনি, সুতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে প্রতি মাসেই অনেক কাগজ পড়ি, এর থেকে এই কথাটা মনে হয় মাসিকপত্র বহুলোকের প্রিয় করে তোলার জন্যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন লেখার স্নিগ্ধতা এবং সংযম। উগ্রতায় অভিভূত করে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে যে-লেখা রচিত হয়, একটু মন দিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে, তার পোষাক ও বাইরের আতিশয্য স্বল্পকালের জন্য পাঠকের চিত্ত চঞ্চল করে তুললেও সে স্থায়ী ত হয়ই না, পরন্তু প্রতিক্রিয়ায় অবসাদগ্রস্ত করে দেয়। গল্পেই হোক বা যাতেই হোক, যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন অনুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসেনি তখনি মনে কোরো তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, সে অন্তঃসারশূন্য—সে টিকবে না।

ইন্‌টেলেকচুয়াল গল্প বলে একটা কথা আজকাল প্রায় শুনতে পাই, কিন্তু তার স্বরূপ কখনো দেখিনি, কিংবা দেখেও যদি থাকি, চিনতে পারিনি। সেদিন হঠাৎ একটা গল্প পড়েছিলুম, শেষ করে মনে হয়েছিল লেখকের বিদ্যের ভারে লেখাটা যেন পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েচে। এ বস্তুকে কাগজে কখনো প্রশ্রয় দিও না। তবে এমন কথাও মনে কোরো না, গল্পে বুদ্ধি-শক্তির ছাপ থাকা মাত্রই দোষণীয়, হৃদয়বৃত্তির অপরিমিত বাহুল্যতায় লেখকের আহাম্মক সাজাই দরকার। †

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* 'রসচক্র' নামক সাহিত্যিকদের সভায় যত্নেন্দ্রমোহন বাগচীর সম্বর্দ্ধনা-সভায় যোগদান করিতে না পারায় সম্পাদক কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়কে লিখিত।

† 'স্বদেশ' নামক পত্রের সম্পাদক শ্রীকুকেন্দুনারায়ণ ভৌমিককে লিখিত।

১৭ই আশ্বিন, ১৩৪১

পরম শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়,—একটা প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা সাহিত্য নিয়ে। আপনি বলতে পারেন, তবে খাঁটি সাহিত্যিকের কাছে না গিয়ে আমার কাছে কেন? তারও কারণ আছে। লোকে আপনাকে ঠিক কি বলে জানিনে, কিন্তু আমি জানি আপনাকে সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় সাধু মানুষ বলে। কর্ম্ম নেই, অথচ কর্ম্মকে আপনি ত্যাগ করেননি। এ-ও তেমনি। সেই কর্ম্মহীন কর্ম্মই আপনার 'প্রবর্ত্তকে'র সম্পাদন। তাই, বহু বিভিন্ন বিষয়ে বহু লেখাই আপনাকে লিখতে হয়, দেখি, বহু চিন্তা আপনার মনের মধ্যে আসে আর যায়,—চলার পথ তাদের অবারিত কিন্তু পথ জুড়ে অন্য পথচারীর পথ আগলানোর অধিকার তাদের নেই।

প্রবর্ত্তকের সম্পাদনায় কেবলমাত্র যদি কাব্য এবং গল্প-উপন্যাস নিয়ে থাকতেন, সাহিত্য-ঘটিত প্রশ্ন হলেও এ জিজ্ঞাসা আপনাকে করতাম না। যদি নিজের কাগজের মারফতে একটা উত্তর দেন অত্যন্ত সুখী হবো। এ বিশ্বাস আছে, উত্তর দিলে সত্য উত্তরই পাবো, ফাঁকির কারবার আপনার নেই।

আচার্য্যগণ বলেন, কলা-সাধনার মূল সূত্র হ'লো সত্য, শিব এবং সুন্দর। অর্থাৎ সাধনা হয় যেন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুন্দরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার ফল যেন হয় কল্যাণময়। যারা বিজ্ঞানের সাধক (তত্ত্বজ্ঞান বলচিনে,—বলচি সাধারণ সাংসারিক অর্থে) অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যাঁরা তাঁদের একমাত্র মন্ত্র হ'লো সত্য। সাধনার ফল সুন্দর-অসুন্দর, কল্যাণ-অকল্যাণকর—কোনটাতেই তাদের গরজ নেই। হয় ভালোই, না হলেও অপরাধ নেই।

অথচ সাহিত্য-সেবায় বহুদিন ব্রতী থেকে নিরন্তর অনুভব করি এখানে সত্য এবং সুন্দরে বাধে পদে পদে বিরোধ। জগতে যা ঘটনায় সত্য, সাহিত্যে হয়ত সে সুন্দর নয়, এবং যা সুন্দর সে হয়ত সাহিত্যে একেবারে মিথ্যা। যাকে সত্য বলে জানি, তাকে মূর্ত্তি দিতে গিয়ে দেখি সে হয়ে ওঠে বীভৎস কদাকার, আবার অসত্যকে বর্জ্জন করেও পাইনে সুন্দরের রূপ। তেমনি মঙ্গল-অমঙ্গলও। সাহিত্যে এ প্রশ্ন অবান্তর স্বীকার না করেও ত পারিনে।

জিজ্ঞাসা করি, সত্য যদি হয় সুন্দরের পরিপন্থী, কল্যাণ-অকল্যাণ হয় গৌণ, সাহিত্য-সাধনায় এ সমস্যার মীমাংসা কোন পথে ?* ইতি –

ভবদীয়
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* 'প্রবর্ত্তক'-সম্পাদক শ্রীমতিলাল রায়কে লিখিত।

(১)

কল্যাণীয়েষু,—লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি দেশের সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমশঃ দশের উৎসুক ও উৎকণ্ঠ দৃষ্টি লাভ করিতেছে। পূর্ব্বেকার উপেক্ষা অবহেলার ভার আর নাই। অর্থাৎ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনে এইগুলির প্রয়োজনীয়তাও মানুষে এখন উপলব্ধি করিতেছে। আনন্দের কথা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার আসনটি কেবলমাত্র দখল করিয়া রাখিলে চলিবে না, কাজের মধ্য দিয়া স্বকীয় মর্য্যাদা প্রতিদিন প্রমাণিত করিতে হইবে; নিরন্তর মনে রাখিতে হইবে তোমার কর্ম্মশীলতা সাধারণের সৌভাগ্য ও কল্যাণ সমৃদ্ধ করিতেছে। আর কোন পন্থায় নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া চলা কাগজের পক্ষে শুধু ব্যর্থতা নয়, বিড়ম্বনা।

কাগজ পরিচালনার কাজ কেবলমাত্র দায়িত্বপূর্ণই নয়, নানাভাবে বিঘ্নসঙ্কুল। বিবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয়। অধিকাংশই সাময়িক নিঃসন্দেহ, তথাপি সংযম ও সহিষ্ণুতার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি নির্ভীক আলোচনা সাপ্তাহিকের প্রাণ, কর্ত্তব্যবিমুখতা অপরাধ, তবু বলি তার চেয়েও মহার্ঘ তোমার আপন চরিত্র ও মর্য্যাদা। ইতি—৭ই শ্রাবণ, ১৩৪২

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২)

কল্যাণীয়েষু,—'বাতায়নে'র প্রত্যেকটি সংখ্যাই আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি, আলস্য বা উপেক্ষায় কোনদিন দূরে ঠেলে রাখিনি।

সকল বিষয়েই যে একমত হতে পেরেছি তা নয়, এর সমালোচনার ভাষা মাঝে মাঝে কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ ঠেকেছে, কিন্তু অকারণ বিদ্বেষ বা ব্যক্তিগত ঈর্ষার আক্রমণে কোন আলোচনাই কোনদিন কলঙ্কিত হতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। এটা আনন্দের কথা। কিন্তু যদি কখনো এমন ঘটেও থাকে, যা আমার চোখে পড়েনি, তার সম্বন্ধে এই কথাই আজ বলবো যে, যা হয়ে গেছে সে যাক, কিন্তু নূতন বৎসরের প্রারম্ভে তোমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা চাই যে, লেখায় অসহিষ্ণুতা যদি-বা সহ্য যায়, ক্রূরতা, নীচতা, অসত্য অপবাদে মানুষকে হীন প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস দীর্ঘদিন পাঠক-সমাজ সইতে পারেন না, তাঁদের চোখে ধীরে ধীরে লেখক আপনিই হয়ে আসে ছোট, তার স্বরূপ ধরা পড়ে। তখন কাগজের মর্য্যাদা হয় নষ্ট, উদ্দেশ্য হয় শিথিল, আলোচনা হয় নিষ্ফল পণ্ডশ্রম—সর্ব্বপ্রকারেই তার কল্যাণের

সামর্থ্য যায় ক্ষীণ হয়ে। এর চেয়ে অবনতি কাগজের আর নেই। কেবল অসত্য বা অন্যায়ের জন্যই নয়, নিশ্চয় জেনো কুশ্রীতা কখনো দীর্ঘজীবী হয় না।*

শুভাকাঙ্খী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমার প্রশ্ন আমি নাটক লিখি না কেন? বোধ করি, তোমার এ জিজ্ঞাসা মনে এসেছে দুটো কারণে। প্রথম, নাট্যকার এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী সম্প্রতি 'বাতায়নে' বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে তুমি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারোনি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিরন্তর যে-সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখে থাকো, তাদের ভাব, ভাষা, চরিত্রগঠন ইত্যাদি বিচার করে দেখবার পর তোমাদের মনে এই কথা জেগেছে যে, শরৎচন্দ্র নাটক লিখলে হয়ত রঙ্গমঞ্চের চেহারার একটু পরিবর্ত্তন হতে পারে।

তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি, তা হলেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিকপত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ জায়গাটায় অ্যাকশন (action) কম,—দর্শক নেবে না, কিংবা এ বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ-সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ, তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামাকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু— যা ভালো না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌছায় না— সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমনভাবে বলতে হয়, কত সোজা করে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে-কৌশল জানিনে, তা

* (১) ও (২) সংখ্যক পত্র দুইটি 'বাতায়ন'-সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে লিখিত।

নয়। এ-ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা-সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি বলেই বিশ্বাস করি। নাটকের ঘটনা বা সিচুয়েশন সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্তেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু-রকমের হতে পারে:—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্ত্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয়ত বিশ বচ্ছর আগে উইলসনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্ম্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয়ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্ত্তন। হয়ত অনেকগুলো ঘটনার আবর্ত্তে পড়ে, পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যি করে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হলে-ত হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি করে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্ত্তনের হেতু খুঁজে মেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই; নাটককে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয়ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, করে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পড়ে না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি একদিন বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা হয়ত চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে।*

—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১)

পরম কল্যাণীয়াসু, সামতাবেড়

……ষোড়শী দেখে খুশী হয়েছ শুনে আমিও খুশী হোলাম। বাস্তবিক কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির (শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী)। আরও চমৎকার তার

* শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত।

শেখানোর পদ্ধতি।……অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে। তারই বাহাদুরি।

আমার লেখা 'সাহিত্যের রীতি-নীতি' পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো লিখেচো। তোমার মনে হয়েছে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে লেখাটা আরও একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করি - আমার গুরুস্থানীয় তিনি, এ ত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে যা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি—আর এক রকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হয়েও থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।

তোমরা একটা কথা তেমন জানো না যে আমার ভাষার ওপরে অধিকার সত্যিই কম। বিনয়ের জন্যে বলছিনে, তোমার মত আত্মীয়ার কাছে মিছে বিনয় করে লাভ কি বল ত? তবুও বলচি এ কথা আমার যথার্থ-ই মনের কথা। ভাষার উপরে দখল এতই অল্প যে দু'ছত্র কবিতা পর্য্যন্ত মেলাতে পারিনে,—কথা খুঁজে পাইনে। তাই যে কেউ যেমন তেমন কবিতা লিখলেও বিস্মিত হয়ে যাই। এই কারণেই বলতে চাইলাম এক, আর হয়ে গেল অন্য। তোমরা দুঃখিত হয়ে ভেবে নিলে—দাদা বুড়ো মানুষ হয়েও আর এক বুড়োকে আক্রমণ করেছে।

সে যাই হোক, নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক স্নেহ এবং টান আছে। তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথা লাগে। তা ছাড়া কত বড় অন্যায় অপবাদ তাদের দেওয়া হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয় এরা গরীব বলেই এই সব নোঙরা ব্যাপার ঘাঁটা-ঘাঁটি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি ভাল করেই জানি বিরুদ্ধদলের লোকেরা এই রকমই কথা বলে বেড়ায়।

কোনদিন যদি তোমার বড়দাকে ভাল করে জানতে পারো ত বুঝবে—বিদ্বেষ বলে জিনিসটা তার মধ্যে নেই বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। একটা কথা তোমাকে জানাই, কারুকে বোলো না। 'পথের দাবী' যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্ণমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না। ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—"পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং

ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্নমেণ্টকে যা' তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।"

ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেট্‌সম্যান প্রভৃতি ইংরাজী কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা-বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে। ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতি-নীতি লিখি। তাতেই বোধহয় কোথাও কোন জায়গায় একটু-আধটু তীব্রতার ঝাঁঝ এসে গেছে। যাই হোক যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি ভাই?······ ইতি—১০ই অক্টোবর, ১৯২১

বড়দাদা

সামতাবেড়

(২)

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম এবং নূতন বছরের আরম্ভে যে আশীর্ব্বাদ চেয়েছিলে, তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করিনি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠেনি ভাই। "এই কালই জবাব দেবো" এই একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই করেচি এবং করতে করতে মাস-দেড়েক কেটে গেলো। এমনি স্বভাব। অথচ তোমাদের আজও এ জ্ঞান জন্মালো না যে ভাবো—"দাদাটি তোমাদের স্বর্গে গেছেন—আর তাঁকে স্মরণ করাই বা কেন, আর তার আশীর্ব্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্যে।" আর কদিনই বা বাকী আছে বোন—একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেছেন। তোমরা পারো না?

একটা কথা লিখেচো দেখলাম যে—কমলের স্রষ্টা রমার স্রষ্টা তো নয় যে—ইত্যাদি। তার মানে যে রমার স্রষ্টাই তোমাদের বুঝতেন—তোমাকে আদর করতে

পারতেন, কিন্তু কমলের কথা যিনি লিখতে আরম্ভ করেছেন তাঁর কাছে আর ভরসা করবার কি আছে ? এই না কি ?

কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে যে পল্লী-সমাজের রমা পল্লী-সমাজেরই মানুষ। যাদের অস্তিত্ব নিত্য নিয়ত আমরা অনুভব করি। সুখে দুঃখে ভালোতে মন্দতে যাদের আমরা কাছে পাই। কিন্তু শেষ প্রশ্নের কমলের কাছে সে প্রত্যাশা করা চলে কি করে ?

আর একটা কথা রাধু। লোকে লিখতে বলে – না লিখলেও দেখি চলে না—কিন্তু এই প্রাচীনকালে আগেকার দিনের অর্থাৎ যৌবনের সে শক্তি পাবো কোথায় ? তাই এখন এই শেষ বয়সের জোর করে লেখার শতেক ত্রুটি শতেক অভাব লোকের চোখে পড়ে। লেখার দৈন্য এখন নিজেই অনুভব করি। ভাষার সে শ্রীও নেই, বাঁধুনিও গেছে। সব যেন এলো-মেলো শিথিল হয়ে দেখা দিচ্চে—না ? দেবার কথাও। আসলে আমি ত সাহিত্যিক নই দিদি। এ যেন আমার এম. এস. সি পাশ করে ওকালতি পেশা ধরা। সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাইনে, যেমন পাই বিজ্ঞানের মধ্যে। এইজন্যেই হয়ত আমি তৈরী হয়েছিলাম, কিন্তু গ্রহের ফেরে হয়ে গেলো ঠিক উল্টো। ভাবি, আবার যদি কথনো জন্ম হয়, সেবার যেন না এত বড় ভুল আর ঘটে। …ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ,'৩৮*

বড়দা

* (১) ও (২) সংখ্যক পত্র দুইটি শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে লিখিত।

গ্রন্থ-পরিচয়

ষোড়শী

প্রথম প্রকাশ—সর্ব্বপ্রথম পুস্তকাকারে, ১৩ই আগস্ট, ১৯২৭ খ্রীঃ (শ্রাবণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ)। ইহা 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ।

বৈকুণ্ঠের উইল

প্রথম প্রকাশ—'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—৫ই জুন, ১৯১৬ খ্রীঃ (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)।

অনুরাধা

প্রথম প্রকাশ—১৩৪০ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রে।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'সতী' ও 'পরেশ' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত একত্র গ্রন্থাকারে, ১৮ই মার্চ, ১৯৩৪ খ্রীঃ (ফাল্গুন, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ)

হরিলক্ষ্মী

প্রথম প্রকাশ—১৩৩২ বঙ্গাব্দের শারদীয়া সংখ্যা 'বসুমতী' মাসিক পত্রিকায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত একত্র পুস্তকাকারে, ১৩ই মার্চ, ১৯২৬ খ্রীঃ (চৈত্র, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ)।

সতী

প্রথম প্রকাশ—১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'অনুরাধা' ও 'পরেশ' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত পুস্তকাকারে, ১৮ই মার্চ, ১৯৩৪ খ্রীঃ (ফাল্গুন, ১৩৪০ বঙ্গাব্দ)।

মামলার ফল

প্রথম প্রকাশ—১৩২৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত বার্ষিকী 'পার্ব্বণী' পত্রিকায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'ছবি' ও 'বিলাসী' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত পুস্তকাকারে, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২০ খ্রীঃ (মাঘ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)।

বিলাসী

প্রথম প্রকাশ—১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায়।

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—'ছবি' ও 'মামলার ফল' নামক অপর দুইটি গল্পের সহিত পুস্তকাকারে, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২০ খ্রীঃ (মাঘ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ)।

বাল্যকালের গল্প

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৯৩৮ খ্রীঃ (বৈশাখ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। ইহার অন্তর্ভুক্ত সাতটি গল্পের মধ্যে নিম্নোক্তগুলির প্রথম প্রকাশকাল :

(ক) লালু (১৩৪৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'মৌচাক' মাসিক পত্রে)।

(খ) কলকাতার নূতন-দা (১৩৪৪ বঙ্গাব্দের বার্ষিকী 'গল্পের মণিমালা'য়)।

(গ) ছেলেধরা (১৩৪২ বঙ্গাব্দের পূজা-বার্ষিকী 'ছোটদের আহরিকা'য়)।

দশম সম্ভার

সমাপ্ত